একক ১ □ জ্ঞাপন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ জ্ঞাপনের ধারণা
১.৩ মানবিক জ্ঞাপন
১.৪ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা
১.৫ উপাদান
১.৬ জ্ঞাপনের কাজ
১.৭ জ্ঞাপনের ইতিহাস
১.৮ জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ
১.৯ পারস্পরিক জ্ঞাপন
১.১০ অর্ন্তমুখী জ্ঞাপন
১.১১ দলগত জ্ঞাপন
১.১২ গণজ্ঞাপন
১.১৩ চিরায়ত জ্ঞাপন
১.১৪ সারাংশ
১.১৫ অনুশীলনী
১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

জ্ঞাপন বিষয়ে কিছু মৌলিক ধারণা দেওয়াই এই এককের লক্ষ্য। আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন একে একে কীভাবে তুলে ধরা হবে মৌল কয়েকটি বিষয় যা জ্ঞাপন বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে। যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হবে সেগুলি হল ঃ

- জ্ঞাপনের ধারণা ও সংজ্ঞা
- উপাদান
- কাজ
- জ্ঞাপনের ইতিহাস
- জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ

১.১ প্রস্তাবনা

জ্ঞাপন বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আলোচিত হবে এখানে। বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরে একেবারে যথাযথ রূপটি পাওয়া যাবে। তারপর জানা যাবে জ্ঞাপনের উপাদান, কাজ কী। প্রতিনিয়ত জ্ঞাপন বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করছে। জ্ঞাপনের ইতিহাসও চমকপ্রদ। তার পরিচয়ও দেওয়া হবে।

১.২ জ্ঞাপনের ধারণা

মানব জগতে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে জ্ঞাপন। মানুষ একে অপরের কাছে নিজেকে মেলে ধরছে। প্রকাশ করছে নিজ মনোভাবনা। এভাবেই ঘটে চলেছে মানবজগতের নিত্য জ্ঞাপন-ক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য যেমন দরকার জল ও খাদ্য। ঠিক তেমনি মানুষের চাহিদা, অনুভব, ক্ষোভ, ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশের জন্য জ্ঞাপনের প্রয়োজন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই রয়েছে জ্ঞাপনের তাগিদ।

জ্ঞাপনের ইংরেজি হল Communication। লাতিন শব্দ Communis থেকে এসেছে। Communis কথার মানে হল Common, অর্থাৎ সাধারণ। কেউ যখন কোন অনুভব, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়াকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে সাধারণগ্রাহ্য করে তোলে, তখনই উদ্ভব হয় জ্ঞাপনের। প্রখ্যাত জ্ঞাপনবিদ Denis MacQuail বলেছেন 'Communication is a process which increases commonality'। একজন বলছে আর একজন শুনছে। পরস্পরের মধ্যে ঘটছে ভাব বিনিময়, বার্তার আদানপ্রদান। একজনের ভাবনা আর একজন ভাগ করে নিচ্ছে। ব্যক্তিভাবনা এভাবেই হয়ে উঠছে সাধারণগ্রাহ্য।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও এই সাধারণগ্রাহ্যতার প্রসঙ্গ রয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সাধারণীকরণের কথা বলা হয়েছে। রস অনুধাবনে এই সাধারণীকরণের ভূমিকা রয়েছে। একজন প্রকাশ করছিল এবং অন্যজন তা গ্রহণ করছেন, দু-দুজনকেই আসতে হবে সম-হৃদয়ের কাছাকাছি। তাহলেই শিল্পরসের ভাগাভাগি সার্থক হয়ে উঠবেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হবে দুই জনে।" প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রবিশংকরের কথায় "গানবাজনা একটা লেনদেনের ওপর চলে। শুধু যে বাজাচ্ছে তার ওপরই সবটা নয়। যে শুনছে তার ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে।" শুধু শিল্পে নয়, প্রতিদিনের প্রাত্যাহিকতাতেও জড়িয়ে আছে দু-পক্ষের সমান অংশগ্রহণ। আর এই অংশগ্রহণ যদি সফল হয় তাহলেই সার্থক হয়ে ওঠে জ্ঞাপন।

জ্ঞাপন হয় প্রতীকের মাধ্যমে। এই প্রতীক ভাষা হতে পারে, ছবি হতে পারে, দেহের ভঙ্গীমা অথবা সুরও হতে পারে। যার প্রতি এই জ্ঞাপন হচ্ছে তাকে এই প্রতীকি ভাষা বুঝতে হবে। যে বার্তা পাঠাচ্ছে এবং যে গ্রহণ করছে, দুজনই জানবে এই ভাষা এবং এটা সম্ভব হলেই তৈরি হবে সেই পরিপ্রেক্ষিত যাকে ইংরেজিতে বলে Shared symbolic enviornment যার মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে। একজন আর একজনের অনুভব ও ভাবনা বুঝতে পারে।

১.৩ মানবিক জ্ঞাপন

মানবসমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত এই যে ভাবনার আদানপ্রদান ঘটছে তাকেই বলা হয় Human Communication বা মানবিক জ্ঞাপন। Denis MacQuail মানব জগতের এই জ্ঞাপনকে মানবিক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন অর্থবহ বার্তার আদানপ্রদানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় human communication। মানুষ শুধু

নিজের ভাবনা ও অনুভবকে প্রকাশ করে এবং অপরকে সঠিকভাবে জেনে মানবিক জ্ঞাপনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করছে এবং তৈরি হচ্ছে সামাজিক অসহযোগিতার বাতাবরণ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্পর্ক স্থাপনে মানবিক জ্ঞাপনের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১.৪ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা

জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাপনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করেছেন জ্ঞাপনের চরিত্রকে। এবার তাঁদের বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

কলিন চেরি বলেছেন জ্ঞাপন হল উদ্দীপনা প্রেরণ এবং প্রত্যুত্তর সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Communication is transmission of stimuli and the evocation of response)। একজন ব্যক্তি যখন অন্য একজনের কাছে কোন বার্তা পাঠায় তখন ঐ বার্তার অবশ্যই উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। উদ্দীপনা থেকেই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। আর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রত্যুত্তর। Collin Cheery-র মূল বক্তব্য হল বার্তা বিনিময়ের মতো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ থাকে না। উদ্দীপনা ও প্রত্যুত্তর জ্ঞাপনকে অর্থবহ করে তোলে। বার্তার আদানপ্রদান নতুন মাত্রা যোগ করে।

জর্জ গার্বনার জ্ঞাপনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, জ্ঞাপন হল বার্তা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত এক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Communication is social interaction through messages)। জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে যে বার্তা বিনিময় ঘটছে তা সর্বদাই সামাজিক আন্তসম্পর্ককে প্রভাবিত করছে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য জ্ঞাপন ঘটছে তা অনিবার্যভাবে তৈরি করছে এক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া যার মাধ্যমে নিরন্তর মানুষ, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিকদল, সরকারের মধ্যে আন্তসম্পর্ক গড়ে উঠছে। পরিণামে তৈরি হচ্ছে এক বিশেষ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত যার মধ্যে নিহিত থাকছে নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, নীতি, জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা। জ্ঞাপন যত বেশি ঘটবে তত বেশি আন্তসম্পর্কের ক্ষেত্রে তত বিস্তৃত হবে। ফলে সামাজিক মিথস্ক্রিয়াও তীব্র হয়ে উঠবে।

উইলবার স্রাম বলেছেন, জ্ঞাপন সাধারণগ্রাহ্যতা প্রতিষ্ঠা করে। আমরা যখন কাউকে কিছু জ্ঞাপন করি তখন তার সঙ্গে তথ্য, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেওয়ার চেষ্ট করি। প্রেরক ও গ্রহীতা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়। সাধারণগ্রাহ্যতার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় এই পারস্পরিক বোঝাপড়া। Schramm-এর কথায় "When we communicate, we are trying to establish a commonness with some one. That is, we are trying to share information, an idea or an attitude."

John C. Merril এবং Ralph L. Lowerstein জ্ঞাপনকে দ্বি-মুখী রাস্তা বলে অভিহিত করেছেন। এঁদের বক্তব্য হল "Communication as a process is a two way street, messages flow bothways... ..." বার্তা বিনিময় যখন ঘটে তখন তা এই দ্বিমুখী রাস্তা ধরে চলে। প্রেরক ও গ্রহীতা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুই প্রান্তে। তাঁদের আদান প্রদান দ্বিমুখী এই রাস্তায় ঘটছে।

Bernard Berelson এবং Leonard Berkowitz বলেছেন জ্ঞাপন হল প্রতীকের সাহায্যে তথ্য, আবেগ, ভাবনা ও দক্ষতার প্রেরণ (Communication is the transmission of information, ideas, emotions, skills etc. by use of symbols)। যে কোন বার্তার মধ্যে তথ্য, আবেগানুভূতি, ভাবনা ও দক্ষতা থাকতে পারে। অন্য কোন মানুষের কাছে এগুলিকে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জ্ঞাপনের সাহায্য নিতে পারে। জ্ঞাপন-ক্রিয়া এগুলিকে পৌঁছে দেবে প্রতীকের সাহায্যে। এই প্রতীক ভাষা দৃশ্য অথবা সুরে হতে পারে। যে কোন জ্ঞাপনে প্রতীকের উপস্থিতি থাকা দরকার। প্রতীক ছাড়া জ্ঞাপন কোন মতেই সম্ভব নয়। প্রতীকের

গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে Denis C. Alexander জ্ঞাপনকে প্রতীকি আচরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন জ্ঞাপন হল, প্রতীকি আচরণ যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন অর্থ ও মূল্যবোধ পৌঁছে দিচ্ছে (Communication is a symbolic behaviour, which results in various degrees of shared meanings and values between participants)। কথায়, সুরে যেভাবেই হোক না কেন, আমরা একটি তথ্য অথবা ভাবাবেগ পৌঁছে দিতে চাই অন্য কারোর কাছে। কথা এখানে প্রতীক এবং কথার দ্যোতনা চায় গ্রহীতাকে প্রভাবিত করতে। দুঃখের কথার দুঃখবোধ, সুখের কথায় আনন্দ পৌঁছে দিতে পারলেই জ্ঞাপন সফল হবে।

১.৫ উপাদান

জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয় উপাদান পাঁচটি। এগুলি হল যথাক্রমে (১) প্রেরক, (২) গ্রহীতা, (৩) বার্তা, (৪) মাধ্যম, (৫) প্রতিক্রিয়া। যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়ার এই পাঁচটি উপাদান থাকবেই। প্রেরক ও গ্রহীতা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন বার্তা পাঠাবার জন্য। বার্তা পৌঁছায় মাধ্যমের দ্বারা। বার্তা পৌঁছলেই কিন্তু জ্ঞাপন শেষ হয়ে যায় না। যিনি বার্তা গ্রহণ করছেন তাঁর মধ্যে বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে সেটাও লক্ষণীয়। ধরা যাক দুই বন্ধু টেলিফোনে কথা বলছে। একজন হল প্রেরক এবং অন্যজন হল গ্রহীতা। কথা হল বার্তা, টেলিফোন হল মাধ্যম। সে বন্ধু শুনছে তার মধ্যে কথা রূপ বার্তা প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। ঐ প্রতিক্রিয়া মধ্য থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন ভাবনা যা বার্তা হিসেবে আবার ফিরে আসছে প্রেরকের কাছে। এই পাঁচটি উপাদানের নিজস্ব মাত্রা রয়েছে। প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে জ্ঞাপনকে প্রভাবিত করে। প্রথমে প্রেরক বার্তা নির্ধারণ করেন। বার্তার রূপ কি হবে তা ঠিক করবেন প্রেরক। বার্তার রূপ নির্ধারণে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়। যেমন কাকে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রহীতা কে এবং কীভাবে বলা হবে অর্থাৎ কোন মাধ্যমে। এমন কি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথাও মাথায় রাখতে হয়। মাধ্যমের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যম টেলিফোন হতে পারে। সংবাদপত্র হতে পারে, রেডিও অথবা টেলিভিশনও হতে পারে। মাধ্যম জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রযুক্তিগত উন্নতি মাধ্যমকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলেছে। গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। টেলিভিশন জ্ঞাপনক্রিয়ায় এত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে যে বার্তা থেকে গ্রহীতা এমনকি প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত এই উন্নত মাধ্যমটির দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। জ্ঞাপনক্রিয়া কতখানি সফল হল তা বোঝা যাবে বার্তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে। গ্রহীতা বার্তা গ্রহণ করে কতটা উদ্দীপিত হচ্ছে সেটা বোঝা যাবে প্রতিক্রিয়া দিয়ে। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে গ্রহীতার মধ্যে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কথা ভেবে। মন্তব্য প্রতিক্রিয়ার কথা অনেক সময় আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়।

১.৬ জ্ঞাপনের কাজ

প্রত্যেকটি জ্ঞাপন-ক্রিয়ার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। আর তা রূপায়ণের জন্যই জ্ঞাপনকে কাজ করতে হয়। তথ্য, ভাবনা ও মতামতের আদান-প্রদান সমাজে অনেক কাজ করছে। এই কাজগুলি আলোচনা করলেই জ্ঞাপন-ক্রিয়ার সামগ্রিক কাজের রূপটি পাওয়া যাবে। বর্তমানে আধুনিক সমাজে জ্ঞাপনের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। যতদিন যাচ্ছে কাজের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজগুলি হল যথাক্রমে ঃ

ক) তথ্য সরবরাহ করা ঃ

তথ্য সরবরাহ করা জ্ঞাপনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। অধিকাংশ জ্ঞাপন-ক্রিয়া এই তথ্য সরবরাহের কাজ

সম্পন্ন করছে। শিক্ষক শিক্ষা দিতে গিয়ে তথ্য দিচ্ছেন ছাত্রকে, সংবাদপত্র তথ্য দিচ্ছে, সরকার ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রচুর তথ্য সরবরাহ করছে। তথ্যের আদান-প্রদান মানুষকে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছে।

খ) শিক্ষা ঃ

জ্ঞাপনের অন্যতম কাজ হল শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্রই জ্ঞাপনের মাধ্যমে শিক্ষার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন, ছাত্র লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়ছে সবেতেই রয়েছে জ্ঞাপন। জ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষ আরও শিক্ষিত, পরিণত হয়ে উঠছে। বক্তৃতা, বইপত্র, আলাপ-আলোচনা এবং সাম্প্রতিককালে বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের মধ্যে। সামাজিক, সংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ বিষয় সম্পর্কে উন্নত চিন্তাভাবনা বয়ে চলেছে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে। তৈরি হচ্ছে শিক্ষার উত্তরাধিকার।

গ) বিনোদন ঃ

জ্ঞাপনের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজটি হল বিনোদন। প্রতিদিন জ্ঞাপনের মাধ্যমে হরেক রকম বিনোদন পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। মানবজীবনকে সুন্দর ও সুখী করে তোলার কাজে বিনোদনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথায়, সুরে, নাটকে মানুষ এই বিনোদন পাচ্ছে। এ সবই হল জ্ঞাপন। বর্তমানে বিনোদনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমে হল সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ভিডিও, রেডিও ও টেলিভিশন। উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টা বিনোদনের প্যাকেজ পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে। গণমাধ্যমের বিপুল জনপ্রিয়তার পিছনে জ্ঞাপনের এই বিনোদন দেবার ক্ষমতাই প্রধান কারণ। গ্রাম জীবনেও লোকসংস্কৃতি কোটি কোটি মানুষের কাছে বিনোদন পৌঁছে দিচ্ছে। লোকগান, লোকনৃত্যের মতো জ্ঞাপনক্রিয়া মানুষের মন জয় করছে।

ঘ) প্রণোদন ঃ

প্রণোদনের কাজটিও করে জ্ঞাপন। মানুষের মতামত ও আচরণে প্রভাবিত করার জন্যই প্রণোদনের প্রয়োজন। বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক প্রকল্পকে সফল করার জন্য মানুষকে প্রণোদিত করা দরকার। জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সভা-সমিতি ও আধুনিক গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রণোদনের লক্ষ্যে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব সাধারণ মানুষের কাছে। আইন মেনে চলা দরকার, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার চালানো হয়। মানুষকে প্রণোদিত করাই এই প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ও পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য আবেদন সমৃদ্ধ জ্ঞাপন-বার্তা সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়শই প্রচারিত হয়।

ঙ) সামাজিকীকরণ ঃ

এই প্রক্রিয়া মানুষকে সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তথ্যের আদান-প্রদান ও শিক্ষাবিস্তার যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণ তৈরি করে প্রকৃতপক্ষে তাই সামাজিকীকরণকে বাস্তবায়িত করে। পরিবারে, স্কুল কলেজে, প্রতিনিয়ত মানুষ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে নিজেকে যুক্ত করে, সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে। ধীরে ধীরে সমাজের একজন হয়ে ওঠে। বর্তমানে গণমাধ্যম এই সামাজিকীকরণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চ) সুসংহতি ঃ

সমাজের মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য, চিন্তা-ভাবনা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর আদানপ্রদানের ফলে সংহতি আসে। জ্ঞাপন মানুষে মানুষে যোগাযোগ ঘটার, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসে। সামাজিক ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা দূর হতে পারে। জ্ঞাপন শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজন মেটায় না, সামাজিক চাহিদাও পূরণ করে।

১.৭ জ্ঞাপনের ইতিহাস

জ্ঞাপনের হাত ধরেই মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনা হয়েছে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই অনুপ্রাণিত করেছে মানুষকে নিজেকে প্রকাশ করতে। প্রথমে মানুষের মুখে ভাষা ছিল না। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদে একদিন তার মুখে উঠে এল ভাষা। নিজের অনুভব, চাহিদা ও প্রয়োজনকে শব্দ প্রতীকের মাধ্যমে মানুষ প্রকাশ করতে শিখল। উইল ডুরান্ট বলেছেন মানব সভ্যতার শুরু হল যেদিন, সেদিন প্রথম মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল কয়েকটি বিশেষ্য পদ। আগুন, ঝড়, পাহাড়, সমুদ্র, বৃষ্টি শব্দ প্রকাশ করল বাস্তব পরিস্থিতি ও অবস্থাকে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রয়োজনকে আলাদা করে চিনতে পারল এবং প্রয়োজনমতো তা প্রকাশ করতে শিখল। মুখের ভাষা, গান, ড্রাম, অগ্নিসংকেত, শারীরিক মুদ্রা প্রভৃতির দ্বারা একের সঙ্গে অপরের, একের সঙ্গে বহুর সম্পর্ক তৈরি হতে শুরু হল।

প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা। এই ভাষা হল কতকগুলি প্রতীকের সমষ্টি। প্রথমে ভাষা বলতে ছিল শুধু মুখের ভাষা। বুদ্ধি দিয়ে এবং সহজাত অনুকরণ ক্ষমতা দিয়ে মানুষ নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেছে। শব্দের অর্থ যাতে সকলের কাছে সমানভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছে। যেমন মানুষ বলতে সকল মানুষ, বাড়ি বলতে সকল আবাসস্থল বোঝা যায়। একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতীকি অর্থ সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই মুখের ভাষার সীমাবদ্ধতা বোঝা যায়। মুখের কথায় কেবলমাত্র দু'দশজনকেই মনের ভাব বোঝানো যায়। বহু মানুষের দরবারে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় না। তাই লিখিত ভাষায় অন্বেষণ শুরু হয়। আবিষ্কার হয় চিত্রের মধ্য দিয়ে ধ্বনির বিকল্প প্রতীকগুচ্ছ। ধীরে ধীরে তা রূপ নেয় বর্ণমালায়। বর্ণমালাকে আশ্রয় করে এর পর জন্ম নেয় লিখিত ভাষা। হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ যে ভাষা ব্যবহার করি তা গড়ে উঠেছে।

De Vito ভাষার তিনটি কার্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল ঃ (১) ভাষা জ্ঞাপনের প্রাথমিক বাহন হিসবে কাজ করে, (২) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে এবং তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রকাশ ঘটায়। এর ফলে ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি উভয়ই বিকশিত হয়, (৩) সমাজ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং সামাজিক গোষ্ঠীর কার্য ও নিয়ন্ত্রণকে সুগঠিত করে। ভাষার উপযোগিতা বোঝাতে এই কাজগুলি যথেষ্ট। যতদিন গেছে ভাষা আরও উন্নত হয়েছে এবং তা জ্ঞাপনকে করেছে সুসংহত ও সুগঠিত।

যন্ত্রের ব্যবহার জ্ঞাপনের ইতিহাসে বৈপ্লবিক রূপান্তর নিয়ে এসেছিল। এর আগে নবম শতাব্দীতে চীনে কাগজের আবিষ্কার ঘটেছিল। যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন বিষয়কে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার জ্ঞাপন ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছিল এক বিরাট পরিবর্তন। ১৪৫৬ সালে জার্মানিতে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন মুভেবল টাইপ ও মুদ্রণযন্ত্র। প্রথম বই ছাপা হয় বাইবেল। দ্রুত ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। ছাপা হতে থাকে বই ও প্যামফ্লেট। মুদ্রণযন্ত্র সংবাদপত্রের প্রকাশনাকেও সম্ভব করে তোলে। ১৬২২ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় উইকলি নিউজ। ১৬৯০ সালে বোস্টন থেকে প্রকাশিত হয় পাবলিক অকারেন্স। সংবাদপত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের রূপরেখা তৈরি হয়ে যায়।

১৮৩৫ সালে Samuel Morse আবিষ্কার করেন টেলিগ্রাফ। তারের মাধ্যমে দূরপ্রান্তরের সঙ্গে সংযোগরক্ষায় টেলিগ্রাফ হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। তথ্য সরবরাহে ও যোগাযোগ রক্ষায় টেলিগ্রাফ যুগান্তকারী

ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৬ সালে Graham Bell-এর টেলিফোন আবিষ্কারের পর জ্ঞাপনে আরও বেশি গতি যুক্ত হল। মুহূর্তের মধ্যে এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হল। প্রেরক ও গ্রাহক একই সঙ্গে জ্ঞাপনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। টেলিফোনে প্রেরক সরাসরি বার্তা পৌছে দিতে পারে গ্রহীতার কাছে। টেলিফোন আবিষ্কারের পর থেকেই জ্ঞাপন ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে Edison -এর ফোনোগ্রাফ জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে। ১৮৯৫ সালে লুমিয়ের ব্রাদার্স ফ্রান্সে প্রথম সিনেমা প্রদর্শন করেন। সিনেমা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯০১ সালে বেতার সম্প্রচার মার্কিন বিজ্ঞানী মার্কিন প্রথম করে দেখালেও, বেতার আবিষ্কারের পিছনে বহু বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে। মাইকেল ফ্যারাডে, হাইনারিখ হারৎজ তার পূর্বে বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখান। প্রথম বেতার সম্প্রচার হয় ১৯২০ সালের ২ নভেম্বর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিটস্‌বার্গ শহরে। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি বেতার সম্প্রচার শুরু করে। ভারতে প্রথম বেতার সম্প্রচার হয় ১৯২১ সালে বোম্বাই শহরে।

টেলিভিশন সম্প্রচারের আবিষ্কারের পিছনেও বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্ট রয়েছে। জার্মানি বিজ্ঞানী Paul Gottileb Nipkon ১৮৬৪ সালে প্রথম এক জায়গার ছবি অন্য জায়গার পাঠাবার চেষ্টা করেন। ১৯২২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী Philo T. Fransworth electronic Scanning আবিষ্কার করেন। ১৯২৬ সালে J. L. Baird রয়াল ইনস্টিটিউটে টেলিভিশনের ছবি সম্প্রচার পরীক্ষাসহ উপস্থিত করেন। ১৯২৮ সালে বিবিসি প্রথম স্থির চিত্র পরীক্ষামূলকভাবে পাঠানো শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে বিবিসি আলেকজান্দ্রা প্রাসাদ থেকে প্রথম সাধারণ মানুষের জন্য টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু করে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার টেলিভিশন সমাজ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। ভারতে প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে।

কম্পিউটার প্রযুক্তি জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্র আমূল বদলে দিয়েছে। মুদ্রণ থেকে উপগ্রহ চ্যানেল সমস্ত গণমাধ্যমই আজ কম্পিউটার প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। ইন্টারনেট ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর। সমগ্র বিশ্বই ঘনিষ্টসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। পৃথিবী আজ বিশ্ব গ্রামে (global village) পরিণত হয়েছে। গণমাধ্যম এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে সাংস্কৃতিক রূপরেখাই গেছে পাল্টে। সামাজিক যোগাযোগের ওপর মানুষ আর এখন নির্ভর করে না। ঘরে বসে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সারা বিশ্বের সঙ্গে সে যোগাযোগ বজায় রাখছে। সমাজতাত্ত্বিকেরা একে বলছেন গণসংস্কৃতি (mass culture)।

সারসংক্ষেপ ঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ তৈরি হয় জ্ঞাপনের মাধ্যমে। মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কথায়, সুরে, ছবিতে, দেহের ভঙ্গীমায় ও লেখায়। মনের ভাব, প্রতিক্রিয়া প্রকাশের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই মানুষকে জ্ঞাপনে উৎসাহিত করেছে। লাতিন শব্দ communis থেকে ইংরেজি communication। জ্ঞাপন সর্বদা চেষ্টা করে একটা সাধারণগ্রাহ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে। একজন আরেক জনের কথা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। সাধারণগ্রাহ্যতা আছে বলেই তা সম্ভব। সংস্কৃত সাহিত্যেও সাধারণীকরণের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে রবিশংকর সকলেই জ্ঞাপনকার্যে প্রেরক ও গ্রহীতার সমান অংশগ্রহণের কথা বলেছেন।

সংজ্ঞা ঃ বিভিন্ন জ্ঞাপনবিদরা জ্ঞাপনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে Colin, Cherry, George Gerbuer, Wilbur, Schramm, Ralph L. Lowerstein উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে মূল যে বক্তব্য বেরিয়ে আসে তা হল জ্ঞাপন একটি বিরামবিহীন প্রক্রিয়া যা দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে প্রতীকের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে।

উপাদান ঃ জ্ঞাপনের উপাদান পাঁচটি — (১) প্রেরক, (২) গ্রহীতা, (৩) বার্তা, (৪) মাধ্যম, (৫) প্রতিক্রিয়া। যে কোন জ্ঞাপনে অতি অবশ্যই এই পাঁচটি উপাদান থাকবে। প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব মাত্রা রয়েছে, যা জ্ঞাপনকে সার্থক করে তোলে।

জ্ঞাপনের কাজ ঃ জ্ঞাপনক্রিয়া যে সমস্ত কাজ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তথ্যসরবরাহ, শিক্ষা, বিনোদন, প্রণোদন, সামাজিকীকরণ, সুসংহতি ইত্যাদি।

জ্ঞাপনের ইতিহাস ঃ জ্ঞাপনের উদ্ভব হয়েছে সভ্যতার একেবারে উষাকালে। প্রথমে মানুষ দেহের ভঙ্গীমায় নিজেকে প্রকাশ করত। পরে তার মুখে এল ভাষা। এরপর লিখিত ভাষার উদ্ভব হয়। কাগজের আবিষ্কার ও মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার জ্ঞাপন ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি নিয়ে আসে। উদ্ভব হয় সংবাদপত্রের। এরপর আবিষ্কৃত হয় টেলিগ্রাফ। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত হয়ে ওঠে। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন এবং সিনেমা আবিষ্কারের ফলে আধুনিক গণমাধ্যম জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্র আমূল পাল্টে দেয়। কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবস্থা বিশ্বের নানা প্রান্তকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলেছে। বাস্তবায়িত হয়েছে বিশ্বপল্লীর global village-এর ধারণা।

১.৮ জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ

জ্ঞাপনের প্রকৃতি ও চরিত্র অনুযায়ী জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে জ্ঞাপন দু'রকম হতে পারে — ১) মৌখিক (verbal), ২) অ-মৌখিক (non-verbal)।

মৌখিক জ্ঞাপন (verbal communication) **ঃ** কথার মাধ্যমে যে জ্ঞাপন হয় তাকেই বলা হয় মৌখিক জ্ঞাপন। দুই বন্ধু কথা বলছে, নেতা ভাষণ দিচ্ছেন, শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন, এ সবই হল মৌখিক জ্ঞাপন। মুখের ভাষাই এই জ্ঞাপনে বার্তা এবং গানও মৌখিক জ্ঞাপনের মধ্যে পড়ে। প্রেরক ধ্বনির প্রয়োগ ঘটান তিনি কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে চান সেটা ভেবে নিয়ে। আনন্দের কথা, খুশীর কথা তিনি যেভাবে বলেন, দুঃখের, বিষাদের কথা সেভাবে বলেন না। টেলিফোনে, বেতারে ও টেলিভিশনেও মৌখিক জ্ঞাপনের প্রয়োগ হতে পারে। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার এই জ্ঞাপনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রেরক তাঁর বার্তা এই অনির্দিষ্ট শ্রোতৃমন্ডলী অথবা দর্শকমন্ডলীর কাছে পৌঁছে দেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না।

অ-মৌখিক (non-verbal) **ঃ** কথা ছাড়াও জ্ঞাপন হয়। দেহের ভঙ্গীমায়, লেখায় ছবিতে যে প্রকাশ তা অ-মৌখিক জ্ঞাপন। নৃত্যে, চিত্রকলায় যে শিল্পরূপ ফুটিয়ে তোলা হয় তার উদ্দেশ্য হল মানুষের মন জয় করা। মানুষের মনকে নাড়া দেবার জন্যই তৈরি হয় নৃত্যের ছন্দ, চিত্রকলার রং রেখার কারুকার্য। দর্শক নৃত্য দেখে, ছবি দেখে শিল্পরসের সন্ধান পায়। এটা সম্ভব হচ্ছে অ-মৌখিক জ্ঞাপনের মাধ্যমে। লেখায় ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। বই, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতি মুদ্রণ মাধ্যমেও যে জ্ঞাপন হচ্ছে তা হল অ-মৌখিক জ্ঞাপন। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞাপন হচ্ছে, যেমন ই-মেল, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জ্ঞাপন ইত্যাদি। এগুলিও অ-মৌখিক জ্ঞাপন।

১.৯ পারস্পরিক জ্ঞাপন

দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক যে জ্ঞাপনক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে বলে পারস্পরিক জ্ঞাপন বা interpersonal communication। কথাবার্তার আদান-প্রদানে, অভিব্যক্তির প্রকাশে, দেহভঙ্গীমার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক জ্ঞাপন বলে। প্রধানত কথাই হল এই জ্ঞাপনের মাধ্যম। মানুষ কথার মাধ্যমে ভাবনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। এক

বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে এই জ্ঞাপন ঘটে। অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলে মানুষ যে শুধু তথ্য বিনিময় করছে তা নয়, কথা বলে একে অন্যকে আবেগের দ্বারা প্রভাবিত করছে, হৃদয় জয় করছে, দুঃখে সুখে একে অপরকে সমান অংশীদার করে তুলছে। পারস্পরিক জ্ঞাপনে শুধুমাত্র কার্যকরী উপযোগীতা নেই, আনন্দ ও অনুভবও আছে। পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরির অবকাশ আছে। এই জ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা (immediate feedback) পাওয়া সম্ভব। কাউকে কোন কথা বলা মাত্রই ঐ কথা তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তা জানা সম্ভব। টেলিফোনে, কম্পিউটার নির্ভর ইন্টারনেটেও পারস্পরিক জ্ঞাপন ঘটতে পারে।

১.১০ অর্ন্তমুখী জ্ঞাপন

মানুষের নিজের মনের মধ্যেও জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে। চিন্তা ও ভাবনার বুনোটের মধ্যেই বার্তার আদান-প্রদান চলে। ভাবতে ভাবতেই নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছে যায় মানুষ। অন্তরের মধ্যে ক্রিয়াশীল এই জ্ঞাপনে প্রধান আধারই হল চেতনা। আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, সৃজনশীল চিন্তা এগিয়ে চলে এই অন্তর্মুখী জ্ঞাপনকে আশ্রয় করে। মানুষ নিজে মনে মনেই বার্তা ঠিক করে তা পৌঁছে দেয় নিজের কাছে। যাচাই করে তার সঠিকতা, তারপর ঐ বার্তা থেকে পৌঁছায় নতুন উপলব্ধিতে। ব্যাপারটি পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক।

১.১১ দলগত জ্ঞাপন

বেশ কিছু মানুষ যখন জ্ঞাপনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তখন যে জ্ঞাপন ঘটে তখন তাকে বলে দলগত জ্ঞাপন। এ ক্ষেত্রেও কথাই হল প্রধান মাধ্যম। অভিব্যক্তি ও দেহভঙ্গীমা এই কথার আদান-প্রদানকে আরও অর্থবহ করে তোলে। সভা-সমিতি, আলোচনা, সভা, আড্ডা হল দলগত জ্ঞাপনের ভাল উদাহরণ। এক সঙ্গে সবাই কথা বলতে পারে না। একজন বলে সবাই শোনে। তারপর একে একে সবাই বলার সুযোগ পায়। পারস্পরিক জ্ঞাপনের মতো তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। একটু দেরিতে প্রতিবার্তা জানা যায়। দল যত বড় হয়, প্রতিবার্তা পেতে তত দেরি হয়। বহু মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময় সম্ভব হয়। এই দলগত জ্ঞাপনে বহু মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করতে এই জ্ঞাপন খুবই কার্যকরী।

১.১২ গণজ্ঞাপন

জ্ঞাপন যখন বহু মানুষের উদ্দেশ্যে করা হয় তখনই ঘটে গণজ্ঞাপন। এক কথায় বলা যেতে পারে গণ-র উদ্দেশ্যে করা জ্ঞাপনই হল গণজ্ঞাপন। এই জ্ঞাপনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্রনির্ভরতা। যান্ত্রিক উপায়ে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় অনির্দিষ্ট বিপুল জনসমষ্টির কাছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, সিনেমা হল গণজ্ঞাপনের মাধ্যম। প্রতিটি মাধ্যমই হল যন্ত্রনির্ভর।

গণজ্ঞাপন প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাতে পারস্পরিক জ্ঞাপনের মতো তাৎক্ষণিক ও স্বতস্ফূর্ততা একেবারেই থাকে না। প্রতিবার্তাও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। আজকাল টেলিফোনে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও খুশীমতো সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ সবসময় বজায় রাখতে পারে না। টেলিফোনে লাইন পাওয়া খুবই শক্ত।

গণজ্ঞাপন পুরোপুরি পরিকল্পিত জ্ঞাপন-ক্রিয়া। যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বার্তাকে পাঠক অথবা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। বার্তার পরিকল্পিত রূপ দর্শকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। মনকে অনেক গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। আধুনিক সমাজে তাই গণজ্ঞাপণের প্রভাব অনেক বেশি।

১.১৩ চিরায়ত জ্ঞাপন

বহুদিন ধরে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করছে এই চিরায়ত জ্ঞাপনের মাধ্যমে। যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনকে অনুমান করার চেষ্টা করেছে তবে থেকেই চল হয়েছে এই চিরায়ত জ্ঞাপনের (traditional communication)। মূলত পারস্পরিক (interpersonal) এবং দলগত জ্ঞাপন (group communication)-এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে চিরায়ত জ্ঞাপন। লোকগান, লোককথা, যাত্রা, লোকনৃত্যের সমন্বয়ে তৈরি হয় চিরায়ত জ্ঞাপনের ঐতিহ্য। লোকায়ত জীবনদর্শন এবং সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় এই চিরায়ত জ্ঞাপনের মধ্যে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে এই চিরায়ত জ্ঞাপন চলে আসছে। আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছে মূলত দলগত জ্ঞাপন ভিত্তিক চিরায়ত জ্ঞাপনের দ্বারা। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ, বীরভূমের বাউলগান, উড়িষ্যার সম্বলপুরী নৃত্য, গুজরাটের গারবা নৃত্য, মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ী লোকনৃত্য চিরায়ত জ্ঞাপনের উজ্জ্বল উদাহরণ। এই জ্ঞাপন প্রধানত দু'উপায়ে সম্পন্ন হয়—(১) মৌখিক (verbal), (২) দৃশ্য (visual)।

মৌখিক (verbal) ঃ মুখের কথাকে আশ্রয় করেই চিরায়ত জ্ঞাপনের এক বিশাল অংশ বাস্তবায়িত হয়। ছড়া, গান, নাটক, যাত্রা সবই অনুষ্ঠিত হয় মুখের কথায়। লোকশিল্পীরা কথার মাধ্যমেই শিল্পরূপ পৌঁছে দেন মানুষের কাছে। বাংলার বাউলগান, ভাটিয়ালি, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের রামলীলা সম্পূর্ণভাবে কথাভিত্তিক জ্ঞাপন। গানে, নাটকে কথাই হল জ্ঞাপনের মাধ্যমে।

দৃশ্য (visual) ঃ চিত্রের মধ্য দিয়েও চিরায়ত জ্ঞাপন ঘটে। পটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, কাপড়ের ওপর চিত্ররূপ এবং বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্প সবই দৃশ্যরূপ রচনা করে শিল্পরস মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। কাঁথা শিল্প যে অপূর্ব দৃশ্যরূপ রচনা করে, তার তুলনা নেই। মধুবনী চিত্রকলা দৃশ্য হস্তশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ রচনা করে তাঁর তুলনা নেই। ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহনির্মাণের রূপও নানানরকম। কোথাও আটচালা, আবার কোথাও চারচালা বা দু'চালা। চিরায়ত জ্ঞাপনে দৃশ্যের মাধ্যমে যে জ্ঞাপন ঘটে তার আবেদন বিপুল।

১.১৪ সারাংশ

জ্ঞাপন মৌখিক ও অ-মৌখিক দু'রকমমের হতে পারে। শিক্ষক ক্লাসে যখন পড়ান তখন তা হয় মৌখিক জ্ঞাপন। সংবাদপত্র, চিত্রকলা, ইন্টারনেট প্রভৃতি হল প্রধানত অ-মৌখিক জ্ঞাপন।

পারস্পরিক জ্ঞাপন হল জ্ঞাপনের একটি রূপ। পারস্পরিক জ্ঞাপন ঘটে দু'জনের মধ্যে। একজন হয় প্রেরক ও আরেকজন হয় গ্রহীতা। প্রধানত কথার মাধ্যমে বার্তার আদানপ্রদান ঘটে। প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। দুই বন্ধু যখন কথা বলে, ভাব বিনিময় করে তখন তা হল পারস্পরিক জ্ঞাপন।

বেশ কয়েকজন মানুষের মধ্যে যখন বার্তার আদানপ্রদান মুখের কথার মাধ্যমে ঘটে তখন তা হল দলগত জ্ঞাপন। আলোচনা সভা, আড্ডা হল দলগত জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মানুষের নিজের মনের মধ্যেও জ্ঞাপন-ক্রিয়া চলে। চিন্তার মধ্যেই মানুষ নিজের সঙ্গে কথা বলে। বোঝাপড়ায় আসতে চায়। অনেক সময় আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছাতে চায়। একে বলে অন্তর্মুখী জ্ঞাপন।

চিরায়ত জ্ঞাপনের মধ্যে মৌখিক এবং দৃশ্য, দুধরনের জ্ঞাপনই হতে পারে। লোকায়ত গান, ছড়া, যাত্রা হল চিরায়ত মৌখিক জ্ঞাপন। দৃশ্য জ্ঞাপনের মধ্যে পড়ে পটচিত্র, কাঁথা শিল্প ও হস্তশিল্পের নিদর্শন।

১.১৫ অনুশীলনী

১) জ্ঞাপন কাকে বলে?

২) জ্ঞাপনের ধারণা সম্পর্কে যা জান লিখুন।

৩) জ্ঞাপনের কাজ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪) জ্ঞাপনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

৫) কত ধরনের জ্ঞাপন দেখা যায়? আলোচনা করুন।

৬) পারস্পরিক জ্ঞাপন ও দলগত জ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৭) গণজ্ঞাপন কাকে বলে? গণজ্ঞাপনের কাজ কী?

৮) গণমাধ্যম কী? গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করুন।

৯) মৌখিক ও অ-মৌখিক জ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য কী?

১০) চিরায়ত জ্ঞাপন কাকে বলে? আলোচনা করুন।

১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

গণজ্ঞাপন ঃ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ঃ ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

Mass Communication and Journalism in India : Keval J. Kumar

একক ২ □ জ্ঞাপন মডেল

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ প্রতিবার্তা

২.৪ জ্ঞাপন মডেল

২.৪.১ লাসওয়েল মডেল

২.৪.২ শ্যানন উইভার মডেল

২.৪.৩ গার্বনার মডেল

২.৪.৪ নিউকম্ব মডেল

২.৪.৫ ডান্স মডেল

২.৪.৬ ওয়েলসলি এবং ম্যাকলিন মডেল

২.৪.৭ অসগুড মডেল

২.৫ জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের বিষয়গুলি জ্ঞাপনকে আরও বিশদভাবে জানতে সাহায্য করবে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে জ্ঞাপনের কার্যধারা কেমন ও তার প্রভাব কী সেটা বোঝা যাবে। প্রতিবার্তা থেকে সামাজিকীকরণ পর্যন্ত একক ২-এর পরিধি। যে বিষয়গুলি আলোচিত হবে সেগুলি হল ঃ

- প্রতিবার্তা
- জ্ঞাপন মডেল
- জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ

২.২ প্রস্তাবনা

যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। যাকে কিছু বলা হচ্ছে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করাই হল ঐ বলার অন্যতম লক্ষ্য। যদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাহলে জ্ঞাপন বাস্তবায়িত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। কী প্রতিক্রিয়া হল সেটা জানাও জরুরী। প্রতিবার্তার মধ্যেই পাওয়া যাবে প্রতিক্রিয়াকে। প্রতিবার্তা সম্পর্কে আলোচনা করলেই জানা যাবে প্রতিবার্তা কী। জ্ঞাপন মডেল জ্ঞাপন ক্রিয়াকে যথাযথভাবে বুঝতে সাহায্য করে। তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন মডেলের অবতারণা করেছেন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের সঙ্গে জ্ঞাপনের যোগ গভীর। জ্ঞাপন ও সমাজের সম্পর্ক কেমন তা জানা যাবে একেবারে শেষে জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ শীর্ষক আলোচনায়।

২.৩ প্রতিবার্তা

যে কোন জ্ঞাপনে প্রতিবার্তা (feedback) খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জ্ঞাপনের এক প্রান্তে থাকে প্রেরক এবং অন্য প্রান্তে থাকে গ্রহীতা। প্রেরক বার্তা পৌঁছে দেন গ্রহীতার কাছে। বার্তা পৌঁছে গেলেই কিন্তু জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় না। বার্তা গ্রহণ করার পর গ্রহীতার কী প্রতিক্রিয়া হল সেটা জানাও জরুরী। এই প্রতিক্রিয়া প্রেরকের কাছে ফিরে আসে প্রতিবার্তা হয়ে। কোন বার্তা গ্রহীতাকে কতখানি প্রভাবিত করল তা প্রতিবার্তা বিশ্লেষণ করলেই জানা যাবে। জ্ঞাপনকে সার্থক করতে হলে গ্রহীতা কীভাবে বার্তা গ্রহণ করছে সেটা প্রেরকের জানা দরকার। কারণ প্রেরক সবসময়ই চান বার্তা পাঠিয়ে প্রভাবিত করতে। গ্রহীতা যদি প্রভাবিত হন তাহলেই প্রেরক সফল। ক্লাসে যখন শিক্ষক পড়ান তখন তিনি ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। ছাত্রদের অভিব্যক্তি দেখেই শিক্ষক বুঝে যান তাঁর বক্তব্য ছাত্ররা কীভাবে গ্রহণ করছে। ছাত্রদের প্রশ্ন থেকেও তিনি কিছুটা আন্দাজ পান। একজন ব্যক্তি যখন অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলেন তখন প্রথম জন দ্বিতীয়জনের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার প্রতি নজর রাখেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যক্তি দেখে তিনি বুঝে যান প্রতিবার্তার চরিত্র। জ্ঞাপনে অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে অংশ নিচ্ছেন জ্ঞাপন-ক্রিয়ায় তা বোঝার জন্য প্রতিবার্তার গুরুত্ব রয়েছে।

পারস্পরিক জ্ঞাপনে, দলগত জ্ঞাপনে প্রতিবার্তা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু গণজ্ঞাপনে প্রতিবার্তা পেতে দেরি হয়। সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রেরক সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেন না বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। অল্প কিছুদিন পরে প্রতিবার্তা পাওয়া সম্ভব। সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ পাঠকদের কেমন লাগছে তা তাৎক্ষণাৎ না জানা গেলেও, কিছুদিন পর চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। রেডিও, টেলিভিশনেও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার্তা জানা যায় না। কিছুদিন পরে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে অথবা শ্রোতৃমন্ডলীর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে জানা সম্ভব।

প্রতিবার্তা সদর্থক ও নঞর্থক, দুরকমেই হতে পারে। সদর্থক প্রতিবার্তা জ্ঞাপন আচরণকে দ্রুত প্রভাবিত করে এবং প্রেরককে উৎসাহিত করে বার্তাকে আরও উন্নত ও সুসংহতভাবে প্রকাশ করার জন্য। নঞর্থক প্রতিবার্তা প্রেরকের কাছে গ্রহীতার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা পৌঁছে দেয়। প্রেরক যা বলছেন, গ্রহীতার তা ভাল লাগছে না এটা যে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারবেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সংশোধন করবেন, বার্তা এবং প্রকাশভঙ্গী বদলে ফেলবেন। জ্ঞাপনকে সফল করতে নঞর্থক প্রতিবার্তারও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমানে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবার্তা জানার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। কারণ প্রতিবার্তা থেকেই জানা যায় রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে শ্রোতা ও দর্শকদের। অর্ডিয়েন্স রিসার্চের মাধ্যমে এই

প্রতিবার্তা জানা যায়। প্রতিবার্তা জানার পর প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অনুষ্ঠানের রদবদল করে শ্রোতাদর্শকদের মন মতো করে তোলার চেষ্টা করে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও প্রতিবার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বাজার সমীক্ষার মাধ্যমে এই প্রতিবার্তা সংগ্রহ করা হয়।

যত দিন যাচ্ছে প্রতিবার্তার গুরুত্ব বেশি করে অনুধাবন করা হচ্ছে গণজ্ঞাপণে। সংবাদপত্র থেকে স্যাটেলাইট চ্যানেল সমস্ত গণমাধ্যমই চাইছে সঠিক প্রতিবার্তাটি পেতে। গণমাধ্যমগুলি আজ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বাজার দখল করার লড়াইতে ব্যস্ত। বেশি পাঠক, বেশি দর্শক পেতে হলে আগে জানতে হবে তারা কীভাবে গণমাধ্যমের পরিবেশিত বিষয়বস্তু গ্রহণ করছে। একমাত্র প্রতিবার্তা বিশ্লেষণ করেই তা জানা সম্ভব। সংবাদপত্র যদি দেখে বিশেষ ধরনের ফিচার পাঠকরা পছন্দ করছে, তাহলে ঐ ধরনের লেখা বেশি ছাপার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চ্যানেলগুলি সমীক্ষা চালিয়ে বোঝায় চেষ্টা করে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কী। যদি দেখা যায় কোন অনুষ্ঠান দর্শকদের ভালো লাগছে না, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ঐ অনুষ্ঠান বাদ দিতে হবে। আবার যদি দেখা যায় কোন অনুষ্ঠান দর্শকদের ভালো লাগছে তাহলে ঐ ধরনের অনুষ্ঠান প্রযোজনার ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় বলা যেতে পারে পাঠকদের, দর্শকদের প্রতিবার্তার মধ্যেই নিহিত আছে গণমাধ্যমের সাফল্যের চাবিকাঠি।

২.৪ জ্ঞাপন মডেল

জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে ভালভাবে বোঝায় জন্য জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মডেলের অবতারণা করেছেন। সমাজে নিরন্তর যে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞাপন-ক্রিয়া ঘটছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিবিধ বিষয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গুলিও পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্র দ্রুত বদলে দিচ্ছে। ঠিক একইভাবে সামাজিক পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হচ্ছে জ্ঞাপনের প্রভাবে। এই পারস্পরিক পরিবর্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জ্ঞাপন পদ্ধতিও বদলে যাচ্ছে। মডেল জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে যথাযথভাবে বর্ণনা করে, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে জ্ঞাপনক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়। মডেল প্রতিটি স্তরকে ব্যাখ্যা করে জ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে বুঝিয়ে দেয়। মডেলকে প্রধানত রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়।

Devito বলেছেন জ্ঞাপন মডেল জ্ঞাপন-ক্রিয়ার পদ্ধতি ও উপাদানগুলিকে সুসংগঠিত করে প্রকাশ করে। জ্ঞাপন ক্রিয়ার যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে চিহ্নিত করে যথাসম্ভব যথাযথভাবে ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করে। বিভিন্ন সময়ে ও পরিস্থিতিতে জ্ঞাপনকে ব্যাখ্যা করে মডেল। জ্ঞাপনের কার্য ও গঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রতিষ্ঠা করে।

মডেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপটি হল SMR। এর অর্থ হল SENDER, MESSAGE, RECEIVER। এই রৈখিক মডেলটি হল এইরূপ ঃ S→ M→ R→ SENDER অর্থাৎ প্রেরক জ্ঞাপনক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রেরক একজন ব্যক্তি হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। প্রেরক একটি বিশেষ বক্তব্য পৌঁছে দিতে চায় গ্রহীতা বা RECEIVE-এর কাছে। বক্তব্যটি হল MESSAGE। যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়ায় এই তিনটি উপাদান থাকবেই। শিক্ষক যখন ক্লাসে পড়ান, তখন শিক্ষক হলেন S→ তাঁর বক্তব্য হল M→ এবং ছাত্ররা হল R। এই মডেলটি পরে আরও উন্নত হয় যখন এর সঙ্গে যুক্ত হয় C অর্থাৎ CHANNEL। মডেলের রূপটি হয় S→ M→ R→ বার্তা যে মাধ্যমের দ্বারা বাহিত হয়, তাই হল মাধ্যম বা CHANNEL। যেমন ক্লাসঘরে শিক্ষকের মাধ্যম হল কথা। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মুদ্রিত লেখা।

২.৪.১ লাসওয়েল মডেল

প্রখ্যাত জ্ঞাপনবিদ হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Laswell) জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে মডেলের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। লাসওয়েল ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতা কীভাবে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করছে তার ওপর গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি জ্ঞাপনতত্ত্বের নতুন মাত্রা খুঁজে পান। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখেন SMCR জ্ঞাপনক্রিয়াকে বিশেষ রূপ দিচ্ছে, যার প্রভাবে মানুষ তথা সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হচ্ছে।

লাসওয়েল মডেলের মূল বিষয় হল ঃ—

কে (Who)

কাকে (Whom)

কী মাধ্যমে (What channel)

কী বলল (Said what)

এবং তার কী এবং প্রতিক্রিয়া হল (With what effect)

মডেল অনুসারে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে কে-র প্রতি। কে বার্তা পাঠাচ্ছে। বার্তা নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করছে কে। কে-র অবস্থান ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বার্তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কে বার্তা পাঠাচ্ছে, সুতরাং কে হল প্রেরক। তিনিই ঠিক করবেন কী বার্তা পাঠানো হবে। কী আলোচনা করলেই জানা যাবে বার্তার চরিত্র। বার্তার বিষয় অনুধাবনের বিষয়টিকে বলা হয় content analysis। বিশ্লেষণের মাধ্যমে বার্তার বিষয়বস্তু মর্ম-উপলব্ধি করা যায়। এরপর আসবে মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে বার্তা গ্রহীতার কাছে পৌঁছায়। মাধ্যম জ্ঞাপন-ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাধ্যমের চরিত্র বিশ্লেষণ করে জানা যাবে বার্তা কীভাবে প্রেরিত হচ্ছে। মাধ্যম জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মাধ্যম যদি মুখের কথা হয় তাহলে তার প্রভাব একরকম, আবার মাধ্যম যদি যন্ত্রনির্ভর হয় তবে তার প্রভাব হবে অন্যরকম। কাকে বলা হচ্ছে তাও মাধ্যমে নির্বাচনের সময় খতিয়ে দেখা হয়। 'কাকে' বলা হচ্ছে তা, হল জ্ঞাপনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাধ্যম যার কাছে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে তিনি গ্রহীতা। তার কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়াই হল প্রেরকের লক্ষ্য। এই গ্রহীতা একজন ব্যক্তি হতে পারে। একজন মানুষ হতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষ বহু মানুষ হতে পারে। গ্রহীতার পরিচয় জানা দরকার জ্ঞাপনকে ভালভাবে বোঝার জন্য। প্রেরক যখন বার্তা তৈরি করেন তখন গ্রহীতা কে তা অবশ্যই তিনি জানার চেষ্টা করবেন। গ্রহীতার পরিচয় জানা থাকলে সুবিধা। তার পছন্দ, চাহিদা, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছুই জানা প্রয়োজন। এগুলি জানা গেলেই বার্তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হবে এবং বোঝা যাবে ঐ বার্তা কীভাবে গৃহীত হতে পারে। শেষ স্তরটি হল প্রতিক্রিয়া। গ্রহীতা বার্তা গ্রহণ করলেই কাজ শেষ হয় না, বার্তা পাবার পর গ্রহীতার মধ্যে কোন না কোন প্রতিক্রিয়া হয়। এটাই বলে দেয় জ্ঞাপন কতদূর সার্থক হল। প্রেরক সবসময়ই চায় তাঁর বার্তা গ্রহীতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে তৈরি হবে প্রতিবার্তা, যা প্রেরককে জ্ঞাপন-ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তা বুঝতে সাহায্য করবে। যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে ভালভাবে বোঝার জন্য প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

লাসওয়েল যখন এই মডেলের অবতারণা করেন তখন তিনি রেখাচিত্রের সাহায্য নেননি। পারে মাইকেল বুলার (Michel Buhler) রেখাচিত্রের মাধ্যমে মডেলটিকে আরও যথাযথ ও উন্নত করেন। রেখাচিত্রটি প্রতিটি জ্ঞাপন উপাদানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝিয়ে দেয়।

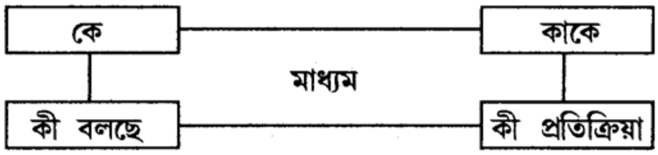

২.৪.২ শ্যানন উইভার মডেল

১৯৪৯ সালে ক্লদ ই শ্যানন এবং ওয়ারেন উইভার জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে একটি মডেলের মাধ্যমে উপস্থিত করেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। নিউইয়ার্কের বেল ল্যাবরেটরিতে ফ্রিকোয়েন্সির ওপর গবেষণা করতে গিয়ে এই ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলটি উদ্ভাবন করেন। মডেলটিতে রয়েছে চারটি উপাদান ঃ (১) তথ্য উৎস (Source of information), (২) বাহক (transmitter), (৩) গ্রাহক (receiver), (৪) গন্তব্যস্থল (destination)। এঁরা বলছেন জ্ঞাপন-ক্রিয়া চলে বাঁদিক থেকে ডান দিকে। একদম বাঁদিকে থাকছে তথ্য উৎস। তারপর বাহক, এরপর প্রেরকের কাছ থেকে সংকেত যাচ্ছে গ্রাহকের কাছে, তারপর গ্রাহকের কাছ থেকে একেবারে গন্তব্যস্থলে।

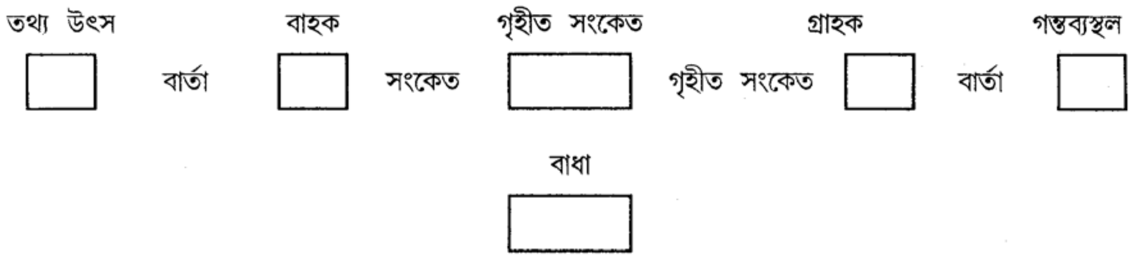

প্রথমে উৎস থেকে বাহকের কাছে বার্তা আসছে। বাহকের মাধ্যমে বার্তা সংকেতের রূপ পাচ্ছে। অর্থাৎ বার্তা সংকেত রূপায়িত হয়ে গ্রাহকের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বার্তা প্রেরণের সময় এই পর্যায় তৈরি হয় বাধা বা নয়েজ। এর ফলে সংকেত সামান্য বিকৃতি ঘটতে পারে। বার্তা বাহকের কাছে আসার পরই এই নয়েজ বা বাধার সৃষ্টি হয়। প্রেরক চাইছেন না। কিন্তু বার্তা যখন সংকেতে রূপায়িত হচ্ছে তখন অনিবার্যভাবে যুক্ত হচ্ছে এই বাধা। এর ফলে গ্রাহকের পক্ষে সংকেত বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কারণ গৃহীত সংকেতের মধ্যে থাকছে বাধা। গ্রাহক ইচ্ছে করলে এই বাধা বাদ দিতে পারেন না। ফলে সংকেত বুঝতে তাঁর সামান্য অসুবিধা হয়। প্রযুক্তিকে প্রেক্ষাপটে রেখেই এই মডেল তৈরি হয়েছে। প্রযুক্ত বার্তা প্রেরণের পদ্ধতিতে নিয়ে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। গতি ও বৈচিত্র প্রেরণ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে বিষয়টি প্রেরণ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে তা হল বাধা বা নয়েজ। বেতার তরঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা নয়েজ যেমন সম্প্রচারকে ব্যহত করে, ঠিক তেমনি আধুনিকতম উপগ্রহ সম্প্রচার ব্যবস্থাতেও নয়েজ বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাপকতর অর্থে এই নয়েজ পারস্পরিক এবং দলগত জ্ঞাপনেও দেখা দিতে পারে। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান নিয়ে বাধা সৃষ্টি করে জ্ঞাপন-ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। প্রেরক চাইছে না, কিন্তু প্রেরণের সময় বাধা তৈরি হচ্ছে। ফলে গ্রহীতা পুরোপুরি বার্তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না।

যে জ্ঞাপনে প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের প্রয়োগ বেশি, সেখানে বাধা বা Noise তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। শ্যানন-উইভার মডেলে প্রযুক্তিগত প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতার কথা বিবেচনা করেই বাধার উৎপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্যানন এবং উইভার দুজনেই হলেন প্রযুক্তিবিদ। বেল ল্যাবরেটরিতে ফ্রিকোয়েন্সির

ওপর কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সম্প্রচারের সময় বেতার তরঙ্গে Noise তৈরি হচ্ছে এবং তা বার্তার চরিত্র পাল্টে দিচ্ছে। পরিণামে ব্যাহত হচ্ছে জ্ঞাপন-ক্রিয়া। প্রেরক যেভাবে চাইছেন গ্রহীতা সেভাবে প্রভাবিত হচ্ছে না। কারণ Noise-এর বিপত্তিতে গ্রহীতা সংকেত ঠিকমতো পাচ্ছে না। এই মডেলটি পরবর্তীকালে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও Noise-এর প্রাসঙ্গিকতা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা গেছে। ভাষা, সংস্কৃতি, আচার আচরণ জ্ঞাপনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই Noise তৈরি করে এবং তার ফলে বিঘ্ন ঘটে জ্ঞাপনে।

C   Noise   **নির্বাচিত মাধ্যমে বার্তা**   Noise   A

C হচ্ছে কমিউনিকেটর, অর্থাৎ প্রেরক। বার্তা পাঠানো হচ্ছে A-কে। A হল Audience বা শ্রোতা। প্রেরকের কাছ থেকে বার্তা ছাড়ার পর Noise তৈরি হচ্ছে। মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যখন বার্তা শ্রোতার কাছে পৌঁছাচ্ছে তখনও থাকছে ঐ Noise বার্তার সঙ্গে। ফলে সংকেত সামান্য বিকৃত হচ্ছে। এই বিকৃতির জন্য সকল গ্রহীতা বার্তার অর্থ সমানভাবে বোঝে না। কারোর কাছে বার্তা অস্পষ্ট, কারোর কাছে আধা স্পষ্ট আবার কোন শ্রোতার কাছে বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছায়।

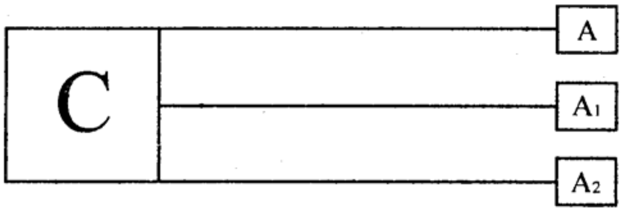

Noise বা মাধ্যম

শ্রোতা তিন ধরনের হতে পারে। A, A_1, A_2 — C অর্থাৎ Communicator যে বার্তা পাঠাচ্ছে তা A অর্থাৎ Audience তিন ভাবে বুঝছে। A পুরো বুঝতে পারছে, A_1 কিছুটা বুঝছে, আর A_2-র কাছে বার্তার অর্থ অনেকটা অস্পষ্ট।

এই বোঝার ওপর নির্ভর করছে প্রতিক্রিয়া। যদি Noise বেশি হয় তাহলে প্রতিক্রিয়া কম হবে। Noise কম হলে কিছুটা প্রতিক্রিয়া ঘটবে। প্রতিবার্তা অনুধাবন করলেই প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বোঝা যাবে। প্রতিবার্তা দেখে প্রেরক বুঝতে পারবেন তাঁর প্রেরিত বার্তা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

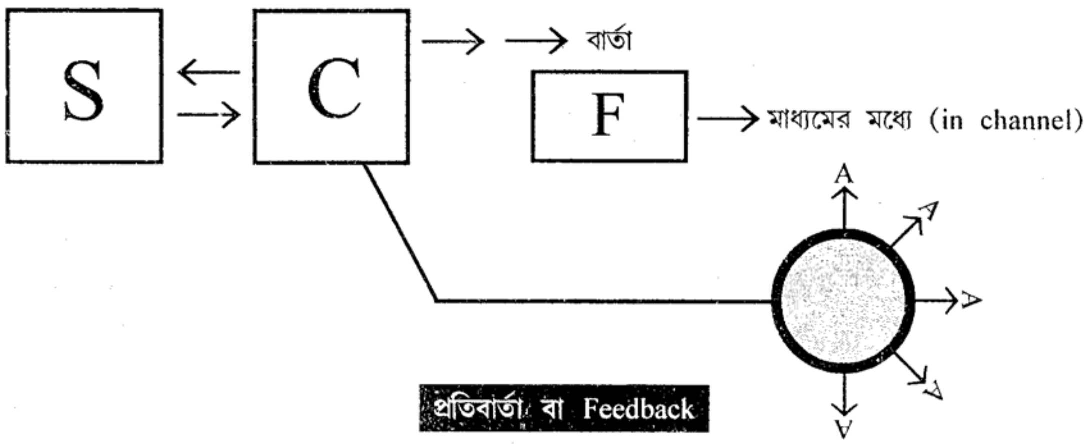

প্রতিবার্তা বা Feedback

ছবিতে প্রতিবার্তা দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন শ্রোতার (A) কাছে একটি বার্তা বিভিন্নভাবে উপস্থিত হচ্ছে পরিণামে প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিবার্তারও তারতম্য হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রোতার কাছে একই বার্তা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে।

২.৪.৩ গার্বনার মডেল

জর্জ-গার্বনার (George Gerbner) ১৯৫৬ সালে একটি মডেলের মাধ্যমে জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন। গার্বনার জ্ঞাপনক্রিয়ার মধ্যে যে উপাদানগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন সেগুলি হল — উৎস (Source), কোন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে উৎসের প্রতিক্রিয়া (the source reacts to the event in a situation through some channel), এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু (Subject matter in a given situation and perspective) এবং জ্ঞাপনের পরিণতি (consequences of communication)। গার্বনার জ্ঞাপনে বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞাপন কেমন হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে এই দুটি বিষয়ের ওপরে প্রেরক যখন বার্তা প্রেরণ করে এবং গ্রহীতা যখন তা পায় তখন তা সংঘটিত হয় এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে। পরিস্থিতি তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের আধারে। গার্বনার মডেলটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ কেউ একটি ঘটনাকে বুঝে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং তা প্রকাশিত হয় কোন একটি মাধ্যমের দ্বারা। উদ্দেশ্য থাকে এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে উপস্থিত উপকরণের সাহায্যে জ্ঞাপনের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করা।

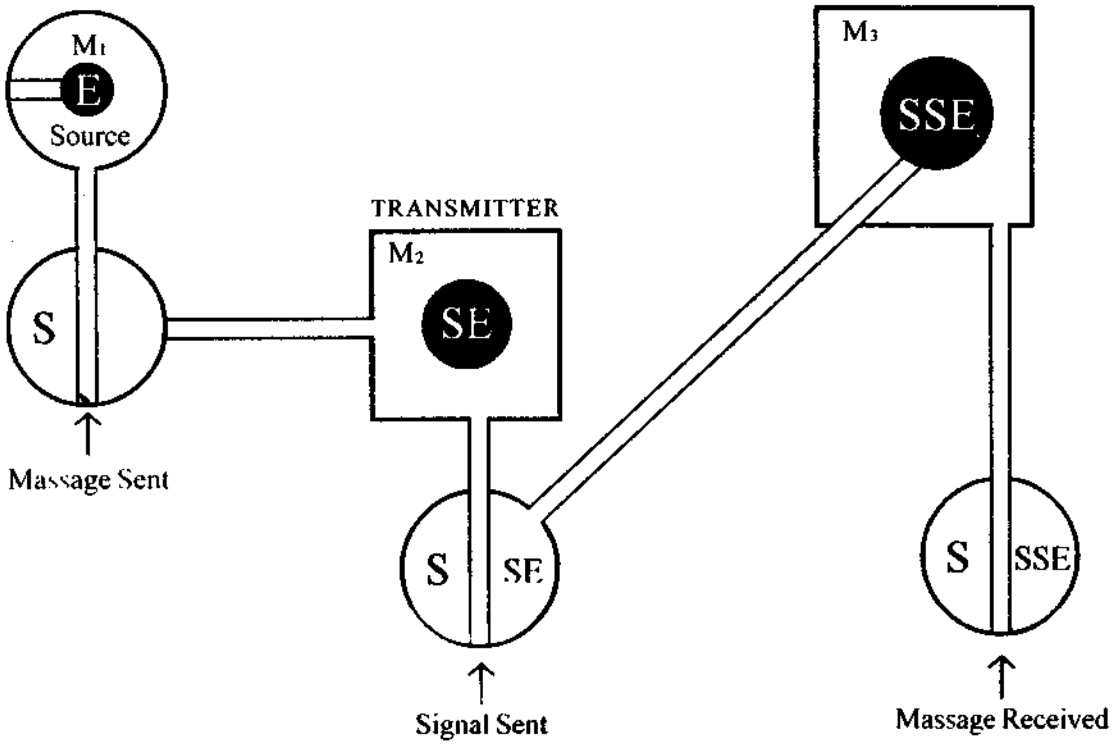

M_1 হচ্ছে উৎস। M_2 হল বাহক যন্ত্র (transmitting) আর M_3 হল গ্রহীতা। E হল M-এর দেখা ঘটনা। S হচ্ছে প্রেরিত বার্তা। SE হল ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি। SSE হল প্রেরিত সংকেত। যা ঐ বিবৃতি সম্পর্কে বলছে। SSEE হল গৃহীত বার্তা যা গ্রহীতা উপলব্ধি করছে। এই মডেল শ্রাব্য-দৃশ্য (audio-visual) জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। টেলিভিশনে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা মডেলে বর্ণিত প্রতিটি স্তরকেই ছুঁয়ে যায়। বাহক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে শ্রাব্য ও দৃশ্য সংকেতের মাধ্যমে একটি ঘটনা সম্পর্কে যে বিবৃতি দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয় তা দর্শক মনন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত এই জ্ঞাপনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

২.৪.৪ নিউকম্ব মডেল

লাসওয়েল, গার্বনার, শ্যানন-উইভার যে মডেলগুলির অবতারণা করেছিলেন তা মূলত ছিল রৈখিক মডেল। কিন্তু থিওডোর নিউকম্ব (Theodore Newcomb) যে মডেল উপস্থিত করলেন তার চরিত্র পূর্বোক্ত মডেলগুলির থেকে একেবারে আলাদা। সামাজিক প্রেক্ষায় তিনি জ্ঞাপনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণে জ্ঞাপন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা প্রমাণ করাই ছিল নিউকোম্ব মডেলের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মডেল অনুসারে সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে জ্ঞাপন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

A এবং B হল যথাক্রমে প্রেরক এবং গ্রহীতা। প্রেরক ও গ্রহীতার ভূমিকায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পরিচালন গোষ্ঠী অথবা জনগণও থাকতে পারে। X হল প্রেরক ও গ্রহীতার সামাজিক পরিবেশ। ABX হল একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বজায় রয়েছে।

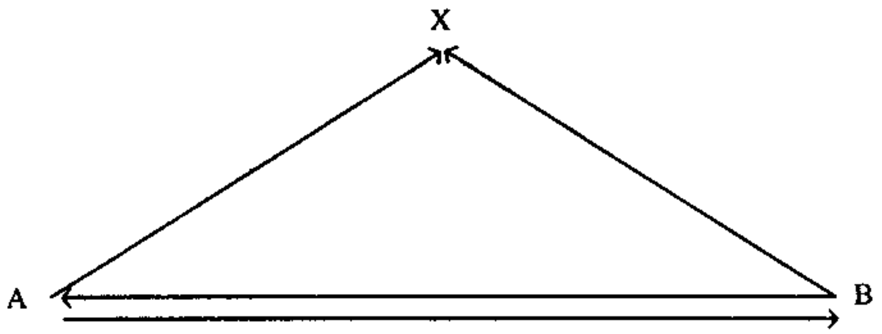

যদি A পরিবর্তিত হয় তাহলে X এবং B-ও পরিবর্তিত হবে। অন্যভাবে বলা যায় A যদি X-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলায়, তাহলে B-কেও X-এর সঙ্গে সম্পর্ক বদলাতে হবে। এর অর্থ হল A এবং B-র মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব যা X-কে প্রভাবিত করছে। লক্ষ্য করার বিষয় এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। অপরদিকে এমনও হতে পারে A X-কে পছন্দ করে, কিন্তু B-কে করে না। এ অবস্থায় A এবং B-কে অনেক ভেবে চিন্তে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই যোগাযোগের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে X-এর প্রতি সহমত বজায় রেখে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। X-এর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা পর্যন্ত A এবং B-কে সযত্নে নিজেদের মধ্যে জ্ঞাপন চালাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে A হল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ইউনিয়ন, B হল সরকার এবং X হল সরকারি নীতিতে একটি পরিবর্তন। যেমন ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ। যদি A এবং B যদি পরস্পরকে পছন্দ করে, তাহলে X সম্পর্কে একমত হবার জন্য তারা

সহজেই আলোচনা চালিয়ে সহমতে আসার চেষ্টা করবে। আবার A এবং B-র মধ্যে যদি ভালো সম্পর্ক না থাকে তাহলে X সম্পর্কে সহমত হবার জন্য A এবং B-র মধ্যে সযত্ন প্রয়াস নিতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সন্তর্পণে সহমতের সূত্র খুঁজে নেবার চেষ্টা করতে হবে। ভারসাম্য অর্জন করাই হল প্রধান লক্ষ্য। নিউকম্ব মডেল সমাজে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

২.৪.৫ ডান্স মডেল

ফ্রাঙ্ক ডান্স (Frank Dance) এই মডেলটি ১৯৬৭ সালে উপস্থাপন করেছিলেন। জ্ঞাপন সর্বদাই মানবিক এটা ধরে নিয়েই ডান্স এই মডেলে জ্ঞাপনকে এক বিরামবিহীন প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। চক্রাকারে চলতে থাকে জ্ঞাপন-ক্রিয়া এক স্তর থেকে আরেক স্তরে।

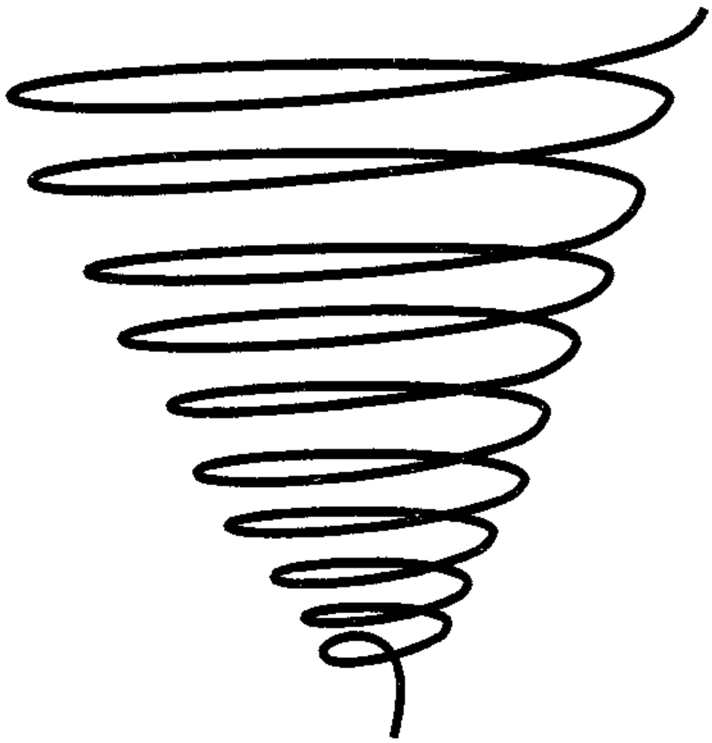

ডান্স তাঁর মডেলে দেখিয়েছেন জ্ঞাপনের কোন নির্দিষ্ট শুরু বা শেষ নেই। চক্রাকারে বিরামবিহীন জ্ঞাপনক্রিয়া ঘটেই চলে। কোন নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে জ্ঞাপনক্রিয়া আবদ্ধ থাকে না। এখন যা ঘটছে তার সঙ্গে আগে ঘটে যাওয়া জ্ঞাপনের যোগ রয়েছে। ঠিক একইভাবে বর্তমান জ্ঞাপন-ক্রিয়া ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চক্রাকারে পেঁচিয়ে নীচের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে প্রতীক জ্ঞাপন-ক্রিয়া নেমে আসছে। জ্ঞাপন-ক্রিয়া সবসময়ই খুব সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানান ধরনের বিষয় প্রভাবিত করে জ্ঞাপনকে। চক্রাকার গতি এই জটিলতাকে প্রতিষ্ঠা করে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ করে যে জ্ঞাপন-ক্রিয়া সর্বদাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে

চলেছে। প্রতি স্তরেই জ্ঞাপন উন্নত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। একটি জ্ঞাপন থেকে উদ্ভুত হচ্ছে অন্য একটি জ্ঞাপনের ধারা। এভাবেই চলছে, অতীত থেকে বর্তমান, তারপর ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন-ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা।

২.৪.৬ ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল

বি. এইচ. ওয়েসলি এবং এম.এস.ম্যাকলিন ১৯৫৭ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেছিলেন। জ্ঞাপন-ক্রিয়ার মধ্যে যে গভীর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তা যথাযথভাবে উপস্থিত করাই ছিল এই মডেলটির উদ্দেশ্য। মডেলটিকে ABX মডেল বলে চিহ্নিত করা হয়। X হল বিষয়, A হল জ্ঞাপক এবং B হল গ্রহীতা।

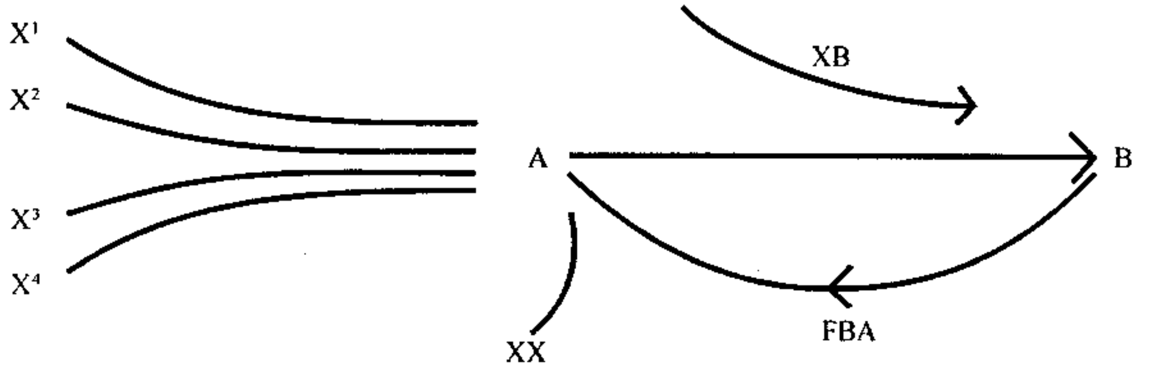

বিভিন্ন উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে A নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বার্তা গঠন করছে। তারপর তা B-কে পাঠাচ্ছে। তারপর B বার্তাগ্রহণ করে প্রতিবার্তার মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। এই প্রতিবার্তা তৈরির সময় B-র মনস্তাত্বিক পরিমন্ডল তথা গঠন সক্রিয় থেকে প্রতিবার্তাকে প্রভাবিত করে। X বিষয় বিভিন্ন সূত্র থেকে উঠে আসে। একজন যখন বার্তা গঠন করে তখন তার উপাদান উঠে আসে বিভিন্ন সূত্র থেকে। অর্থাৎ সূত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্র অনেক বড় থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাদান থেকে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে A তার বার্তা গঠন করে। জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন সমস্ত কিছুই আমরা দেখি আমাদের ধ্যানধারণা দিয়ে (We see everything with our own perceptions)। কান্টের বক্তব্য এই মডেলে খুবই প্রাসঙ্গিক। A বার্তা গঠনের সময় X^1, X^2, X^3, X^4 সূত্র থেকে উপকরণ নিচ্ছে। তারপর নিজের ধ্যানধারণা ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ঐ সব উপকরণকে বার্তাগঠনের কাজে লাগাচ্ছে। আবার B বার্তা গ্রহণ করছে নিজস্ব বিচারবুদ্ধির প্রেক্ষিতে। A এবং B-র বিচারবুদ্ধি উঠে আসছে পরিবেশ থেকে। A চাইছে B-র ধারণাকে পরিবর্তন করতে। B কতটা পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করছে B-র নিজস্ব ধারণার ওপর। XB হল B-র নিজস্ব ধারণাসূত্র। A-র মতন B-রও কিছু সূত্র রয়েছে। এই সূত্রগুলি B-র গ্রহণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ থেকে উঠে আসা XB সূত্রগুলি ঠিক করবে B-র প্রত্যুত্তর বা প্রতিবার্তা কী রকম হবে। এই প্রতিবার্তা A যেমন চাইছে সেরকম নাও হতে পারে। B-র কাছ থেকে যে প্রতিবার্তা আসছে তা হল FBA। এই FBA বিচার করলে বোঝা যাবে B কীভাবে A বার্তা গ্রহণ করেছে এবং ঐ বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে B-র মধ্যে।

পরবর্তীকালে এই মডেলে C-কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। C গেটকীপারের ভূমিকা নেয়। জ্ঞাপনবিদ লিউইন (Lewin) C-কে নিয়ে আসেন গেটকীপারের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। গণমাধ্যমের দ্বারা যে জ্ঞাপন হচ্ছে তা বোঝাতে C-র ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গণমাধ্যমের প্রসার যত ঘটছে তত C-র অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

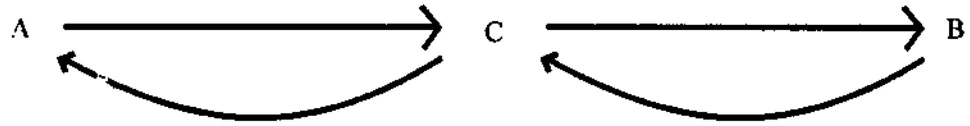

প্রতিবার্তা A সরাসরি যায় না। C-র কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে হয়। B-র প্রতিবার্তা গ্রহণ করে C। তারপর তা যায় A-র কাছে।

২.৪.৭ অসগুড মডেল

সি. ই. অসগুড (C. E. Osgood) উইলবার চক্র মডেলকে আরও সুসংহত করে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। কতকগুলি বক্স এবং তীরচিহ্ন ব্যবহার করে ডান্স প্রবর্তিত চক্রাকার মডেলের অনুকরণে তিনি Noise এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। অসগুড মডেলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বিরামবিহীন জ্ঞাপনক্রিয়ায় ক্রমশ Noise-এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পরস্পরকে জানার সুযোগ যত বাড়বে, পরস্পরের ধারণার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদও বাড়বে। এর বলে জ্ঞাপন ও গ্রহীতার মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। একজন আরেকজনকে যতভালোভাবে বুঝবে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাবে। চক্রাকারে জ্ঞাপন ক্রিয়া যত নিচের দিকে নামবে ব্যক্তিত্বের বক্স তত বড় হবে এবং Noise-এর বক্স ক্রমশ ছোট হবে।

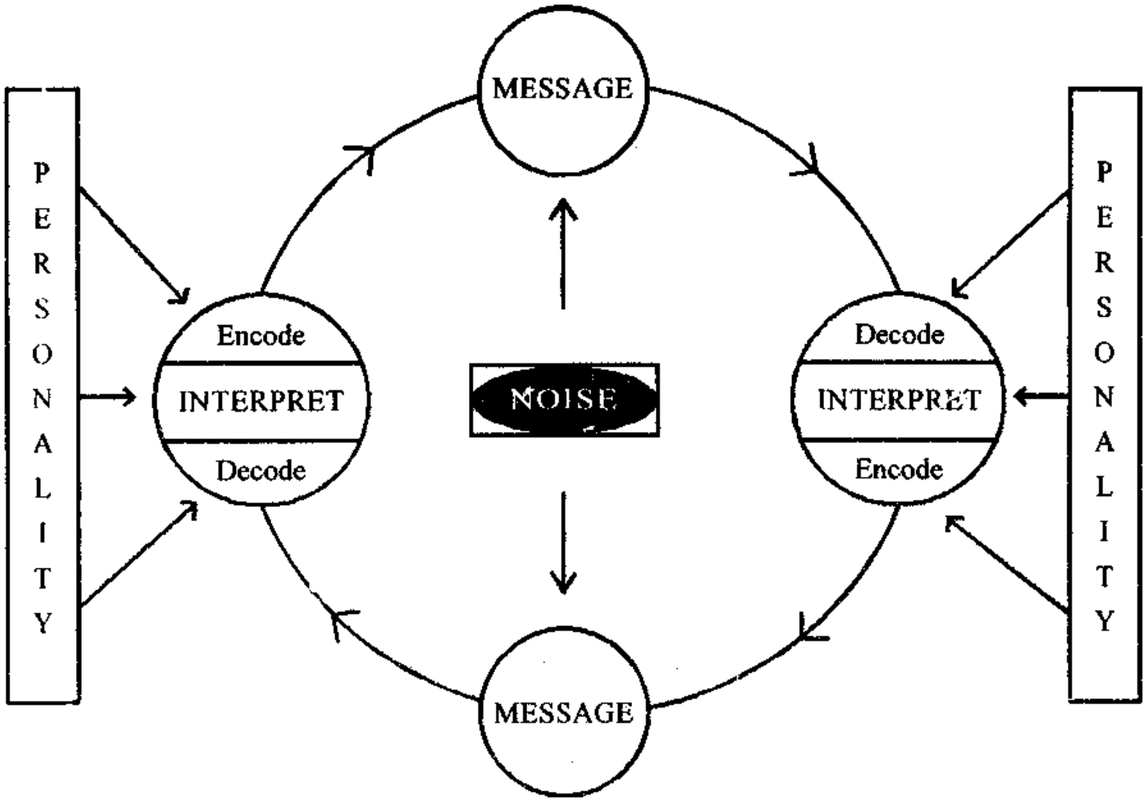

২.৫ জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ

জ্ঞাপনের সঙ্গে সামাজিকীকরণে গভীর যোগ রয়েছে। জ্ঞাপনের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে এবং অপরকে জানার সুযোগ পায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে এবং সমাজের বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে পারস্পরিক জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ তৈরি হয়। প্রাথমিকভাবে মুখের ভাষায় চলে এই জ্ঞাপন। পরিবার প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে আছে মূলত এই ধরনের জ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করে। স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও পারস্পরিক জ্ঞাপনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

দলগত জ্ঞাপনের প্রভাবও রয়েছে সামাজিকীকরণ। মুখের কথাকে আশ্রয় করে সামাজিক মেলামেশা চলে। আড্ডায়, আলোচনায় ক্রমাগত ঘটে চলে মতামত এবং ভাবনার আদান-প্রদান। সামাজিক অভ্যাস সংস্কৃতি, নীতি ও মূল্যবোধ গঠিত হয় এই জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। পারস্পরিক ও দলগত জ্ঞাপন সামাজিকীকরণকে শুধুমাত্র বাস্তবায়িত করে না। এই প্রক্রিয়ার যোগ করে নিত্য নতুন মাত্রা। মানুষের ব্যক্তিত্ব অর্জনে এবং সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে জ্ঞাপন খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গণজ্ঞাপনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকীকরণ আরও দ্রুত হতে থাকে। ব্যাপকতর হয় তার পরিধি। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বই, বেতার, টেলিভিশন সাধারণ মানুষের কাছে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকেই সমাজবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও বই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এগুলি মানুষের সামাজিক অবস্থানে নিয়ে আসছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। যোগাযোগের নতুন বাহন হিসেবে সমাজ ও জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী চার্লস হর্টন বলেন চারটি কারণে নতুন গণমাধ্যমগুলি সমাজের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। সেগুলি হল প্রকাশ, স্থায়িত্ব, দ্রুততা ও বিস্তৃতি। এ ছাড়া মাধ্যমগুলি অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। সকল শ্রেণীর মানুষ সহজে এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে পারে। স্বাক্ষরতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মাধ্যমগুলির সংস্পর্শে এসে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

রেডিও ও টেলিভিশন আসার পর গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল এই দুটি গণমাধ্যমের দারুণ জনপ্রিয়তা। শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ নয়, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে রেডিও ও টেলিভিশন সাধারণ মানুষের মন দ্রুত জয় করেছিল। সিনেমার আবির্ভাবের পর গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব হয়েছিল আরও বহুদূর বিস্তৃত। সিনেমা হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বিনোদন মাধ্যম। ভিডিও স্যাটেলাইট চ্যানেল ও কম্পিউটার আসার পর গণমাধ্যমের চালচিত্রটাই বোল একেবারে পাল্টে মানুষ ইচ্ছেমতো যে কোন অনুষ্ঠান বাড়িতে বসে দেখার সুযোগ পেল। সামাজিকীকরণে নতুনমাত্রা যোগ করল প্রযুক্তি নির্ভর এই নতুন গণমাধ্যম। এই মাধ্যমগুলি শ্রোতা-দর্শকের বিশ্বাস। দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

গণজ্ঞাপনের প্রভাবে সমাজে ঘটে চলেছে বিরামবিহীন পরিবর্তন। তৈরি হচ্ছে নতুন সামাজিক অবয়ব, সংস্কৃতির নতুন রূপ। মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। গণমাধ্যমকে আশ্রয় করেই তৈরি হয়েছে সাংস্কৃতিক রূপান্তর। গণ সংস্কৃতির উদ্ভব এভাবেই ঘটেছে।

আধুনিক গণমাধ্যম মানুষের চিন্তার, ভাবনার ও আচরণে এমন একটা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করছে যার দ্বারা একজন আরেকজনের ভাবনার অংশীদার হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ নয়। সমাজ, দেশ ও কালের সঙ্গেও যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে মানুষে। প্রকৃতপক্ষে এই যোগাযোগই বাস্তবায়িত করছে পারস্পরিক বোঝাপড়া। লক্ষ্য করার বিষয় এই বোঝাপড়া কিন্তু তৈরি হচ্ছে গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে। গণমাধ্যমের অস্বাভাবিক

অগ্রগতির ফলে মানুষের সামাজিক মেলামেশার অভ্যাস কমছে। অফিস আর বাড়ি এর মধ্যেই তার পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বাড়ি ফিরে টেলিভিশনের সামনে বসেই তার সময় কেটে যায়। কাছের দূরের সব ঘটনাই সে দেখে টেলিভিশনের পর্দায়। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একমাত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়ায় টেলিভিশন। এছাড়া আছে কম্পিউটার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে সে যে কোন প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। দুটি ঘটনা একই সাথে ঘটছে। একদিকে যেমন পছন্দমাফিক যোগাযোগের সম্ভাবনা বিস্তৃত হয়েছে। অপরদিকে ঠিক তেমনি ব্যক্তিগতস্তরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক কমে আসছে। কিন্তু জানার পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশীর খোঁজ না রাখলেও অনায়াসে বিশ্বপল্লীর বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে মানুষ।

সমাজ যত আধুনিক হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তত বাড়ছে। মানসিক দিক দিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ বাড়ছে। মানুষ সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগের জন্য গণমাধ্যমগুলির উপরই নির্ভর করছে। সামাজিক বন্ধন আলাদা, কিন্তু গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। এ এক অদ্ভুত সামাজিকীকরণ। রুচি, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছুই তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে গণসমাজের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বায়ণ যত ঘটবে, গণমাধ্যমের ওপর যত বেশি মানুষ নির্ভরশীল হবে ততই পাকাপোক্ত হবে গণসমাজের ভিত।

২.৬ সারাংশ

জ্ঞাপন-ক্রিয়ায় প্রতিবার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবার্তা বিশ্লেষণ করেই জানা যাবে জ্ঞাপন কতখানি সফল হচ্ছে। প্রতিবার্তা সদর্থক, নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। গণজ্ঞাপনে প্রতিবার্তার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

জ্ঞাপন মডেল জ্ঞাপন ক্রিয়াকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। জ্ঞাপনক্রিয়ার মধ্যে যে বিভিন্ন উপাদানগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জ্ঞাপন ক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে তা যথাযথভাবে রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করাই মডেলের কাজ। জ্ঞাপনবিদরা গবেষণা করে এই মডেলগুলি প্রবর্তন করেছেন। প্রথম মডেলের সন্ধান পাওয়া যায় আরস্তওলের রচনায়। পরবর্তীকালে যে সমস্ত মডেলগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে। লাসওয়েল মডেল, শ্যানন উইভার মডেল, গার্বনার মডেল, ডান্সমডেল, নিউকম্ব মডেল ওসগুড মডেল এবং ওয়েসলি মডেল এই মডেলগুলোর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞাপন সামাজিকীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মস্থ করে মূল্যবোধ, নীতিশিক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি। গণমাধ্যমের সংস্পর্শে এসে এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া আরও প্রসারিত হয়। আধুনিক গণমাধ্যম সামাজিকীকরণ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে সমাজ-সংস্কৃতির ধারণাই গেছে বদলে। গণসমাজের আবির্ভাব বিশ্বায়ণের ভাবনা যেমন পোক্ত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ তেমনি আলাদা হয়ে এসেছে। সামাজিকীকরণ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গণমাধ্যমগুলির ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।

২.৭ অনুশীলনী

১) প্রতিবার্তা কাকে বলে? প্রতিবার্তা কত ধরনের হয়? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২) জ্ঞাপনে মডেলের গুরুত্ব কী?

৩) যে কোন একটি মডেল আলোচনা করুন ঃ—

ক) লাসওয়েল মডেল

খ) গার্বনার মডেল

গ) শ্যানন-উইভার মডেল

ঘ) নিউকম্ব মডেল

ঙ) ডান্স মডেল

চ) ওয়েসলি মডেল

৪) জ্ঞাপনের সামাজিকীকরণ সম্পর্কে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) গণজ্ঞাপন ঃ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ঃ ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৩) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

৪) Communication Theory Today : *Edited by :* David Crowley & David Mitchell

৫) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) ঃ মেলভিন এল. ডি. ফ্লার
স্যান্ড্রা জেবল-রোকেক। *(বাংলা আকাদেমী ঃ ঢাকা)*

একক ৩ □ গণমাধ্যম তত্ত্বাবলী

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ গণমাধ্যম তত্ত্ব
৩.৩ গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম
৩.৪ গণমাধ্যম তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ
৩.৫ সংবাদপত্রের চারটি তত্ত্ব
৩.৬ গণমাধ্যম ও জনমত
৩.৭ বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যম
৩.৮ সারাংশ
৩.৯ অনুশীলনী
৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককে গণমাধ্যম সম্পর্কিত বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচিত হবে। গণমাধ্যমের কার্যধারা। তাত্ত্বিক ধারণা, সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা যথাসম্ভব সহজে বলা হবে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে। প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হবে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। যে বিষয়গুলি আলোচিত হবে সেগুলি হল ঃ

- গণমাধ্যম তত্ত্ব
- গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা
- গণমাধ্যম ও জনমত
- বিভিন্ন তত্ত্বের রূপ
- উন্নয়ন তত্ত্ব
- বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যম

৩.১ প্রস্তাবনা

গণমাধ্যমের বিপুল সামাজিক প্রভাব রয়েছে। সংবাদপত্র, বইপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক আচরণকে প্রভাবিত করে। এই সামাজিক প্রভাবের কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক রূপরেখা, যা গণমাধ্যমের ভূমিকা সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশদভাবে আলোচনা করে। গণজ্ঞাপনের

কার্যপ্রক্রিয়া, গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা, উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আধুনিক অর্থনৈতিক অবস্থায় গণমাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হবে এই এককে।

৩.২ গণমাধ্যম তত্ত্ব

গণমাধ্যমের কার্যধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গণমাধ্যম তত্ত্ব। সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাত্ত্বিক রূপরেখার চিত্রও তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বইপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, চলচ্চিত্র হল গণমাধ্যম। এই মাধ্যমগুলির ভূমিকা সমাজে কী প্রভাব ফেলছে এবং এই প্রভাবের অধীনে সমাজ কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে তাই উঠে আসে গণমাধ্যমের তাত্ত্বিক আলোচনায়। জ্ঞাপন আসে গণমাধ্যমের তাত্ত্বিক আলোচনায়। জ্ঞাপন ব্যক্তিগত স্তরে যেভাবে ঘটে, গণজ্ঞাপনের স্তরে সেভাবে ঘটে না। গণমাধ্যমের আবির্ভাবের ফলে দ্রুত বহু মানুষের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একই বার্তা মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ছে। তথ্য সঞ্চলনে, দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের দ্রুত সম্প্রচার গণমাধ্যমের ভূমিকা ও তার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষণে, ব্যাখ্যায়, উপলব্ধিতে নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। গণমাধ্যম-বিশেষজ্ঞরা গবেষণা চালিয়ে গণমাধ্যমের কার্যধারা ও তার সামাজিক প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে, ব্যাখ্যা করে এবং যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক রূপরেখা তৈরি করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় গণমাধ্যমের কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি বিস্তৃত হয়েছে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের। রাজনীতি ও অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্কগুলি অনুসন্ধান করে দেখার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন সূত্র, নতুন প্যারাডাইম।

গণমাধ্যম তত্ত্বের চারটি প্রধান ধারা রয়েছে। প্রথম ধারাটি গণমাধ্যমের স্বাধীন অস্তিত্বের ওপর গুরুত্ব দেয়। গণমাধ্যম চতুর্থ এস্টেটের মত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। স্বাধীনভাবে তথ্য পরিবেশন করছে। দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে গণমাধ্যম তার স্বাধীন সত্তা টিকিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, সরকার অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশ যাতে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে স্বৈরতান্ত্রিক না হয়ে পড়ে তার জন্য সদাসর্বদা সচেষ্ট থাকে গণমাধ্যম। স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দিলেই গণমাধ্যম তাঁর বিরোধিকা করে। এর ফলে ক্ষমতার সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারসাম্য বজায় থাকে।

তৃতীয়ত, গণমাধ্যমকে আদর্শগত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। গণমাধ্যম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের গণমাধ্যম প্রধানত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারাই প্রচার করে। আবার কোন কোন দেশে গণমাধ্যম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ চীন, রাশিয়া, কিউবার গণমাধ্যমের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রেণীস্বার্থ বজায় রেখে প্রচলিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে যেমন গণমাধ্যম সচেষ্ট হতে পারে। তেমনি শ্রেণীস্বার্থ অবসানের লক্ষ্যেও চালিত হতে পারে।

চতুর্থত, গণমাধ্যম গণসমাজের ধারণার উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একদিকে মানুষ বহির্বিশ্বের যোগাযোগের জন্য গণমাধ্যমের ওপরই একমাত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সমাজ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার সমাজের মধ্যে দুটি ধারার অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে বিপুল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী যার মধ্যে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ব্যবহারজীবীরা রয়েছে, অন্যদিকে এলিট শ্রেণী, যাঁরা সংখ্যায় কম হলেও, সমাজ পরিচালনায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম এই দুটি শ্রেণীকেই যথাসম্ভব পরিষেবা পৌঁছে

দেয়। এমন বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে সকলকেই গণমাধ্যমের ওপরই তথ্য ও মতামতের জন্য নির্ভর করতে হয়।

গণমাধ্যমের নিজস্ব মতাদর্শও রয়েছে। গণমাধ্যমের কার্যধারার সঙ্গে এই মতাদর্শের সম্পর্ক গভীর। কীভাবে গণমাধ্যম কাজ করবে তা নির্ভর করে গণমাধ্যমের মালিকানা ও পরিচালনগত বিন্যাসের ওপরে। গণমাধ্যমের মালিকানা যদি পুঁজিপতিদের হাতে থাকে তাহলে গণমাধ্যমের পরিচালনায় মুনাফাই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বাজার অর্থনীতির নিয়মে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে টিকে থাকতে চাইবে। আবার সরকার, সমবায় বা দলীয় পরিচালনায় টিকে থাকার উদ্দেশ্য হবে অন্যরকম। মুনাফা নয়, বিশেষ ধরনের প্রচার ও স্বার্থরক্ষাই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থ-সামাজিক বাস্তবতা নির্মাণে গণমাধ্যমের মতাদর্শ উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করে।

৩.৩ গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম

গণজ্ঞাপণ ক্রিয়া বাস্তবায়িত হয় গণমাধ্যমের দ্বারা। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন জ্ঞাপন-ক্রিয়ার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত করেছে। পরিকল্পিত বার্তাকে পৌঁছে দিয়েছে একইসঙ্গে লক্ষকোটি মানুষের কাছে। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার প্রধান আশ্রয়ই হল গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের অগ্রগতি গণজ্ঞাপন চর্চার পরিধিকেও প্রসারিত করেছে। গণজ্ঞাপন চর্চার পরিণতি হিসেবে গড়ে উঠেছে গণমাধ্যম তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান। গণজ্ঞাপনের মডেলে, তাত্ত্বিক প্যারাডাইমে গণমাধ্যমের কার্য ও প্রভাবই মুখ্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। গণজ্ঞাপনের আলোচনা গণমাধ্যমের আলোচনা ছাড়া হতে পারে না। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও এবং চলচ্চিত্রের সামগ্রিক চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে গণজ্ঞাপন চর্চার রূপরেখা তৈরি করে।

৩.৪ গণমাধ্যম তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ

গণমাধ্যম তত্ত্বকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে দেখা হয়। গণমাধ্যমের কার্যধারা ও তার সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করেই এই বিভাজন করা হয়। সমাজের মধ্যে যে সমস্ত জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সঙ্গে গণমাধ্যমের আন্তসম্পর্ক সমাজবাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করছে। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক আধার ও বিন্যাস, যা গণমাধ্যমের চরিত্র ও তার সঙ্গে সামাজিক জীবনযাপনের আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনা করে। কখনই শুধুমাত্র নিয়মনিষ্ঠ ব্যবস্থায় পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যুক্তিসিদ্ধ ভাবনা এবং ধারণার রূপ যা সর্বদিক দিয়ে একটি পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করে, কার্যধারাকে সঠিকপথে পরিচালিত করতে পারে এবং সম্ভাব্য কোন বিশেষ পরিণতির আভাষ দিতে পারে। গণমাধ্যম তত্ত্বের মধ্যেও তত্ত্বের এই সর্বজনীন রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। গণমাধ্যম তত্ত্বকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

এই চারটি রূপ হল ১) সামাজিক-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Social Scientific Theory), ২) আদর্শমূলক তত্ত্ব (Normative Theory), ৩) কার্যকরী তত্ত্ব (Operational Theory) এবং ৪) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব (Every-day Theory)

১) সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Social Scientific Theory) ঃ

গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি, কার্যধারা এবং সমাজের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাই এই তত্ত্বের মূল বিষয়।

গণমাধ্যম কীভাবে গণজ্ঞাপনকে সার্থক করে তুলেছে সেটাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা হয়। স্বাভাবিকভাবেই গণমাধ্যমের কার্যধারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার দ্বারা ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়ার দরকার পড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য সম্ভাব্য সূত্রকেও আশ্রয় করে গণমাধ্যমের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা হয়।

গণমাধ্যমের পরিধি বিশাল। সামগ্রিকভাবে এই বিশাল কার্যধারাকে বিশ্লেষণ করে বোঝা, ব্যাখ্যা করা খুব সহজ কাজ নয়। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিচার বিশ্লেষণকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেই তাত্ত্বিক রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে গণমাধ্যমের আকৃতিই শুধু বড় হচ্ছে না, প্রকৃতি ভীষণভাবে জটিল হয়ে উঠছে। শক্তিশালী আধুনিক গণমাধ্যমের কার্য ও তার সামাজিক প্রভাবও যথেষ্ট বৈচিত্রময় হয়ে ওঠার ফলে গবেষণালব্ধ তাত্ত্বিক ধারণাতেও আসে বৈচিত্র এবং তা স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে।

সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্র এখন আকারে বিশাল হয়ে উঠেছে। আবার বড় হয়ে ওঠার ফলে পুরো তাত্ত্বিক কাঠামোই সুগঠিত হয়ে ওঠে নি। বিভিন্ন মাত্রার গবেষণালব্ধ ধারণার মধ্যেও সবসময় সুসংগঠিত বজায় থাকে নি। আকারে বড় হওয়ার অন্যতম কারণ হল অনুসন্ধানের বিষয় বৈচিত্র্যের বিস্তৃতি। সমাজ সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন উঠে আসে। সমাজ ও গণমাধ্যম পরস্পর কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা জানতে গেলে নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এই সমস্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য থাকে সামগ্রিকতাকে অন্বেষণ করা। গণমাধ্যমেই প্রকৃতিই হোক অথবা প্রভাবই হোক, তা কীভাবে সমগ্র সামাজিক প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় গবেষণার মূল বিষয়। কিন্তু এতো গেল মাত্র একটি খন্ডরূপের কথা। সমগ্রতাকে জানলেই কাজ শেষ হয় না। জানতে হয় সমাজপ্রেক্ষিত তৈরি করছে যাঁরা অর্থাৎ সেই সমস্ত ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে গণমাধ্যমের আন্তসম্পর্কের বিন্যাস। ব্যক্তি মানুষের আবরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিবিধ বিষয়, যা ব্যক্তিগত স্তরে তথ্যের আদান-প্রদানকে প্রভাবিত করছে। এগুলিও সম্যকভাবে জানা দরকার। বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আশ্রয়ে সমাজ থেকে ব্যক্তি মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রের ওপর গবেষণা চালিয়ে তাত্ত্বিক ধারণা গড়ে তোলা এক বিপুল কর্মকান্ড হয়ে দাঁড়ায়। তত্ত্বের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে আকারে বিশাল।

এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলির মধ্যে থাকে নানান ধরনের অনুসন্ধান। কোন তত্ত্ব কী ঘটছে তা ভালোভাবে বুঝতে চায়। সমাজ থেকে ব্যক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে কী ঘটে চলেছে সেটা জানাই জরুরী হয়ে ওঠে গবেষণায়। প্রকৃতির স্বরূপ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। আবার কোন তত্ত্বে সমালোচনামূকল দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বের কোন প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নতুন করে পর্যালোচনা করে একটি নতুন রূপ প্রতিষ্ঠা প্রচ্ছন্ন থাকে। তথ্য সরবরাহরে বাস্তব প্রয়োগ নিয়েও কোন তত্ত্বের অনুসন্ধন চালিত হয়। তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে বোঝার চেষ্টা হয় জনমানসে তার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মানুষ কতটা প্রভাবি হচ্ছে এই ব্যবস্থার দ্বারা সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই তাত্ত্বিক আলোচনায়।

জ্ঞাপন তত্ত্বের আলোচনায় সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যম ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাব বুঝতে এই তত্ত্ব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের বার্তা জনজীবনে কী প্রভাব ফেলছে সেটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট খুবই জরুরী বলে বিবেচিত হয়।

২) আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্ব (Normative Theory) ঃ

আদর্শগত দিক দিয়ে জ্ঞাপন বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাই আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মূল্যবোধভিত্তিক সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে কীভাবে গণমাধ্যমের কাজ করা উচিত, সেটাই বিচার করা হয়

এই তত্ত্বে। পূর্বে নির্ধারিত কিছু সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা কথাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে প্রচলিত সামাজিক দর্শন ও আদর্শকে ভিত্তি করেই এই তত্ত্বের রূপরেখা তৈরি হয়। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসরণ করে কিছু মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। আইনের চোখে সাম্য, আইনের অনুশাসন, মানুষের সমান অধিকার, শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদারনীতিক দর্শনের প্রভাবে গণমাধ্যমের কার্যধারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই দর্শন থেকে উদ্ভূত সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাব গোটা সমাজেই ব্যপ্ত থাকে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও এই মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গণমাধ্যমের কার্যধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বণিকসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল চার গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে তথ্য সরবরাহ করে ও মতামত দিয়ে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলবে। গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণে এবং গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করতে এই জনমতের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গণমাধ্যমের লক্ষ্য শ্রোতারাও চান গণমাধ্যম তাদের আশাআকাঙ্খাকে সার্থক করে তুলুক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ধারণা এইভাবেই গড়ে উঠেছে। উদারনীতিক দর্শনের প্রবক্তারা সবসময়ই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে অপরিহার্য শর্ত বলে গণ্য করেছেন। মুক্ত সমাজের জন্য প্রয়োজন হয়েছে স্বাধীন সংবাদপত্রের। আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের প্রতিফলন পাওয়া যায় দেশের আইনকানুন, গণমাধ্যমনীতি, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতির মধ্যে। গণমাধ্যম ও সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে আন্তঃসম্পর্ক ঘটে চলেছে সেগুলিকে মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করাই আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঠিক যেভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে বিচার করা হয় প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রেক্ষিতে, অস্তিত্বের প্রশ্নও মতাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয়। এই আলোচনার মধ্যে কি ঘটছে এবং কীভাবে ঘটা উচিৎ। দুটোই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা হয়।

উদারনীতিক গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রকৃত অবস্থার পরিচয় জানার জন্য ১৯৪৭ সালে আমেরিকায় একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের সভাপতি ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য Robert Hutchins। কমিশন ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্বকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছিল। একই সঙ্গে কমিশন সংবাদপত্রকে সামাজিক দায়িত্বহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল আবরণের রূপরেখা দিয়েছিল। Hutchins কমিশনের রিপোর্টই পরবর্তীকালে সামাজিক দায়িত্বশীলতার নীতি ও তার দার্শনিক ভিত্তিক রূপায়ণে উল্লেখজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা পশ্চিম ইউরোপে সামাজিক দায়িত্বশীলতা আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণে খুবই উপযোগী ধারণা হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনের গণমাধ্যম ভাবধারাও ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কিউবা, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে গণমাধ্যম কার্যধারাকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুগঠিত করা হয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আলোকে পরিচালিত হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকেও দেখা হয়েছে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাই হয়ে দাঁড়িয়েছে গণমাধ্যমের মূল লক্ষ্য। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই সেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল প্রেরণা।

১৯৯৭ সালে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Nordenstreng আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের পাঁচটি রূপের উল্লেখ করেছেন। এই রূপগুলির মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ ও ধারণার প্রভাব রয়েছে। প্রতিটি রূপই দেশ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে বিশেষ মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। রূপগুলি হল এই রকম ঃ—

(ক) উদারনীতিক-বহুত্ববাদী রূপ ঃ—

সনাতন উদারনীতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই ধারণার রূপরেখা। ব্যক্তি মানুষের অধিকার রক্ষার ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে দেখা হয়েছে জনগণের

আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে। যে বিষয়ে জনগণের আগ্রহ আছে তাকেই জনস্বার্থ বলে মনে করা হয়। বাজার ব্যবস্থার ওপরই গণমাধ্যমগুলি নির্ভর করবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব কম হবে এবং গণমাধ্যম স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই পরিচালিত হবে। এটাই এই উদারনীতিক বহুত্ববাদের মূলকথা।

(খ) সামাজিক দায়বদ্ধতার রূপ ঃ—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমাজের প্রতি এক বিশেষ দায়বদ্ধতা। সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিক মাধ্যম স্বাধীনভাবে তথ্য সরবরাহের সময় অবশ্যই স্মরণ রাখবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা। শুধুমাত্র গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির কথা ভাবলেই চলবে না, ব্যাপক অর্থে সামাজিক লাভ ক্ষতির কথাও ভাবতে হবে। ব্যক্তিত্ববাদী রাজনৈতিক দর্শনের চেয়ে সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীজীবন-ভাবনাই বেশি গুরুত্ব পায় এই দায়বদ্ধতাকেন্দ্রিক তাত্ত্বিক রূপরেখায়।

(গ) সমালোচনামূলক রূপ ঃ—

বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর বিন্যাসের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে গণমাধ্যম। সমাজের মধ্যে রয়েছে নানান স্তর, প্রতিনিয়ত এই স্তরগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করছে গণমাধ্যম। সবসময় এই যোগাযোগের মধ্যে থেকে সদর্থক ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় অসঙ্গতি ও সংঘাতও তৈরি হয়। সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের বিরোধ দেখা দিতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে এরকম বিরোধ বহুবার বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়েছে। সরকারের তৈরি করা কোন আইন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করছে বলে মনে করতে পারে সংবাদপত্র। একইভাবে গণমাধ্যমের কার্যধারা সঠিকপথে চালিত হচ্ছে না বলে মনে করতে পারে বিভিন্ন প্রভাবশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সরকার। এই তাত্ত্বিক আলোচনায় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পায়।

(ঘ) প্রশাসনিক রূপ ঃ—

উনিশ শতকের এলিট বুর্জোয়া প্রেসের ধ্যানধারণার মধ্যে এর উৎস নিহিত। সরকার পরিচালনায় যুক্ত আমলাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিই সংবাদের প্রধান উৎস বলে বিবেচিত হয়। বস্তু নিষ্ঠার নীতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলেও কার্যত, প্রশাসনিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যকেই বিশ্বস্ত সূত্র বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও পরিচালন কাজে নিযুক্ত আমলাদের স্বার্থ রক্ষা করাই গণমাধ্যমের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের স্বার্থ সেভাবে রক্ষিত হয় না।

(ঙ) সাংস্কৃতিক সম্পর্কের রূপ ঃ—

সনাতন গণমাধ্যমের যে ধারা সমাজে প্রচলিত তা মূলত আঞ্চলিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। একটি দেশ ও সমাজের মধ্যে এরকম বহু ধারা রয়েছে। এক একটি অঞ্চলের মধ্যে এই ধারা সীমাবদ্ধ থাকে। কোন সর্বজনীন যুক্তিবাদী ধারণা দিয়ে এই রূপকে বোঝা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে যে গোষ্ঠী জীবনধারা বয়ে চলেছে তা যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ঐশ্বর্যময়। কিন্তু কোন ভাবেই তা সর্বজনীন সূত্র দিয়ে বোঝা যাবে না। এক একটি অঞ্চলের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় এই সাংস্কৃতিক রূপের মধ্যে। গোষ্ঠীর জীবনের সুসংহতি প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৩) কার্যকরী তত্ত্ব (Operational Theory) ঃ

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কার্যধারাকে কেন্দ্র করে কার্যকরী তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা এবং অন্যান্য কর্মীরা যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন তাই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়

এই তত্ত্বে। পেশাদারী অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিন্যাসের মধ্যেই গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে। পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায় প্রয়োগ সম্পর্কিত কার্যধারার প্রকৃতি এবং তা গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। গণমাধ্যম কীভাবে সংবাদ ও অন্যান্য বিষয় নির্বাচন করছে তা জানা যাবে এই কার্যকরী তত্ত্বের আলোচনায়। লক্ষ শ্রোতার আকাঙ্খা ও চাহিদা কতটা পূরণ হচ্ছে তাও সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে। বিজ্ঞাপণের বার্তা ও বিন্যাস তৈরিতে সামাজিক প্রেক্ষিতের ভূমিকা কী এবং তা বিজ্ঞাপন তৈরির প্রক্রিয়াকে কতটা প্রভাবিত করে সেটাও জানা যাবে কার্যকরী তত্ত্বের আলোচনায়।

সংবাদপত্রে, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচুর সংবাদ এসে জড়ো হয়। সংবাদ-সংস্থা যে খবর পাঠায় তার পরিমাণই বিশাল। এই বিপুল সংবাদপ্রবাহ থেকে সামান্য অংশই নির্বাচন করা হয় পরিবেশনের জন্য। সংবাদপত্রের পাঠক সংবাদপত্রের যেটুকু পায় তা হল ঐ নির্বাচিত সংবাদের প্রবাহ। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকের মতো দায়িত্বশীল পরিচালকরা এই নির্বাচনের কাজটা করেন। গবেষকরা দেখেছেন এই নির্বাচন প্রক্রিয়া বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংবাদপত্রের নীতি, বাজারের প্রভাব, পাঠকের রুচি-পছন্দ, বিজ্ঞাপনদাতার প্রভাব বিবিধ বিষয় জড়িয়ে আছে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। প্রক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে গেট কীপিং এর কাজ। একজন গেটকীপার যেমন বিচারবিবেচনা করে ঠিক করে কে প্রবেশ করবে, কে করবে না, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকরা সংবাদ নির্বাচন ঠিক এভাবেই করে থাকেন। রেডিও, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। এই গেটকীপিং-এর বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে গেলে এই কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের আচরণ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কার্যকরী তত্ত্বে এই আচরণগত পর্যালোচনা খুবই প্রয়োজনীয় ও জরুরী। এই আলোচনায় নীতিগত বিষয়ও অনিবার্যভাবে এসে পড়বে। কারণ কীভাবে কাজ করলে সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় থাকবে অথবা থাকবে না তার সঙ্গে নীতিবোধের যোগ খুবই গভীর। নীতি সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে আবার আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

পেশাদারী উৎকর্ষের দাবি যত বেশি জোরদার হচ্ছে, কার্যকরী তত্ত্বের গুরুত্ব তত বাড়ছে। কর্মচারীদের মানসিকতা, উৎকর্ষতা তৈরিতে সামাজিক পরিমন্ডলও খুব উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করে। সাংবাদিকদের আচরণকে বুঝতে গেলে যে পরিবেশে তাঁরা কাজ করছেন, যে বিষয় থেকে তাঁরা কাজের অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন তা বিচার বিবেচনা করতে হয়। আচরণ তৈরি হয় সমাজপরিমন্ডল থেকেই।

৪) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব (Everyday Theory) ঃ

এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল গণমাধ্যমের ব্যবহার। প্রতিদিন মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে গণমাধ্যমের ব্যবহার করে। কাগজ পড়ে, সাময়িকপত্র হাতে তুলে নেয়, রেডিও শোনে, টিভি দেখে। দৈনন্দিন জীবনে এইভাবেই গণমাধ্যম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সমাজ পরিস্থিতিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে গণমাধ্যম ছাড়া মানুষ এক পাও চলতে পারে না। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

গণমাধ্যমের এই ব্যাপক ব্যবহার থেকেই প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্বের রূপরেখা তৈরি হয়েছে। গণমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক জরুরী বিষয়। মাধ্যম ব্যবহারের বিষয়টিকে বুঝতে এই বিষয়গুলির আলোচনা দরকার। ব্যবহারের আগে অনিবার্যভাবে যে বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয় তাহল কোন মাধ্যম ব্যবহার করবে। সংবাদপত্র, বেতার অথবা টেলিভিশন। যে কোন একটি মাধ্যম বেছে নেওয়া হয় ব্যবহারের জন্য। কোনটি বেছে নেওয়া হবে একটি বিশেষ সময়ে তা ব্যবহারকারী ঠিক করেন নিরন্তর প্রয়োজন অনুসারে। যদি কেউ ঠিক করেন সংবাদপত্র পড়বেন তাহলে তাঁকে আবার বেছে নিতে হয় বহু সংবাদপত্রের মধ্যে একটি। বাজারে

বহু সংবাদপত্র রয়েছে। কোনটি তাঁর প্রয়োজন মেটাবে তা নিয়েও যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আবার যদি মাধ্যম হয় টেলিভিশন, তাহলেও ঠিক করতে হয় কোন চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখা হবে। মাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে ব্যবহারকারীর পছন্দের গভীর যোগ রয়েছে। এই পছন্দের কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে তা সবসময়ই পরিবর্তনশীল। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে পছন্দ যেভাবে কাজ করবে, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তা অন্যরকম হতে পারে। আবার এক দিন থেকে অন্য দিনে এই পছন্দ পাল্টাতে পারে। এই পছন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর মনস্তত্ত্ব, রুচিবোধ, চাহিদা ও প্রয়োজনবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মানুষে মানুষে রুচিবোধ, চাহিদা আলাদা। স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেই তারতম্য ঘটে এই স্বাতন্ত্রের জন্য। মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও পছন্দ নিবারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তের পছন্দ একরকম হয় না। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থান এই পছন্দ ঠিক করে দেয়।

গণমাধ্যম কী বার্তা পরিবেশন করবে এবং তার প্রভাব জনমানসে কী হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে ব্যবহারকারীদের রুচি ও পছন্দের ওপরে। গণমাধ্যম যে বার্তা নিয়ে আসে তা কীভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। সংবাদপত্রের একটি লেখার মধ্যে কী তাৎপর্য লুকিয়ে আছে সেটা বুঝবে পাঠক। কিন্তু এই বোঝার ক্ষেত্রে পাঠকের শিক্ষা ও রুচিবোধের ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞাপনের বার্তা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও দর্শকের মানসিকতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিজ্ঞাপন দেখে সবাই একইভাবে প্রভাবিত হয় না। একেক জনের কাছে বিজ্ঞাপনের বার্তা একেক রকম প্রভাব ফেলে।

ব্যবহারকারীদের কাছে আগে থাকতেই মাধ্যম সম্পর্কে যে পূর্ব ধারণা আছে তার প্রভাব রয়েছে মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রে। মানুষের মানসিকতার মধ্যেই মাধ্যম সম্পর্কিত এই ধারণা রয়েছে। যে মাধ্যম বেশি বিশ্বাসযোগ্য সেই মাধ্যমই বেছে নেবে ব্যবহারকারী। এই বিশ্বাসযোগ্যতার পটভূমি আগে থাকতেই তৈরি থাকে। মাধ্যমের কার্যধারা অনুধাবন করেই ব্যবহারকারী ঠিক করেন কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করবেন। প্রতিদিনের মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কার্যধারাও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৩.৫ সংবাদপত্রের চারটি তত্ত্ব

সমাজে সংবাদপত্র ভূমিকাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা সংবাদপত্র ও সমাজের মধ্যে যে আন্তসম্পর্ক রয়েছে তা অনুসরণ করে চারটি তাত্ত্বিক রূপরেখা দিয়েছেন। গণমাধ্যম-এর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই চারটি তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে সুবিধা। দর্শন ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বগুলি গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বগুলি হল — (১) কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Authoritarian theory) (২) উদারনীতিক তত্ত্ব (Liberatarian theory) (৩) সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist theory) (৪) সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব (Social responsibility theory)।

কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব ঃ—

সংবাদপত্র কীভাবে কাজ করবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে দেশে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে। ইউরোপের বহু দেশেই একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কর্তৃত্ববাদীরা মনে করতেন দেশের ভালোমন্দ একজন একনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এই ন্যস্ত কর্তৃত্বই এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে। কোনরকমে বিরোধিতা ও সমালোচনার জায়গা থাকবে না। সংবাদপত্রকেও এই কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। জার্মানি, ইটালিতে এই কর্তৃত্ববাদী

ধারণার বিকাশ হয়েছিল হিটলার ও মুসোলিনির আমলে। স্পেনের ফ্রাংকোর রাজত্বও ছিল কর্তৃত্ববাদী ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা এই ব্যবস্থায় থাকে না। শাসন ব্যবস্থায় একনায়কের কর্তৃত্বকে সমর্থন করাই একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সংবাদপত্রের।

উদারনীতিক তত্ত্ব ঃ—

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য চিরন্তন সংগ্রামের কথা ধ্বনিত হয় উদারনীতিক তত্ত্বে। সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং যে কোন মতামত ব্যক্ত করতে পারবে। সমাজবিকাশে উদারনীতিক দর্শনের প্রভাব সংবাদপত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। উদারনীতিক দর্শন কোনরকম নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিকেই আদর্শ অবস্থা বলে মনে করে। মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবে এবং সেই মতো আচরণ করবে এটাই উদারনীতিক দর্শনের মূল কথা। সংবাদপত্রর কার্যকারিতা এই দার্শনিকভিত্তির ওপর নির্ভর করে। সংবাদপত্র হবে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণমুক্ত। সংবাদপত্রের কাজে কোনরকম সরকার হস্তপেক্ষ থাকবে না। কীভাবে কাজ করা উচিৎ তা সংবাদপত্র নিজেই ঠিক করে, আত্ম-সঠিকতার নীতি অনুসরণ করে। এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল সত্যই সবসময় জয়লাভ করে এই বিশ্বাস। বহু মাত্রিক বিশ্বাস ও মতবাদের মধ্য থেকে সঠিক সত্যপথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই উদারনীতিক তত্ত্বের দ্বারা গণমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে উদারনীতিক তত্ত্বের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকদের স্বার্থই বেশি সুরক্ষিত হয়েছে। বাজারমুখী যে কোন প্রতিষ্ঠানিক কার্যকলাপের সমর্থন আছে এই নীতিতে। মুক্তচিন্তার বিকাশে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাধা সৃষ্টি করে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের নেতিবাচক আচরণের প্রতি কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। মুনাফার লোভে বেসরকারি গণমাধ্যমও কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে মুক্ত চিন্তার বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

সাম্যবাদী তত্ত্ব ঃ—

সাম্যবাদী ভাবধারার আলোকে এই গণমাধ্যম তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। মার্কসবাদী দর্শনই হল এই তত্ত্বের প্রধান অনুপ্রেরণা। শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। শোষণহীন সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্য হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই লক্ষ্যে যাবার পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং ঐ রাষ্ট্র সামাজিক উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকবে না। উদারনীতিক তত্ত্বের একেবারে বিপরীত ধারণার অনুসারী সাম্যবাদী তত্ত্বে ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে সমাজের অধিকারের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের কার্যধারাও এই সমষ্টিগত সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করার দিকেই চালিত হয়। মুনাফা নয়। সামাজিক সুষম বন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে গণমাধ্যম। মার্ক্সিয় ভাবধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন কাজ করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় মার্ক্সবাদী ভাবধারার প্রেক্ষায় সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের যে স্বাধীনতা থাকে উদারনীতিকে গণতান্ত্রিক দেশে, তা সাম্যবাদী তত্ত্বে স্বীকার করা হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনে এই সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়েছিল। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের মালিকানা ঐ সমস্ত দেশে বেসরকারি হাতে ছিল না। সরকার, পার্টি অথবা ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত।

সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব ঃ—

উদারনীতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে সংশোধন করে বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা জোরদার হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং তাতেই সামাজিক মঙ্গল সাধিত হবে এ ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে। সামাজিক স্বার্থে সংবাদপত্রকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বটুকুর কথা ভাবলে চলবে না। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাও বজায় রাখতে হবে। ব্যক্তি মালিকানার অধীনে সংবাদপত্র যদি শুধু নিজের মুনাফার কথা ভাবে তাতে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও, সাংবাদিকতার গুণগত মান উন্নত হয় না। সাংবাদিকতার নীতি, উদ্দেশ্য যদি বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় তাহলেই সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়িত হতে পারে। দায়বদ্ধতার এই ধারণা থেকেই উদ্ভব হয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে ব্যঞ্জনা পায় উদারনীতিক তত্ত্বে তার মধ্যে রয়েছে নেতিবাচক ধারণা। সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ হল সংবাদপত্রের কোন কাজে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। যেমন খুশী সংবাদপত্র নিজের পথে চলবে। মুনাফা অথবা অন্য কোন কায়েমি স্বার্থ-সাধন করতে গিয়ে সংবাদপত্র যদি সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাহলেও তা মেনে নিতে হবে, কারণ সংবাদপত্র স্বাধীন। সামাজিক দায়বদ্ধতার সমর্থকরা এই অবস্থা মেনে নেননি। তাঁরা বিকল্প অবস্থার সন্ধান দিতে গিয়ে সামাজিক হস্তক্ষেপ এবং স্বেচ্ছা আরোপিত নীতির কথা বলেছেন। তাঁদের মূল কথা সংবাদপত্র হবে সামাজিক দায়বদ্ধ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হতে হবে পরস্পরের পরিপূরক। স্বাধীনতা ভোগ করার সময় সাংবাদিকতা সমাজের প্রতি সমানভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হবে। এই দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার জন্য পেশাদারী বিভিন্ন সংগঠন নির্দেশিকা জারি করতে পারে। এই নির্দেশিকা হল সামাজিক হস্তক্ষেপ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সঠিকপথে চালাতে এই হস্তক্ষেপ সাহায্য করে।

উন্নয়ন তত্ত্ব ঃ—

চারটি তত্ত্বের রূপরেখা সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। বিশেষ করে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক চাহিদার যখন তারতম্য ঘটে তখন এই তত্ত্বগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন ভারতীয় সমাজে উদারনীতিক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা একেবারেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সব সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতেই কয়েকজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ নতুন একটি তত্ত্বের রূপরেখা দিয়েছেন। এর নাম উন্নয়ন তত্ত্ব। যে সমস্ত দেশ দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন ছিল একেবারে অন্যরকম। উন্নতদেশগুলির চাহিদা ও প্রয়োজন দিয়ে তাদের অবস্থা একেবারেই বোঝা যাবে না। এই সমস্ত দেশগুলির কাছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নশীল এই দেশগুলির কাছে পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। McQuail, Altschull এবং Hatchten বলেছেন এই অগ্রগতির পথে ঐ সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের গণমাধ্যমগুলি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গণমাধ্যমের কার্যক্রম উন্নয়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে সরকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে পারবে। গণমাধ্যমের, অধিকার ও স্বাধীনতার চেয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। দেশের সাধারণ মানুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিতে এবং উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্বাচন করতে সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে। এই উন্নয়ন তত্ত্ব থেকেই উদ্ভব হয়েছে উন্নয়মুখী সাংবাদিকতার।

৩.৬ গণমাধ্যম ও জনমত

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত গঠনে গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীন সংবাদপত্র, বেতার

ও টেলিভিশন সংবাদ পরিবেশন ও মতামত প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে গণমাধ্যমের নিজস্ব সম্পাদকীয় মন্তব্য মতামত গঠনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর যে বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনার অবতারণা করে তা পাঠকের চিন্তাভাবনার ওপর ছাপ ফেলে। যুক্তিতর্ক দিয়ে সম্পাদকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে। জটিল রাজনৈতিক বিষয়। আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে যে মতামত ও বক্তব্য রাখা হয় তা পাঠকদের মতামতকে প্রভাবিত করে। কখনও সরকারি নীতির বিরুদ্ধে আবার কখনও রাজনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্রমের পক্ষে। কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলোকপাত করে এমন কিছু বিষয়ের ওপর যা মানুষকে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবায়, সংবাদপত্রের দেওয়া মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে উৎসাহিত করে। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিশেষ নিবন্ধ ছাপা হয়। ঐ সমস্ত লেখায় সুস্পষ্ট মতামত থাকে। জনমত গঠনে এই সমস্ত রচনারও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

টেলিভিশনে আজকাল বহু বিষয়ের ওপর চর্চা করা হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক বহু সমস্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। দর্শকরা ঐ অনুষ্ঠান দেখে, যুক্তিতর্ক শুনে প্রভাবিত হয়। এইভাবে টেলিভিশন জনমত গঠন করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গুজরাত দাঙ্গার সময় ভারতের কয়েকটি উপগ্রহ চ্যানেল তাদের কভারেজ ও অনুষ্ঠান পরিবেশনার দ্বারা জনমতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব যত বাড়ছে জনমত গঠনে গণমাধ্যমের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৭ বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যম

আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে প্রচুর খবরাখবর দিচ্ছে। এই খবরাখবরের গুরুত্ব এত বেশি যে অর্থনীতি বিষয়ের জন্যই আলাদা কাগজ প্রকাশিত হয়। ইকনমিক টাইমস, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পূর্ণভাবে অর্থনীতি বিষয়ের কাগজ। টেলিভিশনে বিভিন্ন উপগ্রহ চ্যানেল প্রচুর অর্থনীতি ও বাণিজ্যের খবর দেয়। সি.এন.বি.সি. নামে একটি উপগ্রহ চ্যানেলই আছে এই বিষয়ে খবরাখবর ও অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য। বাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক খবরাখবরের প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে। শেয়ার বাজার পুরোপুরি নির্ভর করে এই খবরাখবরের ওপরে। যারা শেয়ার কিনবে ও বিক্রি করবে তারা তাদের সিদ্ধান্ত নেয় খবরাখবর দেখেই। প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দর জানা দরকার, কোম্পানিগুলো কীভাবে চলছে সেটা জানাও জরুরী।

গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল। আবার বিজ্ঞাপনও গণমাধ্যমকে তার প্রধান মাধ্যম করে। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন আমরা দেখি সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে, বেতারে এবং টেলিভিশনে। সাধারণ মানুষকে জানানো এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটি দ্রব্য বা পরিষেবা কেনার জন্য মানুষকে প্রণোদিত করাই হল বিজ্ঞাপনের কাজ। এই কাজটি সম্পন্ন হয় জ্ঞাপনের মাধ্যমে। জ্ঞাপন করতে গেলেই মাধ্যম দরকার। বহু মানুষের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞাপন করতে হলে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার ও টেলিভিশনই উপযুক্ত গণমাধ্যম। বিজ্ঞাপনদাতা প্রয়োজন বুঝে মাধ্যম নির্বাচন করে। গণমাধ্যমের অস্তিত্বও তাই বিজ্ঞাপনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রচুর আয় করে বিজ্ঞাপন থেকে। যে কাগজ ও সাময়িকপত্র যত বেশি বিজ্ঞাপন পায় তার আর্থিক অবস্থা তত ভালো। কম দামে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া সম্ভব হয় বিজ্ঞাপন থেকে প্রচুর আয় হওয়ার জন্যই। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের উৎপাদন খরচের বিপুল অংশই উঠে আসে বিজ্ঞাপন থেকে। টেলিভিশনেও প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। প্রতিদিন আকর্ষণীয় যে সমস্ত অনুষ্ঠান দেখি তার স্পনসররা হল বিজ্ঞাপনদাতা।

বিজ্ঞাপন বিপণনে সাহায্য করে। বিভিন্ন কোম্পানি বাজার তৈরি করতে বিজ্ঞাপনরে আশ্রয় নেয়। খবরের কাগজে, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা ক্রেতা তৈরি করতে চায়। ক্রেতা তৈরি হলেই বাজার সৃষ্টি হবে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাজার দখল করার লড়াই নিরন্তর চলে। আর এই লড়াইয়ে বিজ্ঞাপন অন্যতম সহায় হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞাপন মানেই গণমাধ্যমের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। যে কোম্পানি যত বেশি গণমাধ্যমের ব্যবহার করবে তার বাজার দখলের সম্ভাবনা তত বেশি হয়। আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

জনসংযোগসংক্রান্ত কাজকর্মেও গণমাধ্যমের ব্যবহার রয়েছে। কোনও তথ্য বা আইডিয়ার পক্ষে প্রচার চালাতে গণমাধ্যমের প্রয়োজন আছে। লক্ষ্য শ্রোতার কাছে কোন বিশেষ বার্তা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যও গণমাধ্যমের দরকার হয়। জনসংযোগ আধিকারিককে সফল গণমাধ্যমের সঙ্গেই সুসম্পর্ক রেখে চলতে হয়। গণমাধ্যম যাতে সবসময় তাঁর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালো খবরাখবর দেয় সেটা নিশ্চিত করাই জনসংযোগ আধিকারিকের অন্যতম কাজ। প্রতি মুহূর্তেই তাই জনসংযোগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে গণমাধ্যম।

৩.৮ সারাংশ

গণমাধ্যমের কার্যধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমতত্ত্ব। সমাজে গণমাধ্যম যত জনপ্রিয় হয়েছে, গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাবও তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় গণমাধ্যম হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। সমাজের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক কী এবং এই সম্পর্কের বিন্যাসের মধ্যে কেন বিষয়গুলি জড়িয়ে আছে তা ভালোভাবে জানার জন্য গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক রূপরেখা দিয়েছেন। গবেষণার মধ্য থেকে উঠে এসেছে নতুন নতুন প্যারাডাইম বা তত্ত্ব।

গণমাধ্যম তত্ত্বের প্রধান চারটি ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে টিকে থাকা। দ্বিতীয়টি হল স্বৈরতন্ত্রের বিরোধীতা করা। তৃতীয়টি দার্শনিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়। চতুর্থত, গণমাধ্যম এক নতুন সমাজ ভাবনা রূপরেখা তৈরি করে, যার নাম গণসমাজ। এই সমাজে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ কমে আসে। সমাজে থেকেও মানুষ এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধে আচ্ছন্ন থাকে এবং বর্হিবিশ্বের সম্পর্কের জন্য সম্পূর্ণভাবে গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। কী এলিট, কী সাধারণ মানুষ, সমস্ত মানুষের কাছেই গণমাধ্যম নিজের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে।

গণমাধ্যমের নিজস্ব মতাদর্শ রয়েছে। এই মতাদর্শ গণমাধ্যমের কাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গণমাধ্যমের মালিকানাও এপ্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কারণ গণমাধ্যমের মতাদর্শ নিয়ন্ত্রিত করে গণমাধ্যমের মালিক গোষ্ঠী।

গণজ্ঞাপন বাস্তবায়িত হয় গণমাধ্যমের দ্বারা। গণমাধ্যম কার্যধারা এবং তার সামাজিক প্রভাবকে ভালোভাবে বোঝার জন্য গণমাধ্যম তত্ত্বের আলোচনা খুবই জরুরি হয়ে ওঠে। গণজ্ঞাপন চর্চায় গণমাধ্যম তত্ত্বের প্যারাডাইম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

গণমাধ্যম তত্ত্বের চারটি রূপ রয়েছে। এগুলি হল (১) সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, (২) আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্ব, (৩) কার্যকরী তত্ত্ব, (৪) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলি গণমাধ্যমের দার্শনিক ভিত্তি ও কার্যধারাকে সামাজিক প্রেক্ষায় আলোচনা করে।

গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র হল একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সংবাদপত্র ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসকে কেন্দ্র করে চারটি তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এগুলি হয় (১) কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব, (২) উদারনীতিক তত্ত্ব, (৩) সাম্যবাদী

তত্ত্ব, (৪) সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব, (৫) সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন এই তত্ত্বগুলি নির্মাণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

জনমত গঠনে গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশন সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং পর্যালোচনাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান প্রচার করে জনমতকে প্রভাবিত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের জনমত গঠনের ভূমিকা বর্তমানে খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যমের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্য বিষয়ক খবরাখবরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেয়ারবাজারের বেচাকেনা নির্ভর করে আছে বাণিজ্য বিষয়ক খবরাখবরের ওপর। বিজ্ঞাপন দিতে সবসময় গণমাধ্যম লাগে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনে প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপন যত বাড়ছে গণমাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংযোগের কাজেও গণমাধ্যমের গরুত্ব রয়েছে। জনসংযোগ রক্ষায় সর্বদাই গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়।

৩.৯ অনুশীলনী

১) গণমাধ্যম তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন? সংক্ষেপে লিখুন।

২) গণসমাজের ধারণায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

৩) গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক কী?

৪) গণমাধ্যম তত্ত্বের চারটি রূপ কী? সংক্ষেপে লিখুন।

৫) কার্যকরী তত্ত্ব সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৬) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব কী? সংক্ষেপে লিখুন।

৭) সংবাদপত্রের চারটি তত্ত্ব কী? সংক্ষেপ বর্ণনা করুন।

৮) জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী?

৯) বিজ্ঞাপন ও বিপণনে গণমাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

১০) আর্থিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম — ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

ভারতীয় গণমাধ্যম — বংশী মান্না

Mass Communication Theory — Denis McQuail

গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী — এম.এল.ডি.ফ্লার ও এস.জে. বল-রোকেশ (অনুবাদ : আফতাব হোসেন)

একক ৪ □ গণমাধ্যম

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি
৪.৩ গণমাধ্যমের প্রভাব
৪.৪ শ্রোতৃমন্ডলী — ধরন — বৈশিষ্ট্য
৪.৫ শ্রোতা-গবেষণা
৪.৬ গণমাধ্যমের ব্যবহার
৪.৭ গণমাধ্যম ও মেয়েরা
৪.৮ গণমাধ্যম ও পরিবেশ
৪.৯ গণমাধ্যম ও মানবাধিকার
৪.১০ সারাংশ
৪.১১ অনুশীলনী
৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককে গণমাধ্যম এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করা হবে। গণমাধ্যমের সূত্র ধরে গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যাবে। গণজ্ঞাপনের প্রকৃতির মধ্যে গণমাধ্যমই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণমাধ্যমের প্রভাবই গণজ্ঞাপনের প্রকৃতির রূপরেখা স্পষ্টভাবে দিতে পারে। সুতরাং গণমাধ্যমের প্রভাবের আলোচনা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। প্রভাব যাঁদের ওপর পরে তাঁরা হলেন শ্রোতৃমন্ডলী, তারাই হলেন গণমাধ্যমের লক্ষ্য। তাই শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর আলোচনা দরকার। আরও নানা আনুসঙ্গিক বিষয় যা গণমাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলোচ্য বিষয়গুলি হল ঃ

- গণমাধ্যমের প্রভাব
- শ্রোতৃমন্ডলী — ধরন — বৈশিষ্ট্য

- গণমাধ্যমের ব্যবহার
- গণমাধ্যম ও মেয়েরা
- গণমাধ্যম ও পরিষেবা
- গণমাধ্যম ও মানবাধিকার

৪.১ প্রস্তাবনা

সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব বিপুল। যতদিন যাচ্ছে এই প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। প্রভাব কতটা এবং কেমন তার রূপ সেটা জানলেই গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি কেমন তা বোঝা যাবে। শ্রোতৃমন্ডলী হল গণজ্ঞাপনক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রোতৃমন্ডলীর ধরন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে। গণমাধ্যমের সঙ্গে যে বিষয়গুলি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তার মধ্যে অন্যতম হল, পরিষেবা ও মানবাধিকার। মেয়েদের বিষয় নিয়ে গণমাধ্যম কী কাজ করছে সেটা জানলে গণমাধ্যমে সামগ্রিক রূপ ভালোভাবে জানা যাবে। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি

গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি বুঝতে গেলে গণমাধ্যমের আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। গণজ্ঞাপন ক্রিয়া বাস্তবায়িত হয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে গণজ্ঞাপন কীভাবে সংঘটিত হচ্ছে সেটা বুঝতে গেলে গণমাধ্যম কী কাজ করছে সেটা আগে জানতে হবে।

গণজ্ঞাপন সবসময়ই যন্ত্রনির্ভর মাধ্যমের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। গণজ্ঞাপন বার্তাকে পৌঁছে দেয় বিপুল শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে। একই সময়ে বহু মানুষের কাছে পৌঁছতে গেলে যন্ত্রের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। খবরের কাগজের জন্য চাই মুদ্রণযন্ত্র, বেতার বা টেলিভিশনের জন্য চাই আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর সম্প্রচার ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রনির্ভর। গণজ্ঞাপনের বার্তা হবে নৈর্বক্তিক। বহু মানুষের কাছে একই বার্তা গ্রহণীয় হয় এই নৈর্বক্তিকতার জন্য। বহু মানুষের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় বার্তাকে। ধরে নেওয়া হয় এই বার্তা বহু মানুষের কাছে উপযোগী বলে গৃহীত হবে। গণজ্ঞাপনের প্রকৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল গণজ্ঞাপনের বার্তা তৈরি হয় পরিকল্পিতভাবে। ভেবে চিন্তে সময় নিয়ে পরিকল্পিত বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৃহৎ শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে। এই শ্রোতৃমন্ডলীর ওপর এই বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে এবং কীভাবে তাঁরা প্রভাবিত হয় তা জানা গেলে গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অনেক পরিষ্কার হবে।

৪.৩ গণমাধ্যমের প্রভাব

গণমাধ্যমের গুরুত্ব বিচার করতে গেলেই প্রভাবের বিষয়টি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। প্রতিটি গণমাধ্যমেরই লক্ষ্য শ্রোতা রয়েছে। সংবাদপত্রের পাঠক, বেতারের শ্রোতা ও টেলিভিশনের দর্শক হল এই লক্ষ্য শ্রোতা। যে সমস্ত মানুষ গণমাধ্যমের বার্তা নিয়মিত গ্রহণ করছে তাঁরাই হল গণমাধ্যমের লক্ষ্য শ্রোতা। যে সমস্ত বার্তা গণমাধ্যম দিচ্ছে তার দ্বারা লক্ষ্য শ্রোতারা কম বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তা জানতে পারলেই প্রভাবের বিষয়টি বোঝা যাবে। প্রভাব শুধুমাত্র যে পাঠকদের ওপর হচ্ছে তাই নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশের ওপরই প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন মাত্রায়।

সংবাদপত্র সমাজের ওপর যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। হরিশ মুখার্জির হিন্দু প্যাট্রিয়ট নীল আন্দোলন নিয়ে তৎকালীন সমাজকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জনমানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্তমানেও নির্বাচনের সময় সংবাদপত্রের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

১৯৩০ সালে হিটলারের বেতার বক্তৃতা শুনে জার্মানরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিলের বেতার বক্তৃতা ব্রিটেনের মানুষকে সাহস ও আস্থা জুগিয়েছিল। পরাধীন ভারতে নেতাজী সুভাষ বসুর গোপন বেতার বার্তার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ঐ বার্তা পরাধীন ভারতের মানুষকে দেশাত্মবোধের প্রেরণা জোগাত। সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বেতার। যারা পড়তে পারে না তাঁরাও বেতার অনুষ্ঠান শুনে উপভোগ করতে পারে। ভারতের মতো দেশে যেখানে নিরক্ষরতা ও দারিদ্রতা এক বিরাট সমস্যা সেখানে বেতারের মতো গণমাধ্যম খুবই উপযোগী। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও নিরক্ষর গ্রামবাসীর কাছেও পৌঁছে যেতে পারে বেতার। পরিবার পরিকল্পনার বার্তা, ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশ পাঠিয়ে জনজীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

টেলিভিশন আসার পর জনজীবনে গণমাধ্যমের প্রভাব এক নতুন মাত্রা পায়। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার জন্যও লেখাপড়া জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। নিরক্ষর মানুষও টেলিভিশন দেখে উপভোগ করতে পারে। দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম হিসেবে মানুষের কাছে টেলিভিশনের আবেদন রয়েছে। কথায়, ছবিতে, হুবহু জীবন যেরকম তার চিত্রায়নে টেলিভিশন সমস্ত গণমাধ্যমের চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষের মনে, চিন্তায় ও আচরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। দেহ, মন আচ্ছন্ন হয়েছে ছোটপর্দার যাদুতে। ম্যাকলুহানের কথায় মাধ্যম নিজেই বার্তা হয়ে উঠেছে (medium is the message)। মানুষের মধ্যে ভোগপ্রবণতা, উচ্চাকাঙ্খা বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রথমদিকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন মানুষের আচার আচরণে গণমাধ্যমের প্রভব খুবই সামান্য। ১৯৪০ সালে পল লাজারসফেল্ড (Paul Lazarsfeld) এবং বার্নাড বেরেলসন (Bernard Berelson) অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন মানুষের আচরণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য। তাঁরা দেখেছেন আগে থেকেই মানুষের মনের মধ্য যে সব ধারণা রয়েছে তাকেই কেবলমাত্র পরিপুষ্ট করছে গণমাধ্যম। যেমন কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের যদি বিরূপতা থাকে, তবে ঐ বিরূপতা বাড়িয়ে দিতে পারে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের এই স্বল্প প্রভাবকে তাঁরা minimul effects বলে অভিহিত করেছিলেন।

বর্তমানে গণমাধ্যমের প্রভাব কিন্তু এই minimul effects-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। টেলিফোন আসার পর এই প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ গণমাধ্যমের প্রভাবের ওপর পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন মানুষের আচরণে, বিশ্বাসে এমনকি ব্যক্তিগত অনুভবেও গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও সাম্প্রতিক কালে কম্পিউটার নির্ভর ইন্টারনেট ব্যবস্থা মানুষের আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সামাজিক প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল ভোগবাদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশন পণ্য সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপন মানুষের মধ্যে তীব্র আকাঙ্খাবোধ তৈরি করে। বিজ্ঞাপিত পণ্যের জন্য সৃষ্টি হয় চাহিদা। বিজ্ঞাপন দেখে মানুষ যেমন বিচিত্র পণ্যসম্ভার সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে, তেমনি পণ্য কেনবার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত হচ্ছে। এভাবেই ভোগবাদের প্রসারে বিজ্ঞাপন সাহায্য করছে।

শুধু বিজ্ঞাপন নয়, গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মধ্যেও এমন বিষয় থাকছে যা মানুষকে উৎসাহিত করছে ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে। ফ্যাশান, খাওয়াদাওয়া, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রাত্যহিক কাজের সরঞ্জাম নিয়ে বহু লেখা প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে। এই সব রচনার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে মানুষের মধ্যে। টেলিভিশনের যেসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তার মধ্যেও থাকে ভোগবাদের উৎসাহিত হবার মালমশলা। দৃশ্যও শ্রাব্য মাধ্যমের যাদুর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায় মানুষের মনে। মানুষের মনের মধ্যে তৈরি হয় আরো ভালভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে। জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার বাসনা জাগ্রত হয়। গণমাধ্যমের কাছ থেকেই মানুষ পেয়েছে উন্নতজীবনযাত্রার সূত্র। ক্রমাগত ফ্রিজের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে ফ্রিজ কেনার ইচ্ছে জাগাটা খুবই স্বাভাবিক।

গণমাধ্যম জনশিক্ষায় প্রসার ঘটিয়ে সমাজ জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র ও টি.ভি. স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ রক্ষা প্রকৃতি বিষয়ে রচনা ও অনুষ্ঠান প্রচার করে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। টি.ভি. সিরিয়াল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে শিশুদের ওপর টেলিভিশন বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে। অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সের বাড়াবাড়ি শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলে। শিশুর স্বাভাবিক আচরণ বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন গবেষণায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.৪ শ্রোতৃমন্ডলী — ধরণ — বৈশিষ্ট্য

শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

গণজ্ঞাপনে বার্তা যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় তাঁরাই হল শ্রোতৃমন্ডলী। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় শ্রোতৃমন্ডলী হল অন্যতম উপাদান। গণজ্ঞাপনের আলোচনায় শ্রোতৃমন্ডলীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিপুল মানুষের সমষ্টি হল এই শ্রোতৃমন্ডলী। অনেক জ্ঞাপনবিদ মনে করেন শ্রোতৃমন্ডলী হল একটি বিমূর্ত ধারণা। কারণ শ্রোতৃমন্ডলীকে সহজে চিহ্নিত করা যায় না। জ্ঞাপনক্রিয়া যখন ঘটছে সেই সময় শ্রোতৃমন্ডলীকে বোঝা খুব কঠিন। নানান ধরণের মানুষ এই শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে। কারা কখন গণজ্ঞাপন ক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না। অনেকটাই অনুমানে ধরে নিতে হয়।

শ্রোতৃমন্ডলী গড়ে ওঠে এক সামাজিক প্রেক্ষিতে। সমাজে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ভাবনা, বোঝাপড়া, অভ্যাস, ভাষা ও তথ্যের চাহিদা যে প্রেক্ষাপট তৈরি করে তারই মধ্য থেকে উঠে আসে শ্রোতৃমন্ডলী। এর কোন সার্বজনীন রূপ নেই। মাধ্যম অনুযায়ী একেক ধরনের শ্রোতৃমন্ডলী তৈরি হয়। আবার একই মাধ্যমের শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যেও ফারাক থাকে।

ধরণ ঃ

শ্রোতৃমন্ডলীকে বুঝতে হলে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। বিষয়গুলি হল স্থান, বিভিন্ন ধরণের মানুষ, মাধ্যম, বিষয়বস্তু ও সময়। স্থান দিয়ে বোঝা যাবে শ্রোতৃমন্ডলীর অবস্থান কোথায়। আঞ্চলিক মাধ্যমের শ্রোতৃমন্ডলী ও জাতীয় মাধ্যমের শ্রোতৃমন্ডলী একরকম হবে না। স্থান অনুযায়ী শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্রও পাল্টে যায়। দ্বিতীয়, শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরণের মানুষ। মেয়েরা একধরণের শ্রোতা, আবার পুরুষরা হল আরেক ধরণের শ্রোতা। বয়েস এবং আয় অনুসারেও শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্র বদলে যায়। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে

এবং বয়স্ক মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের চাহিদা ও বয়স্ক মানুষের চাহিদা একরকম হবে না। বয়েসের তারতম্যের কারণে শ্রোতৃমন্ডলীর ধরণ আলাদা হয়।

মাধ্যম অনুসারেও শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার সংবাদপত্রের চরিত্রও শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আসে। সিরিয়াস সংবাদপত্রের পাঠক ও পপুলার সংবাদপত্রের পাঠক একইরকম হয় না। টেলিভিশন চ্যানেল অনুযায়ী ও শ্রোতৃমন্ডলীর চেহারা একেক রকম হয়। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এবং এম.টি.ভির দর্শক একই ধরনের হয় না।

বিষয়বস্তুর জন্যও শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্রে তারতম্য দেখা যায়। একই সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলের নানারকম শ্রোতৃমন্ডলী থাকতে পারে। আনন্দবাজার পত্রিকার পাঠকদের মধ্যেও বিভাজন রয়েছে। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার পাঠক এবং খেলার পাতার পাঠাক একধরণের হয় না। টেলিভিশন চ্যানেলও অনুষ্ঠান অনুযায়ী দর্শকদের চরিত্র আলাদা হয়। একটি চ্যানেলে বহু অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সিরিয়াল যে দেখে সে হয়তো সংবাদধর্মী অনুষ্ঠান দেখে না। একইভাবে সংবাদধর্মী অনুষ্ঠানের দর্শক হয়তো নিয়মিত সিরিয়াল দেখে না।

সময় অনুসারেও টেলিভিশনের দর্শক আলাদা হয়। প্রাইম টাইমের দর্শক আর অন্য সময়ের দর্শক একরকম হয় না। একইভাবে দৈনিক পত্রিকার পাঠক এবং বিষয় কেন্দ্রিক সাময়িকপত্রের পাঠকের চরিত্র আলাদা হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

শ্রোতৃমন্ডলীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে শ্রোতৃমন্ডলীর যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ

(১) স্বেচ্ছাহীন শ্রোতৃমন্ডলী
(২) সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী
(৩) বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী
(৪) স্থান ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী।

১) স্বেচ্ছাধীন শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

নিজেদের ইচ্ছে ও পছন্দমত বিষয়ের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন। সংবাদপত্র পড়ার সময় কোন বিষয় পড়বেন, টেলিভিশন দেখার সময় কী তাঁরা দেখবেন সেটা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের ইচ্ছাধীন। স্বাধীনভাবে তাঁরা ঠিক করবেন কোন বিষয় পড়বেন অথবা কোন অনুষ্ঠান দেখবেন।

২) সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

শিক্ষা, বিনোদন এবং মানসিক আগ্রহের বিষয় জানার জন্য, উপভোগ করার জন্য মানুষ সংবাদপত্র পাঠ করে এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে। এগুলি হল সাধারণ বিষয় যা সমস্ত গণমাধ্যমেই পরিবেশিত হয়। এই বিষয়গুলির জন্য নির্দিষ্ট শ্রোতৃমন্ডলী থাকে, যাঁরা গণমাধ্যমে তাঁদের অভীষ্ট বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৩) বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য আলাদা শ্রোতৃমন্ডলী থাকে। খেলাধূলার পত্রিকার পাঠক একরকম, আবার বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিাকর পাঠক আরেকরকম হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রোতার সঙ্গে পপ্ গানের শ্রোতার পার্থক্য রয়েছে।

৪.৫ শ্রোতা-গবেষণা

গণজ্ঞাপনে গবেষণা করে জানতে হয় শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্র। গণমাধ্যমে মধ্য দিয়ে যে বার্তা শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তা কীভাবে কাদের কাছে কীভাবে গৃহীত হচ্ছে সেটা জানা জরুরী। এটা জানতে না পারলে গণমাধ্যম তার কার্যধারাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারবে না। বার্তার সার্থকতা জানতে গেলে শ্রোতৃমন্ডলীর পরিচয় জানতে হবে। বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে শ্রোতারা লুকিয়ে আছে। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের খুঁজে বার করতে হয়। যে উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রোতৃমন্ডলীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা হয় তারই নাম গবেষণা।

এই গবেষণা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে করতে পারে। আবার কোন শ্রোতা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করতে পারে। সংবাদপত্র জানতে পারে কারা পাঠক এবং তাঁরা কীভাবে দেখছে সংবাদপত্রটিকে। টেলিভিশনের চ্যানেলও গবেষণা চালিয়ে জানতে পারে কারা তাদের দর্শক এবং চ্যানেলের অনুষ্ঠান দর্শকদের কেমন লাগছে। গবেষণা চালিয়ে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান যে বিষয়টি জানে তার দুটি দিক আছে। এক, কে শ্রোতা সেটা জানা যায়। দুই, মাধ্যমে পরিবেশিত বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রথমটি থেকে জানা যায় কী ধরনের মানুষ গণমাধ্যমের শ্রোতা, তাঁদের আর্থিক সামাজিক অবস্থান কী। দ্বিতীয়টি থেকে জানা যায় গণমাধ্যমের পরিবেশিত বিষয়ের সার্থকতা। যদি শ্রোতাদের খারাপ লাগে তাহলে গণমাধ্যম বিষয়টি নতুনভাবে গঠন করতে পারে।

বিজ্ঞাপনদাতারাও গবেষণা থেকে প্রভূত সাহায্য পায়। প্রতিটি বিজ্ঞাপনদাতাই চায় তাদের দেওয়া বিজ্ঞাপন লক্ষ্য শ্রোতার কাছে গিয়ে পৌঁছাক। লক্ষ্য শ্রোতার কথা বিবেচনা করেই বিজ্ঞাপনদাতা মাধ্যম নির্বাচন করে। বিজ্ঞাপন দেবার পর বিজ্ঞাপন-বার্তা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সেটা জানাও দরকার। তাহলেই জানা যাবে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনদাতার কাঙ্খিত বাজার তৈরি করতে পারবে কিনা। যদি বিজ্ঞাপনদাতা জানতে পারেন যে প্রচারিত বিজ্ঞাপন সেভাবে কার্যকরী হচ্ছে না, তাহলে বিজ্ঞাপনটিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে পুণরায় প্রচার করতে পারে। বিজ্ঞাপনকে সফল করতে হলে শ্রোতৃমন্ডলীর গবেষণা খুবই প্রয়োজনীয়।

শ্রোতৃমন্ডলীর গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

১) শ্রোতৃমন্ডলীর রুচি-পছন্দ জানা
২) বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যের পরিমান করা
৩) শ্রোতৃমন্ডলীর বাজার অনুসন্ধান করা
৪) পণ্যের সার্থকতা যাচাই করা
৫) শ্রোতৃমন্ডলীর চাহিদা মিটছে কিনা জানা
৬) মাধ্যমের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ণ করা

গবেষণা চালানো হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। বাজার সমীক্ষা করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যাতত্ত্ব ভিত্তিক পদ্ধতি রয়েছে। প্রশ্নমালা তৈরি করে প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে গিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। শ্রোতার আর্থ-সামাজিক অবস্থান জেনে নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়। শ্রোতার দেওয়া উত্তরগুলি পরে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে জানা যায় শ্রোতৃমন্ডলীর সঠিক প্রতিক্রিয়া।

৪.৬ গণমাধ্যমের ব্যবহার

গণমাধ্যমের আলোচনায় গণমাধ্যমের ব্যবহারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের সংস্পর্শে মানুষ আসে এই মাধ্যমগুলির উপযোগিতা আছে বলেই। কী উদ্দেশ্যে কখন কীভাবে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে মানুষ সেটা জানলে গণমাধ্যমের সামাজিক ভূমিকা আরও ভালোভাবে জানা যাবে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা

গবেষণা চালিয়ে দেখেছে গণমাধ্যমের বিষয়টির গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে। ছোটবেলা থেকেই গণমাধ্যমের ব্যবহারের সঙ্গে মানুষ পরিচিত। এর মাধ্যমে জানা, শেখা ও উপভোগ করার মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

গণমাধ্যম ব্যবহারের সুফল ও কুফল দুটি দিকই হয়েছে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ যখন শিক্ষিত হয়, আলোকিত হয় তখন তাহল সুফল, আর শিশুরা যখন টেলিভিশন দেখে হিংসার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তা হল কুফল। প্রতিটি গণমাধ্যমের ব্যবহারের মধ্যেই এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে।

গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলি হল — (১) ব্যক্তিগতস্তরে ব্যবহার, (২) পারিবারিকস্তরে ব্যবহার (৩) প্রকাশ্যস্তরে ব্যবহার। মানুষ যখন শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে একেবারে নিজস্বভাবে এই গণমধ্যমকে ব্যবহার করে তখন বলা হয় ব্যক্তিগতস্তরে মাধ্যম ব্যবহার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে যখন মাধ্যমের ব্যবহার করে মানুষ তখন ঘটে পারিবারিক স্তরে ব্যবহার। আবার অনেক সময় প্রকাশ্যে মাধ্যমের ব্যবহার ঘটে। যেমন সিনেমা দেখা, অডিটোরিয়ামে গিয়ে সংগীতানুষ্ঠান শোনা ইত্যাদি।

গণমাধ্যমগুলির ব্যবহার অনুষ্ঠান করলে দেখা যায় এই তিনটি স্তর অনেক ক্ষেত্রে মিলেমিশে আছে। যেমন সংবাদপত্র ব্যক্তিগতস্তরে ব্যবহৃত হয়। তবে চরিত্রের দিক থেকে এর আবেদন বহু মানুষের কাছে একই রকম হবে এটা ধরে নেওয়া হয়। ফলে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করলেও এর আবেদনের মধ্যে এক ধরনের সার্বজনীনতা থেকে যায়। টেলিভিশন অনুষ্ঠান মানুষ পরিবারের অনেক সদস্যদের সঙ্গে দেখে। এর আবেদনও সার্বজনীন। সদস্যদের সঙ্গে টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া যায়। বেতার টেলিভিশনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী। কারণ শ্রুতি মাধ্যম অনেক বেশি মনোযোগ দাবি করে। কথা বা গান যে আবেদন রাখছে তা অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। সময়মতো ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে। ইচ্ছেমতো বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পারে মানুষ। বই-এর ব্যবহারও অনেক বেশি ব্যক্তিগত। প্রয়োজনমতো অবকাশ অনুযায়ী বই পড়া যায়।

কম্পিউটার ও উপগ্রহ চ্যানেল মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আন্তঃক্রিয়াশীলতার সুযোগ এই মাধ্যমগুলিতে বেশি। ইন্টারনেট, সিডিরম ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারী নিজের পছন্দ মাফিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। উপগ্রহ চ্যানেলের ক্ষেত্রেও এই সুযোগ রয়েছে। ইচ্ছেমতো চ্যানেল বোতাম টিপলেই পাওয়া যায়। ব্যবহারকারী খুশীমতো মাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারে। সংবাদপত্র, বই, বেতারের ক্ষেত্রে এই মিথস্ক্রিয়তার (interaction) সুযোগ খুবই সীমিত।

তৃপ্তি ঃ

মাধ্যম ব্যবহার মানুষকে তৃপ্তি দেয়। বৈদ্যুতিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে তৃপ্তি পাবার সুযোগ বেশি। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বেতার এবং টেলিভিশন দেখে মানুষ তৃপ্তি পায়। তবে মাধ্যম অনুযায়ী তৃপ্তির রকমফের হয়ে থাকে। সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা বেশি উপলব্ধি করা যায়। সংবাদ পাঠ করে মানুষ বিভিন্ন ঘটনা, সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়। এই জানার মধ্যে আছে কৌতূহলের নিবৃত্তি, অজানাকে জানার আকুলতা। সংবাদ পাঠ করে মানুষ আরও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। তৃপ্তির সম্ভাবনা এখানে খুবই কম। কিন্তু ফিচার, কলাম পাঠ করে মানুষ এক ধরনের তৃপ্তি পায়, উপভোগের আনন্দ পায়।

বেতার অনুষ্ঠান শুনেও মানুষ তৃপ্তি পায়। সংবাদপত্র পাঠ করার চেয়ে বেতার অনুষ্ঠান শোনার তৃপ্তি অনেক বেশি। গান, নাটক ও সংগীতের বিচিত্রানুষ্ঠান শুনে মানুষের মন ভরে যায়। অবকাশের সময়ে বেতার অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মানুষের মন তৃপ্ত হয়, আনন্দ-ঘন আবেশে আপ্লুত হয় হৃদয়।

টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তিবোধে আচ্ছন্ন হয় মন। সিরিয়াল, নাটক, নাচ-গানের অনুষ্ঠান

দেখতে দেখতে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তার মাত্রা সংবাদপত্র, বেতারের থেকে অনেক বেশি। মানুষের মনের ওপর টেলিভিশনের গভীর প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাবের মধ্যে তৃপ্তি অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। টেলিভিশন হল প্রধানত বিনোদন মাধ্যম। যেখানে বিনোদনের সুযোগ বেশি, যেখানে তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনাও বেশি। সিনেমাও মানুষকে তৃপ্ত করে, হৃদয়, মনে তরঙ্গ ভুলে যায়। গানে, কথায়, অভিনয়ে, গল্পের বুনোটে, ক্যামেরার অভিনব ব্যবহারে এক অন্য জগতের সন্ধান পায় দর্শক। হৃদয় মন তৃপ্তিতে ভরে যায়।

Stuart Hyde গণমাধ্যম থেকে উদ্ভূত তৃপ্তির ওপর গবেষণা চালিয়ে ৩১ ধরণের তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। মোট ৪টি শ্রেণীতে তিনি এই ৩১টি তৃপ্তিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই চারটি শ্রেণী হল : (১) প্রতিনিধিত্বমূলক (Vicarious), (২) পলায়নী প্রবৃত্তি (escapist), (৩) সামাজিক (Social) এবং (৪) আত্মিক ও নৈতিক (Spritual and moral)। প্রতিনিধিমূলক শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য তৃপ্তি হল নিজের মনের মতো নায়ক বা নায়িকা দেখা। পলায়ণী প্রবৃত্তির একটি তৃপ্তি হল নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া। সামাজিক তৃপ্তি হল যে কোন বিষয়ে অন্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভাগ করে নেওয়া। আত্মিক ও নৈতিক শ্রেণীর অন্যতম তৃপ্তি হল যা মন্দ তার পরাজয় এবং যা ভাল তার জয় দেখতে চাওয়া।

তৃপ্তির উৎস রয়েছে উপভোগ করার মধ্যে কীভাবে মানুষ উপভোগ করছে সেটা জানতে পারলেই জানা যাবে তৃপ্তির ধরণটি কেমন হবে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক আসার আগে মানুষের মধ্যে যে ধারণা, মূল্যবোধ থাকে তা তৃপ্তি পাবার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি উন্নতমানের রচনা যেভাবে উপভোগ করবেন। একজন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি সেভাবে করবে না। শিক্ষা-রুচির তারতম্যের জন্য তৃপ্তির মধ্যেও পার্থক্য ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের অবস্থান, শিক্ষা, স্বভাব, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তৃপ্তি পায়। গণমাধ্যমের শ্রোতাদের মনস্তাত্বিক গঠন তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেউ উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শুনে আনন্দ পেতে পারে, আবার একজন লোকসঙ্গীত শুনে অশেষ তৃপ্তি পেতে পারে। তৃপ্তি পাবার ক্ষেত্রে যিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন তারও একটি ভূমিকা থাকছে।

৪.৭ গণমাধ্যম ও মেয়েরা

গণমাধ্যমের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মেয়েরা গণমাধ্যমের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে। গণমাধ্যমের শ্রোতা হিসেবে মেয়েদের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিরাট অংশ হল মেয়েরা। গণমাধ্যমে পরিচিত হয়ে তাঁদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। গণমাধ্যমের প্রভাব আলোচনা করতে গেলে এই প্রতিক্রিয়ার চরিত্র অনুধাবন করা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়গুলির মধ্যেও মেয়েরা থাকছে। সংবাদপত্র থেকে টেলিভিশন সর্বত্রই পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মধ্যে মেয়েদের অবস্থান রয়েছে। ভিডিও ও সিনেমায় যা দেখানো হচ্ছে তার মধ্যেও রয়েছে মেয়েরা। কীভাবে মেয়েদের দেখানো হচ্ছে, বিষয়বস্তুর মধ্যে মেয়েদের ভূমিকা কীভাবে চিত্রিত হচ্ছে সেটা গণমাধ্যমের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সংবাদ থেকে ফিচার, সিরিয়াল থেকে ফিচার ফিল্ম সবক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর মধ্যে মেয়েরা রয়েছে।

গণমাধ্যমে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হচ্ছে তা নিয়ে নারীবাদী আন্দোলনের নেতৃবর্গের মেয়েদের ক্ষোভ রয়েছে। নারীবাদীরা মনে করেন গণমাধ্যমে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তার মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট পক্ষপাত।

তাঁদের মূল অভিযোগের তীরটি রয়েছে ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসারে মেয়েরা হয়ে উঠেছে অবিচ্ছেদ্য উপাদান। বিজ্ঞাপনের মডেলে, সিরিয়ালের চরিত্রে মেয়েদের নামিয়ে আনা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী হিসেবে। যৌনতার আবেদনই যেখানে প্রধান হয়ে উঠছে। মানুষ হিসেবে নয়, পণ্য হিসেবেই তাদের উপস্থিত করা হচ্ছে। এই অভিযোগের যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে। গণমাধ্যমে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণা গুলিতে প্রমাণিত হয়েছে যে মেয়েদের ভূমিকা চিত্রণে যথেষ্ট পক্ষপাত হয়েছে। মেয়েদের যে পণ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে যে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। মেয়েদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন পণ্যের বিজ্ঞাপনেরও মেয়েদের মডেল হিসেবে উপস্থিত করা হয়।

সিরিয়াল ও সিনেমায় পরিকল্পিতভাবে মেয়েদের ভূমিকা ও অবস্থান খাটো করে দেখানো হয়। ভারতীয় টেলিভিশনে অধিকাংশে মেয়েদের দেখানো হয় আদর্শ গৃহবধূ হিসেবে। মেয়েদের ভূমিকা হল পুরুষ স্বামীকে সুখী করা ও সন্তানদের প্রতিপালন করা। তাঁদের স্বাধীন সত্ত্বাকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। সিনেমায় মেয়েদের মনের চেয়ে শরীরের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ছবিতে। নাচে, গানে মেয়েদের যেভাবে চিত্রিত করা হয় তাতে যৌন আকর্ষণই প্রধান হয়ে ওঠে।

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা গণমাধ্যমের কার্যধারায় মেয়েদের অংশগ্রহণের বিষয়টির ওপরও গুরত্ব দিয়েছেন। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনে মেয়েরা কী পরিমাণে অংশগ্রহণ করছে তাও অন্যতম বিচার্য বিষয়। গণমাধ্যম গবেষক Van Zoonen মনে করেন মেয়েরা যদি সংবাদ কক্ষে বেশি পরিমাণে নিযুক্ত হয় তাহলে সংবাদ পরিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হবে। প্রথাগতভাবে মেয়েদের বিষয়গুলিকে দেখবার প্রবণতা কমবে এবং মেয়েদের অবস্থান সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে। টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সিনেমা তৈরিতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ মেয়েদের প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরতে পারবে।

মেয়েদের বিষয় নিয়ে আজকাল বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এইসব পত্রপত্রিকায় মেয়েদের জগতের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকে। ভারতে মেয়েদের জন্য যে সব সাময়িকপত্র রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফেমিনা, উইমেনস্ এরা, মনোরমা, সানন্দা প্রভৃতি। টেলিভিশনেও মেয়েদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

৪.৮ গণমাধ্যম ও পরিবেশ

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনাতা বাড়াতে ও পরিবেশ রক্ষার গণমাধ্যম খুবই তাৎপর্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আইন করে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবেশ পুরোপুরি রক্ষা করা যায় না। পরিবেশ রক্ষিত হয় সাধারণ মানুষের সচেতনতায় এবং প্রচেষ্টায়। বাতাস, গাছ, পাহাড়, নদীর সঙ্গে মানুষের নিজের অস্তিত্ব জুড়ে আছে। প্রকৃতি যদি বিপন্ন হয় তাহলে মানুষের জীবনও সঙ্কটের মধ্যে পড়বে এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে গড়ে উঠলেই পরিবেশ রক্ষার কাজ সহজ হয়। পরিবেশ নিয়ে এই সচেতনতা ও উপলব্ধি তৈরি করতে গণমাধ্যম সবচেয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে, ফিচার ও অন্যান্য রচনায় পরিবেশ নিয়ে প্রতিনিয়ত লেখা হচ্ছে। মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য, বিশেষ করে সেই সমস্ত ঘটনার কথা যা পরিবেশকে বিপন্ন করছে। সাধারণ মানুষ এই সব রচনা পড়ে বুঝতে পারছে পরিবেশ রক্ষিত না হলে মানবজীবন এক মহাবিপদের মধ্যে পড়বে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে সংবাদপত্র।

টেলিভিশন, বেতার ও পরিবেশ বিষয়ে বিবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বিশেষ করে আলোচনামূলক অনুষ্ঠান যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়ে পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারে। টেলিভিশন বিপন্ন পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে বিপন্নতার প্রামাণিক দলিল হাজির করে আমাদের সামনে। পলি পড়ে যাওয়া নদীর ছবি, জলাশায় ভরাট হওয়ার ছবি, জঙ্গল কাটার ছবি তুলে ধরে বিপন্ন পরিবেশের প্রমাণ। মানুষ সহজেই বুঝতে পারে এতে কতখানি বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

আজ সারা বিশ্বজুড়েই পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। এই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান অবলম্বনই হল গণমাধ্যম। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীতে মিশে যে ভয়ানক অবস্থায় সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে আমরা কম বেশি অনেক সচেতন হয়েছি। গণমাধ্যমই এই সচেতনতা তৈরি করেছে। বসুন্ধরা বৈঠক থেকে, জাতিপুঞ্জ সর্বস্তরেই উন্নত দেশগুলিকে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। পরিবেশ নিয়ে জনমত গঠনে গণমাধ্যমই সবচেয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

পরিবেশ বর্তমানে সাংবাদিকতায় একটি আলাদা জায়গা নিয়ে নিয়েছে। বহু সাংবাদিক পরিবেশ সম্পর্কে লেখার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। ভারতে পরিবেশ নিয়ে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে বহু তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে যে পরিবেশ আন্দোলন তৈরি হয়েছে তাতে গণমাধ্যমেরও ভূমিকা আছে। সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে ও টেলিভিশনে প্রচুর কভারেজ দেওয়া হয়েছে নর্মদা ও তেহার বাঁধের বিষয়ে। বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঐ দুটি বিশাল প্রকল্পকে কেন্দ্র করে।

জলাশয় রক্ষা করার ব্যাপারেও সংবাদপত্র ও টেলিভিশন প্রচার চালায়। জলাশয় ও ভেড়ি বুজিয়ে বাসযোগ্য জমি করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কলকাতার সংবাদপত্রে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। অনেকগুলি বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। পরিবেশবাদীরা যে আন্দোলন তৈরি করছে তাতে গণমাধ্যম অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আজকে মানুষ এটা বুঝেছে যে পরিবেশ রক্ষা না করলে সামনে সমূহ বিপদ। এই উপলব্ধির তৈরি করতে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যম।

৪.৯ গণমাধ্যম ও মানবাধিকার

সুস্থ স্বাভাবিকভাবে নিজের জীবনকে স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকার হল মানবাধিকার। মানবাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন মানবাধিকার বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে বর্তমান দিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে রাখছে এবং অভিজ্ঞ করে তুলছে। এই পৃথিবীতে মর্যাদার সঙ্গে জীবনের অধিকারকে সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠা করার অধিকার সমস্ত মানুষের আছে। বিশ্বের সমস্ত দেশেই এই অধিকারকে মৌল অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

তত্ত্বগতভাবে মানবাধিকার সর্বত্র স্বীকৃত হলেও বাস্তবে কিন্তু অনেক সময়ই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। বিনা বিচারে পুলিশ হেপাজতে কোন ব্যক্তিকে দিনের পর দিন রেখে দিলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী কিনা তা আদালতের বিচার সাপেক্ষ। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে বিচারের সুযোগ দিতে হবে। বিনা বিচারে পুলিশি হেপাজতে দীর্ঘসময় যদি কাউকে আটকে রাখা হয় তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তির মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। আইনসম্মত বিচারপদ্ধতি থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি বঞ্চিত হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি পুলিশি হেপাজতে রাখা যায় না। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে আদালতের সামনে বিচারের জন্য হাজির করতে হয়। এরকম ঘটনা যদি ঘটে তাহলে, সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের

মতো গণমাধ্যম এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ করতে পারে। মানবাধিকারের এই বিষয়টির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বহুবার সংবাদপত্র এই ধরনের ঘটনা নিয়ে সংবাদ করেছে।

পুলিসি হেপাজতে, জেল-হাজতে কোন বন্দীকে যদি অত্যাচার করা হয় তাহলে তা মানবাধিকার বলে চিহ্নিত হয়। পুলিসি হেপাজতে বন্দীকে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা আমাদের দেশে বহুবার ঘটেছে। সংবাদপত্রে টেলিভিশনে এই পুলিসি নির্যাতনে বন্দীমৃত্যুকে নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে তা অনেক সময়ই সোরগোল ফেলে দিয়েছে। পার্লামেন্ট থেকে আইনসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আলোচনা ও বিতর্কে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি প্রতিবাদের সোচ্চার হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য। চোর বা ডাকাত সন্দেহে জনতা নিজের হাতে আইন তুলে নেয়। উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে মারে বেশ কয়েকজনকে। হামেশাই এরকম খবর সংবাদপত্রের পাতায় থাকে। এই ধরনের ঘটনা হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু প্রতিনিয়ত ঘটছে। বসনিয়া, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমরে লক্ষ লক্ষ মানুষ গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছে। জাতিদাঙ্গার এই ভয়াবহ পরিণতি মানিবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে কোন ধরনের গণহত্যাই মানবাধিকার হরণের চূড়ান্ত পর্যায়। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে পরিকল্পিত গণহত্যা ঘটেছিল, ২০০২ সালে গুজরাতে যে নরমেধ যজ্ঞ সংগঠিত হয়েছিল তা সর্বদিক দিয়ে মানবাধিকারকে লঙ্ঘিত করেছিল।

দেশে যখন দুর্ভিক্ষ ঘটে, তখনও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ আফ্রিকার দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ন্যূনতম আহারের সংস্থান করতে পারে না, এবং নিরন্ন মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করে তখন তাও হয় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জ্বলন্ত প্রমাণ।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ধরনের ঘটনাই ঘটুক না কেন গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব হল ঐ ঘটনাকে সংবাদ করে সাধারণ মানুষের গোচরে নিয়ে আসা। শুধু তথ্য সরবরাহ করে নয়, মতামত ও পর্যালোচনা প্রকাশ করে ও মানবাধিকা লঙ্ঘনের বিষয়টিকে প্রকাশ্য আলোচনায় নিয়ে আসে।

সাম্প্রতিককালে মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকে পর্যাপ্ত কভারেজ দিয়ে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন মানবাধিকর লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যখন ঘটে তখন সরকার তা প্রচার করতে একেবারেই উৎসাহী হয় না। দেশে বিদেশে সর্বত্রই একথা সত্য। আফ্রিকায় যখন দুর্ভিক্ষ ঘটেছে তখন পশ্চিমি গণমাধ্যমগুলি ঐ ঘটনার বিস্তৃত কভারেজ দিয়েছে বলেই আমরা জানতে পেরেছি। যে সব দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেছে তারা কিন্তু কখনই বিশ্বের দরবারে বিষয়টি হাজির করেনি। কারণ এটা তাদের ব্যর্থতা। সব সরকারই চায় ব্যর্থতা ঢাকতে। কিন্তু গণমাধ্যমের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষের খবর সমগ্র বিশ্বের মানুষ জানতে পারে। পশ্চিমি গণমাধ্যমগুলি বিশেষ করে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলি যে বিস্তৃত কভারেজ দিয়েছিল তার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্য। চিকিৎসার সরঞ্জাম দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশগুলিতে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজনীতির, কূটনীতির উর্দ্ধে উঠে বিভিন্ন দেশে এই যে সাহায্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার পিছনে গণমাধ্যমগুলির অবদান যথেষ্ট ছিল।

মানবিক অধিকার ভঙ্গের অনেক সাড়াজাগানো খবর বার করার জন্য তদন্তমূলক সাংবাদিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে উদ্যোগ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে বহু মানবিক অধিকারভঙ্গের খবর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অরুণ শৌরীর করা ভাগলপুরে জেলে বন্দীদের অন্ধ করার খবর উল্লেখ করা যেতে পারে। খবরটি

সারা দেশে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল।

মানবিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে গণমাধ্যম বর্তমানে সতর্ক প্রহরীর মতো কাজ করে। অধিকার লঙ্ঘের সম্ভাবনা অনেকখানি কমিয়ে দেয়।

৪.১০ সারাংশ

গণমাধ্যমের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় গণজ্ঞাপন ক্রিয়া। তাই গণজ্ঞাপনের আলোচনায় গণমাধ্যমের কার্যধারা বোঝা প্রয়োজন। গণমাধ্যম যন্ত্র নির্ভর। বার্তার চরিত্র নৈর্ব্যক্তিক। একই সঙ্গে বহু মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। পরিচালিত এই বার্তা শ্রোতাদের ওপর কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যেটা জানলে গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে।

গণমাধ্যমের বার্তা লক্ষ শ্রোতাকে কম বেশি প্রভাবিত করে। লক্ষ শ্রোতারা হল সংবাদপত্রের পাঠক, বেতারের শ্রোতা এবং টেলিভিশনের দর্শক। ঐতিহাসিক দিক থেকে সংবাদপত্রের সামাজিক প্রভাব একটি স্বীকৃত ঘটনা। সংবাদপত্র ও বেতার মানুষের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নিরক্ষর ও দরিদ্র দেশে বেতারের প্রভাব বেশি। টেলিভিশনের আবির্ভাবের পর গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়। প্রথম দিকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন এই প্রভাব ছিল খুব স্বল্প। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞরা অনুধাবন করেন যে এই প্রভাবের ব্যপ্তি বিশাল। দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমে হিসেব টেলিভিশন দ্রুত মানুষের মন জয় করার ফলে প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল পণ্য সংস্কৃতির প্রসার। সমস্ত গণমাধ্যমেই প্রচারিত বিজ্ঞাপন মানুষের মনে পণ্য কেনার প্রবণতা তৈরি করছে। পণ্যসংস্কৃতি ভোগবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে। গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুও ভোগবাদের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করছে। বিশেষ করে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান মানুষের মনে তৈরি করছে আরও উন্নততর জীবনযাত্রার স্তরে উন্নত হবার আকাঙ্খা, জনশিক্ষার প্রসার ঘটিয়েও গণমাধ্যম সমাজজীবনকে প্রভাবিত করছে। পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার ওপর টি.ভি. অনুষ্ঠান, সংবাদপত্রের নিবন্ধ সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে।

গণমাধ্যমের আলোচনায় শ্রোতৃমন্ডলীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের মানুষ আছেন এই শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে। সহজে শ্রোতৃমন্ডলীকে চেনা যায় না। অনুমানে গড়ে ওঠে। মাধ্যম অনুযায়ী তাদের চরিত্র আলাদা হয়।

শ্রোতৃমন্ডলীকে ভালভাবে বোঝায় জন্য কতকগুলি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল স্থান, মানুষ, মাধ্যম, বিষয়বস্তু ও সময়। শ্রোতৃমন্ডলীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এর জন্য অন্যতম হল স্বেচ্ছাধীন শ্রোতৃমন্ডলী, সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী, বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী এবং স্থান ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী। শ্রোতৃমন্ডলী চরিত্র বোঝার জন্য গবেষণার সাহায্য নেওয়া হয়। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় এই গবেষণার জন্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর এই গবেষণা থেকে দুটি দিক পরিস্ফুট হয় — (১) শ্রোতা কে (২) বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। বিজ্ঞাপনদাতারও জানতে পারে কারা তাদের লক্ষশ্রোতা। শ্রোতৃমন্ডলীর গবেষণার ছ'টি উদ্দেশ্য রয়েছে।

মানুষ গণমাধ্যমের ব্যবহার বিভিন্নভাবে করে। গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে করতেই মানুষ ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। ব্যবহারের সুফল এবং কুফল দুটি দিকই রয়েছে। তিনভাবে গণমাধ্যম ব্যবহৃত হতে পারে — ব্যক্তিগত স্তরে, পারিবারিক স্তরে এবং প্রকাশ্য স্তরে। একটি স্তর অবশ্য অন্য স্তরের

সঙ্গে অনেকসময় যুক্ত হয়ে থাকে। কম্পিউটার ও উপগ্রহ চ্যানেল মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করছে। মাত্রাটি হল মিথস্ক্রিয়তা।

গণমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তৃপ্তি। মাধ্যম অনুযায়ী তৃপ্তি পাবার মাত্রাতে তারতম্য ঘটে। টেলিভিশনে তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ৪টি শ্রেণীতে ৩১ ধরণের তৃপ্তি হতে পারে। তৃপ্তির উৎস রয়েছে উপভোগ করার মধ্যে। মানুষ নিজের অবস্থান, শিক্ষা, স্বভাব, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তৃপ্তি পায়।

গণমাধ্যমের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষ্য শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েদের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেকটা জায়গা নিয়ে আছে মেয়েরা। নারীবাদীরা মনে করেন গণমাধ্যমে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তার মধ্যে যথেষ্ট পক্ষপাত রয়েছে। বিজ্ঞাপনের মডেলে, সিরিয়ালের চরিত্রে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তাতে মনে হয় মেয়েরা ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। যৌনতার আবেদনই প্রধান হয়ে উঠছে। পরিবারে মেয়েদের ভূমিকা সন্তান প্রতিপালন করা ও পরিবারের সদস্যদের সুখী করা। তাঁদের স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বের কথা একেবারেই বলা হয় না। গণমাধ্যমে মেয়েদের অংশগ্রহণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মেয়েরা যদি গণমাধ্যমের কার্যধারায় অংশগ্রহণ করে তাহলে মেয়েদের ভূমিকার চিত্রণ অবশ্যই একটু অন্যরকম হবে। মেয়েদের বিষয় নিয়ে আজকাল বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

পরিবেশ রক্ষায় গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন পরিবেশ বিষয় রচনা ও অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলে। অরণ্য নদীকে রক্ষা করার সঙ্গেই আমাদের অস্তিত্ব যুক্ত হয়ে আছে। বাতাসে দূষিত হলে আমাদের জীবনও বিপন্ন হবে। গণমাধ্যমই এ বিষয়ে আমাদের সজাগ করছে। আন্তর্জাতিক স্তরেও পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার যে সূত্রপাত ঘটেছে তার পিছনে গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মানবাধিকার হল একটি মৌল অধিকার। এই অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। গণহত্যা, দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু এসবই হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ। গণমাধ্যম এই সব বিষয়ের ওপর কভারেজ দিয়ে সাধারণ মানুষের গোচরে নিয়ে আসে। ফলে জনমত তৈরি হয় এবং প্রয়োজন হলে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। মানবাধিকার বিষয়ে খবর করার জন্য সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনকে নিজ উদ্যোগ কাজে নামাতে হয়, অনেক সময় তদন্তমূলক সাংবাদিকতার আশ্রয় নিতে হয়। মানবিক অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম সতর্ক প্রহরীর মতো কাজ করে।

৪.১১ অনুশীলনী

১) গণজ্ঞাপনের গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

২) গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব কী?

৩) বিজ্ঞাপণের কি আলাদা প্রভাব আছে?

৪) শ্রোতৃমন্ডলী কী?

৫) শ্রোতৃমন্ডলী চরিত্র বুঝতে কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ?

৬) শ্রোতৃমন্ডলীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৭) শ্রোতৃমন্ডলী গবেষণা কাকে বলে?

৮) শ্রোতৃমন্ডলী গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি কী?

৯) গণমাধ্যম ব্যবহারের স্তরগুলি কী?

১০) তৃপ্তি কাকে বলে? তৃপ্তিকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

১১) গণমাধ্যমে মেয়েদের অবস্থান কী?

১২) পরিবেশিত বিষয়বস্তুতে মেয়েদের কীভাবে দেখানো হয়?

১৩) নারীবাদীদের অভিযোগগুলি কী?

১৪) মেয়েদের গণমাধ্যম কার্যধারায় অংশগ্রহণ কি প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবে?

১৫) মেয়েদের জন্য কয়েকটি পত্রিকার নাম করুন।

১৬) পরিবেশ রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

১৭) গণমাধ্যম কি এবিষয়ে জনমত গঠন করতে পারে?

১৮) মানবাধিকার কী?

১৯) মানবাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম কী ভূমিকা পালন করে?

২০) মানবাধিকার বিষয়ে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার সুযোগ আছে কী?

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১) গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম — ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৩) Mass Communication Today — Subir Ghosh

৪) Mass Communication Theory — Denis McQuail

৫) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী — এম.এল.ডি. ফ্লার ও এস.জে.বল-রোকেশ (অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন)

৬) Women and Media — Edited by Pradip Mathur

৭) Mass Communication Theory — Denis McQuail

৮) Media Issues — K. M. Shrivastava.

৯) ভারতীয় গণমাধ্যম — বংশী মান্না

একক ৫ □ উন্নয়ন ও জ্ঞাপন

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা
৫.৩ উন্নয়ন মডেল
৫.৪ উন্নয়ন তত্ত্ব
৫.৫ উন্নয়নে যোগাযোগ তত্ত্ব
৫.৬ উন্নয়নের লক্ষ্য
৫.৭ জ্ঞাপন ও উন্নয়ন
৫.৮ সারাংশ
৫.৯ অনুশীলনী
৫.১০ পরিভাষা
৫.১১ গ্রন্থসূচী

৫.০ উদ্দেশ্য

উন্নয়ন কী? এ প্রশ্নে নানা মুনির নানা মত। প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়ন ধারণা বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশ পরে লক্ষ্য করা গেল জ্ঞাপন ও উন্নয়নে একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। তবে মূলত জ্ঞাপন ও উন্নয়নের সম্পর্ক কি সে বিষয়ে ধারণা গড়ে তোলাই এই এককের উদ্দেশ্য।

৫.১ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন একটি সামাজিক কর্মকান্ড। সমাজকে ঘিরে যে ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদের কর্মকান্ডই প্রতিফলিত হয় তাদের সমাজ বিন্যাসে। সুতরাং উন্নয় প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যে জরুরি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞাপন বা যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে এই বিশাল কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং উন্নয়নকে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প জ্ঞাপনকে উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৫.২ উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা

'উন্নয়ন সংক্রান্ত' ধারণা সমাজ বিজ্ঞানে অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন একটা বহুমাত্রিক বিষয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন প্রশ্নের ধারণাও বদলেছে গুণগতভাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উন্নয়ন প্রশ্নে নতুন ধারণা জন্ম নিতে থাকে। এই ধারণার মূল বক্তব্য হল 'সব উন্নয়নই মানব উন্নয়ন'। অর্থাৎ উন্নয়নের অর্থ হল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানের এবং তার জীবন প্রতিবেশের (environment) উন্নয়ন। কিন্তু উন্নয়ন সংক্রান্ত পূর্বধারণায় মানবিক ও পরিবেশের নানা উপাদান, উপকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আড়ালে থেকে যায়। চল্লিশের দশকে উন্নয়নমূলক ধারণা ছিল ইউরোপ কেন্দ্রিক এবং উন্নয়ন বলতে তখন শিল্পায়ণকেই বোঝাত।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর দশকে আধুনিকীকরণ, গণতান্ত্রিকতার প্রসার, উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ইত্যাদি এবং উন্নয়ন ছিল সমার্থক।

৫.৩ উন্নয়ন-মডেল

আধুনিক কালের ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা পশ্চিমী উন্নয়ন ধারণাকে পরিশিলীত রূপ দিয়ে একটা 'মডেল' (Model) তৈরীর চেষ্টা করেন। তাঁদের লক্ষ্য এই মডেল যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মডেলটি সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরা হল —

- শিল্প দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। সুতরাং বিনিয়োগের সিংহভাগই শিল্প, পরিবহন, কাঁচামাল এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে।
- শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রের মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও দক্ষ ব্যক্তি জরুরী। তাঁরা তাদের নিজস্ব দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা পালনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।
- দেশের শ্রমশক্তিকে যথার্থভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে এবং সরকারী পরিচালন প্রক্রিয়ায় যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে জন্য জনশিক্ষা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর জোর দিতে হবে।
- প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো জরুরী।

উল্লিখিত উন্নয়ন মডেল উন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরে। তবে উন্নয়ন প্রশ্নে নির্দিষ্ট কিছু তত্ত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন।

৫.৪ উন্নয়ন তত্ত্ব

১৯৫০ থেকে ১৯৭০-র দশকের মধ্যে উন্নয়ন প্রশ্নে কয়েকটি তত্ত্ব তুলে ধরা হয়। সেগুলি হল —

ক) অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Economic Theory)

খ) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory)

গ) রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Theory)

ঘ) যোগাযোগ তত্ত্ব (Communication Theory)

ক) অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Economic Theory) ঃ

১৯৫০-এর দশকের অর্থনীতির সমালোচকগণ উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যের বিষয়টি বাতিল করে দেন। ওয়াল্ট রসটো (Walt Rostow) তাঁর 'দ্য স্টেজেস্ অব ইকোনমিক' গ্রন্থে উন্নয়নের পাঁচটি স্তর তুলে ধরেছেন —

(১) ঐতিহ্যবাহী সমাজ (২) 'টেক অফ'-এর পূর্বশর্ত, বা অবস্থা (৩) 'টেক অফ' (৪) ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং (৫) নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিজের উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়া বজায় থাকলে বাইরের সাহায্য ছাড়াই দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

কিন্তু শুরু থেকেই রাষ্ট্রের এই ধারণা সমালোচনার সম্মুখীন। সমালোচকদের মতে রাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী ধারণা আধুনিকতার পরিপন্থী। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, রাষ্ট্রে উল্লিখিত পাঁচটি স্তর পেরিয়ে পশ্চিমের দেশগুলি উন্নত হয়েছে? পরবর্তী সময়ে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত এক রিভিউয়ে ফ্রেডরিক ফ্রে (Frederic Frey) বলেন যে উন্নয়নের প্রশ্নে অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকরা যোগাযোগ সংক্রান্ত ফ্যাক্টরসগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, এমনকি অনেকে বিষয়টিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

খ) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory) ঃ

অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকেরা উন্নয়ন বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজের ও দেশের বৃহৎক্ষেত্রের পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সমর্থকরা উন্নয়নকে দেখতে চেয়েছিলেন একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উন্নয়ন হোল আধুনিকতার সমস্যা এবং ব্যক্তি স্তর থেকেই উন্নয়নের শুরু। এ ব্যাপারে দুই মার্কিন গবেষকের গবেষণালব্ধ কাজ উল্লেখ্য। ডেভিড সি. ম্যাকল্যান্ড (David C.McClelland)-র 'The Achieving Society' 1961, এবং অপরটি হোল 'On the theory of Social Change' 1962 — যার রূপকার হলেন এভারেট ই. হোজেন (Everett E.Hogen)। উল্লেখ করা জরুরি যে উভয়ের গবেষণা ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয়। তাঁদের মতে, সমাজ পরিবর্তনে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই নির্ধারক ভূমিকা পালন করে থাকে। হোজেন তাঁর গবেষণায় এই অভিমত প্রকাশ করেন, সামাজিক পরিকাঠামো ও ব্যক্তির কর্মকাণ্ড পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রাক্-আধুনিক এবং আধুনিক মানুষের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক মানুষ অনেক বেশী সৃজনশীল (Creative), অনুসন্ধিৎসু (innovative)।

গ) রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Theory) ঃ

রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বা বিন্যাস নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। এই মতের সমর্থকদের মতে তৃতীয় বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে সেই দেশ গুলির কাছে জরুরী ছিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব লাভ। তাছাড়া, সদ্য স্বাধীন দেশ গুলি ছিল বহু ভাষা, জাতি, ধর্ম, উপজাতি সমন্বিত দেশ। স্বাভাবিকভাবেই এই দেশগুলির কাছে জাতীয় সংহতি গঠনের বিষয়টি ছিল বিশেষ বিবেচ্য বিষয়।

১৯৫০—৬০ এর দশক পর্যন্ত চলতি ধারণা অনুসারে এটা মনে করা হোত যে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকরা পরামর্শ দেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে

পশ্চিমী ধাঁচের ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিক স্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনের চর্চা জরুরি। জরুরি অবাধ বাণিজ্য বাজার।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তারা গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম গুলির ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু তাদের মতে গণমাধ্যমের ভূমিকা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। অর্থাৎ উন্নয়নের অন্যান্য বিষয়গুলি আড়ালে চলে যায়। কারণ রাজনৈতিক উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন হল বহুমাত্রিক বিষয়।

৫.৫ উন্নয়নে যোগাযোগ তত্ত্ব

গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক যোগাযোগ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন মার্কিন বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল লার্নার (Daniel Lerner)। তিনি তাঁর 'The Passing of Modernity' (১৯৫৮) গ্রন্থে উন্নয়ন পদ্ধতিকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শীলতায় (Variables) ভাগ করেছিলেন। সেগুলি হল ঃ নগরায়ন (urbanization), নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণমাধ্যমের প্রচার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় আরো বেশি অংশগ্রহণ। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের আরো বেশি অংশগ্রহণের বিষয়টি মাথায় রেখে সাক্ষরতা ও গণমাধ্যমের প্রসার ও প্রচারের উপর জোর দেন ড্যানিয়েল লার্নার। উন্নয়ন প্রশ্নে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন (modern individual) লার্নারের কাছে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর মতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন হল পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে নিজেকে সজাগ রাখা এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলা।

১৯৭০ দশকের মধ্যভাগ থেকে উন্নয়সংক্রান্ত বিষয়ে পশ্চিমী ধারণার আধিপত্যবাদকে ঘিরে প্রশ্ন ওঠে। এটা মনে করা হয় যে, গোড়ার পর্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে গণযোগাযোগ গুরুত্ব পেতে থাকে এবং বিষয়টিকে উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

মাস মিডিয়া—ম্যাজিক—মাল্টিপ্লায়ার ঃ

ড্যানিয়েল লার্নারের বিষয়টিকে আরো পরিশীলিত রূপ দেবার চেষ্টা করেন আরেক মার্কিনী বিশেষজ্ঞ উইলবার শ্র্যাম (Willber Schramm)। তাঁর মতে গণমাধ্যম 'the magic multiplier' বা জাদু গুণক। দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রেস, বেতার সম্প্রচার, ফিল্ম এবং টেলিভিশন ইত্যাদি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা গঠনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও ইউনেস্কো একটা কার্যকরী প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেয়। উইলবার শ্র্যামের ম্যাজিক মাল্টিপ্লাইয়ার তত্ত্ব ছিল তারই একটা অংশ।

শ্র্যামের মতে তৎকালীন সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ পরিবর্তনে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা ছিল সমাজ পরিবর্তনের এজেন্টের মত। আচরণ, বিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনে গণমাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, অনুপযুক্ত চলতি রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, বাঞ্ছিত ও উপযুক্ত রীতিনীতি সন্ধান এবং সে সম্পর্কে জনসমাজকে ওয়াকিবহাল করা। এইভাবে একটা দেশ তার জনগণের সচেতনতা প্রসারিত করবে এবং নতুন রীতি-নীতি সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা তুলে ধরে তাকে বাস্তবে রূপায়ণ করবে। শ্র্যাম জোর দিয়েই বলেন যে, মানুষের ধ্যান ধারণার প্রসারণে, আশা-আকাঙ্খা বৃদ্ধিতে এবং সর্বোপরি উন্নয়নের পরিবেশ তৈরিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গণমাধ্যমের এই ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে উইলবার শ্র্যাম প্রস্তাব দেন যে তথ্য লেনদেনের বিভিন্ন বাধা দূর করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বচ্ছতার পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরী। একই সঙ্গে ওই দেশগুলিতে নতুন

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করা এবং তা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, সম্পদ এবং আধুনিক গণমাধ্যম ও তার প্রযুক্তি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন আজকের দিনে বড় চ্যালেঞ্জ। শ্র্যাম এই অভিমতপোষণ করেন যে গণমাধ্যমের এই জাদুগুণক কে বাদ দিয়ে উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব।

৫.৬ উন্নয়নের লক্ষ্য

আধুনিক উন্নয়ন পাঁচটি লক্ষ্যপূরণ করতে চায়। সেগুলি হল ঃ—

(১) গ্রামীণ উন্নতির প্রতি জোর ঃ কোন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই দেশের দরিদ্র মানুষের অবস্থার পরিবর্তনে কতখানি সাহায্য করছে সেটি উন্নয়নের বড় মাপকাঠি। আমরা জানি উন্নয়নশীল দেশে বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। ফলে গ্রামীন উন্নতি এসব দেশে উন্নয়নের নির্দেশক।

(২) জীবন ধারণের উৎকর্ষতাবৃদ্ধি ঃ প্রচলিত অর্থে উন্নয়নের প্রধান পরিমাপ হল মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধি। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তি নিজের জীবনকে উন্নততর করার জন্য কতখানি আগ্রহ পোষণ করছেন এবং সেই চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট দেশের উপকরণগুলি কতখানি সহায়ক তার উপর উন্নয়ন পরিমাপ নির্ভর করছে। সুতরাং উন্নয়নের যেসব দিক ব্যক্তিগত উৎপাদক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও সামাজিক প্রয়োজন মেটায় সেগুলির উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়।

(৩) জনসাধারণের অংশগ্রহণ ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রিয় ভূমিকায় রয়েছে জনগণ। পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যই হল জনগণ এবং তার জীবন প্রতিবেশের উন্নতি সাধন করা। সে জন্য পরিকল্পনাবিদ্‌রা মনে করেন জনসাধারণের কাছ থেকে সর্বাগ্রে জানতে হবে উন্নয়নের দ্বারা জনসাধারণ তাঁদের কি কি উপকার করতে চান। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

(৪) স্বনির্ভরতা অর্জন ঃ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা অনুসারে উন্নয়-সংক্রান্ত কোন পশ্চিমী মডেল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আদর্শ উন্নয়ন হল বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন। প্রত্যেকটি দেশ, এমনকি প্রতিটি গ্রাম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন অনুসারে স্বতন্ত্র উন্নয়নের পথ বেছে নেবে। গ্রামীণ উন্নয়ন হবে স্থানীয় কৃষ্টি শিল্পভিত্তিক উন্নয়ন। এই ধরনের গ্রামীন অর্থনীতি বিদেশী সাহায্য ও প্রযুক্তি সহায়তার উপর নির্ভরশীল নয়।

(৫) উন্নয়নের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার সমন্বয় ঃ গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্য শুধুমাত্র কৃষ্টি, অর্থনৈতিক নয়, উন্নয়ন হল এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। স্থানীয় কৃষ্টিভিত্তিক শিল্প, গৃহ উন্নয়ন, পাণীয় জল সরবরাহ, শক্তির উৎস সৃষ্টি, স্যানিটেশন, পথ-ঘাট, পরিকাঠামো — এ সমস্ত উন্নয়ন এক কথায় গ্রামীণ উন্নয়ন। কৃষি ও শিল্পকে ঘিরে গড়ে উঠলেও তার উদ্দেশ্য বহুমুখী। এই বহুমুখী উন্নয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন উন্নয়নের গুরুর্তপূর্ণ শর্ত।

৫.৭ জ্ঞাপন ও উন্নয়ন

জ্ঞাপনের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক খুব নীবিড়। উন্নয়ন এক সামাজিক কর্মকান্ড এবং জনগণের সদিচ্ছা ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। জ্ঞাপনের প্রশ্ন তাই স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। ড. উইলবার

শ্র্যাম তাঁর "মাস মিডিয়া অ্যান্ড ন্যাশনাল ডেভেলেপমেন্ট" গ্রন্থে লিখছেন, "In the service of national development, the mass media are agent of social change" অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমই হল সমাজ পরিবর্তনের এজেন্ট।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্বনির্ভরতা এবং জোটনিরপেক্ষতার দাবি ঘোষণা করে। আর এই প্রেক্ষাপটেই উন্নয়নমূলক যোগাযোগ জ্ঞাপন সংক্রান্ত গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশগুলি দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে, দারিদ্র্যতা দূরীকরণের, সাক্ষরতার প্রসারের এবং কর্মবিনিয়োগের দ্রুত পথ খুঁজতে থাকে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

ঔপনিবেশিক মুক্তির পর সদ্য স্বাধীন দেশগুলি যোগাযোগের ঔপনিবেশিক কাঠামো দূর করে দেশের স্বার্থক যোগাযোগ বিন্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তথ্য-সম্পদ সংক্রান্ত ধারণা এই দেশগুলির কাছে বলা যেতে পারে এক নতুন উপলব্ধি।

তাছাড়া, পশ্চিমী কিছু অর্থনৈতিক সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য পরামর্শদাতারা এই অভিমত পোষণ করেন যে, নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্পের প্রসার এবং উন্নয়নমূলকও উন্নতমানের গণজ্ঞাপন বিন্যাস বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

৫.৮ সারাংশ

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণারও বদল ঘটেছে। হাজির হয়েছে উন্নয়ন তত্ত্ব। পশ্চিমীরা গঠন করল উন্নয়নমডেল। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে উন্নত দেশগুলির পরিকাঠামোগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে পশ্চিমীমডেল এদেশে তার কার্যকারিতা হারায়, তবে নানা মতপার্থক্যেও যোগযোগের ইতিবাচক ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করে।

৫.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত নোট ঃ

১. অর্থনৈতিক তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক তত্ত্ব, উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. উন্নয়ন মডেলের প্রধান বক্তব্যগুলি কী কী?

২. উন্নয়ন বলতে ঠিক কি বোঝায়?

৩. উন্নয়ন ও জ্ঞাপন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত—যুক্তি দিয়ে এসম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. উন্নয়নের লক্ষ্য কী?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১. উন্নয়ন কী? জ্ঞাপনকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় — এই বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

২. উন্নয়ন তত্ত্বগুলি কী কী? কোন তত্ত্বটি উন্নয়নে বেশি প্রাসঙ্গিক এবং কেন?

৩. উন্নয়নের লক্ষ্য কী? এই লক্ষ্যপূরণে জ্ঞাপন কতটা কার্যকরী?

৫.১০ পরিভাষা

■ environment — জীবনপ্রতিবেশ ■ innovative — অনুসন্ধিৎসু ■ creative — সৃজনশীল ■ Variables — পরিবর্তনশীলতা ■ modern individual — ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন ■ urbanization — নগরায়ন ■ magic multiplier — জাদুগুণক ■ customs — রীতিনীতি

৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ্য ঃ—

১. গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২. Mass Communication In India — Keval J. Kumar

৩. Communication & Development — Everett M. Rogers

৪. The Passing of Traditional Society — David Lerner

৫. Encyelopedia of International Communication (Vol.-2) — Barnouw, Gerbner, Schramm, Worth and Gross.

৬. The passing of moderning — Hamid Mowlana

৭. Communication for Development in the Third World — Melkote Steeves.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১. Communication and Social change in developing Nations — Goran Hedebro

২. Communication and Development : Critical Perspectives — Beverly Hills, Calif

৩. Development Communication :
Information, Agriculture, and Nutrition in the Third World — Robert Hornik

একক ৬ ☐ উন্নয়ন পরিকল্পনা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ

৬.৩ ডমিন্যান্ত প্যারাডাইম

৬.৪ বিকল্প প্যারাডাইম

৬.৫ সাইট

৬.৬ খেদা প্রকল্প

৬.৭ সারাংশ

৬.৮ অনুশীলনী

৬.৯ পরিভাষা

৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

উন্নয়ন প্রশ্নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সঠিক প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে রয়েছে নানা মত ও পথ। আমাদের দেশে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে সব বিষয়গুলি আলোচনা করে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬.১ প্রস্তাবনা

উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা অনুসারে উন্নয়ন হল একটি দেশের প্রয়োজন অনুসারে একটি বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে কোন সমাজকে পরিবর্তিত করা। প্রয়োজনকে চিহ্নিত করে গ্রহণ করতে হয় সঠিক পরিকল্পনা এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচন জরুরি। আমাদের দেশে উন্নয়নমূলক নানা পরিকল্পনা যেমন সাইট, খেদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করা না গেলেও সেগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ এমন বলা যায় না।

৬.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ

উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ বা জ্ঞাপন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ একটা সচেতন এবং পরিকল্পিত (Planned) প্রচেষ্টা। চলতি সমস্যা, প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় গণমাধ্যম প্রতিফলিত করে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা, প্রয়োজন সমাধানের লক্ষ্যে গণমাধ্যমগুলি জনসচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং আচার আচরণের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তি এই পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেন।

বার্তা (Message) নির্বাচন ঃ

গবেষণা ও নানা সূত্র মারফত তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা বা প্রয়োজনীয় বিষয় চিহ্নিত করার পর গণমাধ্যমের চরিত্র, তার ধরণ এবং সুবিধা অনুসারে বার্তা তৈরি করতে হয়। কাঙ্খিত জনগণ অর্থাৎ যাদেরকে লক্ষ্য রেখে এই বার্তা, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সংক্রান্ত নানা বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্তার ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, আকার, বাক্যবিন্যাস করতে হয়।

গণমাধ্যম পরিকল্পনা ঃ

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে গণমাধ্যম সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণে কতকগুলি বিষয় বিবেচনায় রাখা জরুরী।

প্রথমত, নীতি। ইউনেস্কো এই নীতি সম্পর্কে বলছে, Communication policy is "sets of principles and norms established to guide the behaviour of communication system."

দ্বিতীয়ত, অর্থাৎ গণমাধ্যম সংক্রান্ত নীতি (Policy) হল সুগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, তার গঠন, প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক দিকটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যদিকে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমে যোগাযোগ নীতিকে ব্যবহার করার কৌশল ও পরিকল্পনার অঙ্গ।

তৃতীয়ত, অর্থ, শ্রম-সম্পদ এবং অন্যান্য বস্তুগত বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এগুলি ছাড়াও আরো কিছু বিষয় পরিকল্পনা গ্রহণের সময় নজরে রাখতে হয়। সেগুলি হল —

১) সমাজের বা সামাজিক সম্প্রদায়ের পশ্চাদপট, তাদের সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয়গুলির যথাযথ বিশ্লেষণ ও তা বোঝা জরুরী।

২) সমস্যা বা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুসারে সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী গণমাধ্যম সংক্রান্ত পরিকল্পনা নেওয়া দরকার।

৩) সমাজ বা সামাজিক গোষ্ঠীতে চালু থাকা মাধ্যম তা সে আধুনিক মাধ্যম বা লোক-গণমাধ্যম (folk media) যাই হোক না কেন, গণমাধ্যম ব্যবহারের সময় এই দিকটিও বিবেচনা রাখতে হয়। তাছাড়া কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীতে (Community) কোন ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব থাকতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন ঃ

উন্নয়ন পরিকল্পনায় শুধুমাত্র, গণমাধ্যম ক্ষেত্রের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সমাজবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী,

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। কারণ তাঁরা সমাজ, তার গঠন, সামাজিক মূল্যবোধ, সমাজের প্রয়োজন এবং তার সামর্থ সম্পর্কে দক্ষ। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও তারা আগাম আন্দাজ তুলে ধরতে পারেন।

পরিকল্পনা প্রয়োগ ঃ—

পরিকল্পনা গ্রহণের পরই আসে পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের বিষয়টি। পরিকল্পনা গ্রহণের মত বাস্তবায়নের বা প্রয়োগের বিষয়টিকেও যথেষ্ট নজর দিতে হয়। পরিকল্পনা প্রয়োগের সময় তার যথার্থ প্রয়োগের প্রতি সতর্ক থাকা যেমন জরুরী, তেমনি কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তা দূর করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হয়।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিটি পর্বে সতর্ক নজরদারি প্রয়োজন। এখানে নজরদারি মানে কাঙ্খিত উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে জনমানসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া খুটিয়ে লক্ষ্য করা। প্রতিক্রিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনে প্রোগ্রামের কিছু পরিবর্তন করে প্রোগ্রামকে কার্যকরী করে তোলা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় গণমাধ্যমের ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হলেও উন্নয়ন-প্রকৌশল (Strategy) ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। প্রকৌশলের উপরও নির্ভর করে একটি ক্যাম্পেন বা অভিযানের সাফল্য ও অসাফল্য। এ প্রসঙ্গে ১৯৬০-এর 'পরিবার পরিকল্পনা' প্রোগ্রামের কথা তুলে ধরা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা অভিযানে রেডিও, টেলিভিশন, হোর্ডিং, ফিল্ম, মুদ্রণমাধ্যম প্রায় সমস্ত প্রকার গণমাধ্যম ব্যবহার করেও কাঙ্খিত সাফল্য লাভ হয়নি। 'Ek Ya Do Bus' অর্থাৎ একটা অথবা দুটো সন্তান ব্যাস, আর নয়। কিন্তু গ্রাম বা মফঃস্বলের খেটে খাওয়া পরিবার গুলিতে এই স্লোগান গ্রহণযোগ্য হয়নি। এই সব পরিবারের কাছে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্রসন্তান ছিল একমাত্র কাঙ্খিত বিষয়। ফলে যে সব পরিবার দু-তিনটি কন্যাসন্তান জন্ম দেন তারা পুত্রসন্তান লাভ না করা পর্যন্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

অবশ্য অনাগ্রহের পিছনে ঐসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বিষয় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল।

৬.৩ ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তর পর্বে উন্নয়নের প্রশ্নে উঠে আসে 'ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম' তত্ত্ব। পশ্চিমী এই তত্ত্বে উন্নয়নে গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। বলা হয় উন্নত গণমাধ্যম ব্যবস্থা একটা দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। গণমাধ্যমগুলি বেশি বেশি তথ্য তুলে ধরে তথ্য সমৃদ্ধ জনসমাজ গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু পরবর্তীকালে উন্নয়নের প্রশ্নে এই তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায় 'ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম' তত্ত্বে তথ্য প্রবাহ একমুখী — গণমাধ্যম থেকে জনগণ। ১৯৬১ — ১৯৭০ এই সময় পর্বকে রাষ্ট্র সংঘ উন্নয়নের দশক হিসেব চিহ্নিত করে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই ধারণার মূল প্রবক্তা ড্যানিয়েল লার্নার। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমের প্রসার ঘটলেই উন্নয়ন সম্ভব, এমন নয়। এই ব্যর্থতাই 'ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম' তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বাস্তবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, গণমাধ্যম উন্নয়নের এক এবং একমাত্র শর্ত নয়। এর পিছনে আরো অনেক ফ্যাক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নেতৃত্ব

প্রদানকারী ব্যক্তিরাও উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। ভূমিসংস্কার না করলে শুধুমাত্র গণমাধ্যম এককভাবে উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম, তত্ত্বের ব্যর্থতার পর তাই উঠে আসে বিকল্প প্যারাডাইম (alternative paradigm) সংক্রান্ত ধারণা।

৬.৪ বিকল্প প্যারাডাইম

আশির দশকে 'উন্নয়ন' এবং 'পরনির্ভরশীলতা'-র বিকল্প প্রক্রিয়া হিসেবে উঠে আসে বিকল্প প্যারাডাইম এই দৃষ্টিভঙ্গী জোর দেয় জাতির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি তুলে ধরার পাশাপাশি, বাহ্যিক বিষয়গুলির উপর, যে গুলি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সমসাময়িক বেশকিছু বিশেষজ্ঞ জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নে 'আত্ম-স্বনির্ভরশীলতা'র (Self-reliance) বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে থাকেন। আন্তর্জাতিকস্তরে পশ্চিমীদেশগুলির অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদকে নিরসন করার উদ্দেশ্যে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি 'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস' এবং 'নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা' গঠনের দাবি জানায়। তারা, স্ব-পরিচালিত জাতীয়-উন্নয়ন প্রকৌশলের সঙ্গে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ আত্ম-স্বনির্ভরতা অর্জনে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য সহায়ক ভূমিকা পালন। আত্ম স্বনির্ভরতা উন্নয়নের প্রধান বক্তব্য ছিল যে, জাতীয় উন্নয়নে বিদেশীয় প্রকৌশল প্রয়োগ করা হলেও তার লক্ষ্য হবে দেশে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং আঞ্চলিক প্রয়োজন পূরণ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আত্ম-স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়টিকে পুষ্ট করেছিল চীনের দ্রুত অগ্রগতি এবং মহাত্মা গাঁন্ধী, মাও জে দং, পাওলো ফ্রেইরি প্রমুখের রচনা।

সম্প্রতি দিল্লীর 'ডেভেলপিং স্টাডি সোসাইটি' সেন্টারের পরিচালক রজনী কোঠারী উন্নয়নে আত্ম-স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়টিকে এক নতুন আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির ইতিবাচক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে এই উন্নয়ন প্রয়োজন।

৬.৫ স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট (সাইট)

১৯৬৭ সালের তৎকালীন ভারত সরকারের সহযোগিতায় ইউনেস্কোর এক বিশেষজ্ঞ 'স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট' বা সংক্ষেপে 'সাইট' (SITE) প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। এই কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় উন্নয়নে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহের ভূমিকা খতিয়ে দেখা। ১৯৭৫ সালের ১-লা আগস্ট থেকে শুরু হয় উপগ্রহের সাহায্যে ভারতের ২৪০০ গ্রামে শিক্ষামূলক নানা অনুষ্ঠান প্রচার।

এক বছরের জন্য ঐ উপগ্রহটি ধার করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ১৯৭৬ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন চার ঘন্টা করে সাইট অনুষ্ঠান হোত। এই অনুষ্ঠান প্রচার করা হোত দিল্লির আর্থস্টেশন থেকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির রিসিভারে।

অনুষ্ঠানের ধরণ ঃ—

প্রচারিত অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর। অনুষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা এবং তার নির্মাণ হোত দিল্লী, হায়দ্রাবাদ (চেন্নাই) এবং কটকে অবস্থিত অল্ ইন্ডিয়া রেডিও-র প্রোডাকশন সেন্টারে। এতে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ এবং বিভিন্ন সমাজসেবী।

অনুষ্ঠানসূচী — স্কুলটেলিকাস্ট ঃ

এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল পাঁচ থেকে বার বছরের শিশু এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিদিন দেড়ঘন্টা করে এই অনুষ্ঠান প্রচার করা হোত এবং ঐ সময়ের মধ্যে বাইশ মিনিট ধরে চলত তেলেগু, কানাড়া ওড়িয়া এবং হিন্দী ভাষায় প্রচার।

এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল স্কুল শিক্ষা সম্পর্কে শিশুমনে আগ্রহ সৃষ্টি, স্কুল ত্যাগরোধ করা এবং শিশুমনের প্রাথমিক ধারণার বিকাশ সাধন।

কৃষি অনুষ্ঠান ঃ

অনাবাদী জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার পদ্ধতি, পোলট্রি, পশুপালন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষিমন্ত্রক এই অনুষ্ঠান শুরু করে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হোত আবহাওয়া ও পণ্যের বাজার সম্পর্কিত তথ্য। চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রচার করা হোত কৃষি ও কৃষকের সাফল্যের কাহিনীও।

স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান ঃ

স্বাস্থ্য ও প্রসূতি পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা হোত এই অনুষ্ঠানে।

পরিবার পরিকল্পনা অনুষ্ঠান ঃ

পরিবার পরিকল্পনা ছিল সাইটের বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ইতিবাচক সাফল্য না পেলেও অনেকে মনে করেন, এক বছরের জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান কাঙ্খিত সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়।

সাইট প্রকল্পের সাফল্য দেখে ঠিক হয় সাইট কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত গ্রাম গুলিতে টেলিভিশন কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হবে। ১৯৭৭—৭৮ সালের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে জয়পুর, রায়পুর, মজঃফরপুর, সম্বলপুর, হায়দ্রাবাদ ও গুলবার্তায় ট্রান্সমিটার বসানো হয়। শিক্ষামূলক কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ কর্মসূচী The Indian National Satellite (INSAT) রচিত হয়েছে।

৬.৬ খেদা (Kheda) যোগাযোগ পরিকল্পনা (Project)

আমেদাবাদের 'স্পেশ অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'খেদা যোগাযোগ পরিকল্পনা' ইতিবাচক সাফল্য লাভ করেছে। অথচ এই কর্মকান্ড চালু হয়েছিল 'সাইট' পরিকল্পনার সময়কালেই। খেদা হচ্ছে গুজরাটের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা।

খেদা প্রকল্প ঃ

খেদা জেলার ৪৪৩টি গ্রামে ৬০৭টি কমিউনিটি টেলিভিশন বসান হয়। টেলিভিশন গুলির মালিকানা কমিউনিটিদের হাতে থাকলেও তদারকি করত রাজ্য সরকার। দুধ বিক্রয়কেন্দ্র কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িগুলিতে এই টি.ভি.-সেট বসানো হয়।

অনুষ্ঠান ঃ

প্রতিদিন একঘন্টারও বেশি অনুষ্ঠান প্রচার করা হোত। অনুষ্ঠান প্রচার করতো দূরদর্শন এবং স্পেশ অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার। জেলার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন থেকে নানা উপাদান, উপকরণের ভিত্তিতে তৈরি করা হোত ওই সব অনুষ্ঠান এবং প্রচলিত স্থানীয় ভাষায় সেগুলি প্রচার করা হোত। অস্পৃশ্যতা, ন্যূনতম পারিশ্রমিক, শোষণের

বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগ — ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হোত। সপ্তাহের বিশেষদিনে প্রচারিত হোত মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান। 'দাদি-মা-নি-ভাটন', অর্থাৎ বয়স্কা বৃদ্ধার অভিজ্ঞতার কথা 'ছন-নে-সারা-আমি' (আমি এবং আমার স্বামী), এবং জাগি-নি-জাম-তু' (যখন আমি জাগি এবং দেখি) — ইত্যাদি ছিল বিশেষ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এছাড়া, গুরুত্ব দেওয়া হোত 'কুসংস্কার দূরীকরণ', অপব্যায়, বালিকা বিবাহের কুফল এবং নতুবা ধারণা প্রদান মূলক বিষয়গুলির উপর।

সাফল্য ঃ

একদশক ধরে চারটি পরিদর্শক দল খেদা জেলার সাফল্য খতিয়ে দেখতে শুরু করে। তাদের রিপোর্টে লক্ষ্য করা গেছে যে, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অনেক বেশি সচেতনতা লাভ করেছে। সমালোচকদের মতে টেলিভিশন গুলিতে মহিলাদের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়না। কিন্তু খেদা পরিকল্পনায় তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ায় এই ইতিবাচক সাফল্য আসে। খেদা প্রকল্পের উদ্দেশ্য শুধু মাত্র তথ্য প্রদান এবং সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল না, একই সঙ্গে তারা কৃষি, স্বাস্থ্য এবং পশুপালন দপ্তরগুলির সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করেছিল এবং সে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেছিল।

৬.৭ সারাংশ

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়েণে গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ। বিভিন্ন বিষয় ও দিক বিবেচনার রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ যেমন জরুরী, তেমনি ইতিবাচক সাফল্য অর্জনে পরিকল্পনার যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মে জনগণের অংশগ্রহণও একটা শর্ত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ, পরিকল্পনা, পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা দরকার। অর্থাৎ গণজ্ঞাপন সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা পরিকল্পনারই একটা অংশ। এ সম্পর্কে পশ্চিমী ধারণা তথা ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম ও বিকল্প প্যারাডাইম-এর বিষয়টি চলে আসে। ডমিন্যান্ট প্যারাডাইমের কথা হল তথ্যের একমুখী প্রবাহ। তারাও গৃহীত 'সাইট', বা 'খেদা প্রকল্প' গুলির কিছু ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইতিবাচক দিকও রয়েছে।

৬.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত নোট ঃ—

১. উন্নয়ন বার্তা

২. উন্নয়নে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

৩. উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ—

১. জ্ঞাপন ও উন্নয়নের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২. ডমিন্যান্ট প্যারাডাইসে বলতে কী বোঝায়?

৩. বিকল্প প্যারাডাইসের মূল বক্তব্যগুলি কী কী?

৪. উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১. উন্নয়নে জ্ঞাপন বা যোগাযোগ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যা কর।

২. যোগাযোগের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক আছে কী যুক্তি দাও।

৩. উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি কী কী?

৪. দেশের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট দেশের গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা কি ধরনের ভূমিকা পালন করে?

৫. 'সাইট' ও 'খেদাপ্রকল্প' আলোচনা কর।

৬.৯ পরিভাষা

■ Message—বার্তা ■ policy—নীতি ■ folkmedia—লোকগণমাধ্যম ■ Community—গোষ্ঠী ■ Alternative Paradigm—বিকল্প প্যারাডাইম ■ Self-reliance—আত্মনির্ভরশীলতা ■ Project—পরিকল্পনা

৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ ঃ—

১. গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২. Mass Communication in India — Keval J. Kumar

৩. Diffusion of Innovation — Everett M. Rogers.

৪. International Encyelopedia of Communication (Vol-2) — Barnouw, Gerbner, Schramm, Worth & Gross.

৫. Beyond Dependency . The Developing World Speaks Out — ElizaFox de Cardona & Hector Schmucler.

৬. Communication for Development in the Third World — Melkote Steeves.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১. Communication Development — Everelt M. Rogers.

২. Mass Media & National Development — Wilbur Schramm.

৩. Paradigm Lost — Majid Teharanian.

৪. The passing of modernity — Hamid Mowlana

৫. Communication policy for national development — Majid Teheranian.

৬. The Passing of Traditional Society — Daniel Lerner.

৭. Communication for development — Kunwar B. Mathur.

একক ৭ □ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য
৭.১ প্রস্তাবনা
৭.২ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কি?
৭.৩ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চর্চার বৃদ্ধি
৭.৪ আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন ও চ্যানেল
৭.৫ কতৃত্বকারী ভূমিকায় কারা?
৭.৬ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক যোগযোগ
৭.৭ সারাংশ
৭.৮ অনুশীলনী
৭.৯ পরিভাষা
৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭.০ উদ্দেশ্য

গণজ্ঞাপন ব্যবস্থায় 'আন্তর্জাতিক যোগাযোগ' এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার পর কিভাবে যোগাযোগ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন, বিতর্ক আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে এবং কিভাবে তথ্য প্রবাহ সংক্রান্ত বিষয় রাজনৈতিক মঞ্চগুলিকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

৭.১ প্রস্তাবনা

আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ সংক্রান্ত বিতর্কে নানা স্তর পর্ব আছে। ঔপনিবেশিক মুক্তিলাভের পর সদ্য স্বাধীন দেশগুলি তথ্য-সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এতদিন তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ সংক্রান্ত নানা জটিলতা দূরীকরণ ছিল দেশগুলির নিজস্ব মাথাব্যথার বিষয়। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জগঠিত হওয়ার পর তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদানের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তাছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির ক্রম-উন্নয়ন এবং উন্নত দেশ গুলিতে তার প্রয়োগ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কে প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে। ফলে সে সম্পর্কে চর্চা, গবেষণা ও বিতর্ক শুরু হয় বিভিন্ন স্তরে।

৭.২ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কি?

সংবাদ-লেনদেনের বিচারে দুই বা তার বেশি দেশের মধ্যে তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদান হোল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ (International Communication)। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রাথমিক শর্তই হোল অন্তত দুটি দেশের মধ্যে তথ্য বিনিময়।

৭.৩ আন্তর্জাতিক যোগাযোগের চর্চার বৃদ্ধি

কয়েক দশক পূর্বে স্বল্প পরিসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। প্রথম সারির মার্কিনী সমাজবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশাবলী (Directives) তৈরি করে। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঠান্ডাযুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল এর অন্যতম কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নীতিও তৈরি করেছিলেন ওই সমাজ বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও তার বিন্যাস সম্পর্কে তেমন স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠেনি। কারো কাছে এই যোগাযোগ ছিল প্রচারের ইস্যু। আবার কেউ কেউ মনে করতেন এটা শিক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয় ইস্যু।

বিভিন্ন কারণে গবেষণা, নীতিনির্ধারণ চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত চর্চা বৃদ্ধি পায়। গুরুত্বপূর্ণ কারণ (Factors) গুলি উল্লেখ করা হোল —

১) উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার পর্বে ফটোগ্রাফির উন্নতি, টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মধ্যে সাবমেরিন যোগাযোগের প্রতিষ্ঠা।

২) ইউরোপীয় রাজনীতি এবং তাদের ব্যবহৃত যোগাযোগ প্রযুক্তি গুটি কয়েক পশ্চিমী সংস্থার জন্ম এবং বিশ্বব্যাপী তাদের প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগ এবং উপনিবেশ গঠন প্রক্রিয়া।

৩) শিল্পায়ণ এবং ইউরোপীয় করণের পাশাপাশি আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং আরবের সমাজগুলির পশ্চিমীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা। ইউরোপের দেশগুলির পশ্চিমীকরণ এবং ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া আধুনিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। যেমন— প্রেস, সংবাদসংস্থা, বেতার, গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোষ্ট বা ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (PTT) মন্ত্রালয় ইত্যাদি।

৪) আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (International Telecommunication Union), আন্তর্জাতিক পোষ্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union) ইত্যাদি সংস্থার উদ্ভব এবং তাদের কাজের আন্তর্জাতিয়করন। গড়ে ওঠে রাষ্ট্র সংঘ।

৫) আন্তর্জাতিক পশ্চিমী সংবাদ সংস্থার পাশাপাশি জাতীয় সংবাদ সংস্থার গঠন প্রক্রিয়ার শুরু।

৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেডিও-র বাণিজ্যকীকরণ। সিনেমা, ফিল্ম ইত্যাদির প্রসার ও উন্নতি, ইউরোপে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও উন্নয়ন।

৭) উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ফ্যাসীবাদ এবং বিভিন্ন ইসলামীয় আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক আদর্শের প্রসার। এছাড়া ইরান, মেক্সিকো, পূর্ব ইউরোপ এবং তৎকালীন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দেশগুলিতে ঘটতে থাকা বিপ্লবী

আন্দোলন এবং সারা বিশ্বে তাদের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।

এতো গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের কথা। ঠান্ডা যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী প্রেক্ষাপটও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সেগুলি হোল —

১) টেলিভিশন, উপগ্রহ (Satelites), কম্পিউটার, ভিডিও, ফ্যাক্সমেশিন, ডিজিট্যাল সার্ভিস ইত্যাদি নতুন প্রযুক্তি যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে গুণগতভাবে বদলে দেয়।

২) নানা দেশে ঔপনিবেশিক মুক্তি প্রক্রিয়া বহু স্বাধীন দেশের জন্ম দেয়। সদ্য স্বাধীন এই দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। তাদের সাংস্কৃতিক এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুমুখী সুযোগসুবিধা সম্পর্কে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকস্তরে তারা প্রশ্ন তোলে।

৩) কূটনীতি, বিদেশনীতি, অ্যাজেন্ডা — ইত্যাদি প্রচারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক যোগযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের দাবি জানায়।

৪) আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদানে ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্য (imbalance & inequilities) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৫) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ব্যবস্থা গঠনের দাবি।

৭.৪ আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন ও চ্যানেল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদ লেনদেনের চেহারাটাই বদলে গেছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের হাত ধরে গণমাধ্যম ব্যবস্থাতেও দেখা দেয় নানান পরিবর্তন। এই মাধ্যমগুলি হোল—

প্রযুক্তিগত মাধ্যম ঃ

১) স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ চ্যানেল, কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং সাবমেরিন কেবল যোগাযোগ।

মুদ্রণ মাধ্যম ঃ

২) সংবাদপত্র — 'দ্যা টাইমস্' (লন্ডন), মার্কিন ম্যাগাজিন 'টাইম', 'ওয়াশিংটন পোষ্টে' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ইত্যাদি বড় বড় সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনগুলির আন্তর্জাতিক স্তরে সংবাদও তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বই ঃ

'হার্পার কলিনস', 'টাইম লাইফ বুকস্', 'হাইপেরিয়ন বুকস্', 'চিলটন পাবলিকেশনস্' 'সিমন অ্যান্ডকাস্টার', 'ম্যাকমিলান'—ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশদের বই বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে।

এছাড়া, 'টি.ভি.গাইড', 'টাইম', পিপল্', স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড' প্রভৃতি আন্তর্জাতিক স্তরের ম্যাগাজিনগুলি তো আছেই।

বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঃ

৩) রেডিও, টেলিভিশন, 'ডিরেক্ট-টু-হোম-সার্ভিস' ইত্যাদি মাধ্যম ও চ্যানেল।

৪) ফিল্ম, রেকর্ডিংস, ভিডিও, বিজ্ঞাপন এবং কূটনৈতিক স্তরের মতামত বিনিময় আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

৫) 'ডাক ও তার' ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রয়েছে দূরসঞ্চার সার্ভিস ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে দেশে বিদেশে বিভিন্ন 'ফার্ম' গড়ে উঠেছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে 'ইউ.এস.ওয়েস্ট', 'বেল-সাউথ', এ. টি. অ্যান্ড টি. ইত্যাদি।

সরকারি ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ :—

৬) ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দেশে পড়াশুনা সংক্রান্ত যোগাযোগ। সাংস্কৃতিক ও শিল্প জগতে যুক্ত ব্যক্তিরা নানা দেশে অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন। এগুলি ছাড়াও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় রয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

৭) মিলিটারি প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা, সম্মেলন প্রভৃতির পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলির কূটনৈতিক স্তরে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মারফত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

৮) রাষ্ট্রগুলির সম্প্রদায়গত যোগাযোগ এবং ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্য দিয়েও গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক স্তরের এই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্য ও সংবাদ প্রবাহ লিখিত, মৌখিক অথবা ডাটা ভিত্তিক হতে পারে।

৭.৫ কর্তৃত্বকারীর ভূমিকায় কারা?

আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তথ্য ও সংবাদ লেনদেনের ক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলির আধিপত্যবাদ এবং সংবাদের বিষয়বস্তুতে গুণগত বৈষম্য অনেকের মতে মাধ্যম সাম্রাজ্যবাদ। আবার কারো মতে 'মিডিয়া কলোনিয়নিজম' বা গণমাধ্যম-ঔপনিবেশিকতাবাদ। প্রকৃত পক্ষে মার্কিন সংবাদ সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এ.পি.), ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা 'রয়টার্স' (Reuters), এবং ফরাসী সংবাদ সংস্থা 'এজেন্স ফ্রান্স প্রেস' (এ.এফ.পি.) তৃতীয় বিশ্ব তথা সারা বিশ্বে সংবাদ লেনদেনে আধিপত্য বজায় রাখছে।

সংবাদ সংস্থা ছাড়াও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিন্যাস ব্যবস্থায় ভাগ বসিয়েছে বহু পশ্চিমী বহুজাতিক সংস্থা। বাণিজ্যিক সাফল্যই তাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য।

এদের মধ্যে হল, টাইম ওয়ার্নার, ডিসনে, কার্টেলসম্যান, ভায়াকম এবং নিউজ কর্পোরেশন। নিউজ কর্পোরেশন, টাইম ওয়ার্নারা, ডিসনে এবং ভায়াকম — এদের রয়েছে বড়মাপের ফিল্ম ও টেলিভিশন সংক্রান্ত প্রোগ্রাম তৈরি ও তা সম্প্রচারের পরিকাঠামো। এদের পরেই রয়েছে পলিগ্রাম, সিয়াগ্রাম, সনি এবং জেনারেল ইলেকট্রিক।

অধুনা আমেরিকাবাসী রূপার্টমার্ডক (Rupert Murdoch) পরিচালিত নিউজ কর্পোরেশন ফিল্ম, খেলাধূলা, এমনকি শিশুসংক্রান্ত অনুষ্ঠান — প্রতিটি ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভায়াকমের প্রধান কর্তা সামনার রেজস্টানের ভাষায়, 'মার্ডক আসলে বিশ্বকেই জয় করতে চায়'।

বহুজাতিক সংস্থার আঁতাত (Holding) :

বহুজাতিক সংস্থাগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্ব নিয়ে গণমাধ্যম ব্যবস্থায় গড়ে তুলেছে আন্তর্জাতিক আঁতাত। এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল —

নিউজ কর্পোরেশন :

- ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকায় অন্তত ১৩২টি সংবাদপত্রের অংশীদার।

- টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স — ফিল্ম, টেলিভিশন এবং ভিডিও প্রোগ্রাম উৎপাদক সংস্থা।
- টি.ভি.গাইড সহ আরো এগারটি ম্যাগাজিনের অংশীদার।
- হার্পার কলিন্স সহ অন্যান্য পুস্তক প্রকাশনার অংশীদার।
- জার্মানীর 'ভক্স' চ্যানেলে রয়েছে ৪৯.৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব।
- পঞ্চাশ শতাংশ অংশীদার চ্যানেল 'ভি'-র
- ভারতীয় 'স্কাই ব্রডকাস্টিং ডিজিটাল স্যাটেলাইট সার্ভিস'-র ও অংশীদার নিউজ কর্পোরেশন।

এগুলি ছাড়া 'টাইমওয়ার্নার', 'ভিয়াকম', গ্লোবো', বি.বি.সি., কার্লটন, টেলিভিসা — ইত্যাদিতে রয়েছে তার অংশীদারিত্ব।

৭.৬ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

ভবিষ্যতে মানব জাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। মূলত রাজনৈতিক সংগঠন হলেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এই সংগঠনের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তেমন ইতিবাচক সাফল্য না পেলেও বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা আলোচনাচক্র ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন সতর্কতা সৃষ্টি করে। তৈরি করেছিল এক সচেতন আবহাওয়া।

সংস্থা গঠন প্রক্রিয়া ঃ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানা দেশে আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন সংস্থা গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টার ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জার্নালিষ্ট এবং এর পিছনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ইন্টার ন্যাশানাল স্পোর্টিং প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ইন্টার ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর পিরিয়ডিক প্রেস এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গৃহীত উদ্দেশ্য ঃ

১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ অর্থাৎ সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের প্রাক্ ভাঙন পর্বে অন্তত সাতটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। যার বিষয় ছিল প্রেস, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বশান্তির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জের সভায় বিশ্বশান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বিপন্ন দেশের প্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবনায় বলা হয় যে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেস জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৯২৭ সালে জাতিপুঞ্জের কাউন্সিল প্রেস বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদসংস্থা সংবদপত্র, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং ৩০টি দেশের প্রেস ব্যুরোর ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন এই সম্মেলনে।

অন্যান্য সম্মেলন ঃ

কোপেন হেগেন সম্মেলন ঃ ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন ছিল পার্লামেন্টাল প্রেস ব্যুরো এবং বিভিন্ন প্রেসের প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে জাতিপুঞ্জ বিকৃত তথ্যপ্রবাহ রোধ এবং অবাধ তথ্য প্রবাহ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে।

মাদ্রিদ সম্মেলন ঃ

১৯৩৩ সালে স্পেনের মাদ্রিদে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিকৃত তথ্যপ্রবাহ রোধে একটি প্রস্তাবনা গৃহীত হয় এই সম্মেলনে।

প্রস্তাবনায় আরো বলা হয় ঃ

ক) আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক সন্দেহ, ভুলবোঝাবুঝি হ্রাস করার জন্য খুব দ্রুত এবং সুলভে সংবাদ আদান-প্রদান করতে হবে।

খ) সুস্থ জনমত গঠনের অনুকুল পরিস্থিতির জন্য সকলপ্রকার প্রযুক্তিগত সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা করা জরুরী।

১৯২৬ সালে ওয়াল্টার উইলিয়ামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে জাতিপুঞ্জ অংশ নেয়। এই সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিষ্ট'। এরা শুধুমাত্র প্রেস সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার সম্মেলন করার অনুরোধ করে জাতিপুঞ্জকে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯২৬ সালে 'আই.এল.ও.'-কে কর্মরত সাংবাদিকদের কাজের পরিস্থিতি পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়। এ ব্যাপারে 'Condition of work and life of Journalist' শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

প্রস্তাবনায় বলা হয় ঃ

প্রেসের স্বাধীনতা এবং অবাধ ও যথার্থ সংবাদ সরবরাহ গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃত তথ্য পরিবেশন রোধ করা জরুরী। অবাধ ও সুষ্ঠ সংবাদ লেনদেনকে সুনিশ্চিত করার জন্য দ্বিপাক্ষিকও বহুপাক্ষিক চুক্তি জরুরী।

সম্প্রচার ঃ

১৯৩১ সালে জাতিপুঞ্জ Institute for Intellectual Co-operation-কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রেডিও-র ভূমিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেয়। Broadcasting and Peace শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। চলতি বহুমুখী চুক্তিগুলির একটা খসড়া করার কথা বলে এই রিপোর্ট।

এছাড়া ১৯৩৬ সালে জেনেভায় আরো একটা সম্মেলন করে জাতিপুঞ্জ। উদ্দেশ্য ছিল শান্তিস্থাপনে সম্প্রচারের ভূমিকা।

৭.৭ সারাংশ

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রাথমিক শর্ত অন্ততঃ দুটি দেশের অংশগ্রহণ। যতদিন যাচ্ছে ততই বিশ্বের প্রতিটি দেশের যৌথসহযোগিতা মূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা স্তরে এবং প্রয়োজনে এই সহযোগিতা জরুরী। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি দেশ জাতীয় স্বার্থে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চর্চায় উৎসাহও দিচ্ছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দুটি স্তরে ভাগ করতে পারি — প্রাক্ উপগ্রহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং উপগ্রহ পরবর্তী আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। অর্থাৎ আজকের দিনে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিন্যাসটা গুণগতভাবে ভিন্নস্তরে প্রবেশ করেছে।

৭.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত নোট ঃ—

১. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চ্যানেল, জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ—

১. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?

২. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রযুক্তি মাধ্যম গুলি কী কী?

৩. ব্যক্তিগত ও সরকারিস্তরে কিভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে?

৪. ১৯৩৩ সালে স্পেনের মাদ্রিদে গৃহীত প্রস্তাবনাটির বক্তব্য কী ছিল? কেন এই প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছিল?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চর্চা বৃদ্ধির কারণ গুলি ব্যাখ্যা কর?

২. আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমগুলি কীভাবে ভূমিকা পালন করে?

৩. প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা কী ছিল?

৪. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের সাফল্য ব্যর্থতা আলোচনা কর।

৭.৯ পরিভাষা

- International Communication — আন্তর্জাতিক যোগাযোগ
- Directives — নির্দেশাবলী
- Satellites — উপগ্রহ
- Imbalance & inequilities — ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্য
- Holding — আঁতাত
- Partner — অংশীদার
- Study — পর্যালোচনা

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ ঃ—

১. Transnational Media and Third World development : the structure and impact of imperialism — William H. Meyer

২. Media and the Third World — D. R. Mankekar

৩. One-Way free flow; neo colonialism via news media — D. R. Mankekar.

৪. Whose News? — Rosemar Righter.

৫. Many Voices One World — UNESCO Report (1980)

৬. Encyelopedia of International Communication (Vol.-3) —
Barnouw, Gerbner, Scheremm, Worth and Gross.

৭. Global Information and World Communication — Hamid Mowlana.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১. Crisis in international News — Jim Richstad and Michael H.Anderson.

২. Many Voices One World (UNESCO Report, 1980)

৩. Mass Communication and American empire — Herbert I. Schiller.

৪. The news merchants — Sapru, Somnath.

৫. Electronic Colonialism : the future of international broadcasting and Communication — McPhail, ThomasL.

৬. The Politics of World Communication — Cees. J. Hamelink.

৭. MAPPING WORLD COMMUNICATION — Armand Mattelart.

একক ৮ □ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

গঠন ঃ

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

৮.৩ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৮.৪ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

৮.৫ জোট নিরপেক্ষ সংবাদপুল

৮.৬ ম্যাকব্রাইড কমিশন

৮.৭ সারাংশ

৮.৮ অনুশীলনী

৮.৯ পরিভাষা

৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রশ্নকে ঘিরে উঠে আসে 'নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা', গঠনের দাবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলিতে নানা স্তরে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে ওই ব্যবস্থা গঠনের দাবি ক্রমপরিণতি লাভ করে। সেই সকল দাবি এবং নয়া তথ্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা।

৮.১ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় থাকা দেশগুলির তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ ও ছিল ঔপনিবেশিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু সদ্যস্বাধীন দেশ তাদের তথ্যপ্রবাহ বিন্যাসকে ঢেলে সাজাবার জন্য নানা উদ্যোগ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তথ্য-সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে ছিল এক নতুন উপলব্ধি। এদিকে গঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্ব রাজনীতি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশ কোন শিবিরে না গিয়ে গড়ে তোলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং প্রভাব ফেলতে থাকে রাষ্ট্রসংঘের কর্মকান্ডে। নয়া তথ্য ব্যবস্থা গঠনের দাবি প্রথম উঠে আসে এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন থেকেই।

৮.২ নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

'নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য বিন্যাস' (New International Information Order) গঠনের প্রশ্নে নানা প্রস্তাব উত্থাপন, সম্মেলন, প্রচার পুস্তিকা প্রচার ছিল ১৯৭০ এর দশকের বিশ্বের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে জোরালো দাবি এসেছিল জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির পক্ষ থেকেই। আবার এই বছরই যোগাযোগ মাধ্যম জগতে বিশেষ উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেল, যা এই সময় পর্বকে Information Age তথা 'তথ্যযুগ' হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলির কাছে এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে তারা শুধু অর্থনৈতিকভাবেই দুর্বল নয়, তথ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে (resource) ও দুর্বল এবং এই তথ্যপ্রবাহে একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে পশ্চিমী দেশগুলির। বেশির ভাগ জোটনিরপেক্ষ দেশ তাদেরকে দেখতে লাগল সাংস্কৃতিক উপনিবেশিকতাবাদের শিকার হিসেবে। অর্থনীতি এবং আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এই বোধ উপলব্ধ হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই তথ্যপ্রবাহ ও যোগাযোগ বিন্যাস ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়।

নয়া ব্যবস্থা কী?

নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বা New International Information and Communication Order (NIICO) সংক্রান্ত ধারণার মূলনীতি হলো আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ। গণতন্ত্রীকরণের ধারণার বিকাশে কতকগুলি স্তর পর্ব আছে।

বিতর্কের ক্রমবিকাশ

১৯৭৩ সালে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলন নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস গঠন প্রস্তাব তুলে ধরে এবং তারপরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা ওই প্রস্তাব স্বীকৃতি দেয়। উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে এই স্বীকৃতি ছিল এক বড় জয়। কারণ তারা নয়া তথ্য ব্যবস্থা গঠনের দাবির পাশা-পাশি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের দাবিও তুলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জোর দিয়েছিল উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বনির্ভরতার উপর এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আধিপত্যকামিতার নিরসন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনই ছিল এই দাবির মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাই হোক ১৯৭৬ সালে তিউনিসিয়ার অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদ সংক্রান্ত আলোচনা চক্রে তিউনিসিয়ার তৎকালীন তথ্য সংক্রান্ত সচিব মুস্তাফা মাসমোদি যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের দাবি করেন। তাঁর মতে এই ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন রূপ এবং তাঁর দাবি This "decolonization" of information, must lead to a "new order in information materials!" পরবর্তী সময়ে এই দাবিই "a new world information and communication order" বা নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের দাবি উঠল এই প্রথম, যা নয়া তথ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার আধুনিক ভাবনার প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, তিউনিসিয়া আলোচনাচক্র একটা খসড়া কাঠামো (frame work) তুলে ধরে, যার মূল লক্ষ্য পশ্চিমী আধিপত্যকামিতার নিরসন।

ঐ একই বছর কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর (UNESCO) সাধারণ সম্মেলন তথ্য সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করে এবং এই সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে যায় নয়া তথ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নে উন্নত বিশ্বের অবস্থান। তারা 'অবাধ তথ্য প্রবাহ' (Free flow of Information) সংক্রান্ত ধারণাকে তুলে ধরে। আসলে

এই ধারণা 'অবাধ এবং ভারসাম্যমূলক তথ্য প্রবাহ' (Free and balanced inforflow)-র দাবি, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের দাবি, তাকে আড়াল করতে চায়। পশ্চিমী ধারণায় পুষ্ট অবাধ তথ্য প্রবাহ আদতে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক স্বার্থকেই পূরণ করে, উন্নয়নশীল বিশ্বকে নয়।

৮.৩ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা New International Economic Order সংক্রান্ত ধারণার মূলনীতি হোল আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গণন্ত্রীকরণ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যেক দেশের, তা সে উন্নত বা উন্নয়নশীল যাই হোক না কেন, সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। আর এই লক্ষ্যপূরণে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চলতি বিন্যাসে বা ব্যবস্থায় পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংস্থার একাধিপত্যের নিরসন।

নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবির ক্ষেত্রেও যেমন, নয়া অর্থবিন্যাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তেমনি এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশ গুলি এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রসংঘের মত আন্তর্জাতিক মঞ্চে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি পেয়ে যায় এক বিশেষ মাত্রা।

প্রেক্ষাপট ঃ

১৯৭০-এর দশকে বিশ্বঅর্থনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় পর্বে লক্ষ্য করা গেল যে, তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনিয় দ্রব্যের মূল্য ক্রমশ উর্দ্ধমুখী। উন্নয়নশীল দেশগুলি পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে আর্থিক সহায়তা নিতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নজরে পড়ল এক বিশাল বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন ঘোষণা করল যে, রাষ্ট্র সংঘের ঘোষিত 'দ্বিতীয় উন্নয়নের দশক' (Second Development Decade) ব্যর্থ এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে এক বিশেষ অধিবেশনে উল্লেখ করে যে, "the current economic order was in direct conflict with current developments in international political and economic relations, ..." এবং এই অধিবেশনেই এক 'অ্যাকশন প্রোগ্রাম'-এর সনদে (Character) গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয় তুলে ধরে। সেগুলি হল — কাঁচামাল ও প্রাথমিক দ্রব্য, আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা ও পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তি সরবরাহ, আন্তর্জাতিক ও ধনতান্ত্রিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে রাষ্ট্র সংঘের ভূমিকাকে আরো জোরদার করে তোলা ইত্যাদি।

ঐ বছরের মে মাসে রাষ্ট্রসংঘের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন (প্যারিস) নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়টি ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা New International Economic Order এ পরিভাষাটি (term) রাষ্ট্র সংঘই প্রথম তাদের ঘোষণায় উল্লেখ করে।

রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা, ১৯৭৪ ঃ

রাষ্ট্র সংঘ তাদের ঘোষণায় স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করে —

"We, the Member of United Nations, ... Solemnly proclaim our united determination to work urgently for the establishment of a new international economic order based on

equity, sovereign equality, interdependence, common interest and co-operation among all states, irrespectives of their economic and social system which shall correct inequalities and redress existing injustice, ..." এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দূর করে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উন্নত সমাজ তুলে ধরার লক্ষ্যে এই ঘোষণা —

১) তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাস করে। অথচ বিশ্বের মোট আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পায় এই দেশগুলি। চলতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতি অসম্ভব, তা প্রমাণিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সময় থেকেই এই অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও ভারসাম্যহীনতার শুরু। একে দূর করতে হবে।

২) চলতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এই সঙ্গতিহীনতা দূর করতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রে সদ্য স্বাধীন এই দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে।

৩) উন্নয়নশীল দেশগুলি সার্বভৌমত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা, যৌথ এবং আত্ম স্বনির্ভরতা এবং নানা প্রকার পরনির্ভরতা (interdepence) সম্পর্কে সচেতন। উন্নয়নের প্রশ্নে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ বিচ্ছিন্ন নয়। উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা হোল যৌথ লক্ষ্য এবং তা পালন করা প্রতিটি দেশের অভিন্ন কর্তব্য।

৪) নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি উল্লেখ করা হোল —

   ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নিজস্ব সিদ্ধান্তগ্রহণ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংহতি ও বিষয়ে অপর কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ বা কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করবে না।

   খ) আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিটি দেশ সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকারী এবং এব্যাপারে কোন দেশ হস্তক্ষেপ করবে না।

   গ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে বিশ্বের প্রতিটি দেশ সমভাবে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা দরকার।

   ঘ) বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

   ঙ) প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ (natural resources) সংরক্ষণ বা তার রাষ্ট্রীয় করণে অথবা মালিকানা হস্তান্তর করণে ব্যবস্থা নেবার অধিকারী।

   চ) রাষ্ট্রের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ম-প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ ওই সংস্থার কাজ-কর্ম-পর্যালোচনা করতে পারে বা যুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

   ছ) কাঁচামাল, অন্যান্য দ্রব্য আমদানি বা রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে।

   জ) উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা (International Monetary System)-কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

ঝ) উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজস্ব বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করে তা ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া জরুরী।

রাষ্ট্রসংঘের এই ঘোষণা উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে ছিল এক বড় জয়। কিন্তু তাই বলে নয়া অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি কোন বিশেষ রাষ্ট্রের উন্নতির প্রশ্ন নয়। এদাবির কেন্দ্রেই ছিল এবং রয়েছে বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সেই দিক দিয়ে এ দাবি ইতিবাচক এবং রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি এক বড় উলম্ফন।

৮.৪ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বা নাম (NAM)

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যাম একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বের ফসল। যে পর্বের সূত্রপাত ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র বনাম ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ছিল দ্বিমেরুকৃত। প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়েরপূর্ব পর্যন্ত অন্তত তাই ছিল। দ্বিমেরুকৃত বিশ্বব্যবস্থায় কোন পক্ষে না গিয়ে স্বতন্ত্র তৃতীয় মঞ্চ হিসাবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বিশ্বরাজনীতিতে উঠে আসে।

প্রেক্ষাপট ঃ

১৯৫৫ সালের ১৮-২৪শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুঙ শহরে বসে আফ্রো-এশিয়া সম্মেলন। চীন, জাপান, ভারত, ভিয়েতনাম গণপ্রজাতন্ত্র, পাকিস্তান সহ এশিয়ার ২৩টি এবং মিশর সহ আফ্রিকার ৬টি দেশ বান্দুঙতে অংশ নেয়। দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই সম্মেলনে। বলা যায় জোটনিরপেক্ষ নীতির 'আংশিক জমাট বাঁধার কাজ সূচিত হয়েছিল' বান্দুঙ সম্মেলনেই। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আফ্রো-এশিয় সংহতি আন্দোলন এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক হিসেবেই বিকশিত হয়ে ওঠে।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত হল জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। অংশ নিয়েছিল ২৫টি দেশ। উল্লেখ্য বর্তমানে ন্যামের সদস্য সংখ্যা ১০৮টিরও বেশি দেশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির — এই বিবদমান গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, যাকে বলা হয় দ্বিমেরুকৃত (Bipolar) বিশ্ব ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য এবং ক্রমশবৃদ্ধি ডি-কোলোনাইজেশন বা দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবির সব দিক দিয়েই সদ্যস্বাধীন দেশগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে যুদ্ধ-জোট তো গঠন করছিলই, সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকেও টেনে আনছিল সামরিক জোটের ছত্রছায়ায়। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য মার্কিন উদ্যোগে গঠিত হয় 'সিয়াটো' জোট, ১৯৫১ সালে গঠিত হয় 'আনজাস্'।

আর এই প্রেক্ষাপটেই যৌথ স্বনির্ভরতা ঘোষণাকে সামনে রেখে বিশ্বরাজনীতিতে তৃতীয় মঞ্চ হিসেবে উঠে আসে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। 'জোটনিরপেক্ষ' শব্দটির মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্রবোধের ছাপ স্পষ্ট। আমরা মার্কিন জোটেও নেই, সমাজতান্ত্রিক জোটেও নেই — অনেকটা এরকম ঘোষণায় জোটনিরপেক্ষতাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা।

জোটনিরপেক্ষতার নীতি ঃ

জোটনিরপেক্ষ নীতির ব্যাপারে নির্ধারিত মানদন্ড ছিল —

১) সেই দেশকে স্বাধীননীতি অনুসরণ করতে হবে। যে নীতির ভিত্তি হবে ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহাবস্থান। অনুসরণ করতে হবে জোটনিরপেক্ষতা অথবা অনুরূপ নীতি।

২) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বরাবর সমর্থন জানিয়ে যেতে হবে।

৩) শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত বহুমুখী সামরিক জোটের সদস্য হওয়া চলবে না।

৪) মহাশক্তিধর কোন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হলে অথবা আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সন্ধি চুক্তির সদস্য হলে দেখতে হবে, সেই চুক্তি বা সন্ধিচুক্তি যেন মহাশক্তিধর দেশগুলির সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পাদিত না হয়।

৫) দেশের মধ্যে কোন বিদেশী শক্তিকে তাদের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ঘাঁটি করতে দেওয়া যাবে না।

এই নীতিগুলি ছাড়াও প্রথম শীর্ষ সম্মেলন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে, স্থায়ী শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ সহ সমস্ত রকম আগ্রাসনের বিরোধীতা করতে হবে।

ন্যামের প্রাসঙ্গিকতা ঃ

১৯৯১-এ প্রাক্তন রাশিয়া বিপর্যয়ের ফলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সামনে বিশ্বরাজনীতির এতদিনের চেনা বিন্যাসটাই বদলে গেছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাকে ঘিরে। ১৯৯২-এ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দশমশীর্ষ সম্মেলন শুরু হবার আগে ওই শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'জাকার্তা টাইমস' তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে 'রাজনৈতিক ডাইনোসোর' হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, পরিবর্তিত অবস্থার ন্যাম 'অচল', 'অপ্রাসঙ্গিক'।

কোন সন্দেহ নেই ন্যামের কিছু স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও, ঘোষিত নীতি অনুযায়ী একটি ইতিবাচক ও সদর্থক প্রচেষ্টা। উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাধীন ও সার্বভৌম কার্যক্রমের মধ্যেই এর ভিত্তি। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বাধীন ও সার্বভৌম উদ্যোগ, তা সে যৌথ বা একক যাই হোক না কেন, অপ্রাসঙ্গিক হয় কি করে?

সাম্রাজ্যবাদী চাপ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ওপর সব সময়ই ছিল, ছিল আক্রমণ — মতাদর্শগত ও বৈষয়িক। বিশ্বরাজনীতির বিন্যাসের বদল ঘটলেও আক্রমণকারী থেকে গেছে একই স্থানে, বরং আরও বলিষ্ঠ তার আক্রমণ। তাই সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে এই স্বাধীন ও সার্বভৌম উদ্যোগের ওপর সাম্রাজ্যবাদ যখন আক্রমণ তীব্র করছে, তখন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আরো গুরুত্ব পেয়েছে। আরো আবশ্যক হয়ে উঠেছে।

৮.৫ জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল

সংবাদ সংস্থাগুলির মারফত আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ সংক্রান্ত আলোচনা জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল (Nonaligned News Pool)-কে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তথ্যও ও সংবাদপ্রবাহে যে পরিমাণগত ও গুণগত বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যেই জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল বা সংক্ষেপে 'পুল'-এর প্রতিষ্ঠা।

পুল কী?

জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল একটা বহুপক্ষীয় উদ্যোগ। তবে পুল কি তা বুঝতে গেলে পুলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ভারতীয় সাংবাদিক ডি. আর. মানকেকার (D. R. Mankekar)-এর কথাটি স্মরণ করতে হয়। তার মতে "জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে তথ্যও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাই সংবাদপুল নামে পরিচিত।"

পুলসংবাদ সংস্থা নয় ঃ

জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল 'পি.টি.আই.' (P.T.I.) 'ইউ.এন.আই. (U.N.I.), 'রয়টার্স' (Reuters), বা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (API)-এর মত কোন সংবাদ সংস্থা নয়। কেন না, সংবাদ সংস্থাগুলির মত এর কোন কেন্দ্রিয় সদর দপ্তর নেই, কোন জেনারেল ম্যানেজারও নেই। এমনকি আর্থিক বাজেট এবং কর্মচারীও নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই পুলের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলতে রয়েছে পুলের কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কমিটির একজন সভাপতি থাকেন। তিন বছর অন্তর তাঁর পরিবর্তন হয়।

কেন এই পুল?

যে লক্ষ্য ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিকশিত হয়েছে, তার সূত্র ধরেই জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুলের জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের এই সদ্য স্বাধীন দেশগুলি অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দুর্বলতার পাশাপাশি তথ্য ও সংবাদ প্রবাহ ব্যবস্থার স্তরেও পিছিয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলি আত্ম-স্বনির্ভরশীল হওয়ার প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর যুগোশ্লাভিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন এক ঘোষণা বলে —

"We are fighting for collective self reliance" অর্থাৎ যৌথ স্বনির্ভরতার জন্য আমাদের এই লড়াই। যৌথ স্বনির্ভরতা অর্জন এবং পরস্পরকে স্বনির্ভর করে তোলাই আমাদের পারস্পরিক লক্ষ্য। স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে যৌথ কর্মকান্ড।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে উন্নয়নের প্রশ্নে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে যোগাযোগও তথ্যপ্রবাহ সংক্রান্ত বিষয়টি। তথ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অভাব দেশগুলির কাছে দারিদ্র্যতার নতুন অর্থকে তুলে ধরে। এছাড়া, পশ্চিমী-মার্কিনী সংবাদ সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যে সংবাদ পাঠায় তার সত্তর শতাংশই উন্নত দেশ সংক্রান্ত। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির সংবাদ সেখানে ব্রাত্য। শুধু তাই নয়, সরবরাহকৃত সংবাদগুলি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে দিল্লিতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির তথ্যমন্ত্রীরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। ঐ সম্মেলন স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছিল যে, চলতি তথ্যব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা দূর করা এবং যৌথ স্বনির্ভরতা অর্জনে পরস্পরের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য এই সম্মেলনই পুলের কার্যক্রমের খসড়াপত্র গৃহীত হয় এবং একই বছরে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জোটনিরপেক্ষশীর্ষ সম্মেলনে সেটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার সংবাদ সংস্থা তানজুং (Tanjung) ১৯৭৫ সালে দশটি অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মাধ্যমে পুলের কাজ শুরু করে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সাংবিধানিক তত্ত্বাবধানেই পুলের কাজ কর্ম পরিচালিত হয়।

সংবাদ পুলের লক্ষ্য ঃ

পুলের সংবিধানের লক্ষ্য হিসেবে ৫-টি বিষয়ের উল্লেখ আছে —

১) জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংবাদ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও উন্নত করা।

২) পুলের মূল প্রতিশ্রুতিই হোল বস্তুনিষ্ঠ (objective) সংবাদ বিষয়ে জোর দেওয়া। একই সঙ্গে প্রগতিমূলক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মপ্রয়াসের উপর জোর দেওয়া।

৩) সংবাদপুল তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক জনসমাজে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংবাদ আদান-প্রদান করতে চায়।

৪) জোটনিরপেক্ষ দেশ এবং তাদের নীতিসম্বন্ধে আরো তথ্য প্রদান করে পুল এক্ষেত্রে ফাঁকপূরণ করতে চায়। আগ্রহী সংবাদসংস্থা, প্রচার মাধ্যম গুলিকেও সংবাদ দিতে আগ্রহী পুল।

৫) আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা গঠনের মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে চলতি সংবাদ বিনিময় ব্যবস্থাকে পুল বদলাতে চায় না। কিন্তু উপরোক্ত লক্ষ্যপূরণই তার কাজ।

পুল তিনটি ফাঁক পূরণ করতে চায় ঃ

১) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পরস্পরের খবর জানতে পারেনা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আমরা লন্ডন, নিউইয়র্ক, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের খবর যতটা জানি, পাশের বার্মা (মায়ারমান), মালদ্বীপ, মরিশাস অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশগুলির সংবাদ ততটা জানিনা। কারণ এগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংবাদ সংস্থার তেমন যোগাযোগ নেই। 'পুল' এই যোগাযোগ করে দিতে চায়।

২) পশ্চিমী সংবাদ সংস্থা গুলি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সংবাদ প্রচার করে তৃতীয় বিশ্বের এক বিকৃত ভাবমূর্তি তুলে ধরে। পুল এই ভাবমূর্তি বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে দূর করতে চায়।

৩) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি যে ধরনের সংবাদ সরবরাহ করে তা শুধুমাত্র তথ্যগত দিক দিয়ে নয়, দৃষ্টিভঙ্গীগত দিক থেকেও সঠিক নয়। পুল এটি শোধরাতে চায়।

সংবাদ প্রদান কীভাবে হয় ঃ

সংবাদ পুলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংবাদ প্রেরণকারী সংবাদ সংস্থাকে সংবাদ পাঠানোর খরচ বহন করতে হয়। আবার গ্রাহক সংবাদ সংস্থা সংবাদ যোগ্য মনে করলে তা সংবাদমাধ্যম গুলিকে সরবরাহ করতে পারে। গৃহীত সংবাদ প্রচার বা প্রদান করা না করা একান্তভাবেই সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতির ব্যাপার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুলের সংবাদ বিনিময় হয় তিনটি ভাষায় —

(১) ফরাসী, (২) স্প্যানিশ এবং (৩) ইংরেজী।

৮.৬ ম্যাক ব্রাইড কমিশন

১৯৭৬ সালের সম্মেলনেই ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল আমাদো মহতার এম. বো (Amadou Mahtar M'Bow) এক কমিশন গঠনের কথা বলেন এবং এই প্রস্তাবানুসারে ১৯৭৭ সালে আয়ারল্যান্ডের সিয়ান ম্যাকব্রাইডের নেতৃত্বে ষোল সদস্যের 'ম্যাক ব্রাইড কমিশন' গঠিত হয়। কমিশনের লক্ষ্য হিসাবে বলা হয় 'to study —"the totality of communication problems in modern societies' এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা দূরীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব (recommendations) পেশ করা।

১৯৮০ সালে বেলগ্রেড অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর একুশতম সাধারণ সম্মেলনে কমিশন "Many Voices One World" শীর্ষক চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে এবং ঐ সম্মেলন রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি বিচার বিবেচনা করে। উল্লেখ্য, কমিশনের সদস্যরা এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, চলতি তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সামগ্রিক বিচারে আশাপ্রদ নয়।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ওই বছরে এবং কমিশনের রিপোর্টে পেশ করার কয়েকমাস পূর্বে বাগদাদে আয়োজিত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ বিন্যাস সংক্রান্ত কয়েকটি নীতি (principles) তুলে ধরে, যা পরবর্তী সময়ে ম্যাক ব্রাইড কমিশনের রিপোর্টেও প্রতিফলিত হয়।

কমিশনের প্রস্তাব এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির দাবি গুলিকে সামনে রেখে ১৯৮০ সালের সম্মেলনে

ইউনেস্কো এগারটি নীতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। ওই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্রটিকে তুলে ধরা হয়। নীতিগুলি হল —

১) বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্যহীনতা দূরীকরণ করতে হবে।

২) সরকারী, বেসরকারী আধিপত্যকামিতার নিরসন করে এই চলতি কাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ জরুরী।

৩) কোন দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বাধাগুলিকে দূর করে অবাধ ও ভারসাম্যমূলক তথ্য, মতামত আদান-প্রাদনের ব্যবস্থাকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৪) তথ্য যোগাযোগের মাধ্যম ও চ্যানেল পর্যাপ্ত করে তুলতে হবে।

৫) প্রেসের স্বাধীনতার পাশাপাশি তথ্য জানার অধিকারকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, যোগাযোগ পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলিকে তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণের উপযোগী করে তুলতে হবে।

৭) এ ব্যাপারে উন্নত দেশগুলিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

৮) অন্য দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়কে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নিজস্ব স্বার্থ, আকাঙ্খা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে।

৯) সমতার ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থায় প্রতিটি জনগণের অংশ গ্রহণের অধিকারকে স্বীকার করতে হবে।

১০) সমাজ ইতিবাচক দায়বদ্ধতা পালনের স্বার্থে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও সাংবাদিকদের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করতে হবে।

১১) নয়া তথ্য ব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যক্তি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী গুলিকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। শ্রদ্ধা করতে হবে তাদের নিজস্বতাকে।

৮.৭ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে বিশ্বরাজনীতির বিন্যাসটা বদলে যায়। অর্থাৎ ইউরোপকেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতির অবসান ঘটে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়াকে কেন্দ্র করে দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। একে বলা হয় দ্বিমেরুকৃত বিশ্বব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে সদ্যস্বাধীন দেশগুলি নিয়ে গঠিত হল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় পশ্চিমী দেশগুলির আধিপত্যকামিতা নিরসনের দাবি জানায় তারা। যার মূল বক্তব্য হল যোগাযোগ ও তথ্য বিন্যাসের গণতান্ত্রিকরণ। এই লক্ষ্য পূরণকে সামনে রেখে উঠে আসে নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীস্তরে গঠিত রাষ্ট্রসংঘ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক মঞ্চ হলেও যোগাযোগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষ ও দেশগুলি গঠন করে জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল।

৮.৮ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত নোট ঃ**

১. নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল, ইউনেস্কো, ম্যাকব্রাইড কমিশন।

■ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১. নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবি কেন উঠে আসে?

২. নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নীতিগুলি কি ছিল?

৩. নয়া অর্থনৈতিক দাবির গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪. সংবাদপুল ও সংবাদ সংস্থার পার্থক্য চিহ্নিত কর।

৫. পুলের লক্ষ্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবি কারা এবং কেন তুলেছিলেন?

২. কোন প্রেক্ষাপটে এবং কেন নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা গঠনের দাবি উঠে আসে?

৩. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কি? জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে যুক্তি দাও।

৪. রাষ্ট্র সংঘ কিভাবে নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবিকে ক্রমপরিণতির দিকে নিয়ে যায়?

৫. পুল কি? কোন কোন লক্ষ্য পূরণকে সামনে রেখে পুল গঠিত হয়?

৮.৯ পরিভাষা

■ New International Information Order — নয়া আন্তর্জাতিক তথ্যবিন্যাস বা ব্যবস্থা ■ Information Age — তথ্য-যুগ ■ Resource — সম্পদ ■ Cultural Colonialism — সাংস্কৃতিক উপনিবেশকতাবাদ ■ Communication Order — যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বিন্যাস ■ framework — কাঠামো ■ Free Flow of Information — অবাধ তথ্যপ্রবাহ ■ Free and balanced information flow — অবাধ এবং ভারসাম্যমূলক তথ্যপ্রবাহ ■ recommendation — প্রস্তাব ■ New International Economic Order — নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা বিন্যাস ■ Second Development Decade — দ্বিতীয় উন্নয়নের দশক ■ Charter — খসড়াপত্র ■ Commonduty — সাধারণ কর্তব্য ■ International Monetary System — আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা ■ Bipolar — দ্বিমেরকৃত।

৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ্য ঃ**

১. "The New World Information Order" in World Communication — Mustapha Masmoudi

২. Global Information and World Communication : New Frontiers in International Relations — Hamid Mowlana.
৩. Encyclopentia of International Commuciation (Vol.-3)
৪. One Way free flow — D. R. Mankekar.
৫. Whose freedom? Whose order — D. R. Mankekar.
৬. Communication, development and the third world — Robert L.Sternson.
৭. News Agencies fool of Non-Aligned Countries — I.I.M.C.

■ সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. "Many Voices One World (UNESCO Report, 1980)
২. The Mass Media Declaration of UNESCO — Kaarle Norden Streng.
৩. Crisis In international News — Jim Richstad and Michael Anderson.
৪. Mass Communication in India — Keval J. Kumar.
৫. The Polities of World Communication — Cees J. Hamelink.

একক ৯ □ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ প্রস্তাবনা

৯.২ নানা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কি?

৯.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ বাধা

৯.৪ সারাংশ

৯.৫ অনুশীলনী

৯.৬ পরিভাষা

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করেছেন। বাস্তবত সংস্কৃতির কোন একক পরিচিত নেই। বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত এই সংস্কৃতি। কিন্তু আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারকালচারাল বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক কারণেই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা জরুরি।

৯.১ প্রস্তাবনা

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আজ আমাদের দৈনন্দিন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমায়িত নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাবও প্রসারের হাত ধরে সংস্কৃতি আজ তার গণ্ডী ছাড়িয়ে পৌঁছে যাচ্ছে নানা স্থানে। এ প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে একটি দেশ একক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাস্তবে কিন্তু একটি দেশ নানা মাত্রার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এক দেশ এক সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা হয় আলোচনার সুবিধার্থে।

৯.২ নানা সংস্কৃতিক যোগাযোগ কি?

ইন্টার কালচারাল কমিউনিকেশন বা নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ হল বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ। সাধারণভাবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে একটি জাতি ও দেশ সমার্থক। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটা অংশই হল নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুই বা আর বেশি সংস্কৃতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি হচ্ছে সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ইন্টার কালচারাল কমিউনিকেশন নয়। আবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলা দেশের যোগাযোগ — দুটি ভিন্ন দেশ হলেও হলেও ইন্টার কালচারাল কমিউনিকেশন নয়; কারণ উভয় সংস্কৃতি মোটামুটিভাবে এক।

সাংস্কৃতির আদান-প্রদান ঃ

সংস্কৃতি বলতে প্রচলিত অর্থে আমরা বুঝি গান, বাজনা, নাটক, চলচ্চিত্র, নানা-আঙ্গিকের নৃত্যশিল্প অথবা সংস্কৃতি বলতে বুঝি সংস্কৃত মানুষের আচরণ। অর্থাৎ ভব্যতা, আদাব-কায়দা এবং দেশজ রীতি-নীতি ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য সংজ্ঞানুসারে মানুষের সমস্ত জীবনচর্চাই সংস্কৃতি।

সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক সত্ত্বাবিশিষ্ট দুই বা তার বেশি দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নানা ভাবে হতে পারে। বিভিন্ন দেশের অনুষ্ঠিত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানান আলাপ-আলোচনা, ওয়ার্কশপ, বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ব্যক্তিস্তরে চিঠিপত্র ইত্যাদি মারফত নানা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তাছাড়া আজকের দিনে টেলিভিশন, উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

কিন্তু নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বহু পূর্ব থেকেই — দেশে দেশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার হাত ধরেই। সাম্রাজ্যবাদীশক্তিগুলি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের চেষ্টা করেনি, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ কয়েম করারও চেষ্টা করে। অর্থাৎ রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ।

৯.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ বাধা

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মৌল উদ্দেশ্য কোন সাংস্কৃতিকে গিলে খাওয়া নয়, বরং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে উভয় সংস্কৃতিকে আরো উন্নত করা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা। আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বাড়লে সংস্কৃতির বিনিময় হবে উর্দ্ধমুখী।

তবে বর্তমান সমাজে সমস্ত সামাজিক মানুষই যে একই সাংস্কৃতিক বিন্যাস অনুসরণ করবেন তার মানে নেই। একটি সমাজ বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ সাংস্কৃতিক কাঠামোর অঙ্গীকৃত সংস্কৃতি যাকে সহজ সাধারণ সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা যায় (স্ত্রী আচার, বিবাহবিধি, পূজাপার্বণ, রান্নাবান্না) তাকে বলা হয় উপসংস্কৃতি। প্রতিটি জটিল সমাজই বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এই উপসংস্কৃতির মধ্যে জ্ঞাপন-ভেদ (Communication gap) দেখা দিতে পারে আবার নানান উপসংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতিগত সংঘর্ষও দেখা দিতে পারে। কোন সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কিছু মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে অথবা তার বিরুদ্ধে কিছু কাজকর্ম করতে পারে। যেমন বহু ব্যক্তি "অশ্লীলতাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেন ও তাকে জীবনের অঙ্গ বলে মনে করেন। অথবা প্রচলিত সাংস্কৃতিক অর্থে যা অশ্লীল তাদের চোখে তা অশ্লীল নয়, এই প্রথা বিরোধিতা করলে প্রতিসংস্কৃতি (Counter-Culture)।

৯.৪ সারাংশ

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আন্তর্জাতিকস্তরে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটা অংশ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা মাত্রার, বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে একটা পৃথক অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আলোচনায় একটি দেশ একটি সংস্কৃতির পরিচায়ক — এই সরল নথিকরণ মেনে চলা হয়। যদিও বাস্তবতা অন্য কথা বলে।

৯.৫ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. সাংস্কৃতিক বা ইন্টার কালচারাল যোগাযোগ কি?

২. সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সম্পর্ক কি?

৩. সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১. "আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আসলে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ"—বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দাও।

২. সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কি কি ধরনের বাধা আসতে পারে?

৩. আধুনিক গণমাধ্যম গুলি কিভাবে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলে? সাম্প্রতিক চিত্রসহ আলোচনা কর।

৯.৬ পরিভাষা

■ Intercultural Communication — সাংস্কৃতিক যোগাযোগ/নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ ■ Counter Culture — প্রতিসংস্কৃতি ■ Communication Gap — জ্ঞাপন ভেদ।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ্য :**

১. গণ জ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২. The Cultural barriers; problems in the exchange of ideas : — Daniel, Norman.

৩. Handbook of international and intercultural Communication — edited by Molefi Kete Asante, William B. Gudykunst.

৪. Global Work : bringing distance Cultural and time — O'Hara-Deveroux, Mary.

৫. Theories in intercultural Communication — edited by Young YunKim & William B. Gudykunst.

■ **সহায়ক গ্রন্থ :**

১. Intercultural Communication Theory : Cultural perspective — William B.Gudykunst.

২. Mass media polieies in changing cultures — George Gerbner.

৩. Tretition as truth and communication — Pased Boyer.

৪. Mass Communication Theory — Denis Mc.Qual.

একক ১০ □ সংস্কৃতি ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি

গঠন ঃ—

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ প্রস্তাবনা

১০.২ লোকসংস্কৃতি

১০.৩ গণমাধ্যম

১০.৪ জ্ঞাপন মাধ্যম ও গণমাধ্যম

১০.৫ গণসংস্কৃতি

১০.৬ বিশ্বায়ণ—তথ্যবিনোদন, নতুন প্রযুক্তির প্রভাব

১০.৭ সারাংশ

১০.৮ অনুশীলনী

১০.৯ পরিভাষা

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১০.০ উদ্দেশ্য

প্রতিটি দেশে নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। সেগুলি দেশজ সংস্কৃতি অর্থাৎ দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জীবনবোধের প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টসংস্কৃতি। দেশজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সেই দেশের সম্পদ। এই বৈচিত্র্য দেশের পরিচিতিকে বহন করে। কিন্তু আজ প্রতিটি স্তরে বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার থেকে রেহাই পাচ্ছেনা সংস্কৃতি। অভিন্ন বাজার তৈরির প্রবণতা ক্ষতিগ্রস্থ করছে দেশজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে। এখানে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

১০.১ প্রস্তাবনা

লোকসমাজে মানুষে মানুষে একটি আত্মিক সম্পর্ক ছিল। যে সমাজে ঐতিহ্যকে মূল্য দেওয়া হোত সব চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য ও চিরাচরিত মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই সমাজের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। দেশের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ যেমন সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে সংস্কৃতি একটি রূপ পায়। অর্থাৎ সংস্কৃতি দেশের চরিত্রকে তুলে ধরে। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃতিকে পণ্যায়ণ শুরু হয়েছে। পশ্চিমী গণমাধ্যম গুলিতে তো বটেই, এমনকি দেশীয় গণমাধ্যম গুলিও তথ্যবিনোদনের প্রবণতাকে উস্কে দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে একটি ভোগবাদী প্রবণতা।

১০.২ লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত বুঝি অনাগরিক সংস্কৃতিকে। সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী যৌথ সমাজে তার জন্ম। তখন স্রষ্টা ও উপভোক্তাদের মধ্যে তফাত ছিলনা বললেই হয়। যখন মানুষ লিখতে শেখেনি তখনও সে ভাবতে পারত এবং প্রকাশ করতে জানত সেই ভাবনাকে নানাভাবে। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি সমাজ-প্রক্রিয়ারই অংশ, স্বয়ং একটি প্রক্রিয়াই।

লোকসংস্কৃতির লক্ষণ ঃ

১) লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা বা উৎস যাই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তা পরিণত হত সামাজিক সম্পত্তিতে।

২) স্রষ্টা ভোক্তার মধ্যে ঘনিষ্ট অবস্থানগত সম্পর্ক, ফলে সৃষ্টির রূপ ও ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হত না।

৩) মানসিক শিল্পগুলিকে (অর্থাৎ গান, নাচ, লোককথা, রূপকথা, লোকনাট্য, লোককবিতা, লোকশিল্প) পণ্য ও দর্শক-তোষক পারফরম্যান্স হিসেবে গণ্য না করা।

৪) বিষয় বা ভাববস্তুতে কালযোগী অদলবদল ঘটলেও রচনা সংগঠনের মূল আদলটির রক্ষণশীলতা — ভাদু-তুষুর গানে বা গম্ভীরাতে যেমন লক্ষ্য করা যায়।

৫) রিচুয়াল বা আচার অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, শিশুকে ঘুমপাড়ানো গান, বিয়ের গান, ধান ঝাড়াই বা ছাদ-পিটানোর গান ইত্যাদিতে লোকসৃষ্টি প্রয়োগের সম্পর্ক বর্তমান।

লোকসংস্কৃতির মূল্য ঃ

লোকসংস্কৃতি সমাজের আরোপিত নয়। গোষ্ঠীজীবনের বা প্রান্তীয় জনসমাজের অলিখিত ইতিহাস লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির মধ্যে নিহীত রয়েছে গোষ্ঠীর বিশ্বাস, ধর্মীয়তা, নানা সামাজিক নিয়মনীতি। ইতিহাসবিদ্‌রা লোকসংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করছেন ইতিহাস রচনায়। লোককথা, পুরাণ, আচার-অনুষ্ঠানের পরম্পরা যে ইতিহাস চর্চার মূল্যবান উপাদান হতে পারে তা বলছে তাঁরা যাঁরা লিখছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস।

ইদানিংকালে অপসংস্কৃতি দূরীকরণে লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগ, পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে।

বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

লোকসংস্কৃতির পিছনে কোন বাণিজ্যিক প্রয়াস নেই, তা ব্যক্তির মানসলোকে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়। কিন্তু গণ-সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানকেও গণবিনোদনের বিষয়বস্তু করে তোলে। আজ লোকসংস্কৃতি তার সংহত গ্রামীণ আবাস ছেড়ে পৌঁছে যাচ্ছে বৃহত্তর ক্রেতা-সমাজের কাছে। হয়ে উঠছে প্রদর্শন ও বিনোদনের পণ্য। দ্রুত বদলের হাওয়া লেগেছে তার গায়ে।

তার নানা বস্তু ও সৃষ্টি মিডিয়া বা গণমাধ্যমগুলির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে দেশের বহু জনসমাজের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় সংস্কৃতি ব্যবসায়রা তার উৎপাদন বা পরিবেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ বসাতে চায়। লোকসংস্কৃতির স্রষ্টারা লাভ-সচেতন হয়ে ওঠেন, সেই সঙ্গে প্রদর্শন-নির্মাণ-পরিবেশনের প্রযুক্তিও তাদের প্রভাবিত করে।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রান্তীয় গোষ্ঠীগুলির কাছে যে সংস্কৃতি রয়েছে তা প্রতিটি দেশের সম্পদ। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসার

ও প্রভাবের ফলে লোকসংস্কৃতির ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিত্তিক বৈচিত্র্যের ঘরানা বদলে যাচ্ছে। এই বদলের অর্থ বৈচিত্র্য বৃদ্ধি নয় বরং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বময় সাধারণ বাজার তৈরি করছে। সাংস্কৃতিক এই অভিন্নতা বিভিন্নতাকে গৌণ না করে পারে না। গণসংস্কৃতি আসলে বাজারী সংস্কৃতি, ছাঁচে ঢালা সংস্কৃতি। পণ্যায়ণ তার ফল।

১০.৩ গণমাধ্যম

গণজ্ঞাপনের ভাষায় জনগণ বলতে আমরা বুঝি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরাট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত জনসমষ্টি। বিচ্ছিন্ন এই জনসমষ্টির কাছে যার মারফত একই বার্তা (Message) পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় তাকেই বলা হয় গণমাধ্যম (Mass Media)। এই গণমাধ্যম অন্যান্য গণ ভোগ্য পণ্যের মত প্রযুক্তি বিদ্যার দান ও যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত। কিন্তু গণমাধ্যম ও গণ ভোগ্যপণ্য এক নয়, এর নিজস্ব চরিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

গণমাধ্যম আসলে কী?

মাধ্যম বা ইংরাজী 'মিডিয়াম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ — যার দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করা হয় অথবা তথ্য পরিবেশনের উপযোগী সূত্র (a chance for information)। কিন্তু কোন সূত্র মারফত বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কোন কিছু জ্ঞাপন করলেই ওই সূত্রকে গণমাধ্যম বলা যায় না। দেখতে হবে যা জ্ঞাপণ করা হচ্ছে, তা তথ্য, শিক্ষা, ভাবধারা, আবেগ বা বিনোদন কিনা। এই অর্থে বৈদ্যুতিক বাল্ব গণমাধ্যম নয়। যদিও বাল্বকে আলোক মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই আলো কোন তথ্য পরিবেশন করছে না, বহু ব্যক্তির অন্ধকার দূর করছে। তবে এই আলো যখন বিজ্ঞাপনের নিওন সাইন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এই আলো এক ধরনের গণমাধ্যম। অ্যালান হ্যানকক (Alan Hancock) তাঁর 'মাস কমিউনিকেশন' গ্রন্থে লিখছেন, "শুধু একটি টেলিফোন দূরভাষণ যন্ত্রমাত্র। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন দেশের অধিকাংশ লোকেরই টেলিফোন আছে এবং সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের জন্য টেলিফোন ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন টেলিফোন গণমাধ্যম।"

১০.৪ জ্ঞাপনমাধ্যম ও গণমাধ্যম

চিঠিপত্র মারফত আমরা আমাদের সংবাদ বা কোন তথ্য অপর কোন ব্যক্তি বা কিছু ব্যক্তিকে জানাতে পারি। এক্ষেত্রে চিঠিপত্র জ্ঞাপনমাধ্যম, গণমাধ্যম নয়। কারণ চিঠি-পত্রর দ্বারা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে সংবাদ বা তথ্য জানানো হচ্ছে তারা জনসমষ্টি গণ বা Mass-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। এখানে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিরাট ভৌগোলিক ভূখন্ডের অধিবাসী নয়।

কিন্তু আমাদের মেটালিক মাধ্যম, যেমন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মুদ্রণ বা বৈদ্যুতিন মাধ্যম মারফত যখন ওই চিঠি ছেপে বা পড়ে বৃহৎ বিচ্ছিন্ন জনগণের কাছে তুলে ধরা হয় তখন ওই মাধ্যমগুলি গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ গণমাধ্যম হল সেই মাধ্যম যার সাহায্যে কোন বার্তা লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে পরিবেশন করা সম্ভব হয়।

গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য ঃ

তাহলে প্রকৃত গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে —

১) গণমাধ্যম হল এমন মাধ্যম যা যান্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত।

২) যা বিরাট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বৃহৎ জনসমষ্টির কাছে দ্রুত বার্তা পৌঁছে দিতে সমর্থ।

৩) যে মাধ্যমকে বা মাধ্যম মারফত তুলে ধরা বার্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ বা সঞ্চয় করা সম্ভব।

বিভিন্নপ্রকার গণমাধ্যম ঃ

গণমাধ্যম গুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —

ক) মুদ্রণ মাধ্যম

খ) বৈদ্যুতিন মাধ্যম

বৈদ্যুতিন মাধ্যম আবার দুই ভাগে বিভক্ত —

ক) শব্দ মাধ্যম

খ) গতি মাধ্যম

মুদ্রণ মাধ্যম (Print Media) ঃ

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, বহুল প্রচারিত বই, পেপার ব্যাক, বিভিন্নপ্রকার প্রচার পুস্তিকা। যথা ফোল্ডার, ব্রোশিয়ার, লিফ্‌লেট, পোষ্টার, স্টিকার ইত্যাদি।

শব্দ মাধ্যম (Sound Media) ঃ

রেডিও, রেকর্ড, টেপরেকডার প্রভৃতি।

গতি মাধ্যম (Motion Media) ঃ

চলচ্চিত্র, টি.ভি., ভি.ডি.ও. এবং স্লাইড।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই তিন মাধ্যম কখনো পরস্পরের পরিপূরক আবার কখনো একে অপরের প্রতিযোগী। পারস্পরিক এই সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আদতে পরিপুষ্ট হয় সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম ব্যবস্থা।

১০.৫ গণসংস্কৃতি

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও বিরাট ও জটিল হয়ে উঠছে তত বেশি করে মানুষ গণমাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। আধুনিকযুগে গণমাধ্যমের প্রচার ও প্রভাব উর্দ্ধমুখী।

শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে জনসমাজে আধুনিকতার শুরু। তারপর যতদিন যায় ততই সমাজে রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমাজের যে চরিত্র লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই সমাজকে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা চিহ্নিত করছেন 'গণ-সমাজ' বা Mass Society বলে। সংস্কৃতি (Culture) তারই এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় গণ-সমাজের নির্ধারক ভূমিকায় থাকে তার নিজস্বসংস্কৃতি।

সংস্কৃতি কিছু আচরণ ও বিশ্বাসের সমষ্টি। এই আচরণ ও বিশ্বাসই এক সমাজকে আরেক সমাজ থেকে আলাদা করে। এই আচরণ ও বিশ্বাস সমাজ বংশ পরম্পরায় তার পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যায়। সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে রূপান্তরিত সংস্কৃতি সমস্ত সমাজেই জন্ম নিতে পারে। ফলে যে সমাজের দরজা যত বেশি খোলা, সেই সমাজের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের হার তত বেশি। এই সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়া মানুষকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে।

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি সমাজ বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন গণসংস্কৃতির উৎপাদন ও ভোগ পৃথকীকৃত। যাঁরা এই সংস্কৃতির প্রযোজনা বা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তাঁরা নিজেরা তা ভোগ করেন না। গণসংস্কৃতি একান্তভাবেই দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য।

গণ-উৎপাদনের ফলে উৎপাদিত দ্রব্যে ভারসাম্য আনা হয়। এই ভারসাম্য আনা হয় ক্রেতা সাধারণের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদি চরিতার্থ করার জন্য। এই চাহিদামূলক প্রকরণগুলির উপর নির্ভর করে দ্রব্যের মান ও প্রকৃতি।

এই সংস্কৃতিতে ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং জনগণের প্রশংসার উপর নির্ভর করে সাংস্কৃতিক সাফল্য।

গণসংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের ভাললাগাই জীবনের নৈতিক ও নান্দনিক মান বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষার লোকেরা থাকেন। এঁরা নানান উপসংস্কৃতির অন্তর্গত। ফলে গণসংস্কৃতি হল ব্যক্তির সেই সব ধ্যান ধারণা ও আচরণ যা এই সব উপসংস্কৃতিকে অতিক্রম করে চলে যায়। অর্থাৎ সমস্ত উপসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যাতে এই সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেন।

গণসংস্কৃতির উদাহরণ ঃ

যে কোন গণপণ্য, যেমন টেলিভিশন, মোটরগাড়ি, ঘর সাজাবার আসবার পত্র। যে কোন গণ বিনোদন যথা ফুটবল, ক্রিকেট আধুনিক গান ইত্যাদি।

গণসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ঃ

সমাজতত্ত্ববিদরা গণসংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সে গুলি হল —

গণসংস্কৃতির প্রাথমিক শর্তই হল গণ-বিনোদন। ফলে জনসাধারণের সাধারণ রুচিকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তৈরি হয় গণ-বিনোদন। আর যে জন্য সাধারণের দাবি ও প্রত্যাশা পূরণের সমস্ত কলা ও শিল্পকে নতুন করে সাজাতে হয়।

গণসমাজ গণজ্ঞাপন নির্ভর। গণসংস্কৃতির বাহকও তাই গণজ্ঞাপন।

গণবিনোদন গণমাধ্যমকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। সাধারণের রুচি অনুসারে গণমাধ্যমগুলি তাদের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে থাকে।

১০.৬ বিশ্বায়ণ ঃ তথ্যবিনোদন

'বিশ্বায়ণ' (Globalization) একটি নতুন ধারণা। আমাদের আধুনিক জীবন দিন দিন জড়িয়ে পড়ছে এই পরিভাষাটির সঙ্গে। কৃষি থেকে বানিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই পড়ছে এর প্রভাব। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি ব্যবহার হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ ল্যাভ করেছে এবং বিনা বাধায় তা করেন। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর নানা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সুযোগ লাভে বঞ্চিত। ফলে এই অবস্থায় রয়েছে দুটি শ্রেণী একদল তথ্যসমৃদ্ধ, যারা শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে সামর্থ্য এবং অন্যদল তথ্যের নাগালের বাইরে। প্রকৃতপক্ষে 'বিশ্বায়ণ' পশ্চিমী ধারণা থাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অস্বীকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রকৃত বাস্তবতাকে। বিশ্বজুড়ে অভিন্ন বাণিজ্যিক বাজার গড়ার লক্ষ্যেই এটা করা হচ্ছে।

তথ্য-বিনোদন ঃ

'তথ্য' এবং 'বিনোদন' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে তথ্য বিনোদন।

আমরা জানি তথ্যের বহু কাজ — জানানো, শিক্ষিত করা। বিনোদনও তথ্যের অন্যতম কাজ। আর এই

প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যমের বানিজ্যিকীকরণ থেকে এই প্রবণতা আসে। সমালোচকরা বলেন বিনোদনের উপকরণ হিসেবে তথ্যের পরিবেশন। ক্রেতা মনোরঞ্জনই মূল লক্ষে পর্যবসিত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, টেলিভিশন ছাড়াও বাণিজ্য সফল সংবাদপত্রগুলি বিনোদনমূলক বার্তা বা কথা তুলে ধরে বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়, বিশেষত, প্রান্তীক অবস্থানে থাকা মানুষদের কথা বিষয়বস্তু থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির বাস্তবতা থেকে যাচ্ছে আড়ালে। স্যাটেলাইটের হাত ধরে ঢুকে পড়ছে পশ্চিমী ধাঁচের নানা অনুষ্ঠান, উন্নয়নশীল দেশগুলির জীবনযাপনের সঙ্গে যার কোন মিল নেই। পশ্চিমী বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি চেষ্টা করছে একটা অভিন্ন বাণিজ্য বাজার তৈরি করতে। এইভাবে নেতিবাচক ভোগবাদের প্রসারে গণমাধ্যমগুলি সাহায্য করছে। তথ্য বিনোদন নীতি তথ্যের পণ্যায়ন ছাড়া কিছু নয়।

নতুন প্রযুক্তির প্রভাব ঃ

তথ্যবিনোদনের বড় মাধ্যম এখন ইন্টারনেট। বিশ্বের নানা প্রান্তের পোপগোষ্ঠী ঢুকে পড়েছে। ইন্টারনেটে সামর্থ্য থাকলে এই বিনোদন উপভোগ করতে পারে যে কেউ। 'নেট ফ্রেন্ড' আরেকটি বিনোদন উপকরণ।

তাছাড়া আজকাল বহু গায়ক, গায়িকা, অভিনেতা, অভিনেত্রী নিজেদের নামে ওয়েবসাইট খুলেছেন। সম্প্রতি বম্বের অভিনেতা শাহরুখ খান 'এস. আর. কে' ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছেন।

তবে ভারতে তথ্যবিনোদনের শুরু আশির দশক থেকে। গোড়ার পর্বে অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সম্প্রচার করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় ছিল দূরদর্শন। অনুষ্ঠান নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মুম্বাই ফিল্মি জগতের বহু নামি দামি শিল্পী।

ভারতীয় দূরদর্শন তথ্য বিনোদন জগতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায় — 'হামলোগ' (We People) এর হাত ধরে। স্বল্প সময়ের সিরিয়াল ভিত্তিক দেশীয় প্রোগ্রাম মারফত সুনিশ্চিত শ্রোতা দর্শক যেমন তৈরি করা যায়, তেমনি লাভের অঙ্কটাও কম নয় — এই বোধের জন্ম দেয় আমলোগ। এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রধান বিজ্ঞাপন দাতা 'ম্যাগি-টু-মিনিট নুডুলস্'। হামলোগ-এর হাত ধরে ওই ভোগ্যপণ্যটি শুধু বিশাল বাজার দখলই করেনি, ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসও প্রভাব ফেলেছে। বৃদ্ধি পেতে থাকে বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত দূরদর্শন অনুষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই প্রবণতায় বিনোদন আর বিজ্ঞাপনদাতার বাণিজ্যিক সাফল্য প্রায় সমার্থক। বাণিজ্যিক সাফল্যই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তথ্যের পণ্যায়ন তার স্বাভাবিক পরিণতি।

বলা যেতে পারে 'হামলোগ' তথ্য বিনোদনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি গঠন করেছে। আর সেই বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে তথ্য বিনোদনের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা আমরা লক্ষ্য করি। রামায়ণ, মহাভারত, দ্যা সোর্ড অব টিপু সুলতান, শ্রীকৃষ্ণ, জয়হনুমান, ওম্ নমঃ শিবায়ঃ — ইত্যাদি হিন্দুধর্ম কেন্দ্রিক মেগাসিরিয়ালের পাশাপাশি পারিবারিক সিরিয়াল শান্তি, হামরাহি, উদান তথ্যবিনোদনের বিশাল এক ক্রমপর্যায়। তথ্য এখানে গৌণ, বিনোদনই প্রধান।

একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না যে তথ্য বিনোদনের উপর ভর করে দূরদর্শন তার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আর এই জনপ্রিয়তার ভাগ বসিয়েছে দেশিবিদেশী উপগ্রহ চ্যানেলের পাশাপাশি সাম্প্রতিককালের কেবল্ টেলিভিশনও। দূরদর্শনের কাছে এই পরিস্থিতি এক বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাভাবিক কারণেরই বদলে যাচ্ছে তার অনুষ্ঠান বিন্যাস। পরিবর্তিত এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি তথ্য বিনোদনের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি।

১০.৭ সারাংশ

গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব ও প্রসারের ফলে লোকসংস্কৃতি তার গোষ্ঠীবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে মিশেছে বৃহত্তর জনসমাজে। গণসংস্কৃতি বা পণ্যায়ন সংস্কৃতি তার স্বাভাবিক পরিণতি। সাংস্কৃতির পণ্যায়ন যদি হয় ফল, গণমাধ্যমের প্রসার তার কারণ। ফলে জনসমাজের রুচি, পছন্দ আজ ক্রমশ বিনোদনমুখী। বাণিজ্যিক স্বার্থপূরণে তথ্যের চেয়ে বিনোদনের গুরুত্ব তাই দিনদিন বাড়ছে।

১০.৮ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত নোট ঃ**

১. নানা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ লোকসংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, প্রতিবার্তা

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. লোক সংস্কৃতির লক্ষণগুলি কী কী?

২. তথ্যবিনোদন বলতে কি বোঝায়?

৩. নতুন প্রযুক্তি কিভাবে তথ্যবিনোদনে প্রভাব ফেলছে?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. গণসংস্কৃতি কী? গণসংস্কৃতি পণ্যায় সংস্কৃতি?

২. লোকসংস্কৃতি ও গণসংস্কৃতির পার্থক্য কী? লোকসংস্কৃতি কিভাবে গণসংস্কৃতিতে পরিণত হয়?

৩. বিশ্বায়ণের প্রবণতা কী? এই প্রবণতা সংস্কৃতির উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে?

১০.৯ পরিভাষা

■ Message—বার্তা ■ Mass—গণ ■ Print Media—মুদ্রণ মাধ্যম ■ Sound Media—শব্দমাধ্যম ■ Motion Media—গতি মাধ্যম ■ Mass Cultural—গণ সংস্কৃতি ■ Mass Society—গণ সমাজ ■ Cultural—সংস্কৃতি ■ Globalization—বিশ্বায়ন

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ ঃ**

১. গণ জ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

২. Intercultural Communication Competence — Richard L.Wiseman, Jolen Koester.

৩. Mass Media Policies in Changing Cultures — George Gerbner.

৪. The Cultural Dialogue : An Introduction to Intercultural Communication — Michael H.Prosser.

৫. Encyclopedia of International Communication — edited by Barnouw, Gerbner, Schramm, Worth and Gross.

■ **সহায়ক পাঠ্য ঃ**

১. Mass Communication in India — Keval J. Kumar

২. Tradition as Truth and Communication : Cognative description of traditional discourse — Pascal Boyer.

৩. Intercultural Communication theory : Current perspective — Gudykunst, William B.

৪. Culturally speaking meaning report through talk accross culture — edited by Halen Spencer-Oatey.

একক ১১ □ নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ প্রস্তাবনা

১১.২ যোগাযোগ প্রযুক্তি কি?

১১.৩ গণমাধ্যম প্রযুক্তি

১১.৪ জ্ঞাপনপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি

১১.৫ জ্ঞাপন প্রযুক্তি

১১.৬ উপগ্রহ চ্যানেল

১১.৭ কেবল্ টি.ভি.

১১.৮ কম্পিউটার প্রযুক্তি

১১.৯ কনভার্জেন্স

১১.১০ গণজ্ঞাপনের দিন কী শেষ?

১১.১১ সারাংশ

১১.১২ অনুশীলনী

১১.১৩ পরিভাষা

১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১১.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক যোগযোগ প্রযুক্তিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্নায়ুতন্ত্র। তার শাখাপ্রশাখা আজ বহুদূর বিস্তৃত। প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। অন্তত পৃথিবীর অধিবাসীরা তো বটেই। মুদ্রণ প্রযুক্তির কথা আজ গুটেনবার্গেই থেকে নেই। কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট, উপগ্রহ প্রত্যেকেই যোগাযোগের চেহারাটা এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে তা কল্পনার অতীত। প্রশ্ন হোল কীভাবে? আর সে প্রশ্নের উত্তরের জন্যই এই অধ্যায়ের শুরু।

১১.১ প্রস্তাবনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং তার সঠিক প্রয়োগ ভৌগোলিক ও সময়ের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব আজ পরিণত হয়েছে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ। অর্থাৎ পৃথিবী এখন বিশ্বপল্লী। যোগাযোগ প্রযুক্তির হাত ধরে ঘরে বসে দেখেছি সুদূর জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের চলতি অনুষ্ঠান। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ থেকে শুরু করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং হাল আমলের উপগ্রহ যোগাযোগের চেহারাটাকেই বদলে দিয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গোটাবিশ্বের জনজীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে চলেছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সঞ্চয়, তথ্য প্রক্রিয়া, বন্টন বা তথ্য সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে ক্রম উন্নতি কুশলতায়, দ্রুততায় ও নির্ভুলভাবে। ফলত ক্রমোন্নতি ঘটছে গণমাধ্যম ব্যবস্থারও।

১১.২ যোগাযোগ প্রযুক্তি কী?

ইংরেজি 'কমিউনিকেশন'-এর বাংলা হিসেবে 'যোগাযোগ', 'সংযোগ' বা 'জ্ঞাপন' শব্দ তিনটি সাধারণভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। 'যোগাযোগ' বা 'কমিউনিকেশন' হলো তথ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়া। তথ্য হতে পারে কোনো খবর, যে কোন বার্তা, পরিসংখ্যান, কোনো সংকেত, শব্দ, ছবি বা ফটো বা কোন সংকেত। যোগাযোগ ব্যবস্থা এসব বিনিময় ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা কার্যকর করার প্রযুক্তিই হলো যোগাযোগ প্রযুক্তি। যেমন টেলিগ্রাফ, ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ই-মেল এসব হলো যোগাযোগ প্রযুক্তির অঙ্গ।

১১.৩ গণমাধ্যম প্রযুক্তি

মিডিয়া টেকনোলজি বা গণমাধ্যম প্রযুক্তির বিষয়টি একটু পৃথক। এটি সম্পূর্ণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'মিডিয়া টেকনোলজি'-র ক্ষেত্রে 'মিডিয়া' শব্দটির টেকনোলজি হলো এমন ধারণার প্রযুক্তি যা গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ছাপার যন্ত্র। ছাপার যন্ত্র ছাড়া মুদ্রণ মাধ্যমের জন্ম সম্ভব ছিল না। ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ ছাড়া রেডিও'র জন্ম ছিল কি? তাকে কাজে লাগিয়ে যখন রেডিও কেন্দ্র খোলা হলো তখনই জন্ম নিল নতুনতর গণমাধ্যম। আবার টেলিগ্রাফ নিজে যোগাযোগ বা তথ্যপ্রযুক্তির অংশ হলেও তা গণম্যাম প্রযুক্তি নয়। কারণ টেলিফোন বৈজ্ঞানিক অর্থে গণজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই প্রযুক্তিটি না থাকলে গণমাধ্যমের কর্মকান্ড প্রায় অচল হয়ে যেত। তেমনই কম্পিউটার নেটওয়ার্কও আজ গণমাধ্যম প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এই নেটওয়ার্ক তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়ায় যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইন্টারনেটে সংবাদপত্রের অন-লাইন সংস্করণ মুহূর্তে পাড়ি দিচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে।

মুদ্রণ ও পি.টি.এস ঃ

কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে ফটোটাইপ সেটিং (পি.টি.এস.) এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে অফসেট পদ্ধতি মুদ্রণ মাধ্যম জগতে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। পি.টি.এস. পদ্ধতিতে অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ধাতুর ব্যবহার বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ধাতু ঢালাইয়ের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক আলোক চিত্রের সাহায্যে অক্ষরগুলির নেগেটিভের ফটো উঠে যায় বিশেষ ধরণের কাগজের উপর। ১৯৬০-এর দশকে কম্পিউটার সহযোগে পি.টি.এস. পদ্ধতি উদ্ভাবিত

হলে বিশ্বের সর্বত্র তা জনপ্রিয় হয়। দ্রুত এবং ঝকঝকে কম্পোজের জন্য এর কদর বাড়ে সংবাদপত্র গুলিতে। ১৯৭০-এর দশক থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি পি.টি.এস. পদ্ধতি চালু করে দেয়।

পি.টি.এস. যেমন কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে, তেমনি মুদ্রণের ক্ষেত্রে নতুন পর্ব শুরু হয় অফসেট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মেটাল কম্পোজিং করেও অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা হয়, কিন্তু তা খুব পরিচ্ছন্ন হয় না। অফসেটে ছাপা হয় অনেক ঝক ঝকে। ফটোগ্রাফ ছাপাও এর ফলে সহজ হয়ে গেছে। বর্তমানে সংবাদপত্রগুলিতে এসে গেছে ডি.টি.পি. (ডেস্ক টপ্ পাবলিসিং)। কম্পিউটারাইজড্ সংবাদপত্রে কাজের চেহারাটা বদলে গেছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে।

গণমাধ্যম প্রযুক্তি শুধুমাত্র গণমাধ্যম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের মধ্যেই সীমায়িত নয়। তার পরোক্ষ প্রয়োগ বহু দূর বিস্তৃত। সর্বোপরি যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির উপর ভিত্তি করেই এতকাল গণমাধ্যম প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম ক্রম বিকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

১১.৪ জ্ঞাপন প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তি

যে প্রযুক্তি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, তাই যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত। অন্যদিকে যে প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রক্রিয়ণ (Processing) বা তথ্য প্রেরণের কাজে ব্যবহার করা হয় তাই চলতি কথায় তথ্যপ্রযুক্তি। এক্ষেত্রে অবশ্য একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য চিহ্নিত করা যায়। যেমন কম্পিউটারে যখন তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়ণ করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার তথ্যপ্রযুক্তির অংশ। কিন্তু যখন সেই কম্পিউটার একটি নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হয় তখন তথ্য বিনিময় করা সম্ভব হয়। ফলে কম্পিউটার যখন নেটওয়ার্কে যুক্ত তখনই তা প্রকৃত অর্থে যোগাযোগ প্রযুক্তির অংশ। অর্থাৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় যে প্রযুক্তির মারফত তথ্য বা সংবাদ, কোন বার্তা, ছবি, সংকেত ইত্যাদি আদান-প্রদান করা যায় তাই হোল যোগাযোগ প্রযুক্তি। তবে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা তথ্যপ্রযুক্তি আমরা প্রায় সম অর্থে ব্যবহার করে থাকি।

১১.৫ জ্ঞাপন প্রযুক্তি

জ্ঞাপন ব্যবস্থায় সম্প্রসারণে প্রযুক্তিগত বিকাশের দিক থেকে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার আবিষ্কার। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ক্লদ চ্যাপে ১৭৯১ সালে উদ্ভব করেন অপটিক্যাল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে বড় বড় টাওয়ারের উপর সাংকেতিক বার্তাগুলি পড়া হতো টেলিস্কোপের সাহায্যে। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে। টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের সূত্র ধরেই শুরু হয়েছিল দূরসঞ্চার প্রযুক্তির।

চ্যাপের টেলিগ্রাফ থেকে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার — দূর সঞ্চারের ক্ষেত্রে ছিল এব বড় উলম্ফন। সময় ১৭৭৪ সাল অর্থাৎ রামমোহন রায় যে বছর জন্মগ্রহণ করছেন সেই বছর, জার্জস লিৎসজ নামে এক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নিয়ে প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। স্যামুয়েল ব্রিড মোর্স উদ্ভাবিত মোর্স টেলিগ্রাম পদ্ধতিতে ১৮৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী আমেরিকার ওয়াশিংটন থেকে বার্লিমোরের সঙ্গে বার্তা বিনিময় শুরু হয়। এর পর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটেছে দ্রুত। আমাদের দেশে ১৮৩৯ সালে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার অভিমুখে তেত্রিশ কিমি. টেলিগ্রাফ লাইন পাতা হয়েছিল। ১৮৫৫ সালেই এদেশে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খুলে দেওয়া হয় জনসাধারণের জন্য। ১৮৬৭—৭০ সালের মধ্যে একটি জার্মান কোম্পানী লন্ডন, এমডেন, বার্লিন, ওয়ারশ, ওডেসা, তেহরান, করাচি, আগ্রা ও কলকাতার মধ্যে টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক সম্পন্ন হয়ে যায়।

টেলিগ্রাফ ভৌগোলিক ও সময়ের ব্যবধানকে কমিয়ে দিল। বিশেষত অর্ন্তমহাদেশীয় ও আন্তঃ রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। টেলিগ্রাফ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সংবাদ সংস্থগুলি সংবাদ বাজারকে সারা বিশ্বের ছড়িয়ে দিয়েছিল।

টেলিপ্রিন্টার ঃ

যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আরো এগিয়ে দেয় টেলিপ্রিন্টারের আবিষ্কার। এই যন্ত্রের এক প্রান্তে যখন হরফ টাইপ করা হবে অন্য প্রান্তে তখন ঠিক তেমনি হরফ ফুটে উঠবে। উল্লেখ্য, ১৮৯৪ সালে অস্ট্রিয়ায় প্রথম টেলিপ্রিন্টারের মডেল নির্মিত হয়। বর্তমানে চালু হয়েছে ইলেকট্রনিক টেলিপ্রিন্টার। সংবাদ মাধ্যমকে সংবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে সংবাদ সংস্থাগুলি তিরিশের দশক থেকে টেলিপ্রিন্টার ব্যবহার শুরু করে।

ফটোগ্রাফি ঃ

'ফটোগ্রাফি' শব্দ এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ 'ফেটোস' (আলো) এবং 'গ্রাফোস' (আলো) থেকে। অর্থাৎ আলো দিয়ে লেখা। জোসেফ এন নিপসে এবং লুই জ্যাক মান্দে দাগুয়রে নামে দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফির সাহায্যে কোন কিছুর প্রতিকৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তবে আধুনিক ফটোগ্রাফি সম্ভব হয়েছিল সেলুলয়েড ফিল্ম আবিষ্কারের সূত্রে (১৮৬১)। ১৯১২ সালে চালু হয় স্পিডগ্রাফিক প্রেস ক্যামেরা। ১৯২০ সালের পর চালু হয় ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম ব্যবহারযোগ্য লাইকা ক্যামেরা। ১৯৩৫ সালে ইষ্টম্যান কোডাক কোম্পানী রঙিন ফিল্ম উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে শুরু হয়েছে ফিল্মহীন ডিজিটাল ক্যামেরাও। এরকম স্থীর ফটোগ্রাফি মুদ্রণ মাধ্যম প্রভূত উপকৃত করেছে। এ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ইতিবাচক সাফল্য পেয়েছে মুদ্রণ মাধ্যম।

টেলিভিশন ঃ

এ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী গণমাধ্যম, টেলিভিশন। টেলিভিশন হল দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম। টেলিভিশনের জনক জন লোগি বেয়ার্ড টেলিভিশনের প্রয়োগকে দিকটিকে প্রথম সফলভাবে তুলে ধরতে পেয়েছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে একক ভাবে তিনিই টিভির আবিষ্কর্তা নন।

প্রকৃতপক্ষে তিরিশের দশক থেকেই টেলিভিশন নিয়ে গণমাধ্যমের সূত্রপাত। ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে টিভি সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। ব্রিটেনে ১৯৩৫ সালে এবং আমেরিকায় ১৯৩৯ সালে টিভি. সম্প্রচার শুরু হয়। ষাটের দশক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টিভি. সম্প্রচার শুরু হয়। আমাদের দেশে দূরদর্শন চালু হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে।

১১.৬ উপগ্রহ চ্যানেল

টেলিসম্প্রচার প্রযুক্তিতে বিকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তগারী ছিল কৃত্রিম উপগ্রহের আবিষ্কার। কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সিক্লার্ক কৃত্রিম উপগ্রহের ধারণা দেন। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ঐ উপগ্রহের কাজ হচ্ছে রিলে সেন্টারের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পাঠান তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণ করে উপগ্রহ তা আবার ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছে দেয়। একেই বলে জিও স্টেশনারী বা ভূ-স্থানিক উপগ্রহ।

সরাসরি সম্প্রচার যোগ্য উপগ্রহ ঃ

সরাসরি সম্প্রচারযোগ্য উপগ্রহ বা ডিরেক্ট ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইটের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের কাজের ধরনের কিছু ফারাক আছে। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় দুটি স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য। যেমন

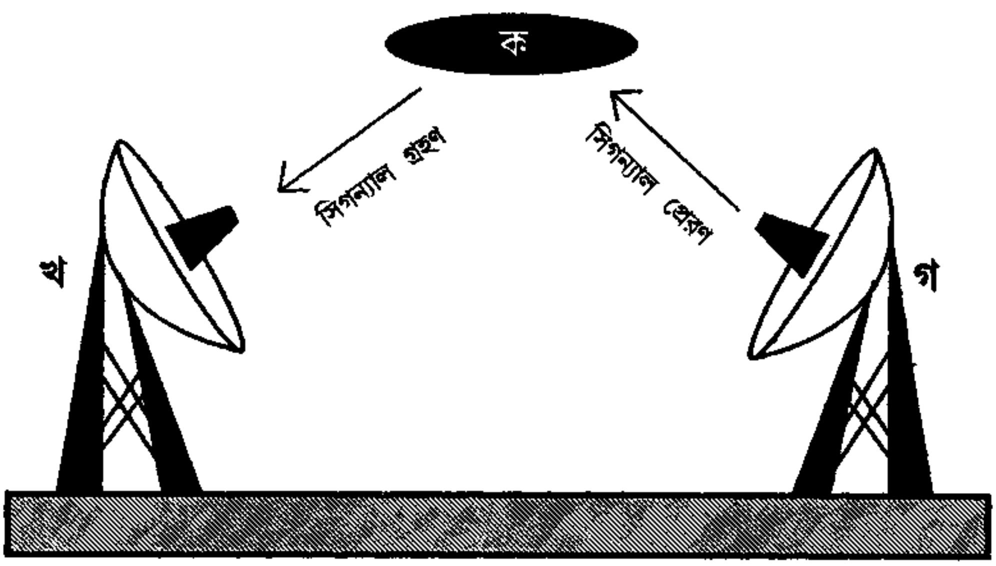

উপগ্রহ সম্প্রচার ঃ (ক) কৃত্রিম উপগ্রহ, (খ) আর্থ স্টেশন, যা সম্প্রচার তরঙ্গগ্রহণ করছে, (গ) আপলিঙ্ক ষ্টেশন, যা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছে দিচ্ছে।

দিল্লী দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে কৃত্রিম উপগ্রহ পৌঁছে দিল গলফ্ গ্রীনের কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে। সেই তরঙ্গ ধরার জন্য কলকাতা আছে আর্থ স্টেশন।

ডি.বি.এস-এর ক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ট থেকে তরঙ্গ পাঠানো হয় উপগ্রহের দিকে। কিন্তু ফেরত আসা তরঙ্গ গ্রহণ করার জন্য কোন বিশেষ আর্থস্টেশন প্রয়োজন হয় না। ডি.বি.এস.-এর পাঠানো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এতটাই শক্তিশালী যে বাড়ির ছাদে বসানো ডিশ অ্যান্টেনাই যথেষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা জরুরি 'ট্রান্সপন্ডার' এর বিষয়টি। কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণ ও প্রয়োজনে তাকে বিবর্ধিত করে এবং কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে ভূ-পৃষ্টে ফেরত পাঠানোর কাজ করে ট্রান্সপন্ডার। এটি একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবস্থা। ট্রান্সপন্ডার ভূ-পৃষ্ঠের উপর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ফেরত পাঠায় অনেকটা জায়গা জুড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে ফলে 'ফুটপ্রিন্ট' এলাকা। এই ফুটপ্রিন্টের মধ্যে যে-কোন জায়গায় ডিশ অ্যান্টেনা চালু করলেই ট্রান্সপন্ডারের পাঠানো তরঙ্গ ধরা সম্ভব হয়।

১১.৭ কেবল টি.ভি.

উপগ্রহ টি.ভি. ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে কেবল্ টিভি-র ক্ষেত্রেও আমেরিকার পেন্সিল ভ্যানিয়ার মাহানোভ শহরে ১৯৪৮ সালে প্রথম কেবল্ টি.ভি. চালু হয়। সত্তর দশক থেকে উপগ্রহ সম্প্রচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কেবল্ টি.ভি.-র প্রসার পরিধি বেড়েছে। আমাদের যত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কেবল্ টি.ভি. চালু হয়েছে উপগ্রহ সম্প্রচারের সূত্রে। উল্লেখ্য, ডিরেক্ট-টু-হোম (ডি.টি.এইচ) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেবল্ টি.ভি.-কে তারহীন ব্যবস্থার রূপান্তর করা আজ আর অসম্ভব নয়।

১১.৮ কম্পিউটার প্রযুক্তি

কম্পিউটার এবং কম্পিউটার বাহিত যোগাযোগ জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে গুণগতভাবে। তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রক্রিয়ণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সম্পূর্ণ নতুন পর্বের সূত্রপাত করে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কই সম্ভব করল যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে কম্পিউটারের প্রয়োগকে। কম্পিউটারের সঙ্গে টেলিযোগাযোগের সমন্বয় ও সংযোগই গড়ে তুলেছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এখন এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহারও। শুধু আন্তঃরাষ্ট্রীয় নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে কম্পিউটার গুলির মধ্যে সংযোগসাধনের কাজ করছে এই ধরণের উপগ্রহ। এভাবেই সম্ভব হয়েছে আজকের 'ইন্টারনেট'।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ও তার প্রসার সৃষ্টি করেছে বিভ্রান্তিও। প্রযুক্তির সামাজিক ভূমিকা ও সামাজিক বিকাশে সমাজ ও সামাজিক বিকাশের ভূমিকা কী হবে — এ প্রশ্ন উঠেছে নানা স্তরে। প্রযুক্তিগত আধিপত্যবাদের সমর্থকরা বলেন, প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ ও গণমাধ্যম প্রযুক্তি নিজে সমাজ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁরা আরও বলছেন, এই প্রযুক্তি সামাজিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব নিরুপণেও চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছে।

কিন্তু স্যাটেলাইট টি.ভি. নিজেই পৃথিবীকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' করে দিতে পারে না। কারণ, প্রযুক্তি ব্যবহারের আর্থিক সামর্থ্য লাভ প্রযুক্তি আবিষ্কার হলেই হয়না; তার জন্য দরকার আর্থিক সামর্থ্য।

১১.৯ কনভার্জেন্স

সংবাদ অভিধানে ইংরেজি 'কনভার্জেন্স' শব্দটির বাংলা অর্থ 'সমকেন্দ্রা-ভিমুখতা' বা 'সমকেন্দ্রিকতা'। 'মিডিয়া' এখন এই 'সমকেন্দ্রিকতা'-র কল্যাণে মাল্টিমিডিয়া—মাধ্যমের বহুত্ব।

১৯৭০-এর দশকে কম্পিউটার যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন সেটি ছিল মূলত 'ডেস্ক টপ পাবলিশিং' প্রযুক্তি মাত্র। কিন্তু কনভার্জেন্সের ফলে আজ সে ধারণার বদল ঘটেছে। টেলিযোগাযোগ, মিডিয়া এবং কম্পিউটারের মধ্যে প্রচলিত বিভাজন ঘুচে যাচ্ছে — পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গীকৃত হয়ে গেছে তারা। বাড়ির পার্সোনাল কম্পিউটারে একসঙ্গে গানশোনা, সিনেমা দেখা, নিজের কোন নোট কম্পোজ করা, আবার একই সঙ্গে ফোন, ইন্টারনেট সংস্থা সবই সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটার কেন্দ্রিক কনভার্জেন্সের আরো বহু ব্যবহারিক দিক রয়েছে। সম্ভব হয়েছে তথ্য আদান-প্রদান ও তথ্য সংরক্ষণ। এছাড়া পৃষ্ঠা সজ্জা (Lay outs), সংবাদ রচনা (News Compose), বিভিন্ন গ্রাফিক্স তৈরি করা এবং সংবাদচিত্র স্ক্যান করা তার আউটপুট বের করা — এসবই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে।

সুতরাং কম্পিউটার আজ শুধুমাত্র ডেস্কটপ প্রযুক্তি নয়, একই সঙ্গে তা বহুমুখী কর্মকান্ডকে সম্ভব করেছে। একই কেন্দ্রে বহুমুখী কর্মকান্ডই হল কনভার্জেন্স। সময় ও ভৌগোলিক দূরত্ব প্রায় মুছে যাচ্ছে প্রযুক্তির উপস্থিতিতে।

১১.১০ গণজ্ঞাপনের দিন কী শেষ?

যখন আকাশবাণীর সংবাদ-দাতা খবর পড়েন বা সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা পাঠকদের উদ্দেশ্যে যে সংবাদভাষ্য রচনা করেন, তখন তাঁর সামনে কোন পাঠকের মুখ থাকেনা বা কোন শ্রোতার ছবি চোখে ভাসেনা। তাঁরা

যে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁদের বার্তা রচনা করেন সেই জনসাধারণ বিমূর্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিশাল এলাকা জুড়ে তাদের বসবাস এমনকি তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীও হতে পারেন।

প্রতিবার্তা (feed back) ঃ

প্রেরকের বার্তা যখন গ্রাহকদের কাছে এসে পৌঁছয় তখন সেই বার্তায় উদ্দীপ্ত হয়ে গ্রাহক প্রেরকের কাছে তার যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সেটাই হল প্রতি-বার্তা। এই প্রতিবার্তা দু'রকমেরই হতে পারে — তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা ও বিলম্বিত প্রতিবার্তা। মুখোমুখি জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায়। গ্রাহক যখন বিমূর্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন তখন প্রতিবার্তা বিলম্বিত হয়।

কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি বেতার বা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে টেলিফোন মারফত প্রতিবার্তা গ্রহণ করা হচ্ছে। বলা যেতে পারে এ ধরনের জ্ঞাপনপ্রক্রিয়া দৈনন্দিন কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। আর এ ধরনের জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে গণজ্ঞাপন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। জ্ঞাপনের সংজ্ঞানুসারে তা একান্ত জ্ঞাপন। একান্ত জ্ঞাপন পদ্ধতি হল সেই জ্ঞাপন পদ্ধতি যেখানে বক্তা ও শ্রোতা মুখোমুখি থাকে। বহু ক্ষেত্রে গ্রাহক বা শ্রোতা প্রতিবার্তা প্রকাশের সুযোগ পান। শ্রোতা এখানে বিমূর্ত নয়। জ্ঞাপনের এই প্রক্রিয়া গণজ্ঞাপনের সংজ্ঞা বদল করতে বাধ্য।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, শুধু চোখে দেখে বা কানে শুনে জানার শেষ হয় না। পড়াশুনো অভ্যাস আমাদের ধারাবাহিত ঐতিহ্য। ফলে মুদ্রণ মাধ্যম মারফত গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া থাকবে। তাছাড়া তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা প্রেরণের সুযোগ সবার নেই। অন্তত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তো বটেই।

১১.১১ সারাংশ

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির তফাত তেমন নেই। বলা যেতে পারে উভয়ের মানুষের চাহিদা পূরণে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপগ্রহ চ্যানেল, কম্পিউটার এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি তথ্যের আদান প্রদানে যেমন, তেমন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দিনদিন বদলে যাচ্ছে গণজ্ঞাপণ প্রক্রিয়ার বিন্যাস। প্রযুক্তির ক্রমউন্নতি আদতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বেশি বেশি মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি।

১১.১২ অনুশীলনী

- **সংক্ষিপ্ত নোট ঃ**

১. যোগাযোগ প্রযুক্তি. গণমাধ্যম প্রযুক্তি, পি.টি.এস. পদ্ধতি, জিও স্টেশনারী উপগ্রহ, ট্রান্সপন্ডার।

- **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. যোগাযোগ প্রযুক্তি কী? যোগাযোগ প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তির পার্থক্য আছে কী?

২. যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে?

৩. টেলিপ্রিন্টার, টেলিগ্রাফ কীভাবে মুদ্রণ মাধ্যমে সহায়ক হয়েছে?

৪. উপগ্রহ মারফত কীভাবে সম্প্রচার করা হয়?

৫. কনভার্জেন্স কী? যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য লেনদেন ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে?

২. আধুনিক প্রযুক্তি মুদ্রণ ব্যবস্থার চেহারাটাই বদলে দিয়েছে — একথা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

৩. প্রাক্ কৃত্রিম উপগ্রহ এবং উপগ্রহ পরবর্তী জ্ঞাপন প্রযুক্তির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. "কৃত্রিম উপগ্রহ চ্যানেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গুণগতভাবে বদলে দিয়েছে"—উপগ্রহ কিভাবে সম্প্রচার তরঙ্গ পাঠায়? যোগাযোগ ব্যবস্থা উপগ্রহ মারফত কতটা উপকৃত হয়েছে?

১১.১৩ পরিভাষা

■ Electronic Mail — ই-মেল/ই-মেইল

■ Media — গণমাধ্যম

■ Processing — প্রক্রিয়ণ

■ Direct Broadcasting Satellite — সরাসরি সম্প্রচার যোগ্য উপগ্রহ

■ News Compose — সংবাদ রচনা

■ Lay outs — পৃষ্ঠা সজ্জা

১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ ঃ**

১. তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন — সৌমিত্র লাহিড়ী ও মানসপ্রতীম দাস, সম্পাদিত, একুশশতক।

২. Satellite invasion of India — S. C. Bhatt

৩. India's Communication Revolution : From Bullock early To Cyber Marts — Arvind Singhal, Everett M.Rogers

৪. টেলি প্রজন্মের সংস্কৃতি — ড. অঞ্জন বেরা, দেজ প্রকাশন।

৫. গণজ্ঞাপণ — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৬. Mass Communication In India — Keval J. Kumar, Jaico Publication House.

৭. Sattellite Invation of India — S. C. Bhatt.

■ **সহায়ক পাঠ্য ঃ**

১. Satellites Over South Asia — David Pages William Crowliy

২. Electronic Convergence — Hukul-Ono-Vallath.

একক ১২ □ ইন্টারনেট

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য
১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ ইন্টারনেট
১২.৩ ইন্টারনেট কেমন করে এল?
১২.৪ ইনফরমেশন সুপার হাই ওয়ে
১২.৫ প্রয়োগ ক্ষেত্র
১২.৬ ইন্টারনেট সার্ভিস দেয় কিভাবে?
১২.৭ ইন্টারনেট ও অসুবিধা
১২.৮ সারাংশ
১২.৯ অনুশীলনী
১২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১২.০ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ছাপ ফেলেছে। তাছাড়া ব্যবসাবাণিজ্যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায়, প্রকাশনায়, শিল্পচর্চা, বিনোদন ইত্যাদিতেও ইন্টারনেট নিজেকে অপরিহার্য করে তুলছে। কিন্তু ইন্টারনেট একটি জটিল ব্যবস্থা। এই জটিল ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

১২.১ প্রস্তাবনা

ইন্টারনেট যেভাবে শুরু হয়েছিল, আজ তার ছবিটাই বদলে গেছে। নেট ব্যবহারকারীদের যৌথ শিক্ষা, রুচি ও প্রবণতা নিয়ে দিন-দিন তিল-তিল করে গড়ে উঠছে ইন্টারনেট চরিত্র। এই ব্যবস্থা অগ্রসর দেশগুলির ব্যবসা বাণিজ্যের প্রকরণে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে।

ছোট বড় নানা ধরনের কম্পিউটার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখন জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে, তা মাকড়সার জালের মতো ঘিরে ফেলেছে প্রায় সারা পৃথিবীকে। কিন্তু এই ইন্টারনেট গড়ে তুলেছেন বহু মানুষ।

তাঁদের বুদ্ধি, শ্রম সমৃদ্ধ করেছে এই ব্যাপক ব্যবস্থাকে। পৃথিবী জুড়ে বিপ্লব এনেছে ইন্টারনেট। এর প্রভাব পড়ছে আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে। ডাক-ব্যবস্থার মতোই ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন বহু মানুষের রোজকার অভ্যাস হয়ে গেছে।

১১.২ ইন্টারনেট (নেট)

বিভিন্ন ধরনের তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থায় অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা 'নেটওয়ার্ক অব্ নেটওয়ার্ক বা 'ইন্টারনেটওয়ার্ক' অথবা, সংক্ষেপে ইন্টারনেট নামে পরিচিত। এই নামটির আরও সংক্ষিপ্ত প্রচলিত রূপ হল 'নেট'।

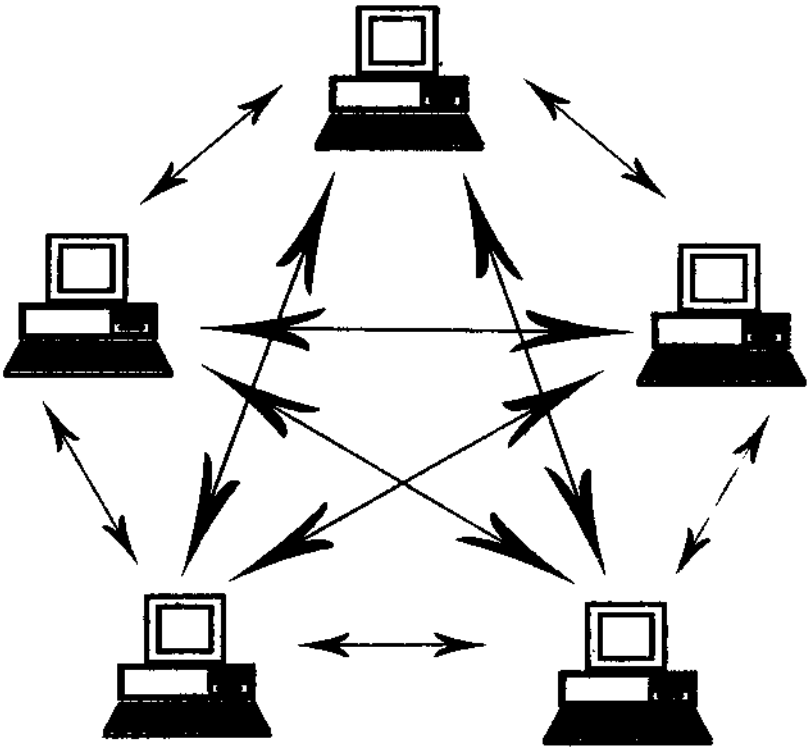

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

ইন্টারনেট কি যন্ত্র, কম্পিউটার?

ইন্টারনেট কোন যন্ত্র নয়, কম্পিউটার নয়, কম্পিউটার প্রোগ্রাম নয়, নয় কোন হার্ডওয়্যার বা সফ্ট ওয়্যার। উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ই ইন্টারনেটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু কোন একটিকে একক ভাবে চিহ্নিত করে বলা যাবে না যে এটাই ইন্টারনেট। আসলে ইন্টারনেট হল এ সব কিছু মিলেমিশে তৈরি হওয়া তথ্য আদান-প্রদানের একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা 'নেটওয়ার্ক অব্ নেটওয়ার্ক'।

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গেলে নানা ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম চালাতে হয় তবে ব্যবহারকারা ঠিক কী ধরণের প্রোগ্রাম চালাবেন সেটা নির্ভর করে তাঁর প্রয়োজনের ধরনের ওপর। পৃথিবীর নানা প্রান্তের অসংখ্য ব্যবহারকারী একই সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।

সুতরাং 'ইন্টারনেট' বলতে শুধু 'ইন্টারকানেক্টেড' কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বোঝায় না। তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে অসংখ্য ব্যবহারকারী, তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও বিশাল তথ্যভান্ডার।

১২.৩ ইন্টারনেট কেমন করে এল?

প্রযুক্তির গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠে 'অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি' বা সংক্ষেপে 'আরপা'। সংস্থার কম্পিউটার দপ্তর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জে.সি.আর. লিকালাইডার। তিনি কম্পিউটারের সঙ্গে কম্পিউটার জুড়ে এক নতুন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন।

এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে 'প্যাকেট সুইচিং' ব্যবস্থা। প্যাকেট সুইচিং-এর পথিকৃৎ লিওনার্ড ক্লাইনরক ১৯৬২ সালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তার দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পল ব্যারন এক নথিপ্রকাশ করে পরমাণু যুদ্ধের পরিস্থিতি যোগাযোগ ব্যবস্থায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেন।

তার বক্তব্য অনুযায়ী, অনেকগুলো কম্পিউটার যদি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়, তাহলে যুদ্ধের সময় নেটওয়ার্কের কোন অংশ ধ্বংস হয়ে গেলেও নেটওয়ার্কের বাকি অক্ষত অংশ দিয়ে অনায়াসে তথ্য আদানপ্রদানের কাজ চলতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নেটওয়ার্কের কোনও সেন্ট্রাল কম্পিউটার নেই, কোন হেড কোয়ার্টারও নেই এবং সর্বপরি এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র একটা কম্পিউটার নির্ভর না, ফলে একে পুরোপুরি ধ্বংস করা প্রায় অসম্ভব।

এইভাবে শুরু হল প্রজেক্ট 'আরপানেট'। ক্লাইনরকের কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ডগলাস এঙ্গেলবার্টের কম্পিউটার। ১৯৬৯ সালে এই দুটি কম্পিউটারের মধ্যে সফলভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হল। আর তখনই তৈরি হল পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

১২.৪ ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে

ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে কি সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে উইলিয়ম এইচ. ডাটন (William H.Dutton) তাঁর " 'The Politics of Information and Communication Policy' : The Information Superhighway" গ্রন্থে লিখেছেন যে, "The information superhighway can be defind as an information and communication technology network, which delivers all kinds of electronic services — audio, video, text and data — to household and business."

ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ইন্টারনেট। আর এই বিচারে বলা যায় যে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের শুরু মার্কিন সংস্থা আরপা নেটের হাত ধরেই। পরবর্তীকালে ১৯৮০-এর দশকে 'ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (NSFNET) করলেন, ইলিনয়েজ (Illinoise), পিটস বার্গ (Petts burg) এবং সান-দিয়ে-গো (Sun-Die-go) তে তাদের নেটওয়ার্ক চালু করে। ফলে বহুগবেষক তাদের গবেষণা-সংক্রান্ত কাজ কর্ম প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাবার সুযোগসুবিধা লাভ করেন। তাছাড়া এই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি

সংস্থা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৯২ সালে 'ন্যাশনাল এডুকেশন এবং রিসার্চ নেটওয়ার্ক' বা 'Enhance Internet' অনেক বেশি এবং বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ চালু করে। এমনকি নেটওয়ার্ক মারফত মোশন ভিডিও আদান-প্রদান শুরু হয়। ডাক্তাররা নানা দেশে তাদের পরিচিত সঙ্গীদের কাছে X-Ray, Cat-Scan পাঠাবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করলেন। ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে লাগলেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এমনকি বইয়ের বিষয়বস্তু এবং বই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হতে লাগল ইন্টারনেট মারফত। স্যাটেলাইট টেলিফোনের সাহায্য নিয়ে চাষী ও আবহাওয়া বিদ্‌দের কাছে আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, ঝড় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য এবং সেই সঙ্গে ছবি সরবরাহ ইন্টারনেট জগতের এক বড় উলম্ফন।

১২.৫ প্রয়োগ ক্ষেত্র

অতএব উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা গেল যে যতদিন যাচ্ছে ততই ইন্টারনেটের প্রয়োগক্ষেত্র উর্দ্ধমুখী। ইন্টারনেটের প্রতিদিন যেসব ধরনের তথ্য আদান-প্রদান হয় তার কয়েকটি হল —

১) পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে খবর সংগ্রহ।

২) বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র পড়া এবং প্রয়োজনে তা সংগ্রহ করা।

৩) ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা।

৪) চিঠিপত্র আদান-প্রদান।

৫) ইন্টারনেট বন্ধুত্ব বা সংক্ষেপে 'নেটফ্রেন্ড'।

৬) অন্যান্য বিনোদন।

ইন্টারনেট ও গণমাধ্যম ঃ

ইন্টারনেট চালু হবার পর সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন অন্ লাইন সংস্করণ। ইন্টারনেট এমন একটি নেটওয়ার্ক যা একই সঙ্গে মাধ্যম এবং তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেট সূত্রে বিশেষ তথ্য ভান্ডারের দুয়ার খুলে গেছে গণমাধ্যম গুলির সামনে। রয়টার, এ.পি., এ.এফ.পি.-র মতো বড় বড় সংবাদ সংস্থা গুলির খবর ও এখন পাওয়া যাচ্ছে ইন্টারনেটে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মাধ্যম হিসবে ব্যবহার করে সংবাদপত্রগুলি করছে অন্‌লাইন সংস্করণ। অনলাইন সংস্করণ কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখা যায় এবং পড়া যায়। বলা যেতে পারে এ এক কাগজহীন খবরের কাগজ। আমাদের দেশে বড় বড় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি অন্‌লাইন সংস্করণ প্রকাশ করছে।

১২.৬ ইন্টারনেট সার্ভিস দেয় কীভাবে?

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে যদি আমরা 'ক্লায়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করি তাহলে যে কম্পিউটারের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট ইন্টারনেটে যুক্ত হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা সংক্ষেপে সার্ভার। বলা বাহুল্য সার্ভার যুক্ত ক্লায়েন্টের সংখ্যা কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে।

ইন্টারনেটে যুক্ত প্রত্যেক ক্লায়েন্ট তার সার্ভারের মাসিক অথবা বাৎসরিক হারে ফি দেন। এর ফলে ক্লায়েন্টের

মাথা পিছু খরচও কমে যায়। ক্লায়েন্ট হতে চাইলে কোন সার্ভারকে ডায়ালিং। সফ্‌টওয়্যারের সাহায্যে ফোন করলে সার্ভার সামান্য খরচে ইন্টারনেট সংযোগ ভাড়া দেন।

পাঁচটি জিনিস ঃ

তবে ইন্টারনেটে যোগ দিতে হলে দরকার পাঁচটি জিনিস। সেগুলি হল —

১) একটি টেলিফোন

২) একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার

৩) একটি মোডেম

৪) টেলি কমিউনিকেশস্‌ সফ্‌টওয়্যার

৫) ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কম্পিউটারে সঞ্চিত তথ্য চার রকমের হতে পারে — 'অডিও', 'ভিডিও', 'টেক্সট' ও 'গ্রাফিক্স'। অর্থাৎ সার্ভার তার ক্লায়েন্টদের এই চার ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে।

১২.৭ ইন্টারনেট ও অসুবিধা

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট রমরমা। তাছাড়া ব্যবসাক্ষেত্রে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায়, প্রকাশনার ক্ষেত্রে, শিল্পচর্চায়, বিনোদন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ইন্টারনেট নিজেকে জরুরি বলে প্রমাণ করেছে।

পশ্চিমে অবস্থাটা অনেকটা এরকম হলেও ভারতে ইন্টারনেটের জনপ্রিয় এখনও অনেক পিছিয়ে। অবশ্য এর পিছনে নানা কারণ বর্তমান —

শিক্ষার হার —

ভারতে সাক্ষরতার হার শতকরা প্রায় ৫২। এর মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষিতের হার স্বভাবতই অনেক কম। ফলে ভারতের বিপুল জনসংখ্যার সামান্য অংশই ইন্টারনেট ব্যবহার করার শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে।

খরচ —

ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ক্লায়েন্ট হতে লাগে প্রচুর অর্থ। কম্পিউটার এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশের জন্য খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৫০,০০০ টাকা। তার সঙ্গে যুক্ত হবে ভি.এস.এন.এল. নির্ধারিত খরচ। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে এই অর্থ খরচ করার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। সুতরাং যতদিন না পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহার সর্বার্থে জনগণের নাগালে আসছে ততদিন পর্যন্ত এদেশের সমাজ ও জীবনে ইন্টারনেট জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম।

ইতিবাচক আশা ঃ

তবে যে, দ্রুত হারে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের দাম কমছে তাতে কয়েক দশকের মধ্যেই বর্তমান চেহারাটা বদলে যেতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয়। ফলে এখনও পর্যন্ত ইন্টারনেটের ব্যবহার প্রধানত বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞান প্রযুক্তির ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এছাড়া কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। তবে

কিছু কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারনেট কাফে' খোলার কথা ভাবছেন। এমন হলে সেখানে যে কোনও ব্যবহারকারী স্বল্প খরচে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

১২.৮ সারাংশ

'নেটওয়ার্ক অব নেটওয়ার্কস' আজ ইন্টারনেট হিসেবে চিহ্নিত। এই ব্যবস্থার প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তৃত। তথ্য, ডাটা থেকে বিনোদন সর্বত্র ইন্টারনেটের বিচরণ ক্ষেত্র। গবেষক, লাইব্রেরিয়ান, ব্যবসাদার প্রত্যেকের কাছে ইন্টারনেট সহায়ক হয়েছে।

১২.৯ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১. ইন্টারনেট কী?

২. ইন্টারনেট কি যন্ত্র না কম্পিউটার?

৩. কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়?

৪. তুমি কিভাবে ইন্টারনেট সার্ভিস পেতে পার?

৫. উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেটের সার্বিক ব্যবহারে কী কী বাধা দূর করা দরকার?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১. ইন্টারনেট কী? কোন লক্ষ্যপূরণকে সামনে রেখে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হয়?

২. প্রেক্ষাপটসহ ইন্টারনেটের আবির্ভাব — ইতিহাস লেখ।

৩. ইন্টারনেট যন্ত্র নয় ব্যবস্থা — উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। এই ব্যবস্থা কিভাবে সার্ভিস দেয়?

৪. উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট জরুরী — এবিষয়ে আপনার মতামত দিন? কিভাবে এই ব্যবস্থা চালু করা যাবে বলে আপনি মনে করেন।

৫. ভারতে ইন্টারনেটে কি ধরনের ভূমিকা নিতে পারে? ইন্টারনেটের সার্বিক প্রয়োগ এদেশে কোন কোন স্তরে বাধা রয়েছে?

৬. সাংবাদিকতায় ইন্টারনেট কিভাবে সহায়ক হয়েছে?

৪.৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

■ অবশ্য পাঠ :

১. তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন — সম্পাদনা, সৌমিত্র লাহিড়ী ও মানসপ্রতীম দাস।

২. India's Communication Revolution : From Bullock Carts To Cyber Marts — Arvind Singhal, Everett M.Rogers.

৩. Mass Communication in India — Keval J. Kumar.

৪. (The) How and Why of internet — Arora, Pawan.
৫. The ABC of the internet — Crumlish, Christian
৬. The State of the Cybernation : Cultures political and econimic implications of the interest — Neil Barrett.
৭. History of the Internet : a chronology, 1843 to the present — Christos J.P. Mosehovits.

■ সহায়ক পাঠ্য ঃ

১. Multimedia on the Web — McGloughin Stephen.
২. Cultural treasures of the internet — Clark, Michael.
৩. The internet Book — Comer, Douglas.
৪. Internet : an introduction — Manish Dixit

2

দ্বিতীয় পত্র

একক ১ □ সংবাদ ও প্রতিবেদন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সংবাদ

১.২.১ সংবাদের সংজ্ঞা

১.২.২ সংবাদের উৎস

১.২.৩ সংবাদের সূত্র

১.৩ সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা

১.৩.১ সূচনা বা ইনট্রো করার নিয়ম

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সংবাদ কী ও প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং কাকে বলে এবং সংবাদের রচনাশৈলী বা পদ্ধতিই বা কেমন হবে সে সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার একটি ধারণা হবে।

১.১ প্রস্তাবনা

এই একক পাঠে কিভাবে মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের শুরু থেকেই সংবাদ লেনদেন প্রচলিত হতে থাকে এবং গণমাধ্যমের যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে সংবাদ প্রচার ও পরিবেশনের ধারার কিভাবে বিবর্তন ও পরিবর্তন হয়, সংবাদের উপাদানই বা কী, এর উৎসই বা কী, কত রকম এর প্রকারভেদ, গরম খবর আর নরম খবরের কী পার্থক্য, সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনার ছক কেমন হবে, কিভাবে সংবাদের সূচনা লিখতে হয় যাতে নির্দিষ্ট সংবাদ-সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নের (কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে) উত্তর সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে আপনার যে ধারণা তৈরি হবে তার সাহায্যে আপনি সংবাদ মাধ্যমে, বিশেষত সংবাদপত্রে, নিজের ভাষায় প্রতিবেদন লিখতে সক্ষম হবেন।

১.২ সংবাদ

সংবাদ কী সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই মোটামুটি একটা ধারণা আছে। লোকসমাজে এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির দেখা হলে প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে— কী খবর, কেমন আছেন, অমুক কেমন আছেন, ছেলেমেয়েরা

কে কী করছে? সামাজিক যোগাযোগই তো মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ। তথ্য আদানপ্রদানের যুগ। যে ব্যক্তি, যে গোষ্ঠী বা যে দেশের তথ্যের ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে তত বেশি শক্তিশালী। অর্থাৎ তথ্যই ক্ষমতা। এই তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের রেওয়াজ চিরাগত। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁরা সাংবাদিক, আর যে পেশার মাধ্যমে সংবাদ জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হয় সে পেশার নাম সাংবাদিকতা।

সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশনের বিষয়টি আদিযুগ থেকে চলে আসছে। রামায়ণের দুর্মুখ বস্তুতপক্ষে রামচন্দ্রের সংবাদ সংগ্রাহকের কাজই করেছেন। আর মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সংবাদ সঞ্জয় যেভাবে বিবৃত করেছেন তা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের সমর-সাংবাদিকদের সঙ্গে তুলনীয়। পুরাকালে রাজা-বাদশাদের নিযুক্ত গুপ্তদূত বা চরদের বৃত্তিই ছিল গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা। একালেও বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় গুপ্তবার্তা দফতর বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ কী সে বিষয়ে মোটামুটি সকলেই অবহিত আছেন। আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ায় 'নিউজ রাইটার' বা সংবাদ লেখকের প্রধান কাজই ছিল সরকারি সংবাদ সংগ্রহ করে নথিবদ্ধ করা। সতের দশকের প্রথম দিকে বিত্তবান ইওরোপীয়দের নিজস্ব সংবাদলেখক নিয়োগ করার কথা শোনা যায়। রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এই সংবাদ লেখকরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। ভারতবর্ষে মুঘল আমলে যাঁরা ছিলেন ওয়াকিয়া-নবিস প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন সংবাদলেখক। চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে 'গূঢ়পুরুষদের' উল্লেখ আছে তাঁদের কাজও সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। বিভিন্ন যুগে রাজদরবারে যাঁদেরকে বার্তাবহ বা ঘোষক হিসাবে নিয়োগ করা হত তাঁরাও ছিলেন মূলত সাংবাদিক।

লোকপরম্পরাগত কাহিনী, প্রবচন, কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি সবই মানুষের নিজের জানার ও অপরকে জানানোর আগ্রহ বা কৌতূহলের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর, এই জানা ও জানানোর উপায় ও পদ্ধতিরও সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় রূপান্তর হয়েছে। সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশন শতসহস্র বছরের সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতেই পেশাগত সাংবাদিকতার উদ্ভব। অন্যান্য পেশার মতো এই পেশাও নানা ঘাত-প্রতিঘাত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে আজ এক ঈর্ষণীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর এই পেশায় নিযুক্ত সাংবাদিকরাও আজ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিপ্লব এসেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও সাংবাদিকতার রীতিনীতি ও গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে অর্থাৎ সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের আদব কায়দা। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে প্রতিযোগিতা। পেশা এবং ব্যবসা হিসাবে সাংবাদিকতার ধারা ও প্রকৃতি এবং প্রতিযোগী সংবাদ মাধ্যমগুলির সংবাদ পরিবেশনের প্রণালীও প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে। সময়োপযোগী হওয়ার জন্যই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর তাছাড়া, প্রতিযোগিতার বৃত্তটাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখন যুক্ত হয়েছে কেবল্ বা তারযোগে সম্প্রচার, কমপিউটার-নির্ভর ইনফরমেশন সিসটেম বা তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থা, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বা উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চারণ, ইত্যাদি। সাংবাদিকতার আদর্শ ও নীতি বজায় রেখে, এবং এই কঠিন প্রতিযোগিতার পরিবেশে থেকে, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন খুবই দুরূহ। এই দুরূহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই সাংবাদিক, সাংবাদিকতা ও সংবাদ মাধ্যমের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই সাংবাদিক

ও সংবাদ মাধ্যম সামাজিক দায়িত্বের অংশীদার। জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সঠিক তথ্য ও নির্ভুল সংবাদ ঠিকমতো পরিবেশন করা এবং একই সঙ্গে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা এই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সফল গণতন্ত্র সৎ সাংবাদিকতার ওপরই নির্ভর করে। কারণ, গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে জনমত আর জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস ইত্যাদি সংবাদের মাধ্যমেই জনগণ জানতে পারেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাব বা অবক্ষয়, অর্থনৈতিক অবনতি, বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার অভাব, কুসংস্কৃতি বা কিছু কিছু বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসের মতো সামাজিক অভিশাপ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যচেতনা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার অপ্রতুলতা— সব কিছু বিষয় সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন ও অবহিত করতে পারে সংবাদ মাধ্যম।

সংবাদ মাধ্যমই আবার পারে জনসাধারণকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে। কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ; সমকালীন সাহিত্য, কারুশিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারা ; কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নবতর বিনোদনের আবির্ভাব সবকিছু সম্পর্কেই লোকসমাজকে অবহিত করে সংবাদ মাধ্যম। নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সংবাদ মাধ্যমগুলির মধ্যে থাকলেও সংবাদ মাধ্যম একদিকে সমাজের দর্পণস্বরূপ আর অন্যদিকে সমাজের শিক্ষক।

১.২.১ সংবাদের সংজ্ঞা

সংবাদের সংজ্ঞা কী? কী তার অর্থ? সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী?

আজকের দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিদিত পণ্যগুলির অন্যতম হচ্ছে সংবাদ। প্রতিটি মানুষই কোন না কোন একটি ভাষা জানেন এবং গণমাধ্যমে তাঁর প্রবেশ বা অভিগমন অবারিত। গণমাধ্যমের যুগ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই সংবাদ সম্পর্কিত ধারণা মানুষের মনে ছিল। আদিম সমাজব্যবস্থাতেও গ্রামে গ্রামান্তরে সাপ্তাহিক হাটে বা হাটবারে যখন পণ্য বেচাকেনার জন্য লোকজনেরা মিলিত হতেন তখন তাঁদের মধ্যে স্থানীয় খবরেরও লেনদেন হত। আবার, সাধারণ মানুষকে কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঢোল-শোহরতের প্রচলন বহুযুগ আগেই ছিল। চলতি কথায় এই ব্যবস্থাটিকেই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জারি করা বলা হয়। মোটামুটি ভাবের আদানপ্রদানের শুরু থেকেই খবরের আদানপ্রদান চলছে।

কিন্তু খবর বা সংবাদ কাকে বলে? তার সংজ্ঞাটা কী? সংবাদের সংজ্ঞা সংবাদ নিজেই। অথবা সংবাদ হল সংবাদ। যখন যে ধরনের সংবাদ প্রচারিত বা পরিবেশিত হচ্ছে তখন সেই ধরনটিই সেই সংবাদের সংজ্ঞা। সংবাদের কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। প্রতিনিয়তই সংবাদের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং একইভাবে তার সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত সংজ্ঞার কোনটিই কিন্তু ভুল নয়। কারণ, সংবাদের চেহারা বা চরিত্র বদলেই চলেছে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির যে বিবরণ কোনও না কোন পদ্ধতিতে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় তাই সংবাদ। বিষয়ের এবং পাঠকের বৈচিত্র্যভেদে সংবাদের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি সংজ্ঞারই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সংবাদটি সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বা কৌতূহল থাকা চাই এবং সংবাদটির বিষয়বস্তু নতুন হওয়া চাই। যা আগে সংবাদ হিসাবে অন্য

কোনভাবে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়েছে তা আর নতুন করে সংবাদ গৃহীত বা গ্রাহ্য হবে না ; আর মানুষের তাতে কোনও আগ্রহও নেই।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কুকুর যখন মানুষকে কামড়ায় তখন সেটা কোন সংবাদ নয়। মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা সংবাদ। কোন সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকলেও সংবাদের একাধিক সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সংজ্ঞাগুলি নির্ধারণ করেছেন সাংবাদিক বা সংবাদ বিশেষজ্ঞরাই। অথবা এ বিষয়ে যাঁদের পারদর্শিতা কেবলমাত্র কেতাবি বা পুঁথিগত। এখন দেখা যাক কী ধরনের সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিটি সংজ্ঞারই গুণাগুণ যাচাই করে নিতে হবে। এবং কেবলমাত্র গুণগুলিই মাথায় রাখতে হবে।

১। যে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট সময়োপযোগী এবং বেশ কিছু লোকের তাতে আগ্রহ আছে তাই সংবাদ।

২। গতকালের দুনিয়া ও আজকের দুনিয়ার মধ্যে যে প্রভেদ সেটাই হচ্ছে সংবাদ।

৩। একজন সুদক্ষ প্রতিবেদক যে তথ্য সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট হন ও প্রকাশ করেন এবং তাতে যদি পাঠকের আগ্রহ থাকে তাই সংবাদ।

৪। যথার্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সম্পাদক সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশ করেন তাই সংবাদ।

৫। যে তথ্য পাঠ বা শ্রবণ করে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক সন্তুষ্ট হয় বা উৎসাহিত হয় তাই সংবাদ।

৬। যা চমকপ্রদ বা অভাবনীয় ঘটনা তাই সংবাদ।

৭। জনসাধারণ + ঘটনাবলি + পাঠক বা শ্রোতা-স্বার্থবাহী উপাদান = সংবাদ।

৮। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বা কাহিনীর প্রতিবেদন বা বিবরণ যা একজনের কাছে নতুন তথ্য বলে মনে হল তাই সংবাদ।

৯। ঘটনা বা মতামত, যার সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত তাই সংবাদ।

১০। কারও মতে সঙ্গীত, সুরা ও রমণী হচ্ছে সংবাদের উৎস।

১১। সংবাদ হচ্ছে রমণী, মুদ্রা ও অপরাধের সমান।

১২। সংবাদ বা ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ (NEWS) তা হল North, East, West, South (উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ) অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে সংগৃহীত তথ্য। অর্থাৎ চারিদিকে যা ঘটে চলেছে তাই সংবাদ।

১৩। সেটাই সংবাদ যেটা কেউ গোপন রাখতে চাইছে ; বাকি সবই তো হয় বিজ্ঞাপন, নয় প্রচার।

১৪। জীবন ও জাগতিক বিষয়ের সবরকম বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে যা যা মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে তাই সংবাদ।

১৫। যা কিছু নতুন তাই সংবাদ।

১৬। যা কিছু স্বাভাবিকতা থেকে ব্যতিক্রম তাই সংবাদ।

১৭। সংবাদ হচ্ছে সমসাময়িক ঘটনা, মতামত, চিন্তাভাবনা যা জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে বা সেই অংশের মনে আগ্রহ জাগায়।

১৮। বিশেষ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত যে কোন নতুন তথ্য সেই বিষয়ে আগ্রহী মানুষের কাছে সংবাদ।

১৯। ধর্ম, আভিজাত্য, দারিদ্র্য, অর্থ, যৌনতা ও রহস্যই হচ্ছে সংবাদ।

২০। সংবাদপত্র যা প্রকাশ করে বা রেডিও এবং টেলিভিশন যা প্রচার করে তাই সংবাদ।

সংবাদের সংজ্ঞা, তার অর্থ বা সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী তা মোটামুটি পরিষ্কার। একটা কথা কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে কোন ঘটনা বা কাহিনী বা তথ্য যতই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক হোক না কেন, যতক্ষণ তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বা রেডিও/টেলিভিশনে প্রচারিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা সংবাদ নয়। আর, সংবাদ মাধ্যমে সেটাই পরিবেশিত হয় যেটা সেই মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা সংবাদ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং তা প্রকাশ বা প্রচারের জন্য অনুমোদন করেন। এই কর্তাব্যক্তিরা হচ্ছেন : সম্পাদক, প্রযোজক, 'কপি'-পরীক্ষক, যে সব সাংবাদিকরা সংবাদ বাছাই বাতিল ও পুনর্বিন্যাস করেন। এঁরাই হলেন সংবাদ মাধ্যমের দ্বাররক্ষী বা 'গেটকীপার'। এঁদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং একই সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থ।

সুতরাং এই দুদিকের স্বার্থ বজায় রেখে সাংবাদিককে ঠিক করতে হবে 'সংবাদ কী'? একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে। একজন বিচক্ষণ সাংবাদিককে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। (১) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক কী চান বা কিসে তাঁদের আগ্রহ। এবং (২) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শককে একজন সাংবাদিকের কী দেওয়া উচিত বা কী জানানো উচিত।

সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়? (১) অর্থপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, (২) সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র তুলে ধরা, (৩) মানুষের মতামত, ধ্যানধারণা, নানা বিষয়ে ভাষ্য ইত্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবে মাধ্যমকে গড়ে তোলা, (৪) সমাজের লক্ষ্য কী, মূল্যবোধ কী তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা, (৫) দৈনন্দিন ঘটনাবলি ও তথ্য বিষয়ে মানুষের অবাধ প্রবশাধিকার নিশ্চিত করা, (৬) বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করা, এবং (৭) জনগণের শিক্ষক হিসাবে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও সাক্ষরতা প্রসারে প্রেরণা দেওয়া সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব। তাহলে, সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে এমন সব সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা যাতে মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়, পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকরা সেই সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্বও পালিত হয়। আবার, একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে যে তাঁর পরিবেশিত সংবাদ যেন সত্যনিষ্ঠ হয় এবং কোনরকম একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট না হয়।

১.২.২ সংবাদের উৎস

এই সংবাদ কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা হয় ? বা, এই সংবাদের উৎস কী ? বহতা নদীর মতো সংবাদ বা ঘটনাপ্রবাহের যে অংশটুকু সংবাদ হিসাবে বিবেচিত ও নির্বাচিত হয় তারও একটা উৎস আছে। সংবাদের এই উৎস প্রকটও হতে পারে, অদৃশ্যও হতে পারে। জনসভায় কোন বক্তৃতা, বিধানসভা বা সংসদে কোন ঘোষণা, বার্ষিক বাজেট-বিবরণে কোন বিষয়ে উল্লেখ, সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের তরফে কোন ঘোষণা ইত্যাদি প্রকট বা প্রকাশ্য উৎস থেকে সংবাদ সংগৃহীত হয়। গোপন বা অদৃশ্য উৎস, যেমন

কোন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি নিজের নাম গোপন রেখে কোন তথ্য সাংবাদিককে জানালেন, এর থেকেও অনেক ভালো ভালো, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আহরিত হয়। এই অদৃশ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সংবাদ লেখার সময়, 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়' বলে সাংবাদিকরা উল্লেখ করেন। সংবাদের এই সব গোপন উৎস সম্পর্কে সাংবাদিকদের পূর্ণ আস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া তথ্য কখনোই সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করা উচিত নয়। বিচক্ষণ সাংবাদিকরা সে কথা জানেন। এবং এই ধরনের কোন সংবাদসূত্র কেনই বা কোন তথ্য সংবাদ হিসেবে প্রচারের ব্যাপারে উৎসুক, তাঁর কী স্বার্থ, সাংবাদিককে অভিজ্ঞতার আলোকে তাও যাচাই করে নিতে হয়। এ বিষয়ে সচেতন না হলে সাংবাদিক বিপদে পড়তে পারেন, তাঁর সংবাদ মাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সত্যতা ও উৎসের উদ্দেশ্য যাচাই করার জন্য সাংবাদিকদের খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই একটু সন্দেহবাদী হতেই হয়। সাংবাদিকতার স্বার্থে সেটাই কাম্য।

১.২.৩ সংবাদের সূত্র

নির্দিষ্ট কোন উৎস থেকেই যে সব সংবাদ জানা যায় তা কিন্তু নয়। নানা ধরনের সংবাদের জন্য নির্ভর করতে হয় নানা রকম উৎসর ওপর। সাধারণত, কোন বিশেষ কারণ না থাকলে, কোন উৎস থেকে সংবাদটি সংগৃহীত প্রকাশিত সংবাদে তার উল্লেখ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সরকারি ও পদাধিকারবলে যোগ্য সূত্র থেকে সংগৃহীত সংবাদ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও সংখ্যায়ও অনেক বেশি। এইসব সংবাদ-উৎসকে 'সবল' উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ, যা সাধারণত প্রেস রিলিজ বা ব্রিফিং হিসাবে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়, 'সবল' উৎস হিসাবেই গণ্য হয়। সরকারি 'মুখপাত্র' জানান বলে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় তাও একই পর্যায়ভুক্ত। কোন সরকারি নীতি বা প্রকল্প বা কর্মসূচি ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যরা বা বিভাগীয় সচিবরা সব সময়ই 'সবল' উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক সময় 'সরকারি সূত্র' বা 'প্রামাণিক সূত্র' জাতীয় অভিব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলিকেও মোটামুটি 'সবল' সূত্র বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ততটা সবল নয়।

কিন্তু 'নির্ভরযোগ্য সূত্র', 'জানা গেছে', 'বিশ্বস্ত সূত্র', 'রাজনৈতিক মহল থেকে শোনা', 'পর্যবেক্ষকদের মতে' ইত্যাদি অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গি 'দুর্বল' সংবাদসূত্রের ইঙ্গিতবাহী। সংবাদসূত্র আবার সরকারি ও বেসরকারি দুরকমই হয়। বিধান-সংক্রান্ত, নির্বাহী ও বিচার-সংক্রান্ত বা 'লেজিসলেটিভ', 'এগজিকিউটিভ' ও 'জুডিসিয়ারি' এবং বিভিন্ন সরকার-সংলগ্ন বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সরকারি সূত্র। আর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং নানাধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা হচ্ছেন বেসরকারি উৎস।

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সক্রিয়ভাবে যাঁরা সংবাদ সংগ্রহ করেন তাঁরা হলেন রিপোর্টার বা প্রতিবেদক, নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশেষ সংবাদদাতা, জেলা সংবাদদাতা, বিদেশ সংবাদদাতা ইত্যাদি বা ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন, খেলাধূলা, রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি বিশেষ বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদদাতা। সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করার জনপ্রতিবেদক বা সংবাদদাতারা থানা/পুলিশ, দমকল, হাসপাতাল/অ্যাম্বুলেন্স, আদালত, বিমানবন্দর, বন্দর, খেলার জগৎ, বণিকসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সরকারি দফতর, পুরসভা, পরিবেশ দফতর, আবহাওয়া দফতর ইত্যাদি জায়গায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এটা নিঃসন্দেহে

সাংবাদিকদের নিত্যকৃত্য। আর, এই সমস্ত যোগাযোগের কেন্দ্র ও সেখানকার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংবাদের উৎস বলে বিবেচিত।

এতো সব সত্ত্বেও সাংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ-উৎস হচ্ছে সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ এজেন্সি। প্রকাশিত সংবাদে এই সব সংবাদ সংস্থাকে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাদের নাম সংবাদে উল্লেখ করা হয়। তাই পাঠকরা **পি টি আই, ইউ এন আই, রয়টার, এ পি, এ এফ পি, তাস** ইত্যাদি সংবাদ সংস্থার নামের সঙ্গে পরিচিত। তার বা টেলিপ্রিন্টার যোগে কম্পিউটরের মাধ্যমে দূর দূরান্তে নিযুক্ত সাংবাদিকদের সংগৃহীত সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা দেশে-বিদেশে নানা সংবাদপত্র/সংবাদ মাধ্যমকে পাঠিয়ে দেয়। আর সেই সব সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে দুটি নিউজ এজেন্সি বা সংবাদ সংস্থা আছে— পি টি আই (প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া) আর ইউ এন আই (ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া)। সংবাদ সংস্থাগুলি সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমগুলির কাছে সংবাদ বিক্রি করে। নিজেরা কোন সংবাদপত্র প্রকাশনা করেনা বা নিজেদের অন্য কোন সংবাদ মাধ্যম নেই।

সংবাদ সংস্থা ছাড়া দেশ-বিদেশের রেডিও ও টেলিভিশন শুনে/দেখে সেখান থেকে সংগৃহীত সংবাদ সংবাদপত্রে কখনও কখনও প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ রেডিও ও টেলিভিশনও সংবাদের উৎস হতে পারে। সংবাদ সংস্থাও এই উৎস কাজে লাগায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থার তরফে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে জনপ্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেক সময় সংবাদপত্র অফিসে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট পাঠিয়ে দেন। এগুলিও সংবাদের উৎস হিসাবে গণ্য। আবার, অনেক সময় একজন সাধারণ নাগরিক বা পথচারীও সংবাদের উৎস হতে পারেন। যেমন, কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটলে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করে সেটি জানিয়ে দেন এবং এমন কিছু তথ্য ও আভাস দিয়ে দেন যাতে একজন সাংবাদিক দ্রুত সেই নির্দিষ্ট ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেন এবং ঘটনা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

এছাড়া সংবাদের উৎস হচ্ছে— প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সরকারিভাবে কোন বিবৃতি যদি কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে আসে। এই ধরনের সংবাদ-বিবৃতিকে ইংরাজিতে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট বা প্রেস হ্যান্ড-আউট বলা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্সও সংবাদের অন্যতম এক বড় উৎস। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা কোন পদাধিকারী আগাম ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে পারেন। সাধারণত কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য জনসাধারণকে সংবাদ মাধ্যম মারফৎ জানানোর উদ্দেশ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরও আহ্বায়ক দিয়ে থাকেন। প্রেস কনফারেন্সকে নিউজ কনফারেন্সও বলা হয়।

এছাড়া আছে নিউজ ব্রিফিং। কোন একটি বিষয়কে সংবাদ হিসাবে প্রকাশ বা প্রচার করার জন্য দায়িত্বশীল বা পদাধিকারী কোন ব্যক্তি যখন সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি বিবৃত করেন ও বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দেন তখন সেটিকে বলা হয় নিউজ ব্রিফিং বা প্রেস ব্রিফিং। প্রেস ব্রিফিং অনেকটা প্রেস কনফারেন্সেরই মতো। পার্থক্য খুবই সামান্য। যেমন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করেন, আর তাঁদের সচিবালয়ের কোন প্রতিনিধি বা মুখপাত্র করেন প্রেস ব্রিফিং। একটি দলের সভাপতি করেন প্রেস

কনফারেন্স, আর তাঁর দলের সাধারণ সম্পাদক করেন প্রেস ব্রিফিং। আবার, এই সভাপতিই যখন দলের জাতীয় সম্মেলনের কার্যাবলি সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু বলেন, সেটা হয় প্রেস ব্রিফিং। একইভাবে, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যখন কোন শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন ও সম্মেলনের কার্যাবলি সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন তখন সেটা প্রেস ব্রিফিং বা যদি বিদেশের কোন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী বা উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সে সম্পর্কে কিছু বলেন, সেটাও প্রেস ব্রিফিং। প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস ব্রিফিং-এর মধ্যে পার্থক্য যদি যৎসামান্য, প্রেস কনফারেন্স অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক।

সংবাদের উৎস আরও আছে। যেমন, সাক্ষাৎকার বা ইংরাজিতে যাকে বলে ইন্টারভিউ। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন আগাম-নির্ধারিত জায়গায় সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে জানা ও প্রকাশনার মাধ্যমে তা পাঠক সাধারণকে জানানো হচ্ছে সাক্ষাৎকার। বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও আজকাল সাক্ষাৎকার খুব জনপ্রিয় হয়েছে। একান্ত সাক্ষাৎকার বা একসক্লুসিভ ইন্টারভিউ (অর্থাৎ যা কিনা একজন সাংবাদিকই পেরেছেন, অন্যেরা পারেননি) সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার খুব কদর বাড়ায়।

অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদ, বিধানমণ্ডল, পুরসভা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উৎস। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের নানা স্তরের যে সব আলোচনা সভা হয় সেগুলিও সংবদের উৎস। সংসদের অধিবেশন যখন চলে তখন সরকারের সমস্ত নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে সংসদেই ঘোষণা করতে হয়। রাজ্যস্তরে বিধানমণ্ডলের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং অধিবেশন চলাকালীন সংসদ ও বিধানমণ্ডল সংবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাছাড়া অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদে সমস্ত সাংসদকে ও বিধানমণ্ডলে/বিধানসভায় সমস্ত বিধায়ককে পাওয়া যায়। গোটা দেশের বিভিন্ন এলাকার নানারকম সংবাদের উৎস এসব জনপ্রতিনিধি।

আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-উৎস। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ও বিচারকদের রায় প্রায়শই সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট/হাইকোর্টের কোন কোন মামলার রায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এবং এসব রায়ের ফলে সরকারকে কখনও কখনও তার নীতি বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়।

এছাড়া নানা বিষয়ে নানারকম সম্মেলন, আলোচনাসভা, আলোচনাচক্র বা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা বা কোন শিল্পপতি/বণিকসভার ভোজসভা বা কোন দূতাবাসে নৈশভোজ সবই সংবাদের উৎস। কোন বিষয়ে সমীক্ষা বা তদন্তের রিপোর্ট, গবেষণাপত্র, অভিযোগের বই, টাইম-টেবল, বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র, পোস্টার, এমনকি হিসাবের খাতাও সংবাদের উৎস হতে পারে।

সংবাদের উৎস বা 'সোর্স' খোদ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ পথযাত্রী সকলেই বা যে কেউ হতে পারেন। এই উৎস-র বিশ্বাস অর্জন করা এবং তার গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রতিটি সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। আবার, এই উৎস-র কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সে বিষয়েও প্রতিটি সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে।

সংবাদের প্রকারভেদ অর্থাৎ সংবাদ কত রকমের হয়। সংবাদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সংবাদ। সংবাদপত্র বা

সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই সংবাদ-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ সংবাদ হচ্ছে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং সংবাদের সঙ্গে সংবাদ-ভিত্তিক যে সব বিষয় সেগুলির পার্থক্য বোঝানোর জন্য 'হার্ড' (Hard) নিউজ বা 'স্ট্রেইট' (Straight) নিউজ ও 'সফ্‌ট' (Soft) নিউজ বা 'ফিচার' (Feature) নামে সংবাদের প্রকারভেদ করা হয়েছে। 'হার্ড' নিউজ বা 'স্ট্রেইট' নিউজকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'গরম' খবর বা 'সোজাসাপটা' খবর। প্রসঙ্গক্রমে 'তাজা' খবরও বলা যায়। আর 'সফ্‌ট' নিউজ ও 'ফিচার'কে 'নরম' খবর বা সংবাদের ভিন্ন স্বাদের বিস্তার বলা যেতে পারে। 'হার্ড' নিউজকে কখনও কখনও 'স্পট' নিউজও বলা হয়। 'স্পট' মানে কোন নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা। সুতরাং 'স্পট' নিউজ বলতে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের তরফে সম্ভবত এটাই বোঝানোর অভিপ্রায় থাকে যে 'আমরা অকুস্থলে উপস্থিত থেকে' সংবাদটি পরিবেশন করছি।

ঐতিহ্যগতভাবে গরম খবর বা সোজাসাপটা খবর ঘটনা-দুর্ঘটনা-দুর্যোগ ভিত্তিক। যেমন, পুলিশ আইনভঙ্গকারীদের/আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালালো, বা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সরকারি ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলির আচরণবিধি ব্যাখ্যা করলেন, বা কোন মন্ত্রী ইস্তফা দিলেন, বা পুলিশ কয়েকজন চোরাচালানকারীকে গ্রেফতার করল, বা কোন পথদুর্ঘটনায় কয়েকজন ব্যক্তি হতাহত হলেন, বা কোন পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ বিশেষ কোন গিরিশৃঙ্গ জয় করল, বা ভারত ক্রিকেট টেস্ট জিতল, বা মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হল, বা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোন জনসভা আয়োজন করা হল, বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু জীবনহানি হল, বা শেয়ার বাজারে হঠাৎ কোন নামী কোম্পানির শেয়ারদর পড়ে গেল, বা কোন চিত্রাভিনেতা পুরস্কৃত হলেন, বা বিশ্বসুন্দরী সিনেমায় অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন, বা নামী কোন ব্যক্তির জীবনাবসান হল ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় দৈনন্দিন সংবাদ। এই সংবাদই গুরুত্ব পায় সর্বাগ্রে। কারণ 'হার্ড' নিউজ বা গরম/সোজাসাপটা খবর হচ্ছে নির্মম সত্য। আর এই নির্মম সত্যকে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়াটাই সাংবাদিক বা সংবাদ মাধ্যমের প্রথম দায়িত্ব। আর এই সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে আবেদন হবে প্রত্যক্ষ ও অকপট। বিলম্বহীনতাও এই সংবাদ পরিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তাজা বা গরম খবর যদিও মূলত দৈনন্দিন খবর এবং নতুন খবর, কোনও কোনও সময়ে অজানা পুরনো তথ্যও গরম বা তাজা খবরের মর্যাদা পায়। যেমন, কোন বড় রাজনৈতিক নেতা বা কোন শিল্পপতির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর যদি জানা যায় যে তিনি মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কোন সমাজকল্যাণ সংস্থার নামে উইল করে দিয়েছেন, তখন সেটিও তাজা খবর হিসাবেই গণ্য হবে। অবশ্য মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ভিন্নস্বাদের সংবাদ বা নরম খবর/ফিচার হিসাবেও এই তথ্যটি পরিবেশন করা যায়। সংবাদটি পাঠককে জানানো কতটা জরুরি, আদৌ বিলম্ব করা উচিত হবে কিনা বা সংবাদটির রচনাশৈলী কেমন হবে ইত্যাদি বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে সংবাদটি গরম না নরম— কী হিসাবে পরিবেশিত হবে।

প্রতিদিনের অজস্র ঘটনাবলির যেগুলি তাজা সংবাদ হিসাবে চিহ্নিত, বিবেচিত ও প্রকাশিত হয় তা কিছু কিছু আগে থেকেই সাংবাদিকদের জানা থাকে। কারণ, এগুলি হয় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী। যেমন, কোন বড় জনসভা, বা কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, রাষ্ট্রপতির রাজ্যসফর, ইস্টবেঙ্গল-

মোহনবাগানের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে চ্যারিটি ম্যাচ ইত্যাদি বিষয় তো পূর্বঘোষিত, আগে থেকেই জানা। সুতরাং এসব বিষয় ও সম্পর্কিত তথ্যসংক্রান্ত সংবাদ নির্ধারিত দিনে সংগৃহীত হবে এবং সেদিনই বা তার পরদিনই প্রকাশিত হবে। এগুলি সবই তাজা বা গরম খবর। আবার, যেহেতু এগুলি পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বঘোষিত, নির্ধারিত দিনের আগেই এসব বিষয়-সংক্রান্ত আগাম খবরও করা যায়। তবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রেই আগাম খবর লেখা হয়। অনেকটা, বড় কোন নাটক অভিনীত হবার আগে তার অংশবিশেষ মঞ্চস্থ করার ধাঁচে অথবা 'পরবর্তী আকর্ষণ' বলে কোন সিনেমার কিছু অংশ 'ট্রেলার' হিসাবে দেখানোর কায়দায় এসব আগাম খবর করার রেওয়াজ আছে। এ ধরনের খবরকে বলা হয় 'কার্টেন রেইজার'। প্রস্তাবিত রাজনৈতিক বৈঠক বা দলীয় অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রণকৌশল পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দলের তৃণমূলস্তরে ইতোমধ্যেই তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'কার্টেন রেইজার' হতে পারে। আর এ ধরনের খবর তাজা বা গরম খবর হিসাবেই বিবেচিত ও পরিবেশিত হয়। শুধু রাজনীতি-সংক্রান্ত খবরই নয়, যে কোন বিষয় নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'কার্টেন রেইজার' সংবাদ লেখা যায়।

যে কোন বড় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের অনুসারী সংবাদ বা 'ফলো-আপ' নিউজ লেখা হয়। অর্থাৎ প্রথম দিন কোন একটি বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও একই বিষয়ে নানা অজানা বা নতুন তথ্য সংগ্রহ করে পরের দিন (বা প্রয়োজনে আরও কয়েকদিন) আরও সংবাদ লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদকে অনুসারী বা অনুসরণকারী সংবাদ বলে। কেন বড় দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদী হামলা, মহামারী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সর্বদাই অনুসারী সংবাদ লেখা যায়। অনুসারী খবরও তাজা খবর।

এতো গেলো পূর্বঘোষিত বা আগাম-জানা বিষয়-সংক্রান্ত তাজা বা গরম (হার্ড নিউজ) খবরের কথা। এছাড়া এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানা যায় না। এসব ঘটনা আচম্বিতেই ঘটে। এগুলি প্রধানত দুর্ঘটনা। যেমন, ট্রেন দুর্ঘটনা, বিমান ভেঙে পড়া, পথ-দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, নৌকাডুবি ইত্যাদি। এছাড়া কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলিকে দুর্ঘটনা বলে না, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানাও যায় না। যেমন, মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিচালনা, বিক্ষোভ আন্দোলনের হিংস্র পরিণতি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, কোন নামী ব্যক্তির মৃত্যু, আচমকা হরতাল, দু'দল ছাত্র বা যুবকের মারামারি, কোন প্লেন ছিনতাই (হাইজ্যাক) ইত্যাদি হঠাৎ-ঘটা ব্যাপারগুলিও তাজা বা গরম খবর। এসব খবর লেখার ক্ষেত্রে আবেদন হবে স্পষ্ট, সহজ-সরল, সোজাসাপটা।

নরম খবর বা 'সফট নিউজ'-এর মধ্যে পড়ে সেসব খবর যা দু'দিন পরে ছাপলেও ক্ষতি নেই। আর পড়ে 'ফিচার'। ফিচার ভিন্নস্বাদের, ভিন্নশৈলীর সংবাদ-লিখন যা মানুষের মন কাড়ে, যা জানতে মানুষ উৎসুক, আগ্রহী এবং যা জেনে মানুষ উপভোগ করে। এসব খবর যতটা না সুনির্দিষ্ট ঘটনাভিত্তিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক। কোন ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত আকর্ষণীয় জীবনবৃত্তান্ত বা রেখাচিত্র (প্রোফাইল), ব্যঙ্গরসাত্মক বা হাস্যরসাত্মক বৃত্তান্ত, মানুষের জীবনযাপনের প্রচলিত গতিধারা ও আদবকায়দার কাহিনী (লাইফ স্টাইল), নানা বিষয়-সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও সমালোচনা, সামাজিক সংবাদ, ভ্রমণ ও বিনোদন বিষয়ক লেখা বা বিচিত্র বিষয়ের সংবাদনামা বা হালকা মেজাজের বৃত্তান্তগুলিই সাধারণত নরম খবর বা ফিচার হিসাবে বিবেচিত। তাৎকালিকতার বা গুরুত্বের দিক দিয়ে ভাবলে নরম খবরের স্থান গরম খবরের চেয়ে এক

ধাপ নিচে। নরম খবর সাধারণত বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণময় বিবরণ বা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যা গরম খবরকে ভিত্তি করেও হতে পারে যা গরম খবর ছাড়া অন্য বিষয়ভিত্তিকও হতে পারে।

এই ব্যাখ্যা-বিবরণ-বিশ্লেষণমূলক নরম খবর বা ফিচার বৃহত্তর চিত্রপটের আপাত অমূলক সংবাদকে যেমন ফুটিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষামূলক তথ্যও পরিবেশন করে এবং একই সঙ্গে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর পারদর্শিতায় পাঠকদের আনন্দ বর্ধন করে। নরম খবরের বিষয়ের অন্ত নেই। দৃশ্যমান জগতের সমস্ত বিষয় নিয়েই নরম খবর লেখা যায়, লেখা হয়। আবার, যা অদৃশ্য অর্থাৎ চোখের দেখা নয় বা মননের জগৎ তা নিয়েও লেখা হয় নরম খবর বা ফিচার। এই নরম খবর দু'ধরনের। সংবাদধর্মী ও মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ।

সংবাদধর্মী নরম খবর বা ফিচার কিন্তু অনুযায়ী সংবাদ বা 'ফলো আপ নিউজ' নয়। পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা এবং মূল সংবাদের পটভূমি উদঘাটন অনুসারী সংবাদের অনন্য উপাদান। "কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে"-র উত্তরসম্বলিত গরম বা সোজাসাপটা খবর লেখার পদ্ধতির তুলনায় সংবাদধর্মী নরম খবর লেখার ভঙ্গিটা অন্যরকম। ব্যক্তি বা ব্যক্তির কার্যকলাপ, সমসাময়িক ঘটনা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক আবেদনের কোন বিষয় বা বিষয়ের গুরুত্ব ও তার ব্যাখ্যা বা ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা—যা বাঁধা গতের বাইরে এবং একটু আলাদা—সংবাদধর্মী ফিচার বা নরম খবরের বিশেষত্ব।

সংবাদধর্মী বা সংবাদভিত্তিক ফিচার প্রকাশিত সংবাদে পরিবেশিত তথ্যের অতিরিক্ত কিছু কথা বলবে, যা প্রচলিত রীতিধারা থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্নস্বাদের এবং আনন্দদায়ক। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবর হবে **সৃজনশীল ও অধ্যাত্মীয়** (বা চিত্তনিষ্ঠ, যার বিপরীত হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ) যার প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠককে **তথ্য জানানো ও আনন্দ দান করা**। সংবাদধর্মী নরম খবরের সঙ্গে সোজাসাপটা গরম খবরের এখানেই পার্থক্য। এ ধরনের নরম খবরকে কিন্তু সমকালীনতা বা সময়োপযোগিতা বজায় রাখতে হবে, এবং এ ধরনের খবরে কল্পনাপ্রবণতার সুযোগ খুবই কম। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন বাধানিষেধ নেই।

মানবতাধর্মী-মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবর বা ফিচার যা যা মানুষের মন কাড়ে বা যা যা মানুষের মনকে নাড়া দেয় তাই নিয়েই লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় মানুষ। এতে মানুষ থাকবে এবং মানুষের সংবেদনশীল মন যাতে নিশ্চিতভাবে সাড়া দেবে সে ধরনের একটি কাহিনী বা বৃত্তান্ত থাকবে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। এই মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবরে থাকবে একটি সুনির্দিষ্ট আখ্যানের রূপরেখা, থাকবে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র। গল্পের মতো এই খবরের শুরু, মধ্যপর্যায় ও সমাপ্তি থাকবে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এ ধরনের নরম খবর বা ফিচারের অবস্থান অনেকটা খবর ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি কোনও একটা জায়গায়। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের খবর হচ্ছে ঘটনাভিত্তিক ছোটগল্প। এবং তা সরাসরি বলা। এ ধরনের খবরের মূল উপাদান :

- মানবিক আবেদন — এই ধরনের নরম খবর বা আখ্যান মানুষের মনকে নাড়া দেবে।
- ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা — এই আখ্যান এমন ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করবে যাতে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা মানুষের কাছে আকর্ষণীয়।

- ব্যক্তিত্ব — এ ধরনের আখ্যানে ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। অসামান্য বা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের কথা থাকলে এই আখ্যান আরও বেশি গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।
- দৃষ্টিকোণ — বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হলে আখ্যানের বাঁধুনি মানুষের আগ্রহ বাড়িতে তোলে।
- গতিশীলতা — এ আখ্যান হবে প্রাণবন্ত। আখ্যানে উল্লিখিত যে সব ব্যক্তিত্ব, তাঁদের কর্মচঞ্চলতায় আখ্যান যেন প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়ে ওঠে।
- অনন্যতা ও সর্বজনীনতা — আখ্যানে যেন অনন্যতা বা ভিন্নতা থাকে, আবার একই সঙ্গে তার যেন একটা সর্বজনীন আবেদন থাকে।
- গুরুত্ব — কোনও বিষয় বা ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, নৈকট্য, সময়োপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা থাকলে এ ধরনের আখ্যানের গুরুত্ব বাড়ে।
- উৎসাহবর্ধন — আখ্যান যেন মানুষের মনকে নাড়া দেয়, ঠিক যেমন আখ্যানের বিষয়টি সাংবাদিকের মনকে নাড়া দিয়েছিল।

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার বা আখ্যানের বিষয় বা চরিত্রের নানা রূপের যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়, পাঠক যেন সেই আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারে একাত্ম বোধ করে। আনন্দ, বিষাদ, ভয়, উত্তেজনা, কৌতুক, রাগ, সহানুভূতি ইত্যাদি কত রকমই না আবেগ ও অনুভূতি এ ধরনের ফিচারে ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে পাঠকের একাত্মবোধ এমনই হয় যে, পাঠক যেন নিজেই আখ্যানে বর্ণিত বিষয়ের এক সক্রিয় অংশীদার। উক্ত নাটক বা ছোটগল্পের সে যেন নিজেই একটি চরিত্র। রচনাশৈলী বা লিখনভঙ্গি ও অনন্য বা অদ্ভুত বিষয় বা চরিত্র নির্বাচনের ওপরই মূলত নির্ভর করে এ ধরনের ফিচার বা আখ্যানের গ্রহণযোগ্যতা। মানুষ নিজে যে ব্যাপারে জড়িত, তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যে ব্যাপারে জড়িত সে বিষয়ে সে জানতে চায়। সে নিজের কথা জানতে-শুনতে চায়। সে অপরের কথা জানতে-শুনতে চায়। না-বলা কথা, না-জানা কাহিনী শুনতে/জানতে চায়। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবরের বিন্যাস সাধারণত বৃত্তান্তমূলক। অনেকটা গল্পকথনের রূপ। আর সেই কারণেই এ ধরনের সংবাদের সময়োপযোগিতা বহুলাংশেই গৌণ হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ অনেক আখ্যান বা ফিচারের আকর্ষণ কালাতীত বা চিরন্তন।

অনেক ভালো ভালো আকর্ষণীয় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচারের উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ — বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা (যেমন থ্যালাসেমিয়াগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী শিশু)। এছাড়া আছে বড় বড় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট নজর এড়িয়ে যাওয়া কাহিনী, কোনও নামী মানুষের ছেলেমানুষী শখ বা বিশেষ কোন জিনিসের প্রতি লোভ। বহুরূপী, মুশকিল আসান, ভালুক নাচ, বাঁদর খেলা, ফুটপাথের আর্টিস্ট, শিশু শ্রমিক ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লেখা যায় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার। এ ধরনের ফিচারের বিষয়ের কোনও অন্ত নেই।

সংবাদভিত্তিক ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের ফিচার আছে। যেমন, সমীক্ষা, সমালোচনামূলক ফিচার, বর্ণময় বর্ণনামূলক ফিচার, মতামতধর্মী ফিচার, নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানভিত্তিক ফিচার, আবহাওয়া বা বিশেষ ঋতু সম্পর্কিত ফিচার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ফিচার, বিজ্ঞানভিত্তিক ফিচার, পটভূমি

বা প্রেক্ষাপটভিত্তিক ফিচার, সাক্ষাৎকারভিত্তিক ফিচার, ভ্রমণমূলক ফিচার, ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক ফিচার, খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার, ব্যক্তিভিত্তিক ফিচার, জনসেবামূলক ফিচার, ধর্ম বা রাজনীতিভিত্তিক ফিচার ইত্যাদি।

লিখনশৈলী ও লেখার প্রণালী বিষয়বিশেষে ভিন্ন। তার ওপর আছে ফিচার লেখকের পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গি। কোনও বিষয়ে ফিচারের ভূমিকা বা মুখবন্ধ বা সূচনা কী হবে তারও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবুও সাধারণভাবে ফিচারের ক্ষেত্রে কয়েকরকম মুখবন্ধের প্রচলন আছে। যেমন, সারাংশ মুখবন্ধ (সামারি লীড), প্রত্যক্ষ মুখবন্ধ (ডাইরেক্ট লীড), প্রশ্নমূলক মুখবন্ধ (ক্যোইস্চেন লীড), বর্ণনামূলক মুখবন্ধ (ডেসক্রিপ্টিভ লীড), বিস্ময় বা চমকধর্মী মুখবন্ধ (ট্রেজার লীড), উক্তিমূলক মুখবন্ধ (কোটেশান্ লীড), অদ্ভুত বা উদ্ভট মুখবন্ধ (ফ্রীক লীড) ও সম্মিলিত মুখবন্ধ (কম্বিনেশন লীড)।

যে ধরনেরই ফিচার হোক আর যেমনই হোক সে ফিচারের মুখবন্ধ বা সূচনা, সবরকম ফিচারেরই গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে কয়েকটি শর্তের ওপর। সেগুলি হচ্ছে ভাষার গুণগত মান, যুক্তিগ্রাহ্যতা, সামাজিক চেতনাবোধ, সত্যতা, মানবিকতা ও সামগ্রিক সামঞ্জস্য বা সমন্বয়।

খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন (Changing Pattern of News Coverage) :

খবর লেখার প্রকরণ বা রীতি-পদ্ধতি ক্রমাগত বদলাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি, পরিবর্তিত রুচি পছন্দ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ফলেই প্রতিবেদন প্রচারে অবিরাম পরিবর্তন।

এমন একটা সময় ছিল, যেমন ধরা যাক সদ্যসমাপ্ত বিশ শতকের সাতের দশকের শুরু পর্যন্ত, যখন সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইথার তরঙ্গে বাহিত রেডিও স্টেশন প্রচারিত নিউজ বুলেটিন। সেটাও ছিল দিনে রাতে হাতে-গোনা মাত্র কয়েকবার। এখন যাঁরা প্রৌঢ় তাঁদের অনেকেই সেই আমলে প্রতিদিনিই নির্দিষ্ট সময়টার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন যখন রেডিওর 'নব' বা চাবি ঘোরালে শোনা যেতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটি পরিচিত কণ্ঠস্বর—"আকাশবাণী, খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল/বিজন বসু" অথবা, পরবর্তী কোনও কালে, "খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়"। তখনও দূরদর্শন চালু হয়নি। নানারকম চ্যানেলের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা সংবাদ পরিবেশনের রেওয়াজও তাই গড়ে ওঠেনি। খবর তখন ছিল অনেক সোজাসুজি এবং খবরের কাগজে ঘটনা দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি, খেলাধূলা, রাষ্ট্রশাসন ইত্যাদি প্রায় সবরকম খবরেই সংবাদপত্রগুলি শুধুমাত্র মূল ঘটনা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ বা টীকা-টিপ্পনীসহ তার ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকত। তখনকার দিনে পাঠকও সম্ভবত তার বেশি কিছু আশাও করতেন না। কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই বদলাচ্ছে এবং সংবাদপত্রগুলিকেও পাল্লা দিতে হচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ চ্যানেলগুলির সঙ্গে। তাই কেবলমাত্র মূল খবরটুকু সরবরাহ করে আর কিছু কিছু বিশ্লেষণ পরিবেশন করেই যদি তার কাজ শেষ করতে চায় তাহলে সংবাদপত্রের বাজার হারানোর সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। এখন সংবাদপত্রগুলি তাদের সংবাদ পরিবেশনের আদলও পালটে ফেলেছে। মূল খবরের সঙ্গে বেশি বেশি করে যুক্ত হচ্ছে তার বিশ্লেষণ, তার পটভূমি, তার ভবিষ্যৎ-নির্দেশ এবং তার মন্তব্যমূলক ব্যাখ্যান। যুক্ত হচ্ছে ঘটনার থেকেও তার মানবিক দিকগুলিকে বেশি করে দেখানোর জন্য সংবাদ-সম্পর্কিত অকথিত কাহিনী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। হয়তো কোথাও রাস্তার

প্যাশের জবরদখলকারীদের বে-আইনি বাড়িঘর, দোকান ইত্যাদি ভেঙে দিয়ে রাস্তা চওড়া করার একটা সরকারি পরিকল্পনা নেওয়া হল। পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ-প্রশাসন বুলডোজার, লরি, লোকজন ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কাজ শুরু করল। সংবাদপত্র আগের মতোই, ঐতিহ্য অনুযায়ী, ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দিল। যেমন, কতগুলি ঘরবাড়ি ভাঙা হল, কতজন বাধা দিতে এসে গ্রেফতার হল, কতজন বা পুলিশের লাঠিতে আহত হল, উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির কোথাও কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল কিনা, সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এ বিষয়ে কী বলল বা কী করল ইত্যাদি। একই সঙ্গে দেখা গেল, এসব খবরের পাশাপাশি আলাদা একটি খবরে তুলে ধরা হল কেমন করে কয়েকটি শিশু ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে আনছে তাদের পড়াশুনার বা খেলাধূলার সামগ্রী বা কোন মা তার সন্তানদের খেতে দেওয়ার অতি সাধারণ তৈজসপত্র ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

এরকমভাবেই খবরের অন্যান্য দিকগুলিতেও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে সংবাদপত্র ক্রমশই আরও ব্যাপক ও মনোহারী হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশবিদেশের বিভিন্ন খেলাধূলা আজকাল সরাসরি টিভির পর্দায় মানুষ দেখতে পায় বলে সেসব খেলাধূলার ফলাফলের থেকেও সংবাদপত্র বেশি করে আলোচনা করছে সেসব খেলার নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলি, তাদের পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে তদের ভাবমূর্তি বিপণন বা ইমেজ মার্কেটিং পর্যন্ত। যে সমস্ত বিষয়ে মানুষকে নিত্যদিনই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় খবরের কাগজে সেগুলি আজকাল অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পৌরসেবা বা পুর-পরিষেবা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আজকাল বিস্তারিত খবর পরিবেশন করা হচ্ছে। এবং সে কারণেই, পরিবর্তিত প্রয়োজনবোধে, খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১.৩ সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা (Style and Approach)

খবর লেখার পদ্ধতি বা শৈলী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অথবা বলা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতির খবর লেখার নমুনা নিয়ে গবেষণা করে কয়েকটি নির্দিষ্ট শৈলীকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। খবর অবশ্য ঠিক কীভাবে লেখা যেতে পারে তা নিয়ে কখনই শেষ কথা বলা যায় না। কারণ, যতই নতুন নতুন সাংবাদিক আসবেন ততই নতুন নতুন ভাবে খবর লেখার চেষ্টা চলতেই থাকবে। প্রতিটি সাংবাদিকের লেখাই তাঁর স্বকীয়তায় বিভিন্ন সময়ে দিকনির্দেশ করতে পারে এবং তা করে চলেছেও। কারণ, আমরা সকলেই জানি— "Style is the man" অর্থাৎ শৈলীই হচ্ছে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ।

এসব সত্ত্বেও সাংবাদিকতা শুরু করার মুখে কয়েক রকম লেখার পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা খুবই আবশ্যক। একটি একটি করে সেগুলির কথা বলা যাক।

প্রথমেই আসবে সেই চিরায়ত বা সাবেকি শৈলী যার গড়ন অনেকটা ইংরাজি "T" এর মতো। অর্থাৎ খবরের শুরুর দিকে মূল বক্তব্যটি বা খবরটি প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে বন্দী করার কাঠামো। যেমন, "অনেক আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে আজ প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে রাজ্যে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। যদিও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ১০ জন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ৫০ জনকে"।

এ রকমভাবে লেখা খবরে মূল বক্তব্যটি রাখা হয় একেবারে শুরুর প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদে এবং খবরের বাকি অংশ— যেমন, ভোটদানের শতকরা হার, ঘটনা-দুর্ঘটনার বিশদ বিবরণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি পরপর প্যারাগ্রাফ সাজিয়ে লেখা হয়।

সংবাদ রচনার নানা কাঠামো বা নির্মিতিকে বিশেষজ্ঞরা জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। এই জ্যামিতিক নির্মিতি কৌশল জানা থাকলে সংবাদ পরিবেশনের সঠিক রীতিটি বা বিন্যাসভঙ্গিটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করা যায়। এই সংবাদ-বিন্যাসভঙ্গিকে কয়েকটি জ্যামিতিক ছকে ভাগ করা যায়। সোজা কথায় সংবাদটিকে কীভাবে সাজানো হবে—প্রথমে বা মুখবন্ধে কী লেখা হবে, তারপরই বা মধ্য অংশেই বা কী থাকবে, আর সব শেষে বা উপসংহারেই বা কী লেখা হবে? এই সংবাদ সাজানোর কায়দা বা বিন্যাসভঙ্গির জ্যামিতিক ছক হচ্ছে পিরামিড, উল্টো পিরামিড, ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স, পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয়, রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয়, বালি-ঘড়ি সদৃশ, ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি।

● **পিরামিড (Pyramid) :**

চিত্র ১

ছোটখাট সাধারণ মানের খবরগুলি প্রধানত পিরামিডের মতো আকৃতিরই হয়। এসব খবরে মুখ্যত একটি বিষয়ই থাকে এবং এর মুখবন্ধ বা ইনট্রোও হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গুরুত্ব অনুযায়ী সংবাদের বাকি অংশটুকু ধাপে ধাপে যুক্ত হয় ও কাহিনী বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু যেহেতু খবরের বক্তব্যটিই ছোট এবং মূল খবরটি প্রথমেই থাকছে, তাই প্রয়োজনবোধে লিখিত খবরটির নিচের অংশ ইচ্ছামতো ছোট করা যায়। এই নিচের অংশেই থাকে মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি খবর যা ক্রমেই বিস্তারলাভ করে। প্রয়োজনে এই নিচের অংশকে ছোট করা হয়। কিন্তু খবরের কাঠামোটা জ্যামিতিক কল্পনায় পিরামিডের মতোই থাকে (চিত্র ১)।

● **উল্টো পিরামিড (Inverted Pyramid) :**

ঘটনার ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্রম-অনুসারে ছোটগল্পের শেষ পরিণতিতে বা উপসংহারে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি। গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে বিন্যাসের ধাঁচটি ছোটগল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত।

চিত্র ২

অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তব্যটি খবরের শুরুতেই বলতে হবে। এবং বাকিসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সাজনো হবে তাৎপর্যের অধঃক্রম অনুযায়ী। সবচেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি আসবে সংবাদের সর্বশেষ পর্যায়ে। এ ধরনের নির্মিতিকৌশল বা বিন্যাসভঙ্গির নাম জ্যামিতিক কল্পনায় উল্টো পিরামিড। সংবাদলিখনের এই কাঠামোটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত ও সবচেয়ে নিরাপদ। খবর লেখার সনাতন ধারায় এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কাঠামো বলে বিবেচিত। সংবাদপত্রের মুদ্রণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে। সুতরাং সংবাদ লিখতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। এবং সর্বদাই সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে পরিবেশিত সংবাদের সত্যতা, সময়োপযোগিতা ও পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পর্কে।

এইসব মাথায় রেখেই উল্টো পিরামিডের কাঠামোর কল্পনা। পিরামিডের সমস্ত শক্তি তার অধোভাগে বা তলদেশে। উল্টো পিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় শক্তি হচ্ছে তার শুরুর কথাতেই। অর্থাৎ খবরে সূচনাতেই (ইনট্রো বা লীড) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কিছুটা বিবরণ দেওয়া হয়। এই লীড (সূচনা বা মুখবন্ধ) একটি অনুচ্ছেদেও হতে পরে অথবা, প্রয়োজনে, তিন চারটি অনুচ্ছেদেও হতে পারে। অর্থাৎ খবরের প্রথম দিকটি হয় প্রসারিত বা ছড়ানো। এবং তারপর ধীরে ধীরে কাহিনীকে গুটিয়ে আনা হয় ও প্রয়োজনে নিচের অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় লেখা সংবাদের তিনটি অংশ বা পর্যায় থাকে। প্রথমে লীড বা সূচনা। যে কোন সংবাদের প্রথম কয়েকটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ হচ্ছে সেই সংবাদের লীড। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সংবাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য লীডের মধ্যে থাকবে। মোটামুটি এই লীড থেকেই পুরো সংবাদটি জানা যায়। সংবাদ সংস্থা প্রেরিত কোন কোন সংবাদের লীড অনেক সংবাদপত্রেই সংক্ষিপ্ত সমাচার হিসাবে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বা মধ্যমাংশে লীডের সমর্থনে বা লীডের জোর বাড়ানোর জন্য সেসব বিষয় নিয়ে লেখা হবে যা যথেষ্ট অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অপরিহার্য নয়। যেমন, কোনও সংবাদের সূচনায় যদি খুন সম্পর্কে পারিবারিক কলহকে কারণ হিসাবে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে মধ্যমাংশে সেই কলহ-সংক্রান্ত সাক্ষীর বক্তব্য, মৃতদেহটি ঠিক কী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার ওপর কতগুলি ক্ষতচিহ্ন ছিল, বাড়িতে কেউ ছিল কিনা, কজন ঝি-চাকর সেই বাড়িতে কাজ করে ইত্যাদি বিষয়গুলি ইঙ্গিতপূর্ণ বিবেচনায় থাকবে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির সবগুলিই যে অপরিহার্য তাও নয়। তৃতীয় বা শেষ অংশকে বলা হয় 'ঠিক তত গুরুত্বপূর্ণ নয়'। অর্থাৎ এই অংশটিকে যে কোনও সময়ে বাদ দেওয়া যায়। এবং সাধারণত খবরের কাগজে ছাপানোর সময় স্থান সংকুলান না হলেই খবরের এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। ইংরাজিতে খবরের এই অংশটিকে বলা হয় 'ইকস্‌পেন্ডেবল্ এন্ডিং' অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপসংহারটিকে ত্যাগ করা যায় বা বাদ দেওয়া যায়। যেমন, খুনের খবরের ক্ষেত্রে গত দু'বছরে বা পাঁচ বছরে এই শহরে কতগুলি খুন হয়েছে, পুলিশ কতগুলি খুনের কিনারা করত পেরেছে, পারিবারিক কলহজনিত খুনের সংখ্যাই বা কত ছিল ইত্যাদি বিষয় যেগুলি বাদ দিলে মূল খবরের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় না। খবরের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই এগুলিকে বাদ দেওয়া যায়।

উল্টো পিরামিড কাঠামোই সাধারণত গ্রহণযোগ্য। অবশ্য একশ বছর আগে বা তারও আগে যে কাঠামো প্রচলিত ছিল তা হল ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্সের মতো। বাস্তব সমস্যা এড়াতেই শুরু হয় উল্টো পিরামিড। টেরিগ্রাফ সার্ভিসের অবিশ্বস্ততার বা অনিশ্চয়তার ফলে তারযোগে পাঠানো খবরের সবটুকু খবরের কাগজে পৌঁছতই না। মাঝপথে কেটে যেতো। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য উল্টো পিরামিড কাঠামো চালু করা হয়। যার ফলে যে কোনও খবরের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিই প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই বলা হয়ে যেতো। টেলিগ্রাফের গোলমালের ফলে খবরের বাকি অংশটুকু না পাওয়া গেলেও খুব একটা ক্ষতি হত না। আজকের দিনে অধিকাংশ খবরই উল্টো পিরামিড বিন্যাসে পরিবেশন করা হয়। এতে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই সংবাদের প্রথম ভাগে থাকে আর সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি থাকে সর্বশেষে। এ ধরনের সংবাদ-লিখনভঙ্গি সাংবাদিক ও পাঠক উভয়েরই খুব পছন্দ। পাঠক যেহেতু বেশিরভাগই সংবাদপত্র পড়ার সময় খুব ব্যস্ত থাকেন, তাই তিনি চান যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও যেন খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেলা যায়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে

অর্থাৎ রেডিও ও টেলিভিশনে অবশ্য এ ধরনের সংবাদ বিন্যাস সবসময়ে শ্রোতা-দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেহেতু কোন খবরই সাধারণত এক বা দু মিনিটের বেশি হয় না তাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ বিন্যাস ভিন্ন রূপের হতেই পারে। তবুও এ ধরনের বিন্যাস সকলেই পছন্দ করেন। কারণ শুরুতেই খবরটি জানা হয়ে গেলে, পরিহার্য বাকি অংশ কেউই আর দেখতে চান না (চিত্র ২)।

● **ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স (Chronological) :**

যে ঘটনার পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে সম্প্রসার ঘটেছে এবং কোন পর্যায়ই অন্য কোনও পর্যায়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সে ঘটনা সম্পর্কিত খবরের বিন্যাস বা কাঠামো হবে ঘটনা-অনুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স ধাঁচের। এক অর্থে বলতে গেলে এ ধরনের খবরের মধ্যে একাধিক খবর থাকে এবং এ ধরনের খবরের লীড বা সূচনা কী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। এজন্য সাধারণত এ ধরনের খবরের একটি সমন্বিত সূচনা লিখে তারপর ধাপে দাপে পরবর্তী বিষয় বা তথ্যগুলিকে সাজিয়ে দিতে হয়। এক একটি ধাপ এক একটি বাক্সের মতো ভাবলে, সব মিলিয়ে কয়েকটি সমান্তরাল বাক্সের চেহারা নেয় এ ধরনের সংবাদ বিন্যাস। এই ঘটনানুক্রমিক বিন্যাসে অনেকে যেমন সমন্বিত সূচনা লেখার পক্ষপাতী, তেমনি অনেকেই আবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বাদ দিয়ে তারপর পারম্পর্য অনুযায়ী অন্য তথ্যগুলি দিতে চান যাতে ঘটনার একটি ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে (চিত্র ৩)।

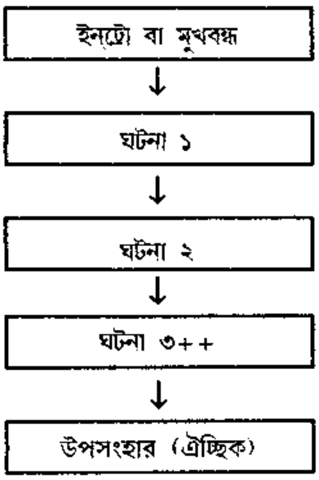

চিত্র ৩

● **পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয় :**

এ ধরনের সংবাদ বিন্যাসের রেওয়াজ এখন আর নেই। এই রেওয়াজ লুপ্ত হয়ে যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, এতে সংবাদের লীড বা সূচনা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় যা আবার মুদ্রণ বিন্যাসে প্রসারিত আয়তক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। সূচনার পরে মূল খবরটিকে আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে ক্রমশ পিরামিডের মতো নিচের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনকার দিনে যেহেতু দীর্ঘায়িত সূচনা লেখার চলন নেই এবং পাঠকও এ ধরনের লেখা পড়তে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না, তাই এ ধরনের সংবাদ-লিখনভঙ্গি বর্জিত হয়েছে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪

● **রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় কাঠামো (Essay Approach or Organisation) :**

সংবাদে রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় বিন্যাস খুবই কম, বলা যায় বিরল। তবে এ ধরনের কাঠামোর লেখা প্রায়শই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, কোনও বিশেষ বিষয়-সংক্রান্ত নিবন্ধ, রবিবাসরীয় বা সাময়িকীর লেখা, ম্যাগাজিন আর্টিকল্, সংবাদভাষ্য, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিশেষ লেখা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। স্কুল কলেজে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনা লেখার সঙ্গে সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের রচনার একটু তফাৎ আছে। পাঠক বা

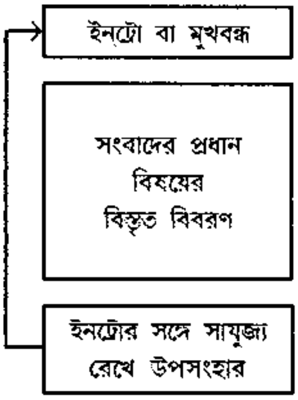

চিত্র ৫

দর্শককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি বা কোন বিশেষ তত্ত্ব বা কোন মন্তব্য দিয়ে আকৃষ্ট করে তবে প্রবন্ধ ধাঁচের লেখা শুরু করতে হয়। সাংবাদিক বা লেখককে তাঁর বক্তব্য বা মন্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ও উদাহরণ দিয়ে লিখতে হবে এই রচনার মধ্যম অংশ। লেখার শেষ অংশে বা উপসংহারে লেখককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি ও তৎসংক্রান্ত মন্তব্যের সারাংশ দিয়ে গোটা বিষয়টিকে গুটিয়ে আনতে হবে। শুরুর সঙ্গে তার সাযুজ্য থাকবে (চিত্র ৫)।

● **বালি-ঘড়ি সদৃশ বিন্যাস বা কাঠামো (Hourglass Organisation):**

বালি-ঘড়ি বা আওয়ারগ্লাস (বালি ভর্তি কাচের পাত্র যার মধ্যভাগ সরু এবং ওপরের মোটা অংশ থেকে বালি একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিচের মোটা অংশে সম্পূর্ণরূপে পড়ে যাওয়ার পরই পাত্রটি উল্টে যাবে ও ওপরের বালি আবার নিচে পড়বে—এরকমভাবে কার্যসাধন পদ্ধতিতে তৈরি যে ঘড়ি) যার আকৃতি অনেকটা ডমরু বা ডুগডুগির মতো সেই রকম জ্যামিতিক বিন্যাসে কখনও কখনও সংবাদ লেখা হয়। এই কাঠামোয় লেখা সংবাদের ওপরের অংশ বা লীড ও নিচের অংশ বা উপসংহার হবে প্রসারিত। মধ্যম অংশ যা তুলনামূলকভাবে সরু সেখানে কাহিনী একটি মোড় নেবে, আর এই অংশটিকে ধরে নেওয়া হবে পরিবেশিত সংবাদটির এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় উত্তরণের মধ্যবর্তী ধাপ। এই বিন্যাসে বা ধাঁচে লেখা সংবাদের জোরটা থাকে প্রধানত দুটি ভিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর। আর থাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটা মোড় বা বাঁক যেটা সংবাদের এক অংশ থেকে আর এক অংশে উত্তরণের একটা ধাপ, জ্যামিতিক ছকে যার অবস্থান সংবাদটির মধ্যভাগে। এই পরিবর্তনসূচক মধ্যবর্তী পর্যায়টি হতে পারে কয়েকটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ, আর এ ধরনের বাক্য বা অনুচ্ছেদ সাধারণত দীর্ঘ বা প্রলম্বিত সংবাদ-কাহিনীতেই দেখা যায়। এই অংশটিতে অনেক সময় উপ-শিরোনাম বা সাব-হেডিং দেওয়া হয়, কোনও কোনও সময় গ্রাফিক্সও ব্যবহার করা হয়, কখনও বা বক্স বা বুলেট ব্যবহার করা হয়। এই মধ্যবর্তী অংশটি হতে পারে সময়ের ব্যবধানের ইঙ্গিতবাহী বা বিবরণমূলক কিছু ভৌগোলিক উপাদান বা হতে পারে অন্য কোনও বিষয় বা ধারার একটি ক্ষেত্র। আর এই ক্ষেত্রটি থাকবে সংবাদটির প্রধান দুটি অংশের সঙ্গে খুব শক্ত সুতোয় বাঁধা। এই ধরনের সংবাদ কাঠামোর প্রথম ও শেষ উভয় অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিতে ঠাসা থাকে (চিত্র ৬)।

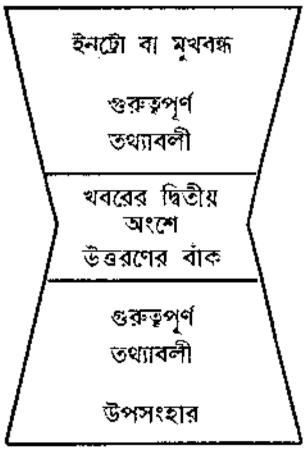

চিত্র ৬

● **ডিম্বাকৃতি কাঠামো (Goose Egg Organisaticn) :**

কোন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে সে বিষয়টি নিয়ে বৃত্তাকারে লেখার প্রথা একেবারে অজানা নয়। বস্তুত কুশলী/শৈলীনিষ্ঠ সাংবাদিক বা লেখকদের কোনও বিষয়ের উপস্থাপনা শৈলী আন্দাজ করা বড় কঠিন।

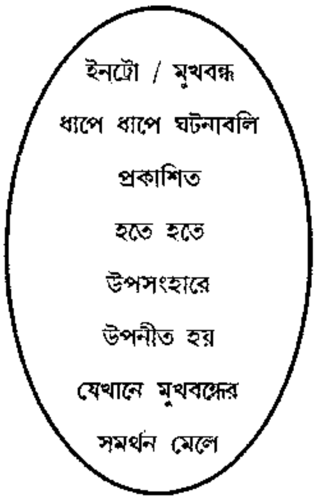

চিত্র ৭

যাঁরা খুব অভিজ্ঞ ও রীতিকুশল তাঁরা যে কোন বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ যে কোনওভাবে শুরু করতে পারেন ও তাঁদের লেখার শেষ ছত্র পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অটুটভাবে ধরে রাখতে পারেন। বহু উন্নতমানের সংবাদ, বাস্তবিকপক্ষে, বৃত্তাকারেই লেখা। তার মানে, কোনও একটি বিষয় নিয়ে সংবাদ লেখা শুরু হয় এবং সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হয়েছে সেটা সংবাদের উপসংহার বলা হয়। 'গুপ্ত এগ' বা ডিম্বাকৃতি অবয়ব আসলে সনাতনী ঢঙে গল্প বলার এক পরীক্ষিত শৈলী। কোনও বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা মানে, প্রথম দৃশ্য শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ঘটনাবলি প্রকাশিত হতে থাকে এবং সবশেষে যে হিতোপদেশটি পাওয়া যায় তার যুক্তিগ্রাহ্য সমর্থন মেলে মুখবন্ধে বর্ণিত ঘটনাটি থেকেই। অর্থাৎ বৃত্তাকারে বা ডিম্বাকৃতি কাঠামোতে লেখার বা গল্প বলার রেওয়াজ স্মরণকাল থেকেই প্রচলিত (চিত্র ৭)।

সংবাদ লেখার এসব কাঠামো ছাড়াও অন্য কাঠামো হতে পারে। সেটা অবশ্যই সাংবাদিকের ব্যক্তিগত লিখনশৈলীর ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তাছাড়া বিষয় বিশেষে শৈলী ও বিন্যাস বদলাতেই পারে।

এসব ছাড়া বড় ধরনের যে গঠনশৈলী সাধারণত চোখে পড়ে সেটা অনেকটা একটি ক্ষুদ্র অংশকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বা সার্বিক বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা। যেমন, "অনুপমের বয়স এখন দশ। তার কোন কিছুরই অভাব নেই। বাবা-মা ভালো চাকরি করেন। তার সমস্যা একটাই— তাকে মাঝেমধ্যেই পেয়ে বসে এক অদ্ভুত হতাশা। ক্লাশ পরীক্ষায় ভালো করতে না পারলেই সে বাড়ি ফিরে বসে থাকে এ কোণায়, কিছু খেতে চায়না। কখনও কখনও তার মনে হয় সবকিছু উড়িয়ে দেয় মেশিনগানের গুলিতে— অনেকটা টিভিতে দেখা নায়কদের কায়দায়।"

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সংবাদের মধ্য দিয়ে পাঠককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি সমসাময়িক সমস্যার দিকে। স্কুলব্যাগের বোঝায় ক্লান্ত, অত্যন্ত কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়ার ভয়ে আজকের অনেক শিশু / কিশোর / তরুণ-তরুণীই যে সমস্যার শিকার, এই সংবাদ সেই সমস্যারই ইঙ্গিতবাহী।

মানবিক উপাদান সম্বলিত এই ধরনের সংবাদ আজকাল প্রায়শই লেখা হয়ে থাকে। অবশ্যই খবর যে বিষয়বস্তুর ওপর লেখা হবে লেখার ভঙ্গি অনেকটাই তার ওপর নির্ভর করবে। কেউ যদি কোনও কঠিন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ে লিখতে চান, তাঁকে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লঘু করেও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপিত করতে হবে। ব্যবসাবাণিজ্য বা অর্থনীতির খবরের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একইভাবে প্রযোজ্য, যদিও সবটাই নয়। কারণ, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক পরিভাষা অনেকটাই বোধগম্য, যেটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবসময় বলা যায় না। একথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, খবর লেখাটা হচ্ছে একইসঙ্গে পাঠককে তথ্য সরবরাহ করা এবং সেই কাজটি মনোহারিত্বের সঙ্গে করা।

লেখার ধরণ এমন হবে যা কিনা পাঠককে আকৃষ্ট করবে, কিন্তু লেখাকে বর্ণাঢ্য করতে গিয়ে ভারসাম্যহীন করে ফেলা চলবে না। লেখার ওপর দখল আনতে গেলে তাই প্রয়োজন প্রতিদিন যিনি যে ভাষায় লিখবেন

সেই ভাষায় প্রচারিত যত বেশি সম্ভব সংবাদপত্র পড়া এবং লেখার বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা। ধ্রুপদী সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশিষ্ট লেখকদের লেখাগুলি পড়লেও লেখার ভঙ্গিতে একটি নিজস্বতা সহজেই জন্মানো সম্ভব।

১.৩.১ সূচনা বা ইনট্রো করার নিয়ম

কী করে 'ইনট্রো' বা সংবাদের সূচনা লিখতে হয়? পরিবেশনযোগ্য সংবাদটির সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থেকে সংবাদটির 'ইনট্রো' বা 'লীড' লিখতে হবে এবং এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে 'ইনট্রো' হচ্ছে সংবাদটির সারাংশ। কর্মব্যস্ত পাঠক পুরো সংবাদটি পড়ার সময় না পেলে কেবলমাত্র ইনট্রোটুকু পড়েই যাতে প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সূচনা বা ইনট্রোতে যেন সংবাদটি-সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই প্রশ্নগুলি হচ্ছে, 'কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে'। ইংরাজিতে এগুলিকে বলা হয় "The Three Ws : Who, What, When, Where and Why। আজকাল যদিও 'ইনট্রো' লেখার ক্ষেত্রে অনেকরকম বৈচিত্র্য এসেছে তবুও চিরাচরিত পদ্ধতিতে লেখা ইনট্রোতে যে ছটি প্রশ্নের উত্তর নিহিত থাকবে তা খুবই অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। যদি ইনট্রোতে বলা হয়, "গতরাতে প্রায় নটার সময় কাশীপুরে একদল সশস্ত্র লোক একটি ব্যাঙ্ক লুট করে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে পালায়"— তাহলেই পাঠক এক নজরে ঘটনাটি সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিতে পারবেন।

কে : কেউ না কেউ কোনরূপ ক্রিয়াকলাপ যুক্ত বা কাউকে না কাউকে ঘিরে চলে সক্রিয়তা। এই ব্যক্তি কে? কে বক্তৃতা দিলেন? কে মারা গেছেন? কে চুরির অভিযোগে ধরা পড়েছে? কখনও নাম হতে পারে, তাতে আবার আভিজাত্যসূচক খেতাব যুক্ত হতে, কখনও বা ব্যক্তির কোন একটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকতে পারে। নামের আগে খেতাব যথা, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারক, মেয়র, উপাচার্য ইত্যাদি লেখা হয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেমন, ছ-ফুট লম্বা এক নতুন খেলোয়াড়, ৩৫ বছর বয়সের এক বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, মানসিক বিকারগ্রস্ত এক কয়েদি, ভিন রাজ্যের অসাধু কয়েকজন ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

কী : কী ঘটেছে বা কী হয়েছে? ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণত এই অংশে থাকে। যেমন, খোয়া গেছে, খুন হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে, পালিয়ে গেছে, গ্রেফতার হয়েছে, বাজেট পেশ হয়েছে, আয়কর বেড়েছে, পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে ইত্যাদি। কখনও বা কিঞ্চিৎ বিবরণ থাকে। যেমন, কার্গিল যুদ্ধে নিহত জওয়ানের স্ত্রীকে সরকার পুরস্কার দিল, উত্তেজিত জনতা ইটপাটকেল ছোঁড়ে ও অফিস ঘর ভাঙচুর করে, গ্রাম থেকে শহরের আদালতে মামলা করতে আসা এক প্রৌঢ় প্রতারিত ইত্যাদি।

কেন : কোনও কোনও সময় খবরের ইনট্রোতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ একটা ঘটনা কেন ঘটলো সেটা ঠিক সেই মুহূর্তে জানা বা বোঝা যায় না। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানা যায়, যেমন চালক গাড়িটির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বলেই দুর্ঘটনাটি হয়, প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ সিলেবাসের বাইরে ছিল বলে কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় পত্রের আবার পরীক্ষা হবে ইত্যাদি।

কবে / কখন : দৈনিক সংবাদপত্রে সাধারণত সপ্তাহের কোন দিনে ঘটনাটি ঘটেছে তার উল্লেখ করা হয়। পাঠকের কাছে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক, যেমন কোথায় ঘটেছে সেটাও খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য। কখনও

কখনও নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে, যেমন শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ যখন সব অফিস কাছারি বন্ধ হয়ে গেছে তখন দুর্বৃত্তরা এসে হানা দেয়, বুধবার লাঞ্চের সময় সবাই যখন অফিস থেকে বেরোতে শুরু করে ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে প্রতারকটি বড়বাবুর ঘরে ঢুকে পড়ে ইত্যাদি।

কোথায় : কোলকাতায় না হাওড়ায় না নদীয়ায়— ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে না বললে সংবাদটি পাঠকের কাছে খুব বিভ্রান্তিকর মনে হবে। আবার শুধু কোলকাতায় বললেও ঘটনাস্থলটি পরিষ্কার হবে না, কোলকাতার কোথায় অর্থাৎ কোন রাস্তায়, এমন কি সম্ভব হলে সেখানকার উল্লেখযোগ্য কোন বাড়ি বা লাইব্রেরি বা স্মৃতিস্তম্ভর কাছে কিনা জানাতে পারলে পাঠক খুব খুশি হয় ও খবরটি সম্বন্ধে আরও বেশি আগ্রহী হয়।

অনেক সংবাদপত্রই সংবাদে উল্লিখিত ঘটনার স্থান ও কাল অর্থাৎ কোথায় ঘটেছে এবং কবে ঘটেছে তা লেখে না। এই সংবাদপত্রগুলি লেখে, আজ এখানে বা গতকাল এখানে। এই সংবাদপত্রগুলি ডেটলাইন ব্যবহার করে। অর্থাৎ এসব সংবাদপত্রের প্রতিটি প্রকাশিত সংবাদের প্রথম ছত্রের শুরুতেই একটি জায়গার নাম ও একটি তারিখ (অর্থাৎ যেখান থেকে যেদিন সংবাদটি লেখা হচ্ছে) উল্লেখ করা থাকে— সেটিকেই বলা হয় ডেটলাইন। যেমন— দিল্লি, ডিসেম্বর ২৫ বা কোলকাতা, জানুয়ারী ১২।

কীভাবে : ঘটনাটি কীভাবে ঘটলো তা সাধারণত প্রকাশিত সংবাদটির মধ্য অংশে বিস্তারিতভাবে বলা থাকে। তবুও তার একটা ইঙ্গিত সংবাদের ইনট্রোতে থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন, বহুতল বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার করার এক অভিনব পরিকল্পনা চালু করতে চলেছেন শহরের মেয়র অথবা বকেয়া বিক্রয়কর কীভাবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে স্কুলের মিড-ডে মিল চালু করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বসতে চান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, স্কুল শিক্ষক মন্ত্রী ও বাণিজ্য-কর মহাধ্যক্ষ ইত্যাদি।

সংবাদের লীড বা ইনট্রোতে যদিও "কে কী কেন কবে কোথায় এবং কীভাবে"-র উত্তর থাকাটা কাম্য, সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে খবরের সূচনা যেন তালগোল পাকানো শ্রুতিকটু বাক্যের সমষ্টি হয়ে না দাঁড়ায়। সংবাদের ভাষা হবে নির্ভুল, সরল, সংক্ষিপ্ত অথচ সাধারণের বোধগম্য। সব প্রশ্নের উত্তর যে একটি বাক্যের মধ্যেই থাকতে হবে বা সব প্রশ্নের উত্তর যে প্রথম প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদেই থাকতে হবে তাও নয়। ইনট্রো বা লীড এক প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু করে তিন-চার প্যারাগ্রাফও প্রয়োজনবোধে হতে পারে। পাঠক যেন একবার পড়েই খুব সহজে সংবাদটি বুঝতে পারে।

১.৪ সারাংশ

সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ বিষয়ের সংবাদ ও প্রতিবেদন অংশটি আপনি পাঠ করলেন। আসুন, এখন আমরা দেখি বিবৃত অংশে যা বলা হয়েছে তার সার কথাটি কী।

মূল পাঠে সংবাদ ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগই মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ, তথ্য আদানপ্রদানের যুগ। তথ্যই শক্তি। তথ্যই সংবাদের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রতিনিয়তই এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে। সংবাদের সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। সংজ্ঞা যাই হোক, সংবাদের বিষয়বস্তু সব সময়ই হবে নতুন, সময়োপযোগী, অর্থবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক।

নানা উৎস থেকে সংগৃহীত হয় তথ্যরাজি, যার ভিত্তিতে লেখা হয় সংবাদ। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁদেরকে বলা হয় রিপোর্টার বা প্রতিবেদক। আর, সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তা হচ্ছে সংবাদ, প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন হতে পারে সোজাসাপটা গরম খবর (হার্ড নিউজ) বা ভিন্নস্বাদের ভিন্নশৈলীর নরম খবর (ফিচার)।

খবর লেখার রীতি-পদ্ধতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, প্রতিযোগিতার ফলে মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী বদলে যাচ্ছে। সংবাদ রচনার কাঠামো বা বিন্যাসভঙ্গিও নানারকম হয়। সূচনা বা মুখবন্ধ, মধ্যাংশ ও উপসংহা— সংবাদ এই তিনটি অংশে বিন্যস্ত থাকে। সূচনা বা ইনট্রোতেই "কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে"-র উত্তর বা সংবাদটির সারাংশ বোঝা যায়। কর্মব্যস্ত পাঠক যেন দ্রুত একনজরে ইনট্রোটুকু পড়েই প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সংবাদের ভাষা এমন সহজ ও সুখপাঠ্য হবে যে তা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু কোনওভাবেই সংবাদের ভাষা যেন ভারসাম্যহীন না হয়, এবং নিরপেক্ষতা না হারায়।

১.৫ অনুশীলনী

১) সংবাদ কাকে বললে বা সংবাদের সংজ্ঞা কী?

২) প্রতিবেদন কাকে বলে?

৩) সংবাদের উৎস কী বা সংবাদ কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?

৪) সংবাদ কত রকমের হয়? সংবাদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করুন।

৫) হার্ড নিউজ ও সফ্‌ট্ নিউজ বা গরম খবর বা নরম খবরের পার্থক্য কী?

৬) সংবাদধর্মী ফিচার কাকে বলে?

৭) ফিচারের মূল উপাদান কী?

৮) সংবাদ লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করুন।

৯) সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

১০) সংবাদ পরিবেশনের রীতির বা সংবাদের বিন্যাসভঙ্গির জ্যামিতিক ছক কত রকমের হয়। বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

১১) কীভাবে সংবাদের 'লীড' বা 'ইনট্রো' বা সূচনা/মুখবন্ধ লিখতে হয়? বা
যে ছ'টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সংবাদের 'লীড' বা 'ইনট্রো'তে পাওয়া উচিত সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।

একক ২ □ সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ বিভিন্ন ধরনের সংবাদ

- ২.২.১ রাজনৈতিক প্রতিবেদন
- ২.২.২ সংসদ / বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- ২.২.৩ নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- ২.২.৪ অপরাধ ও দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিবেদন
- ২.২.৫ আইন আদালত-সংক্রান্ত সংবাদ
- ২.২.৬ অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক প্রতিবেদন
- ২.২.৭ উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- ২.২.৮ খেলাধূলা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- ২.২.৯ ফ্যাশন বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- ২.২.১০ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদন
- ২.২.১১ পরিবেশ ও বাস্তু পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- ২.২.১২ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

২.৩ সারাংশ

২.৪ অনুশীলনী

২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে সংবাদের পরিধি অর্থাৎ সংবাদ কত রকমের হতে পারে সে সম্পর্কে আপনার একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

২.১ প্রস্তাবনা

এই একক পাঠ করলে বিভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ ও সেইসব সংবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার

সচেতনতা বাড়বে। রাজনৈতিক সংবাদ, আইনসভা-সংক্রান্ত সংবাদ, নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত সংবাদ বা অপরাধ ও দুর্নীতি বিষয়ক সংবাদ, অর্থনীতি ও শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বা খেলাধুলা ও ফ্যাশন বা বিজ্ঞান ও উন্নয়ন, পরিবেশ ও বাস্তু পরিবেশ বা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিষয়ক সংবাদের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা পরিষ্কার হবে এবং এইসব বিষয় নিয়ে যথাযথ অনুশীলন করলে আপনারাও এইসব নানা বিষয়ের ওপর খুব ভালো ভালো সংবাদ লিখতে পারবেন।

২.২ বিভিন্ন ধরনের সংবাদ

২.২.১ রাজনৈতিক (Political) প্রতিবেদন

একথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি যেহেতু মোটামুটিভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। এই রাজনীতি কিন্তু আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে রাজনীতি বা পলিটিক্স-এর কথা পড়েছি তার থেকে আলাদা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনীতির তত্ত্বগত দিকগুলি আলোচনা করা হয় আর সংবাদপত্র রাজনীতির ফলিত বা ব্যবহারিক দিকটিতেই বেশি আগ্রহী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনীতিতে অংশ নেয় বহু রাজনীতিক দল। সেই দলগুলির কোনটি থাকে শাসন ক্ষমতায়, কোনটির বা ভূমিকা হয় বিরোধীদলের। সংবাদপত্র শাসক ও বিরোধী এই দুই দলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখে বা সেটাই তার আদর্শ হওয়া উচিত। রাজনৈতিক সংবাদ লেখার সময় সদাসতর্ক থাকতে হয় যাতে বিভিন্ন মতাদর্শগত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে পাঠককে অবহিত রাখা যায় এবং একই সঙ্গে শাসকদলের কার্যকলাপ এবং বিরোধীদলের শাসকদল সম্পর্কে সমালোচনার গতিধারা সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। সেজন্য রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয় এবং তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে মানুষের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের/নেত্রীদের সঙ্গে তো বটেই এমন কি এইসব দলের অন্যান্য স্তরের এবং গণসংগঠনগুলির নেতা/নেত্রীদের সঙ্গেও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সংবাদে মূলত প্রাধান্য পায় বিভিন্ন দলের গণকল্যাণমুখী কার্যসূচী এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত কর্মসূচী বা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের কতটা তফাৎ সেটাকে মানুষের নজরে আনাটাও রাজনৈতিক সংবাদদাতার কাজ। বিভিন্ন উপদলীয় কার্যকলাপের প্রতিও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের নজর রাখতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, রাজনৈতিক সংবাদ লিখতে গিয়ে সাংবাদিক কখনও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ বা পছন্দ অপছন্দের ওপর ভিত্তি করে কোন অভিমত প্রকাশ করবেন না। তাঁর কাজ সঠিক তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনে দিক নির্দেশ করা, কিন্তু কখনোই কোন পক্ষ অবলম্বন করা নয়। তাঁকে সর্বদাই থাকতে হবে নিরপেক্ষ এবং বিষয়নিষ্ঠ।

২.২.২ আইনসভা (Legislative) বা সংবাদ / বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হল আইনসভা। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হল সংসদ। রাজ্যস্তরে বিধানসভা/বিধানমণ্ডলী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখানে নতুন আইন প্রণয়ন করেন, কখনও আবার পুরনো আইনকে সংশোধন করেন বা বদলান সেটিকে যুগের উপযোগী করার জন্য।

এছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন যার মধ্য দিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সময়বিশেষে অভাব-অভিযোগের প্রতিফলন ঘটে।

আইনসভা সম্পর্কিত প্রতিবেদকের তাই আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে কীভাবে বাজেট পাশ হয় বা money bill পাশ হয় সে বিষয়ে খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই। সভায় যেভাবে ভোট দেওয়া হয় বা অধ্যক্ষ যেভাবে রুলিং দেন সেসব বিষয়গুলি বেশ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সভার মধ্যে কোন সদস্য যা হোক কিছু বলতে পারেন, কারণ তাঁর সে ব্যাপারে একটা বিশেষ ক্ষমতা বা legislative prerogative আছে। সাংবাদিকদের কিন্তু তা নেই। তাই কোনও সদস্যের কোন মন্তব্য যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয় বা কুৎসামূলক হয় তাহলে সেসব মন্তব্যকে যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে এবং মানহানি আইন বাঁচিয়ে সাংবাদিককে পরিবেশন করতে হয়।

২.২.৩ নগর ও সমাজজীবন (Civil and Social Life) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

রাজনীতির মতোই প্রশাসন পরিচালনা-সংক্রান্ত সবকিছুই সাংবাদিকদের কাছে সংবাদের একটি অন্যতম বড় উপাদান। প্রশাসনেরও আবার বিভিন্ন দিক আছে। যেমন, লোকসভা বা বিধানসভার শাসকদল যেভাবে সরকার পরিচালনা করে সেটি যেমন প্রশাসনের মূল অংশ, তেমনই কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, জেলাপরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাগুলিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রশাসন সম্পর্কে খবর লিখতে গেলে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ (যেমন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, পরিবহণ, নগর উন্নয়ন ইত্যাদি) বা দফতরের দৈনন্দিন ভিত্তিতে যে সব কাজগুলি হয় সেগুলি থেকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্যগুলি তুলে এনে পাঠককে অবহিত করাও সাংবাদিকদের কাজ। এইসব খবর কখনো বিভাগীয় মন্ত্রী বা কোন উচ্চ-পদাধিকারী কর্তাব্যক্তির সাংবাদিক বৈঠক বা বিবৃতির মাধ্যমে হতে পারে, আবার কখনো বা সাংবাদিক তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমেও এইসব তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ পরিবেশন করেন।

অনেক সময় দেখা যায় সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী বা বিভাগীয় কর্মকর্তা যে বিষয়টিতে জোর দিয়ে বলতে চাইলেন সে বিষয়টি সংবাদ হিসাবে ততটা গুরুত্ব পেল না, গুরুত্ব পেল তাঁর বক্তব্যের এমন একটা দিক যার ওপর তিনি আলোকপাত করতে চাননি কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁদের অনুসন্ধিৎসার জোরে সেটাকে বার করে আনতে পেরেছেন। এতে মন্ত্রী বা তাঁর অফিসার অসন্তুষ্ট হলেও সাংবাদিক নাচার। গণতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখাটা সাংবাদিকের কাজ। একথা তো সকলেরই জানা যে সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রে অলিখিতভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ষাট শতাংশ সাফল্যকে মন্ত্রী বা অফিসার অর্থাৎ সরকার তুলে ধরতে চাইলেও সাংবাদিক যদি চল্লিশ শতাংশ ব্যর্থতা তুলে ধরতে চান তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সরকারি বিভাগীয় খবর করতে গেলে বিভিন্ন প্রকল্পের ওপর সরকারি ঘোষণা ভালো করে সাংবাদিককে মনে রাখতে হয়, বা প্রয়োজনে লিখে রাখতে হয়, এবং দেখতে হয় সেইসব ঘোষিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ে এবং বরাদ্দ অর্থসীমার বা বাজেটের মধ্যে শেষ হল কিনা। না হয়ে থাকলে তার সমালোচনামূলক লেখা এবং ব্যর্থতার জন্য দায় কার সে সম্পর্কে খবর লেখা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় না প্রশাসনের উচ্চতম পর্যায়ে হয়তো অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু মাঝের বা নিচের স্তরের আধিকারিক বা কর্মীদের দীর্ঘসূত্রিতায় বা অবহেলায় তা কার্যকর করা হয়নি যার ফলে হয়তো

কোন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি বা শিল্প গড়ে ওঠেনি। এই ব্যর্থতাগুলিও খবরের বড় উপাদান। সরকারি সাফল্য বা উন্নয়নমূলক যা কিছু কাজ সেগুলিও নিঃসন্দেহে সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এগুলি সাধারণত সরকারি প্রচার মাধ্যমের দৌলতেই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তবুও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নমূলক সংবাদের ওপর সাংবাদিকদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কখনও কখনও সাফল্যের সংবাদ, তা সে সরকারি বা বেসরকারি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, প্রকাশিত হলে শ্রমিক-কর্মীরা খুবই উৎসাহিত হন ও কাজের গতি অব্যাহত থাকে।

মানুষের সামাজিক জীবন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তার বিচ্যুতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উপাদান, তেমনই নাগরিক অধিকার, নাগরিক কর্তব্য এবং নাগরিক সুখসুবিধা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বপালনে অবহেলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাংবাদিকের কাজ হবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা, আবার একইভাবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

২.২.৪ অপরাধ ও দুর্নীতি (Crime and Corruption) বিষয়ক প্রতিবেদন

আইনের বাইরে গিয়ে এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিসাধনকর যেসব কাজকর্মগুলি মানুষ করে সেগুলিই অপরাধ ও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

অপরাধ লঘু অথবা গুরু তা ঠিক করা হয় সাধারণত সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার ওপর। যেমন, খুন জখম যে রকম অপরাধ, চলন্ত বাসে কেউ পকেট মারলে তা ঠিক সেই মাপের অপরাধ নয়। আবার সভ্য জগতে কেউ কাউকে অপমান করাটাও এক ধরনের অপরাধ।

অপরাধ দমনের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা আছে। পুলিশবাহিনীর একটি সদর দফতর থাকে, যার অধীনে বিভিন্ন শাখা অফিস এবং থানাগুলি থাকে সাধারণ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। প্রতিটি সংবাদপত্রই সেজন্য নিয়মিত এক বা একাধিক সাংবাদিককে নিযুক্ত রাখে শহর ও গ্রামের নানারকম অপরাধের খবর সংগ্রহ করার জন্য। এইসব সাংবাদিকদের কাজ হল অপরাধ দমনের কাজে নিযুক্ত যে সব পুলিশ অধিকর্তা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং অপরাধমূলক ঘটনাগুলিকে একটু অন্যরকমভাবে লেখা। অন্যরকম বলতে এটাই বোঝায় যে, অপরাধ যেহেতু মানুষের ব্যতিক্রমী কাজ তাই সে ব্যাপারে মানুষের জানার আগ্রহ বা কৌতূহল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। দেখা যায় কখনও কখনও কোন চুরির ঘটনার থেকেও কী কৌশলে সেই চৌর্যবৃত্তিটি সম্পন্ন হয়েছে তার বিশদ বিবরণ এবং সেই চোরকে ধরতে গিয়ে পুলিশ যে পাল্টা কৌশল ব্যবহার করে সেই কাহিনী অনেক বেশি চাঞ্চল্য জাগায় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একইভাবে কোন হত্যার থেকে তার কৌশল বা ছকের নতুনত্ব বা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার ঘটনা কুশলী এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিকে লেখায় অদ্ভুতভাবে ফুটে ওঠে এবং তা সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

দুর্নীতি সাধারণত চোখের আড়ালেই ঘটে থাকে। অনেক সময় তার নথিপত্র সাংবাদিকরা পরিশ্রম করে এবং সংবাদসূত্রের জোরে জোগাড় করে থাকেন। এঁদের দক্ষতা তাই প্রশ্নাতীত। যে সমস্ত সাংবাদিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আনেন তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। তার মধ্যে প্রধান হল হিসাবশাস্ত্র (Accountancy) এবং প্রশাসনিক রীতিনীতির ওপর বিশেষ দখল। একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক— সরকারি কোন বিভাগে বেশ কিছু টাকা নয়ছয় হয়েছে। অর্থাৎ যে টাকা যে খাতে খরচ

হওয়ার কথা ছিল খাতা-কলমে দেখানো হলেও তা আদৌ খরচ হয়নি। এখন, সেই টাকাটা কে বা কারা আত্মসাৎ করেছে তা যদি কোন সাংবাদিক প্রকাশ করতে পারেন তাহলে একই সঙ্গে কাগজের গুণমান বৃদ্ধি পায়, সমাজের কল্যাণ হয় ও তাঁরও সুনাম বাড়ে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, এই ধরনের খবর প্রকাশ করার পিছনে শুধুমাত্র সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসাই যথেষ্ট নয়, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র বা সংবাদসূত্র থাকাটাও খুব জরুরি। সাংবদিকের এই কাজে সরকারি অফিসার, পুলিশ, কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এমন কি আইনজীবীও সহায়ক হতে পারেন। তাই দুর্নীতির খবর যে সাংবাদিক প্রকাশ্যে আনেন তাঁর সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই অবাধ যাতায়াত থাকা চাই। আর, তার সঙ্গে চাই কঠোর অধ্যবসায়, ধৈর্য, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বুদ্ধি ও গভীর মনন।

২.২.৫ আইন আদালত (Law Court) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

যে কোন শাসনব্যবস্থায়, বিশেষত গণতন্ত্রে, বিচারব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থান আছে। আইনসভা, সরকার, কোনও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা অন্য কোনও ব্যক্তির কোন আদেশ, নির্দেশ বা কাজের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হয় বা অর্থহানি বা সম্মানহানি ঘটে তাহলে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমেই তার প্রতিকার হতে পারে। সংবাদপত্রে কোর্ট রিপোর্টিং তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নতর আদালতগুলি — যেমন, মুন্সেফ আদালত, জজ আদালত, মহকুমা আদালত বা জেলা আদালতগুলির দায়বা বা Criminal বিভাগে যেমন নিত্যই বহুরকম অপরাধ, অত্যাচার বা বঞ্চনার মামলার ওপর রায় দেওয়া হয়, তেমনই রাজ্যস্তরে হাইকোর্ট একইসঙ্গে দেওয়ালি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করে থাকে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ধারাগুলির ব্যাখ্যা করে নাগরিকে মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে এবং একইসঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর বিষয়ভিত্তিক মামলাগুলিতে রায় দিয়ে থাকেন। কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে তাই একইসঙ্গে দু-তিন রকমের দক্ষতা প্রয়োজন। অপরাধ সম্পর্কিত মামলাগুলি সম্বন্ধে লিখতে হলে যেমন প্রয়োজন Indian Penal Code (IPC) / Criminal Procedure Code (Cr.P.C) সহ বিভিন্ন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জ্ঞান ও সেইসঙ্গে মামলার গতিপ্রকৃতিকে একটু সরস ভাষায় পরিবেশন করার ক্ষমতা, তেমনই অন্যদিকে হাইকোর্টের রিপোর্টারকে বিভিন্ন দেওয়ানি আইন (Civil Procedure Code), কোম্পানি আইন, আয়কর আইন, বিক্রয়কর আইন, মোটরযান আইন (Motor Vehicles Act) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। কোর্ট রিপোর্টারকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে আদালতের লিখিত আদেশের বাইরে গিয়ে কোনরকম বাড়তি মন্তব্য বা ব্যাখ্যা করাটা গর্হিত কাজ বলে গণ্য হয় এবং তা আদালত অবমাননার (Contempt of Court) আওতায় পড়ে।

২.২.৬ অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প (Economic, Business & Industry) বিষয়ক প্রতিবেদন

রাজনীতি দেশকে শাসন করে, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যোগায় অর্থনীতি। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনীতিকে দেখতে চায়। তাই রাজনীতি ও অর্থনীতির শুরু ও শেষ

খোঁজার চেষ্টা অনেকটা 'আগে ডিম না আগে মুরগি' সেই ধাঁধার মতো। সে যাই হোক, যাঁরা অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপারে খবর লিখবেন তাঁদেরকে অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি, যেমন— মূলধন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হবেই। কোনও নীতির ভালো ও মন্দ দিক, সেইসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল ও বণিকসভাগুলির প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক স্তরে সেইসব নীতির প্রভাব অথবা কোনও বিশেষ আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিণতিতে এ ধনের নীতি প্রণয়ন হলে তাও জানতে এবং পাঠককে জানাতে হয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সরাসরি প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। যেমন, ইদানীং ইরাকের ওপর আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের দাম ওঠানামার প্রভাব ভারতসহ সব তেল আমদানিকারী দেশের ওপরই পড়বে। তেমনিই, আবার দেশে বা আন্তর্জাতিক স্তরে নির্মাণ (Construction) ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিলে ভারতের ইস্পাতশিল্পে মন্দা দেখা দেবে। তাই এই সমস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ খুব সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করাটা অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্য জগতের রিপোর্টারের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি শিল্পবাণিজ্য নীতি, ভর্তুকি (Subsidy) নীতি, বিক্রয়কর (Sales Tax) বা অধুনা আলোচিত গুণমানবর্ধিত আইন (Value-added Tax), চুঙ্গি কর (Toll Tax), ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সুদের হারের ওঠানামা, শেয়ার বাজারের সূচকের ওঠানামা ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান, বিপণন, কাঁচামাল সরবরাহের সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে শিল্পবাণিজ্য-অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টার তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না। কাজেই এই সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের সম্যক জ্ঞান থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

২.২.৭ উন্নয়ন (Development) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সমাজের উন্নতি বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। একদিকে যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট, সেতু, পয়ঃপ্রণালী, উড়ালপুল, জলসরবরাহ, গৃহনির্মাণ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গবেষণাগার ইত্যাদি নির্মাণের খবর সরাসরি, অর্থাৎ প্রকল্পগুলির বিবরণ, বিস্তার, অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়সহ লেখাই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিক বা development reporter-এর কাজ; অন্যদিকে তেমনই এসব কাজকর্মের ক্ষেত্রে গাফিলতি, বিচ্যুতি, দুর্নীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও মানুষকে এই সাংবাদিকরাই অবহিত করবেন।

এছাড়া যে সব উন্নয়ন মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎকে প্রভাবিত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করাটাও এসব সাংবাদিকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মানুষের অংশগ্রহণ কীভাবে হচ্ছে তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

২.২.৮ খেলাধূলা (Sports) সম্পর্কিত প্রতিবেদন

খেলাধূলা বিষয়ক প্রতিবেদন এক অর্থে একটি বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতা। সেজন্য এই ক্ষেত্রে সাংবাদিকের দক্ষতা হওয়া উচিত এমনই যে তিনি যেন নিজেকে খেলাধূলার জগৎ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। দেশবিদেশের প্রভূত জনপ্রিয় খেলা, যেমন— ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, বেসবল,

ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস থেকে শুরু করে দাবা, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স সহ খেলাধূলার জগতের গভীরে প্রবেশ করতে হয় ক্রীড়া সাংবাদিককে। প্রতিটি খেলাধূলার নিয়মকানুন, সেগুলির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, পরিসংখ্যান, ক্রীড়াবিদদের অতীত ও বর্তমান profile বা ব্যক্তিচিত্র প্রভৃতি বিশদ জেনে রাখা দরকার।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খেলাধূলার প্রতি একটি স্বাভাবিক আগ্রহ। সম্ভব হলে নিয়মিত নিজে খেলাধূলায় অংশ নেওয়া। এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাংবাদিক বুঝতে পারেন যে, তিনি যখন কোন খেলোয়াড়ের প্রশংসা বা সমালোচনা করছেন প্রকৃতপক্ষে তা যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়ই প্রকৃত বুঝতে পারেন যে একজন খেলোয়াড় যখন নির্দিষ্ট কোনও জায়গা থেকে বল গোলে পাঠান তখন তা কতটা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

আজকে টিভি-র কল্যাণে সরাসরি খেলাধূলা দেখার সুযোগ ঘটেছে। ক্রীড়া-সাংবাদিককে তাই খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুশীলন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু বিষয়েই জানতে হয় এবং মাঝে মধ্যে সংবাদ হিসাবে পরিবেশন করতে হয়। সেইজন্য ক্রীড়া-সাংবাদিককে খেলোয়াড়, কোচ, ক্লাবের কর্মকর্তা, মাঠের কর্মকর্তা, এমনকি মালীদের সঙ্গেও হৃদ্যতা গড়ে তুলতে হয়। খেলার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয় শুধু খেলাই নয়, যাঁরা খেলছেন তাঁদের ছন্দোময়তা বা ছন্দোহীনতা, তাঁদের উত্তাপ বা শৈত্য, তাঁদের ঐশ্বর্য বা দৈন্য, তাঁদের জেতার তাগিদ অথবা খেলার আগেই হার-মানা মনোভাব।

২.২.৯ ফ্যাশন (Fashion) বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়ার-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সাংবাদিকতার জগতে ফ্যাশন বস্তুত সর্বকনিষ্ঠ এবং হয়তো বা সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। এই অপত্যস্নেহ কিন্তু পিতামাতার স্নেহের থেকে একটু আলাদা। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সমাজের দর্পণ বা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়েই আবদ্ধ থাকেনি; বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে হয়ে উঠেছে অন্যান্য পণ্যের মতোই সাধারণভাবে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য। তাই তার কোন বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান নেই। অর্থাৎ সমাজের উপরতলার অথবা মধ্যবিত্তদের মধ্যে অধুনা যে ফ্যাশনদুরস্ত হওয়া তাগিদ রয়েছে সেটাকেই সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে সংবাদপত্র পরিবেশন করছে ফ্যাশনের খবর। সংবাদ মাধ্যমের প্রভাবে আজকাল অবশ্য নিম্নমধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তদের মধ্যেও ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বা তৈরি হয়েছে।

ফ্যাশন-সাংবাদিকতার জন্য তাই চাই ফ্যাশন-উদ্যোক্তা নানা ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ। এছাড়াও প্রয়োজন পেশাদার মডেল অথবা চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। আর চাই আধুনিক ফ্যাশন সম্পর্কে ধারণা। কোন কোন আন্তর্জাতিক বা দেশি ডিজাইনাররা কখন/কোথায়/কী নতুন ডিজাইন আনছেন সেগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করা এবং মডেলের ছবিসহ সেগুলি প্রকাশ করাই হল ফ্যাশন-সাংবাদিকের প্রধান কাজ। রূপচর্চা যাঁর স্বাভাবিকভাবেই আসে বা যিনি কোনও না কোন সময়ে মডেলিং বা সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এরকম মানুষের পক্ষে ফ্যাশন-সাংবাদিকতা খুব স্বাভাবিকভাবেই উপযুক্ত কাজ হতে পারে। তবে, আদৌ যাঁর এরকম অভিজ্ঞতা নেই তিনিও পারবেন এই কাজ। তার জন্য চাই শিল্পীর চোখ আর ফ্যাশন-মহলে গণসংযোগ।

২.২.১০ বিজ্ঞান (Science) বিষয়ক প্রতিবেদন

এটি সর্বার্থে একটি বিশেষজ্ঞ-নির্ভর সাংবাদিকতা, যদিও উৎসাহী যে কোন ব্যক্তি ক্রমাগত চর্চা ও পড়াশোনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে রিপোর্ট লেখার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে একটু কঠিন এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে ধরনের জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে তার সঙ্গে শুধু তার মিলিয়ে চলাই নয়, সাংবাদিককে বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে হয়।

বিজ্ঞান-রিপোর্টিং-এ সাধারণত দুটি জিনিস গুরুত্ব পায়। একটি হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন ধারণার উদ্ভব। আর, অন্যটি হল— বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে উদ্ভূত মানবকল্যাণমূলক আবিষ্কারের নতুন নতুন ঘটনা।

আধুনিক যুগে মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স, মহাকাশ-গবেষণা, সমুদ্র-গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রতিনিয়তই বিজ্ঞানীর নতুন নতুন আলোকপাত করছেন। আর, সেগুলির সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচয় করিয়ে দেন সাংবাদিক। সুতরাং সেইসব গবেষণালব্ধ ফল মানুষের পক্ষে ভালো না খারাপ সে বিষয়েও সাংবাদিককে ওয়াকিবহাল হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "ক্লোনিং" (এক প্রাণীদেহ থেকে কোষ নিয়ে অযৌন প্রক্রিয়ায় অন্যদেহে স্থাপন করে ঠিক একইরকম প্রাণী সৃষ্টি করা) নিয়ে, বিশেষ করে মানুষের "ক্লোনিং" করা নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানতে পেরেছে বা পারছে। এই একইরকমভাবে বিজ্ঞান-সাংবাদিক আমাদের জানান যে, কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ আরও বেশি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সুদূরের নীহারিকা থেকে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত মণিমুক্তার সন্ধান পর্যন্ত সবই ওঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়, আর তার কৃতিত্ব বিজ্ঞান-সাংবাদিকদেরই।

২.২.১১ পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ (Environment and Ecology) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(বাস্তু-পরিবেশ বা বাস্তব্যবিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়)

পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা সবসময় উপলব্ধি করতে পারুন বা না পারুন, আমাদের এই সবুজ গ্রহটিকে রক্ষা করা এবং বাসযোগ্য করে রাখার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। জাতি-রাষ্ট্রের (nation state) উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (ethnic group) স্বকীয়ভাবে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা কখনও সীমিত করতে পারেনি পৃথিবীর আবহমণ্ডল, বায়ুস্তর অথবা মহাসাগরগুলির অবিচ্ছিন্নতাকে।

সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কৃষি-সভ্যতা এবং তৎপরবর্তী প্রায় দু/আড়াইশো বছরের শিল্পসভ্যতার সময়কাল পর্যন্ত পৃথিবী যে এক সেই ধারণা স্বচ্ছ না হলেও আজকের দিনে প্রায় সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার মানা প্রজাতির পক্ষে বিষময় হয়ে উঠছে।

একথা ঠিকই যে কয়লা বা পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ব্যবহার করে যন্ত্র চালিয়ে মানুষ প্রভূত সম্পদ সৃষ্টি করেছে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু তার পরিণামে পৃথিবীর পরিবেশ হয়েছে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আমরা এখন জানতে পারছি কলকারখানার ধোঁয়ায়, মোটরযানের ধোঁয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন (ozone) স্তর ক্রমশই নিঃশেষিত হচ্ছে। যার ফলে সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির (ultra-violet ray) সরাসরি পৃথিবীর বুকে নেমে আসার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। বায়ুমণ্ডল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এমন সতর্কবাণীও দিয়েছেন যে, পৃথিবীব্যাপী এই উত্তপ্ততা (global warming) এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে তার ফলে মেরু অঞ্চল থেকে হিমবাহ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলভাগ এমনভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যার ফলে পৃথিবীর নিচু অঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। একইরকমভাবে, সমুদ্রের জলদূষণ এবং বর্জ্য পদার্থ ফেলা যদি অবিলম্বে বন্ধ না করা যায় তাহলেও মানুষের এবং সমুদ্রের প্রাণিজগতের অপূরণীয় ক্ষতি অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তৈলবাহী কোন জাহাজ ফুটো হয়ে গিয়ে জল যদি দূষিত হয়ে যায় তাহলে সামুদ্রিক জীব ও পাখি মারা যায় হাজারে হাজারে।

পরিবেশ রক্ষায় অরণ্যেরও যে একটি বিশেষ অবদান আছে সেকথা আমরা সবাই জানি। গাছ কাটা পড়লে কম বৃষ্টিপাত থেকে শুরু করে বাতাসে অক্সিজেন হ্রাস প্রভৃতি ঘটনা মানুষের জীবনে নিয়ে আসতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি।

পরিবেশ-সংক্রান্ত রিপোর্টিং বা প্রতিবেদন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রাসঙ্গিক যে সমস্ত সনদ (Charter)ও আইনকানুন আছে সেগুলিও ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। যেমন, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে, তাকে বলা হয় Earth Summit বা বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলিকে সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি রূপায়ণ করে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে জল, বায়ু ও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে এবং শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আইন তৈরি হয়েছে। সেগুলিকে বলবৎ করার জন্য কেন্দ্রে আছে Central Pollution Control Board এবং রাজ্যগুলিতে আছে State Pollution Control Board। পরিবেশ সংবাদদাতা যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খবর লক্ষ্য করে এদেশে সেগুলির প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তেমনই তিনি নিয়ত যোগাযোগ রাখবেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ রক্ষায় নিযুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা NGO-র সঙ্গে। তিনি যেমন লক্ষ্য রাখবেন যে কোথাও বেআইনিভাবে গাছ কাটা হচ্ছে কিনা, তেমনই তিনি লক্ষ্য রাখবেন যে কেউ কোথাও জলাজমি ভরাট করে নিয়ে বাড়ি তৈরি করছে কিনা। মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে তাই তিনি পরিবেশন করবেন দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের নির্ভীক সংগ্রাম।

২.২.১২ স্বাস্থ্য (Health) বিষয়ক প্রতিবেদন

কথায় বলে স্বাস্থ্য সম্পদ। প্রতিটি মানুষ ও জাতির সাফল্যের মূলে আছে পরিশ্রম বা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানুষের সুস্থ শরীরের ওপর। শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। প্রতিটি মানুষ চায় সুস্থ থাকতে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে। এরই মধ্যে আবার স্বাস্থ্য সবার আগে। এই স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন একদিকে সুষম খাদ্য, সক্রিয় স্বভাব ও নিয়মানুবর্তিতা আর অন্যদিকে প্রয়োজন সামাজিক ও নগরিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে ভালো মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য আছে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নার্সিং হোম, প্লে ক্লিনিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডাক্তারি-ব্যবসায়। এসব কিছু ব্যবস্থার সবচেয়ে ওপরে আছে স্বাস্থ্য দফতর ও স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্য দফতরের কাজ অনেক বেশি, তাই একজন প্রতিমন্ত্রীরও প্রয়োজন হয়েছে। স্বাস্থ্যকৃত্যক অধিকার বা Directorate of Health Services-এর প্রধান স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য দফতরের স্বাস্থ্য সচিব বা Health Secretary ও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী অফিসার বা আধিকারিক আছেন যাঁরা সরকারের স্বাস্থ্য দফতর বা বিভাগ ও অধিকার বা directorate-এর বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়োগ বদলি সব কিছু স্বাস্থ্য বিভাগ বা অধিকার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। হাসপাতালের মধ্যে আবার কয়েকটি আছে যেখানে শুধু রোগের চিকিৎসাই হয় না, চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিয়ে পড়ানোও হয় অর্থাৎ ডাক্তারি পড়ানো হয়। এসব হাসপাতালে যেমন একজন অধীক্ষক বা Superintendent আছেন, তেমনই একজন অধ্যক্ষ বা Principal ও আছেন। সব হাসপাতালেই বিভিন্ন রোগ বা অসুখের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং সেই সব বিভাগের বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকও আছেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপযোগী হাসপাতালও আছে, যেমন—প্রসূতি হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি-হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, টিবি হাসপাতাল, স্নায়ুরোগ-সংক্রান্ত হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল ইত্যাদি। আরও নতুন হাসপাতাল ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান কলেজ তৈরির পরিকল্পনাও আছে। আবার একইসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় হাসপাতালের ফি বৃদ্ধির ফলে সাধারণ গরীব মানুষ অনেক অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনই আবার ফি না বাড়ালে সরকারের পক্ষেও হাসপাতাল চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

এইসব কিছুই স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে মাথায় রাখতে হবে। তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হল কিনা, দেশে বা শহরে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এলেন কিনা, কোনও হাসপাতালে নতুন ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে কিনা, চিকিৎসায় গাফিলতির ফলে কোনও হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু হল কিনা, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নির্দিষ্ট কোনও বিষয় নিয়ে সরব বা সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিনা, কোনও হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা অধীক্ষককে বদলি করা হল কিনা, কোনও হাসপাতাল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে কিনা, হঠাৎ রক্তদান শিবির উদ্যোগটা কমে গেল কেন এবং প্রকৃতই সেই কারণে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে কিনা, আই ব্যাঙ্কে কেউ কর্ণিয়া দান করেন না কেন ইত্যাদি অজস্র বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে একজন স্বাস্থ্য-প্রতিবেদককে মোটামুটি ভালোভাবে জানতে হবে। এবং প্রয়োজনমতো সময়ে সময়ে মানুষকে সংবাদের মাধ্যমে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে এও জানতে হবে শহরে বা কোনও নির্দিষ্ট জায়গায়/এলাকায় কোনও বিশেষ ধরনের অসুখ দেখা দিয়েছে কিনা, কোনও নির্দিষ্ট স্থানে মশার উপদ্রব বেড়েছে কিনা বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে কিনা, নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কর্পোরেশন বা পুরসভা তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে কিনা, শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে কী বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ জানতে চায় এবং তাদের জানার প্রধান উপায়ই হচ্ছে সংবাদপত্র। সুতরাং স্বাস্থ্য-প্রতিবেদকে সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে বা নতুন কোনও সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা দেখা দিলে তা মানুষকে জানাতে হবে। মাঝে মাঝে নানা জায়গায় স্বাস্থ্য শিবির বা Health Camp-এর ব্যবস্থা করা হয়, সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এসব স্বাস্থ্য শিবির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগে সংগঠিত

হয়। অনেক সময় সরকারি উদ্যোগেও স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়। বিশেষ কোন রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদানের ব্যবস্থাও সময়ে সময়ে করা হয়। এর মধ্যে শিশুদের টীকাদানের ব্যবস্থা কোথাও হলে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সর্বশেষ কী পরিস্থিতি, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম ঠিকমতো অনুসৃত হচ্ছে কিনা, অপুষ্টিজনিত কারণে অসস্থ ও দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সব বিষয়েই নজর রাখতে হবে। নজর রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা বা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা। স্বাস্থ্য-সাংবাদিককে এসব খবরও মানুষকে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য, অসুখ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব খবরই সাংবাদিককে জানতে হবে ও মানুষকে তা জানাতে হবে। সুস্থ সমাজ ও সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার। কিন্তু মানুষকে সচেতন করা ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব।

২.৩ সারাংশ

সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস বা সংবাদ কত রকমের হতে পারে সে বিষয়ক এককটি পাঠ করলেন। এখন দেখা যাক, আলোচিত অংশে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে মূল তথ্যাদি কী আছে।

সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আইনসভা। তাই গুরুত্ব পায় আইনসভা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিশেষত, বাজেট বা বাজেট-সংক্রান্ত নানা বিষয়। নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয় একদিকে সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও তার বিচ্যুতির ওপর ও অন্যদিকে নাগরিক অধিকার, সুখসুবিধা ইত্যাদির ওপর। আইন ভঙ্গ কর যেসব কাজকর্ম হয় ও যার ফলে সমাজের ক্ষতি হয় সেগুলি অপরাধ ও দুর্নীতি বলে গণ্য। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ, সমাজে, শাসনব্যবস্থায় বিচার-ব্যবস্থার একটি বড় স্থান আছে। স্বাভাবিকভাবেই আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুত্ব খুবই। রাজনীতি যেমন দেশ শাসন করে, অর্থনীতি তেমনি যোগায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। সুতরাং অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদনের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। এ ধরনের প্রতিবেদন সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচায়ক। খেলাধূলা সম্পর্কিত সংবাদের পাঠক অসংখ্য এবং তাঁদের আগ্রহ সীমাহীন। খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ব্যক্তি-জীবন, রুচিপছন্দ, দীনতা বা উদারতা সবই সংবাদ। এছাড়া আছে ফ্যাশন বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোষাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ও নবতর প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদনে সাধারণত দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। একটি, বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণার অবসান। আর, অন্যটি— বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে কল্যাণমূলক আবিষ্কার। পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ডের বিস্তার মানব প্রজাতির পক্ষে বিষময়। সেই জন্য পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজন সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা, প্রাথমিকভাবে যার মূল নিহিত আছে সমাজের প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্যের ওপর। এই সুস্থতা সুনিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে নিয়মিত প্রতিবেদন যা সাংবাদিকদের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

২.৪ অনুশীলনী

১) সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস বলতে কী বোঝেন? অথবা, সংবাদ কতরকম বিষয়ভিত্তিক হতে পারে?

২) রাজনৈতিক প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩) আইনসভা বা সংসদ/বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কি? থাকলে তা কী?

৪) নগর ও সমাজজীবন বিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব কী?

৫) অপরাধ ও দুর্নীতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মানুষের আগ্রহ কেন?

৬) আইন-আদালত বিষয়ক প্রতিবেদনকে সংবাদপত্রে কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়?

৭) অর্থনীতি ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব কেন দিন দিন বেড়েই চলেছে?

৮) খেলাধুলা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য সাংবাদিককে বিশেষজ্ঞ হিসাব প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। কেন?

৯) ফ্যাশন-সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য বা প্রয়োজনীয়তা কী? শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোষাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন জনপ্রিয়ই বা কেন?

১০) বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিবেদন সর্বার্থে একটি বিশেষজ্ঞ-নির্ভর সাংবাদিকতা। এর কারণ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

১১) পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনাহীন যন্ত্র-সভ্যতা প্রসারের বিষময়তা সাধারণ মানুষ কিভাবে জানতে পারেন তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

১২) শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। কিভাবে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা যায়? এ বিষয়ে সাংবাদিকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১. The Active Reporter — James Lewis (Vikas Publications, Delhi).

২. The Indian Reporters' Guide — Richard Critchfield (Allied Pacific Private Limited, Bombay).

৩. Interpretative Reporting — Curtis D. MacDougall (Macmillan Limited, London).

৪. সংবাদ ও সাংবাদিকতা — অনুপম অধিকারী (পাত্র বুক হাউস, ৯ নবীন পাল লেন, কলকাতা ৯)

৫. সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা — সুজিত রায় (ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯)

৬. বিষয় সংবাদিকতা — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (লিপিকা, কলেজ রো, কলকাতা ৯)

৭. The Student Journalist — Edmund C. Arnold and Krieghbaum (New York University Press).

৮. The Professional Journalist — John Hohenberg (Henry Holt and Company, New York).

৯. The Practice of Journalism — John Dodge and George Viner (Heinemann, London).

১০. News Reporters and New Sources — Herbert Strentz (Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 110 001).

১১. Professional New Writing — B. Garrison (Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ).

১২. Professional Feature Writing — B. Garrison (Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ).

১৩. Into the Newsroom : An Introduction to Journalism — Leonard Ray Teel and Ron Taylor (Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 110 001).

১৪. Basic Journalism — Rangaswami Parthasarathi.

১৫. A History of Press in India — S. Natarajan (Asia Publishing, Calcutta).

১৬. A History of Indian Journalism — Mohit Mitra (National Book Agency Private Ltd., Calcutta).

১৭. Theory and Practice of Journalism — B. N. Ahuja (Surjeet Publication, New Delhi).

একক ৩ □ ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবরের প্রকৃতি

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবর

- ৩.২.১ বিপর্যয়
- ৩.২.২ দুর্ঘটনা
- ৩.২.৩ দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা
- ৩.২.৪ যুদ্ধ
- ৩.২.৫ দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা

৩.৩ সাংবাদিক সম্মেলন

৩.৪ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

৩.৫ তদন্তমূলক প্রতিবেদন

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হল—

- ঘটনাস্থলের খবর এবং সেখান থেকে পাঠানো খবরের প্রকৃতি,
- সাংবাদিক সম্মেলন এবং তার প্রস্তুতি,
- ব্যাখ্যামূলক ও তদন্তমূলক সাংবাদিকতার ধরণ এবং তার বৈশিষ্ট্য।

৩.১ প্রস্তাবনা

ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো নানা ধরনের খবরের চরিত্র অনুযায়ী তার পরিবেশনায় তারতম্য থাকে। বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে এই ধরনের প্রতিবেদন রচনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনকে কী উপায়ে সবচেয়ে ফলপ্রসূ রূপে ব্যবহার করা যায় তাও এখানে আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের

প্রতিবেদন রচনার পাশাপাশি ব্যাখ্যামূলক এবং তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে আলোচিত হয়েছে।

৩.২ ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবর

সংবাদ মাধ্যম নানা সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করে। সংবাদ সংস্থার পাঠানো খবর নিয়মিত বিট ইত্যাদির পাশাপাশি হঠাৎ করে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ঘটনার খবরও তাদের প্রচার বা সম্প্রচার করতে হয়। যখন উক্ত ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিক খবর পাঠান তখন তাকে ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবর বা Spot news বলা হয়। এই ধরনের খবরে প্রত্যক্ষদর্শীর উষ্ণতা প্রয়োজন। এই খবরের সংবাদমূল্য তার নতুনত্ব, উত্তেজক চরিত্র এবং নিয়মিত না ঘটার মধ্যেই নিহিত। নিচে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ ধরনের প্রতিবেদন রচনার কৌশল ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হল।

৩.২.১ বিপর্যয়

বিপর্যয় হল হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন বিরাট দুর্ঘটনা। যেমন, আমেরিকার ট্রেড সেন্টার ধ্বংস বা রাজধানী রেল দুর্ঘটনা। এই খবরগুলিতে স্বভাবতই দর্শক বা পাঠকের আগ্রহ থাকে প্রায় সর্বজনীন। বিপর্যয় যেহেতু খুব বেশি হয়না তাই এই সংক্রান্ত খবর করার ক্ষেত্রে প্রথমেই বিপর্যয়ের মাত্রা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। বিপর্যয়ের রেশ যেহেতু বেশ কিছুদিন ধরে চলে সেহেতু এই সংক্রান্ত খবর পরিবেশনে 'ফলো-আপ' বা বেশ কিছুদিন ধরে ঘটনাটির ফলাফলের নানা মোড় বা বাঁক সম্পর্কে আলোকপাত করতে হয়। বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিপর্যয়ের কারণ এবং ফলাফলের মাত্রা সম্পর্কে অনুসন্ধান বস্তুনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। এই ধরনের বিপর্যয় আগে কখনো ঘটে থাকলে তার মাত্রার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা পাঠক বা দর্শকমহলে অধিক গৃহীত হয়। বিপর্যয়ের খবর প্রকাশের পর উদ্ধারকাজ বা পুনরুদ্ধারের খবরও গুরুত্বসহকারে ছাপা উচিত। এক্ষেত্রে মানবিক আবেদনের দৃষ্টিকোণ অনেক ক্ষেত্রেই খবরের পরিবেশনকে অনন্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজধানী দুর্ঘটনার কয়েকদিন পরে খবরে প্রকাশিত হয় এক শিখ বৃদ্ধ গাছের গুঁড়ি দিয়ে ট্রেনের জানলা ভেঙে বহু আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে নিজেও আহত হয়েছেন। রেল দুর্ঘটনার খবর প্রকাশের গম্ভীর প্রেক্ষাপটে এই খবর অনবদ্য মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ ছিল।

৩.২.২ দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনা সব সময়েই খবর। দুর্ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে প্রথমেই মৃত বা আহতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানানো উচিত। মৃত বা আহতদের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর অর্থাৎ নাম, বয়স ইত্যাদি জানানো প্রয়োজন। দুর্ঘটনার ফলাফল বা ক্ষয়ক্ষতির পরিণাম সম্পর্কে সরকারী মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। দুর্ঘটনার স্থান এবং সময় সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা উচিত। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কেও সরকারী তথ্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অন্য কোন মতামত থাকলে তা যথাযথভাবে সূত্র উল্লেখ করে জানানো উচিত। দুর্ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে তার ফলো-আপও করা হয়। অগ্নিকাণ্ড বা বাড়ি ভেঙে পড়ার মত দুর্ঘটনার খবর পরিবেশনে ঘটনার বিবরণের পাশাপাশি উদ্ধারকার্য সম্পর্কেও তথ্যাদি জানানো উচিত। এ প্রসঙ্গেও সরকারী ভাষ্যকে

গুরুত্ব দিতে হবে। এ ধরনের খবর পরিবেশনে ঘটনার পাশাপাশি ঘটনার অগ্রগতিও জানানো উচিত। অর্থাৎ আহতদের অবস্থা বা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তাজা খবর দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও কথা বলা যেতে পারে। তদন্তকারী সরকারী ব্যক্তিদের মতামত নেওয়াও উচিত। মোটামুটি এভাবেই একটি দুর্ঘটনার প্রতিবেদন রচনা করা যায়। তবে ঘটনাভেদে রচনাশৈলীর কিছু পরিবর্তন বা পরিমার্জন ঘটতে পারে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

৩.২.৩ দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনার সময় সাংবাদিককে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিকের আত্মসংযম সমাজের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন ঘটনার প্রতি বাড়তি গুরুত্ব আরোপ গোটা পরিস্থিতিকে একটা খারাপ মোড় দিতে পারে একথা সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমকে মনে রাখতে হবে। অনেক সময়ে বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালনে সংবাদ মাধ্যমকে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার প্রকাশ বা সম্প্রচারের সময়েও আত্মনিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের জারি করা নির্দেশিকা প্রণিধানযোগ্য।

সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার পরে সংবাদপত্রগুলির কী ভূমিকা হবে সে সম্বন্ধে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা (১৯৬৯) ঃ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন আছে বলেই সঠিক ভাবধারায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও জনমত গঠন করা এবং জাতীয় সংহতি অর্জন করার লক্ষ্যে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের মননের প্রতিফলন ঘটানোর ব্যাপারে সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—এ কথাটাকে স্বীকার করে নিয়েই ভারতের প্রেস কাউন্সিল মনে করেন যে, যদি সাম্প্রদায়িকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলির ওপর প্রতিবেদন ও মন্তব্য করতে গিয়ে কোনও সংবাদপত্র নির্দিষ্ট নিয়ম ও মান বজায় রেখে চলতে না পারে, তবে সংবাদপত্রের মহান উদ্দেশ্যও যেমন খর্ব হবে, তেমনই সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতিও বিনষ্ট হবে ও অখণ্ডতা ব্যাহত হবে। খুব বিস্তারিত আলোচনায় না গেলেও নিচের কয়েকটি বিষয়কে কাউন্সিল সাংবাদিকতার নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন।

(১) সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনও তথ্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করা অথবা কোনও অপরীক্ষিত গুজবকে অথবা ভিত্তিহীন ধারণা বা সিদ্ধান্তকে প্রকৃত তথ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজে মন্তব্য করা।

(২) কোনও খবর বা মতামত পরিবেশনের ক্ষেত্রে মাত্রাধিক অথবা অসংযমী ভাষা প্রয়োগ—তা এমনকী সাহিত্যধর্মী আতিশয্য বা অলঙ্কার প্রয়োগ বা জোর দিয়ে কিছু বলার খাতিরেও নয়।

(৩) প্রকৃত বা মিথ্যা—যে কোনও অভিযোগ প্রতিকারের অছিলায় হিংসাকে প্ররোচিত করা অথবা প্রশ্রয় দেওয়া।

(৪) শান্তিপূর্ণ, বৈধ বা আইনসঙ্গতভাবে কোনও অভাব-অভিযোগের মীমাংসা হোক—সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃত অভিযোগগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই যখন সংবাদপত্রের যথার্থ দায়িত্ব, তখন মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও অভিযোগ খাড়া করা অথবা প্রকৃতপক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগকে বড় করে দেখানো শুধু যে অন্যায়

তাই-ই নয়, তা সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধও বটে। কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়ে, বিশৃঙ্খলা ত্বরান্বিত হয়।

(৫) কোনও সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিবিশেষের ওপর কুৎসামূলক ও অন্যায় আক্রমণ—বিশেষত যখন শুধুমাত্র কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ জাতিভুক্ত হওয়ার দরুন তার বা তাদের ওপর এই আক্রমণ শানানো হয়।

(৬) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ জড়িত আছেন এমন ঘটনাকে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া।

(৭) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দিগ্ধতা বাড়ায় না অথবা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির জন্ম দেয় না এমন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া।

(৮) আসলে মিথ্যা কিন্তু বিপজ্জনক খবর ছাপানো কিংবা কোনও খবর বা অন্য কিছু সম্বন্ধে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা, যার ফলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অথবা আঞ্চলিক বা ভাষাগত গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে।

(৯) প্রকৃত ঘটনাকে বাড়িয়ে স্পর্শকাতর করে তোলা এবং শীর্ষ শিরোনামে অথবা বড় বড় অক্ষরে সাজিয়ে এমন খবর পরিবেশন করা, যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়।

(১০) বিভিন্ন ধর্ম অথবা বিশ্বাস অথবা ধর্মপ্রবর্তকদের সম্পর্কে অসম্মানজনক, মর্যাদাহানিকর অথবা অপমানজনক মন্তব্য করা অথবা তাদের সঙ্গে ওই ধরনের কোনও কিছুর সম্পর্ক নির্দেশ করা।

সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ও সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা (১৯৯১) ঃ

(১) অস্থিরতা, ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন সাম্প্রদায়িক লেখার ওপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বহন করা উচিত।

(২) দোষী সংবাদপত্র অথবা সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারকে কখনও কখনও ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। কিন্তু তা কখনোই আইনের সীমা লঙ্ঘন করবে না। যদি কোনও সাংবাদিক গ্রেপ্তার হন অথবা তল্লাশি এবং আটক করা যদি জরুরি হয়, তবে প্রেস কাউন্সিলকে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তা জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখে জানানো একটু সুষ্ঠু প্রথা।

(৩) কোনও অবস্থাতেই বিজ্ঞাপন কম করে দেওয়া, সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র বাতিল করা, নিউজপ্রিন্টের কোটা বা অন্যান্য সুবিধা বাতিল করার মতো প্রতিশোধমূলক কোনও কাজ কর্তৃপক্ষ করবেন না।

(৪) সংবাদপত্রগুলিকে প্ররোচনামূলক এবং রোমাঞ্চকর শিরোনাম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৫) শিরোনামের মধ্যে নীচে মুদ্রিত খবরের বিষয়বস্তু যেন প্রতিফলিত হয়।

(৬) যদি মৃতের সঠিক সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ থাকে অথবা বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া সংখ্যাগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে, তবে শিরোনামে তা কম করে দেখানোই ভাল।

(৭) শিরোনামে যদি কোনও বিবৃত অভিযোগ ছাপা হয়, তবে যে ব্যক্তি বা সংস্থা সেই উক্তি করেছেন তার উল্লেখ থাকতে হবে অথবা অভিযোগটিকে অন্তত উদ্ধৃতি চিহ্ন-সংবলিত হতে হবে।

(৮) কোনরকম মন্তব্য অথবা মূল্যায়ন ছাড়াই সংবাদ প্রতিবেদন ছাপা উচিত।

(৯) কোনও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অথবা দলীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়, এমনকী নিরপেক্ষতার প্রশ্ন যেন পাঠকের মনেও না আসে সে ব্যাপারে যত্ন নিতে হবে।

(১০) সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করা হবে তাতে যেন সংযম বজায় থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার ব্যাপারে তে যেন সহায়ক হয়।

(১১) ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে বিলম্ব না করে যথাযথ গুরুত্বসহকারে তা প্রকাশ করতে হবে এবং গুরুতর ক্ষেত্রে দুঃখ প্রকাশও করতে হবে।

(১২) উপরি-উক্ত নিয়ম-নির্দেশ সাংবাদিকরা যেন আত্মস্থ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে প্রেস কাউন্সিল সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

জানুয়ারি ২১-২২, ১৯৯৩-এ রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের পর সংবাদপত্রগুলিকে দেওয়া প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা ঃ

সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত ত্রুটি ও নীতি-বিগর্হিত কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্কতা বিষয়ে নির্দেশিকা ঃ

(১) সাম্প্রদায়িক কোনও তথ্য বা ঘটনাকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করা বা কোনও গুজব, ভিত্তিহীন সন্দেহ বা সিদ্ধান্তকে যাচাই না করেই সত্য ও সঠিক বলে চালানো এবং ওই ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজের মন্তব্য প্রতিষ্ঠা করা।

(২) কোনও খবর অথবা মতামত পরিবেশনের ক্ষেত্রে মাত্রাধিক অথবা অসংযমী ভাষা প্রয়োগ— তা এমনকী সাহিত্যধর্মী আতিশয্য অথবা অলঙ্কার প্রয়োগ বা জোর দিয়ে কিছু বলার খাতিরেও নয়।

(৩) প্রকৃত বা মিথ্যা—যে কোনও অভিযোগ প্রতিকারের অছিলায় হিংসাকে প্ররোচিত করা অথবা প্রশ্রয় দেওয়া।

(৪) শান্তিপূর্ণ, বৈধ ও আইনসঙ্গতভাবে কোনও অভাব-অভিযোগের মীমাংসা হোক—এ কথা মনে রেখে প্রকৃত অভিযোগগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই যখন সংবাদপত্রের যথার্থ দায়িত্ব, তখন মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও অভিযোগ খাড়া করা অথবা প্রকৃতপক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগকে বড় করে দেখানো শুধু যে অন্যায় তা-ই নয়, তা সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধও বটে। কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়ে, বিশৃঙ্খলা তরান্বিত হয়।

(৫) কোনও সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিবিশেষের ওপর কুৎসামূলক ও অন্যায় আক্রমণ—বিশেষত যখন শুধুমাত্র কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ জাতিভুক্ত হওয়ার জন্য তার বা তাদের ওপর এই আক্রমণ শানানো হয়।

(৬) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ জড়িত আছেন এমন ঘটনাকে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া।

(৭) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দিগ্ধতা বাড়ায় না অথবা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির জন্ম দেয় না এমন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া।

(৮) আসলে মিথ্যা কিন্তু বিপজ্জনক খবর ছাপানো কিংবা কোনও খবর বা অন্য কিছু সম্বন্ধে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা—যার ফলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অথবা আঞ্চলিক বা ভাষাগত গোষ্ঠীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে।

(৯) প্রকৃত ঘটনাকে বাড়িয়ে স্পর্শকাতর করে তোলা এবং শীর্ষ শিরোনামে অথবা বড় বড় অক্ষরে সাজিয়ে এমন খবর পরিবেশন করা, যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

(১০) বিভিন্ন ধর্ম অথবা বিশ্বাস অথবা ধর্মপ্রবর্তকদের সম্পর্কে অসম্মানজনক, মর্যাদাহানিকর অথবা অপমানজনক মন্তব্য করা অথবা তাদের সঙ্গে ওই ধরনের কোনও কিছুর সম্পর্ক স্থাপন করা।

৩.২.৪ যুদ্ধ

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বাদ দিলে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদকের (War Correspondent) সঙ্গে সংবাদ জগত ভালভাবে পরিচিত হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থেকে। তার আগে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব ছিল এবং তা সামরিক বাহিনীর গুণকীর্তনেরই সামিল ছিল। হাল আমলের ইরাক যুদ্ধ বা আগের দশকের উপসাগরীয় যুদ্ধ সংবাদ মাধ্যমে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে। উপগ্রহ টেলিভিশন চ্যানেলগুলি অবশ্যই এ বিষয়ে অগ্রণী। যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদকরা এখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে আসেন। এই ধরনের প্রতিবেদনে সামরিক ক্ষয়ক্ষতি জানানোর পাশাপাশি মানবিক আবেদনের একটি দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে। সামরিক এলাকার বাইরে সাধারণ নাগরিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন কিনা, যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি কোন সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করবে কিনা, যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে— এইরকম অজস্র দৃষ্টিকোণ আজ যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যুদ্ধরত দুপক্ষের বক্তব্য সমান গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা উচিত। বর্তমান পৃথিবীর যুদ্ধবিরোধী অবস্থানও এ প্রসঙ্গে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। সদ্য ঘটে যাওয়া ইরাক যুদ্ধের সময়, তার আগের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়, এমনকি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ একপেশে বক্তব্য প্রচার বারংবার বিতর্কের শিরোনামে এসেছে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কেও দুপক্ষের বক্তব্য যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকের নিজস্ব বিচারবোধ এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগও বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘটনার প্রকৃত চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করেন।

৩.২.৫ দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা

দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রেও সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমের আত্মসংযম এবং নৈর্ব্যক্তিকতা বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন চটকদারি পরিবেশন আগুনে ঘৃতাহুতির সমান হতে পারে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কথা আগেই সবিশেষে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা অথবা দুদলের সংঘর্ষ বিষয়ক খবর পরিবেশনের সময় সংবাদ মাধ্যমকে মনে রাখতে হবে তা যেন কোন পক্ষের মুখপত্রে না পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সংঘর্ষের কারণ, ফলাফল এবং পরিণতি সম্পর্কে সংযত, তথ্যধর্মী আলোচনা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সরকারী বক্তব্য প্রকাশের পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণসহ সাংবাদিকের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রও উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সাংবাদিকের একমাত্র তথ্যনিষ্ঠতার প্রতি দায়বদ্ধ

থাকা উচিত। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতির কারণে কোন পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে। এতে কেবল সামাজিক ক্ষতিই সাধিত হয় না, সংবাদ মাধ্যমের বস্তুনিরপেক্ষ চরিত্রও প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়।

৩.৩ সাংবাদিক সম্মেলন

সাংবাদিক সম্মেলন হল কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বা একাধিক আমন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এটি একপ্রকার ক্ষুদ্র দলগত জ্ঞাপন প্রক্রিয়া (Small group communication)। এক্ষেত্রে কোন বিষয় সম্পর্কে সরাসরি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজককে প্রশ্ন করা যায়। সরাসরি মুখের কথা হবার ফলে এর সংবাদমূল্য তথা বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সকল ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা কোন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকার নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান তাকে মিট দ্য প্রেস বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে সাংবাদিকরা বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। তখন সেটি হল মিট দ্য প্রেস। আর কোন বিশেষ খবর জানানোর জন্য কোন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলের নেতা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানান তখন তা হল সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্স।

সাংবাদিক সম্মলনে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য সাংবাদিকের কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেগুলি হল—

- প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্যাদি মজুত করা।
- প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির একটু পূর্ব-তালিকা প্রস্তুত করা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন অন্যান্য সাংবাদিকরাও এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। সেইজন্য একই বিষয়ে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন ভেবে রাখা জরুরী।
- প্রশ্ন উত্থাপনের সময় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমার চেয়ে নমনীয় আচরণ অনেক বেশি ফলপ্রসূ।
- প্রশ্ন উত্থাপনের সময় মনে রাখা উচিত এক্ষেত্রে যেন পাঠক বা দর্শকের আগ্রহ প্রতিফলিত হয়।
- প্রশ্ন উত্থাপনের সময় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিফলিত না হওয়াই ভাল।
- সাংবাদিক সম্মেলনে খুব চড়া গলায় কথা বলা বা মেজাজ হারিয়ে ফেলা দৃষ্টিকটু।
- প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত। এর ফলে তথ্য পাওয়া সহজ হবে। বড় প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া সহজ।
- তর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। সাংবাদিকের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব সম্মেলনকে কেবল সুচারুভাবে সম্পন্ন করবে না, অনেক বেশি তথ্য জানতেও সাহায্য করবে।

৩.৪ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

আধুনিক পৃথিবীতে খবর পরিবেশনের অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। নামকরণ থেকেই স্পষ্ট যে এই ধরনের প্রতিবেদনে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কেবলমাত্র কোন ঘটনার উল্লেখ নয়, এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হল ঘটনাকে কার্য-কারণ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা। সেই কারণে নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ

পরিবেশন করে বা ব্যাখ্যা করা এই প্রতিবেদনের অন্যতম চাহিদা। প্রত্যেক ঘটনারই কিছু প্রচ্ছন্ন দিক থাকে, থাকে প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দৃষ্টিকোণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ত্রিমাত্রিক এক প্রক্রিয়া। অতীতের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করাই এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য। রসকু ড্রামন্ড (Roscoe Drummond) নামে আমেরিকার এক বিখ্যাত ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদকের মতে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের অর্থ হল গতকালের পশ্চাদপটে আজকের ঘটনাকে বিচার করে আগামীকালের অর্থপ্রদান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁক দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কার্টিস ডি. ম্যাকডঙ্গাল (Curtis D. MacDongall) তাঁর Interpretation Reporting গ্রন্থে লিখেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মার্কিনীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন নি। এর ফলে সংবাদ রচনাশৈলীতে পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন অধিকাংশ মার্কিনী অবাক হননি।

ম্যাকডঙ্গাল-এর মতে সাংবাদিককে পরিদর্শকের উর্ধ্বে উঠতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে যে কোন খবরই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ঘটনার পারম্পর্যে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাজ। যুক্তিবোধ, গবেষণাধর্মিতা তাই একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকের অবশ্যম্ভাবী চরিত্র।

আজকের সমাজে ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। ওয়াল্টার লিপম্যান একদা বলেছিলেন সমাজ যত জটিল ও অস্পষ্ট হবে খবরের পশ্চাদপট ততত গুরুত্বপূর্ণ হবে। একথা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বর্তমানে প্রমাণিত। এছাড়াও বর্তমান সময়ে উদ্দীষ্ট পাঠক / দর্শক (target audience) মূল সংবাদ পেয়ে যান খুব তাড়াতাড়ি। মূলত টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন একটি খেলার সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে টেলিভিশনে। তখন উদ্দীষ্ট দর্শক খেলার প্রতিটি মুহূর্তের অগ্রগতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এমনকি সরাসরি সম্প্রচার না হলেও খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিভিশনের মাধ্যমে খেলার ফলাফল সম্প্রচারিত হয়। তখন পরের দিনের সংবাদপত্রে কেবলমাত্র খেলার ফলাফল প্রকাশ করলে মাধ্যমটি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলবে। তাই স্বল্প পরিসরে ফলাফল জানানোর পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ফলাফলের ব্যাখ্যা, বিশেষজ্ঞের মতামত। এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের কথাই ধরা যাক না কেন। ফলাফলের পাশাপাশি টস জিতে ভারতের ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত অথবা ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতা কেবল সংবাদপত্রেই আলোচিত হয়নি। এমনকি টেলিভিশনেও খেলা-সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানে ফলাফলের পাশাপাশি এই ব্যাখ্যামূলক আলোচনা উঠে এসেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ঘটনার নিরস প্রতিবেদন নয়। বরং তা লক্ষ্য দর্শককে শিক্ষিত করে ; 'কে' এবং 'কি'-র স্বল্প পরিসর থেকে 'কেন' এবং 'কিভাবে'-র বৃহৎ প্রেক্ষাপটে নিয়ে যায়।

৩.৫ তদন্তমূলক প্রতিবেদন

তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলতে বোঝায় জনস্বার্থে রচিত এক বিশেষ ধরনের প্রতিবেদন। সুগভীর অনুসন্ধানের

মাধ্যমে জনস্বার্থের পরিপন্থী আপাত লুক্কায়িত কোন তথ্যকে উন্মোচিত করাই মূলত তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলে পরিচিত। পল এন উইলিয়ামস (Paul N. Williams)-এর মতে এটি একটি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, কেবলমাত্র তথ্যের অনুসন্ধান নয়। বরং তথ্যের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিবেদনে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। কিন্তু সেখানে আবেগ বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের কোন স্থান নেই।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে অনেকে সমাজের বিবেকের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান। জাস্টিস এ. এন. গ্রোভার (A. N. Grover) তাঁর Press and Law বইতে ক্লার্ক আর মলেভহগ (Clark R. Mollevhogg)-এর Investigative Reporting বইটির মুখবন্ধ থেকে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

- এটি সংবাদিকের নিজস্ব কাজ। অন্য কোন ব্যক্তি তাঁকে সহায়তা করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকের ভূমিকাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ;
- এই তদন্তের বিষয় অবশ্যই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়া প্রয়োজন ; এবং
- জনগণের কাছ থেকে সত্য গোপন বা মিথ্যা চাপিয়ে দেওয়ার কোন প্রচেষ্টা থাকা চলবে না।

সাধারণত অন্যায়, অপরাধ, অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিষয় হতে পারে। এছাড়াও সমাজ তথা জনগণের জন্য জরুরি যে কোন বিষয়ই তদন্তমূলক প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত এ ধরনের সংবাদিকতার চরিত্রহানি ঘটায়।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনা থেকে। ১৯৭২ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়াশিংটনের ওয়াটারগেট হোটেলে অবস্থিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দপ্তরে আড়িপাতার যন্ত্র বসানো হয়েছিল এবং এই ঘটনায় মদত দিয়েছিলেন খোদ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং রিপাবলিকান পার্টি— এই তথ্য তদন্তমূলক অনুসন্ধান করে উদ্ধার করেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার দুই তরুণ সাংবাদিক কার্ল বার্নস্টেইন (Carl Bernstein) এবং বব উডওয়ার্ড (Bob Woodward)। এই তদন্তের ফলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়।

বার্নস্টেইন এবং উডওয়ার্ড ওয়াটারগেট ঘটনায় গ্রেপ্তার চার ব্যক্তিকে জেরা করার মধ্যে দিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। তদন্তের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হয়। তাঁরা বলেছিলেন, "আমরা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইনি, আমরা কেবল খবরটাকে তাড়া করেছিলাম।" এরকমই কোন ঘটনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থেকে তদন্তমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয়। পুলিৎজার জয়ী সাংবাদিক রবার্ট গ্রিন এই বিষয়টিকেই বলেছেন খবর শোঁকা বা। এর ভিত্তিতেই তদন্তের প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি, প্রমাণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সাংবাদিককে যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

ভারতবর্ষে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা শুরু হয় মূলত ১৯৭৭ সালে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পর। বিশেষত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে সেসময় এই ধরনের বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ভাগলপুর জেলে বন্দীদের পুলিশ কর্তৃক অন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা, কুয়ো তেল কেলেঙ্কারি,

বোফর্স কেলেঙ্কারি, হাওলা কেলেঙ্কারি থেকে সাম্প্রতিককালের তহেলকা কাণ্ড বা কার্গিল যুদ্ধের সময় কফিন কেলেঙ্কারির মত অজস্র তদন্তমূলক প্রতিবেদন ভারতের সাংবাদিকতার ধারাকে পুষ্ট করেছে।

ওয়াল্টার লিপম্যান বলেছিলেন সমাজ যত জটিল হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গুরুত্ব এবং ক্ষেত্র তত প্রসারিত হবে। বর্তমান জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যায়-অবিচারের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই প্রসারিত হচ্ছে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার সুযোগ। কিন্তু এর পাশাপাশি সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্বও বাড়ছে। তদন্তমূলক সাংবাদিকতার লক্ষ্য জনস্বার্থে কোন ঘটনার লুক্কায়িত দৃষ্টিকোণ যথাযাথ তথ্যের সাহায্যে উন্মোচন করা। এক্ষেত্রে মিথ্যা বা অর্ধসত্যের কোন স্থান নেই। কারণ তাতে জনস্বার্থই লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু আজকের মারাত্মক প্রতিযোগিতার মাঝে সাংবাদিকের সামনে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নামে মিথ্যা বা অর্ধসত্য প্রচারের টোপও প্রচুর। এরকম ঘটনার উদাহরণ দেশে বিদেশে খুব কমও নয়। কিন্তু সমাজের বিবেকের যে কণ্ঠস্বর প্রকৃত তদন্তমূলক সাংবাদিকতা প্রকাশ করে, এ ধরনের প্রবণতা তার পরিপন্থীই কেবল নয়, এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের প্রতি জনগণের আস্থাও কমিয়ে দেয়। স্বভাবতই তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থেই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বা অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের মতামত প্রাসঙ্গিকভাবে নীচে উল্লিখিত হল—

অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা, আদর্শ ও প্রক্রিয়ার ঃ

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে

(ক) এটি কোন সাংবাদিকেরই কাজ হতে হবে, অন্য কারোর নয়

(খ) এ বিষয়টি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট হতে হবে

(গ) জনসাধারণের থেকে সত্যকে গোপন রাখার একটি প্রয়াস চলে

(১) প্রথম আচরণবিধিটি (ক) এর প্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্তের অনুসারী। এই অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথাগতভাবেই তদন্তকারী সাংবাদিককে তাঁর লেখাটি সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে যেগুলির অনুসন্ধান, অনুবেক্ষণ এবং সত্যতা নিরূপণ তিনি স্বয়ং করেছেন। তৃতীয় কোনও পক্ষের আহরিত তথ্য যা কোনও প্রত্যক্ষ, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক পরীক্ষিত নয়-—তার ভিত্তিতে লেখাটি তৈরি করা উচিত নয়।

(২) কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা উচিত কোন কোন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে একটা সংঘাত দেখা দিতে পারে। তদন্তকারী সাংবাদিককে সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং একদিকে উন্মোচন ও অন্যদিকে গোপনীয়তার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, তবে সবার ওপরে জনকল্যাণকে স্থান দিয়েই এটা করতে হবে।

(৩) তদন্তকারী সাংবাদিককে অপরিণত, অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট তথ্য, যা স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা নয়, সেগুলি থেকে ঝটিতি ভেল্কিবাজির মতো চমকপ্রদ কিছু তৈরি করে ফেলার লোভ সংবরণ করতে হবে।

(৪) কাল্পনিক তথ্যকে ভিত্তি করার, অস্তিত্বহীন কোনও কিছুকে খুঁচিয়ে বার করার বা কারণ ব্যতিরেকেই অনুমান করার প্রবণতাকে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। যত বেশি সম্ভব তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে, সেগুলি কাজে লাগাতে হবে এবং প্রেসে পাঠানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৫) সংবাদপত্রগুলির তথ্যের সত্যতা ও যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য কঠোর নিদর্শ থাকা উচিত। তদন্তের রায়গুলিকে বিষয়গতভাবে পরিবেশন করা উচিত, অতিরঞ্জন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে।

(৬) সাংবাদিকের তদন্তাধীন বিষয় অথবা প্রশ্নটি নিয়ে এমনভাবে এগোনো উচিত নয়, যাতে তিনি নিজেই অভিযোক্তা অথবা মামলার অধিবক্তা হয়ে যান। সাংবাদিকের মনোভাব হওয়া উচিত স্পষ্ট, সঠিক এবং নিরপেক্ষ। বিবেচ্য বিষয়টির পক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত তথ্যগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর সেগুলি স্পষ্টভাবে এবং আলাদা আলাদাভাবে বিবৃত করা উচিত যার মধ্যে থাকবে না কোনও একতরফা সিদ্ধান্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য। প্রতিবেদনটি সুরে অন্তর্বস্তুতে হওয়া উচিত পরিমিত, শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ, ঠিক এমনটি হওয়া উচিত তার ভাষাও। কখনোই অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক, কণ্টকাকীর্ণ, বিদ্রূপাত্মক এবং ভর্ৎসনামূলক হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যখন সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয় যার অভিযোগে বর্ণিত কার্যকলাপ অথবা অশোভন আচরণ নিয়ে তদন্ত চলছে। অথবা তদন্তকারী সাংবাদিকের কাজকর্ম এমন হওয়া উচিত নয় এবং সেই ব্যক্তি যার অভিযোগে বর্ণিত অপরাধমূলক কাজকর্ম এবং অশোভন আচরণ তদন্তাধীন রয়েছে তার বিরুদ্ধে অপরাধ অথবা নিরপরাধের রায় এমনভাবে দেওয়া উচিত নয় যাতে মনে হয় তিনি (সেই সাংবাদিক) একজন বিচারক হিসাবে অভিযুক্তের বিচার করছেন।

(৭) একটি প্রতিবেদনের তদন্ত, উপস্থাপনা ও প্রকাশনার গোটা প্রক্রিয়ায়, তদন্তকারী সাংবাদিক/সংবাদপত্রের অপরাধ ব্যবহারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই নীতি অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগকৃত অপরাধ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিরপেক্ষ, নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদির দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিরপরাধ।

(৮) কারও ব্যক্তিগত জীবন, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির হলেও, তা তার একান্ত নিজস্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও ব্যক্তির অপরাধ / অন্যায়ের সঙ্গে তার সরকারি পদ বা ক্ষমতার অপব্যবহার জড়িত থাকার তথা জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত জীবন ও তার গোপনীয়তার উন্মোচন অনুমোদনযোগ্য নয়।

(৯) একজন সাংবাদিকের তদন্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির স্পষ্ট প্রয়োগ হতে পারে না। তবুও সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলিকে সমদর্শিতা, নৈতিকতা এবং বিবেকের ভিত্তিতে পথনির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৬ সারাংশ

খবরের নিয়মিত যোগানের পাশাপাশি এমন বহু ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে আগে থেকে যার আঁচ পাওয়া

যায় না। সেই সমস্ত ঘটনার খবর সাংবাদিককে সংগ্রহ করতে হয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে। একেই বলা হয় Spot news। ঘটনাভেদে এর পরিবেশনের শৈলীও পৃথক। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক সম্মেলন খবর সংগ্রহের একটি বড় মাধ্যম। সরাসরি মন্তব্য পাবার দরুন এটির সংবাদমূল্য তথা বিশ্বাসযোগ্যতাও বেশি। এর পাশাপাশি কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ দেবার পাশাপাশি তার গভীরতর ব্যাখ্যা বা অনুসন্ধান প্রয়োজন। এটি পাঠক বা দর্শককে শিক্ষিত করে, ঘটনার অন্তরালের আপাত লুক্কায়িত ঘটনা সর্বসমক্ষে উন্মোচন করে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যামূলক এবং তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তাও উর্ধ্বমুখী।

৩.৭ অনুশীলনী

১) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

ক) দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন রচনার বিশেষত্ব কি?

খ) ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের জনপ্রিয়তা উর্ধ্বমুখী কেন?

গ) তদন্তমূলক সাংবাদিকতা কি? তার সীমা কি নির্দিষ্ট? এর বৈশিষ্ট্য কি?

২) টীকা :

ক) বিপর্যয়ের খবর

খ) দুর্ঘটনার খবর

গ) দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনার খবর

ঘ) সাংবাদিক সম্মেলন

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. M. V. Kamath : Professional Journalism.

২. M. V. Kamath : Journalist's Hand.

৩. Patanjali Sethi : Professional Journalism.

৪. Melvin Mencher : Basic News Writing

৫. S. K. Aggarwal : Investigative Journalism in India.

৬. Chalapati Rao : The Romance of the Newspaper.

৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : সংবাদ বিদ্যা।

একক ৪ □ সংবাদপত্র ও সংবাদ ভাবনা

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ ফিচার

- ৪.২.১ ফিচারের সংজ্ঞা
- ৪.২.২ ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদন
- ৪.২.৩ ফিচারের বিষয়বস্তু
- ৪.২.৪ ফিচারের বৈশিষ্ট্য
- ৪.২.৫ ছবির ব্যবহার
- ৪.২.৬ ফিচারের গুরুত্ব

৪.৩ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

- ৪.৩.১ মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ
- ৪.৩.২ বৈশিষ্ট্য
- ৪.৩.৩ মানবিক আবেদনমুখী দৃষ্টিকোণ

৪.৪ সঙ্গীত সমালোচনা বা পর্যালোচনা

- ৪.৪.১ সমালোচনাকারী
- ৪.৪.২ সঙ্গীত সমালোচনা কী
- ৪.৪.৩ ছবির ব্যবহার
- ৪.৪.৪. মিউজিক রিভিউ এর প্রয়োজনীয়তা

৪.৫ পুস্তক সমালোচনা

- ৪.৫.১ সমালোচনাকারী
- ৪.৫.২ সমালোচনা কী
- ৪.৫.৩ পাঠক কারা
- ৪.৫.৪ পুস্তক সমালোচনার বৈশিষ্ট্য
- ৪.৫.৫ পুস্তক সমালোচনার নিয়ম
- ৪.৫.৬ মাধ্যম নির্বাচন
- ৪.৫.৭ সমালোচনা লেখার পদ্ধতি
- ৪.৫.৮ পুস্তক সমালোচনায় সংবাদিকতা সুলভ লেখা

৪.৬ সিনেমা সমালোচনা
৪.৬.১ সিনেমা সমালোচনা কী
৪.৬.২ সমালোচনাকারী
৪.৬.৩ সমালোচনা শৈলী
৪.৬.৪ সমালোচনা করার নিয়ম
৪.৬.৫ জনপ্রিয়তার কারণ
৪.৭ নাট্য সমালোচনা
৪.৭.১ নাটক সমালোচনা কী
৪.৭.২ সমালোচনা করার নিয়ম
৪.৭.৩ সমালোচনা লেখার কৌশল
৪.৮ প্রদর্শনী সমালোচনা
৪.৮.১ সমালোচনাকারী
৪.৮.২ প্রদর্শনী সমালোচনা লেখার নিয়
৪.৮.৩ চিত্রকলা ও রং প্রসঙ্গ
৪.৮.৪ শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার
৪.৯. সাক্ষাৎকার গ্রহণ
৪.৯.১ সাক্ষাৎকারী
৪.৯.২ সাক্ষাৎকারের ধরন
৪.৯.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি
৪.৯.৪ সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়ম
৪.৯.৫ লেখন শৈলী
৪.১০ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ পরিচালনা
৪.১০.১ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ কী
৪.১০.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
৪.১১ চিত্র সাংবাদিকতা
৪.১১.১ চিত্র সাংবাদিকতার অর্থ
৪.১১.২ চিত্র সাংবাদিকতায় ফটো
৪.১১.৩ চিত্র সাংবাদিকতার গুরুত্ব
৪.১১.৪ সংবাদচিত্র
৪.১১.৫ সংবাদচিত্র সম্পাদনা
৪.১১.৬ ক্যাপশন ও সূত্র

৪.১১.৭ নৈতিকতা
৪.১১.৮ ফটোগ্রাফার সাংবাদিক কিনা
৪.১১.৯ ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের গুণাবলী
৪.১২ অনুশীলনী
৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম জনমানসে এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রগুলিও এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিষয়গত পরিবেশনে তারাও আনছে পরিবর্তন। মানবিক আবেদনমূলক সংবাদের পাশাপাশি, ফিচার, সাক্ষাৎকার, এবং নানা ধরনের রিভিউ প্রকাশ করছে। সংবাদচিত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে সংবাদপত্রের বিষয়বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তুলছে। কিন্তু এ সমস্তর পিছনে এক যৌথ কর্মকাণ্ড জড়িয়ে আছে। কিন্তু কী ভাবে? তাই এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

৪.১ প্রস্তাবনা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কিভাবে একজন ফিচার লিখবেন, কিভাবে সাংবাদিক সংবাদকে করে তুলবেন মানবিক আবেদনসম্পন্ন প্রতিবেদন, তা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক পড়লেই শেখা যায় না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও হাতে-কলমের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শেখা দরকার হয়। তবে বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে ফিল্ডে কাজ করতে সুবিধা হয়। সাধারণ ফটো আর সংবাদচিত্র-র ধারণা থাকলে সাংবাদিক সহজেই চিনে নিতে পারেন সংবাদচিত্রকে। আবার আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে রিভিউ লেখা যায় না। সাধারণ নিয়মগুলি তাই জানতেই হয়। ফিচারকে যথাযথ বুঝে সাংবাদিক ধরে রাখেন তাঁর পাঠককে। এসকল বিষয় হাতে-কলমের কাজ হলেও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সংবাদিক, শিক্ষানবিশের কর্মকাণ্ডের পথকে আরো মসৃণ করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪.২ ফিচার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সংবাদ ও তথ্য জানানোর কৌশলকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ শুধুমাত্র সংবাদ জানানোর মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমগুলি ক্ষান্ত নয়। তারও বিশেষ বিশেষ ধরন আছে ; যা পাঠককে তথ্য ও সংবাদ জানানোর সাথে সাথে আনন্দও দেয়। ফিচার হল সেই সুখপাঠ্যের বিষয়।

৪.২.১ ফিচারের সংজ্ঞা

ফিচারের ধরন ও তার কাঠামো কি হওয়া উচিত এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে ফিচার সম্পর্কে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক উইলিয়াম থ্যাকারের কথাটি একজন সাংবাদিকের মনে রাখা দরকার— "দ্য টু মোস্ট

এনগেজিং পাওয়ারস্ অব অ্যান অথার টু মেক নিউ থিংগস্ ফেমিলিয়ার অ্যান্ড ফেমিলিয়ার থিংগস্ নিউ" অর্থাৎ চেনা জগতের অজানা দিক এবং অজানাকে জানানো ফিচার লেখকের কাজ।

লুইস আলেকজান্ডার মনে করেন ফিচার শুরু হয় রিপোর্টিং দিয়ে এবং পাঠকের কাছে ঘটনাটির বর্ণনা ও তার অর্থ পৌঁছে দেয়। জি. এফ. মট [G. F. Mott] এর মতে— "Features entertains, informs, teaches" অর্থাৎ ফিচার পাঠককে আনন্দ দেয়, তথ্য জানায় এবং কিছু শেখায়।

বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম ব্লায়ার ফিচার কি তা বোঝাতে গিয়ে বলছেন— "a detail presentation of facts in an interesting way adopted to rapid reading for the purpose of entertain or informs the average persons" অর্থাৎ ফিচার হল এমন এক ধরনের লেখা যা দ্রুতপাঠের উপযোগী করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা হয়। ফিচারের উদ্দেশ্য গড়পড়তা সাধারণ পাঠককে তথ্য জানানো বা আনন্দ দেওয়া।

বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মতে ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদনের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। ফিচারে তথ্য ও সংবাদকে শুধুমাত্র সবিস্তারে সাজিয়েই দেওয়া হয় না, তাকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতেও পরিবেশন করা হয়, যা পড়ে পাঠক আনন্দ পায়।

৪.২.২ ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদন

সংবাদ প্রতিবেদনে কোন ঘটনা বি বিষয়ের তথ্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফিচারে কিন্তু তথ্য জানানোর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পশ্চাদপট তুলে ধরে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশন করা হয়। এমনকি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হয় ফিচারে।

সংবাদ প্রতিবেদনের মত কে, কী, কখন, কোথায়, কেন এবং কেমনভাবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হয়না ফিচার লেখক। ফিচারকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঘটনার প্রভাবকে ফিচারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

৪.২.৩ ফিচারের বিষয়বস্তু

ফিচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন Sky is the limit. মূলত গভীর ও মননশীল পর্যবেক্ষণ থেকেই এর বিষয়বস্তু বার করে আনতে পারেন ফিচার লেখক। আসলে বিষয়ের নতুনত্বই ফিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

জে. ইউ. জি. রাও মহাত্মা গান্ধীর ছাগলের দুধ খাওয়া নিয়ে এক 'সাক্ষাৎকার' ভিত্তিক ফিচারে লিখেছিলেন। সবাই জানেন গান্ধীজি ছাগলের দুধ খেতেন নিয়মিত। এ ধরনের বিষয়বস্তুকে নিয়ে লেখা ফিচার পাঠককে আকর্ষণ করেছিল। আবার পি. টি. ট্যান্ডন নেহেরুর সোভিয়েত সফরের সময় তাঁর রাঁধুনী 'বুধি'কে নিয়ে লিখেছিলেন—"The cook who went tomorrow" শীর্ষক ফিচার।

ফিচারের বিষয়বস্তু হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে তাঁর আরদালি বা লিফ্টম্যান অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আসলে পাঠকের সামনে অজানা জগতের অজানা ঘটনা বা চেনা জগতের অচেনা কোন মাত্রা তুলে ধরতে পারলে তা ফিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে।

৪.২.৪ ফিচারের বৈশিষ্ট্য

ফিচার বিনোদনমূলক বিষয়বস্তু হলেও তার প্রধান আকর্ষণ মানবিক স্পর্শে। ফিচার সংবাদ প্রতিবেদনের তুলনায় একটু হালকা চালের, হালকা মেজাজের লেখা এবং এটি সংবাদ প্রতিবেদনের মত উল্টো পিরামিড পদ্ধতিতে লেখা হয়না।

ফিচারে তথ্যকে বিস্তৃত ভাবে সাজিয়ে দিলেই হয়না, প্রয়োজনে তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন যা নতুন দিককে তুলে ধরতে সাহায্য করে। ফিচার নিরপেক্ষভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ করে। পাঠককে কোন একটি মতামতে চালিত করা ফিচার লেখকের কাজ নয়। ভালো ফিচার পাঠক গল্পের মত পড়ে যান। তবে ফিচার গল্পের মত কল্পনাপ্রসূত নয় ; তা অবশ্যভাবেই তথ্যভিত্তিক।

একটা ভালো ফিচারের সাধারণত তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন—

(১) সহজ সরল বর্ণনা।

(২) সুনিয়ন্ত্রিত রচনাশৈলী, যাতে পাঠকের বিরক্তিকর উপাদান অনুপস্থিত।

(৩) সুপ্রচুর ঘটনা বা বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটানো।

৪.২.৫ ছবির ব্যবহার

সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ফিচারকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ফিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক ছবি বা স্কেচের প্রচলন উল্লেখ করার মত। যেমন ভ্রমণ সম্পর্কে ফিচার হলে সংশ্লিষ্ট জায়গার ছবি, বা খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার হলে খেলোয়াড়ের ছবি অথবা খেলার এক বিশেষ মুহূর্তের ছবি ছেপে দেওয়া হয়।

ফিচার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় শিরোনাম, যা সাধারণ পাঠককে ফিচার পড়তে উৎসাহিত করে।

৪.২.৬ ফিচারের গুরুত্ব

সংবাদপত্রের ইতিহাসবেত্তারা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ফিচারের রমরমা। দেখা গেল উপন্যাস, ছোটগল্পের চেয়ে সংবাদপত্রের ফিচারের আকর্ষণ পাঠকের কাছে বেশি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রেডিও, টিভির ক্রমপ্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিতেই ফিচারের আবির্ভাব। আজকে ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের যুগে স্পট নিউজ মানুষ সংবাদপত্র দেবার অনেক আগেই পেয়ে যাচ্ছেন। পালশীহান মনে করেন— "the days of the scoop and the extra gone". সংবাদপত্র তাই ডুব দিয়েছে সংবাদের অন্তরালে। তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন দিককে তুলে ধরা হয় ফিচারে, যা আদতে পাঠককে চিন্তার সূত্র যুগিয়ে দিতে সাহায্য করে।

মানুষের পাঠাভ্যাসও দ্রুত বদলাচ্ছে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মানবিক আবেদন পড়ার মত সময় মানুষ পাচ্ছে না। ফিচারের মানবিক স্পর্শেই সে স্বাদ মেটাচ্ছে। তাছাড়া ফিচারের মধ্য দিয়ে তথ্য জানানোর নতুন স্টাইল তাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে। সংবাদপত্রে ফিচার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে ব্রায়ান নিকোলাস তাঁর 'Feature with Flair' গ্রন্থে ফিচারকে সংবাদপত্রের 'Soul' বা আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন।

৪.৩ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

এখন গণমাধ্যমগুলিতে চটকদার সংবাদ পরিবেশনের রমরমা ব্যাপার। মানবিক আবেদন মূলক সংবাদের বিষয়টি ধীরে ধীরে আড়ালো আড়ালে সরে যাচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমগুলির বাজারী প্রবণতার দরুণ সাধারণ পাঠকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলত প্রশ্ন ওঠে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ কি? তার গুরুত্ব কোথায়?

আজকের সংবাদ মাধ্যমে বা মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ প্রতিবেদন খুবই আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। সংবাদ ডেস্ক ও রিপোর্টাররা, এমনকি সংবাদ সংস্থা পর্যন্ত এ ধরনের বিষয় ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিশেষভাবে মাথা ঘামাচ্ছে। স্বভাবতই, এই প্রেক্ষাপটে মানবিক-আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং কিভাবে তা পরিবেশন করতে হয় তা নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

৪.৩.১ মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ

আক্ষরিক অর্থে যদি ধরা যায়, যে সংবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করে তাই হল হিউম্যান ইন্টারেস্ট বা মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সমস্ত ধরনেরই খবরেরই প্রথম শর্ত হচ্ছে পাঠকের দৃষ্টি ও আগ্রহ আকর্ষণ করার যোগ্যতা। যে খবর পাঠককে পড়তে আগ্রহী করে না, তা খবরই নয়। এটাই তো সাংবাদিকতায় সংবাদ নির্বাচনের প্রচলিত রীতি।

এই রীতিকে সামনে রেখে এ ধরনের সংবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার্য বিষয়। পাঠকের মনে আবেদন তৈরি করতে পারলেই কোন 'সংবাদ'কে 'মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ' সংবাদ বলা যায় না। সমস্ত ধরনের 'সংবাদ'এরই আবেদন আছে বা থাকা উচিত পাঠকের কাছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই 'আবেদন' এক ধরনের নয়। ঘটনা বা তথ্য জানার জন্য পাঠক যে প্রতিবেদন পড়ছেন তার আবেদন এক ধরনের। কিন্তু 'জোড়া-কন্যা গঙ্গা-যমুনা ভোট দিতে যাবে' এই প্রতিবেদনের আবেদন কি একই ধরনের? আবার 'আর. কে. নারায়ণন রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম ভোট দিলেন' এই সংবাদ প্রতিবেদনের সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার ভোট দেবার খবরের কোন পার্থক্য নেই। দুটো সংবাদেরই 'আবেদন' আছে পাঠকের কাছে। কিন্তু পৃথক ধরনের 'আবেদন'। রাষ্ট্রপতির ভোটদানের খবরটার রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণের আবেদন আছে। কিন্তু 'গঙ্গা-যমুনা' ভোটার হিসেবে সাধারণ, রাজনৈতিক গুরুত্বে তাদের খবর হয়ে ওঠার কোন যোগ্যতা নেই। কোন কোন সাধারণ ভোটার ভোট দেওয়া নিয়ে সাধারণ পাঠকেরই কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ নেই। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা রাজনৈতিক বিবেচনায় ভোটার হলেও, সবাই জানেন, তাদের দেহপরস্পরের সঙ্গে জোড়া, সেই অবস্থাতেই তাদের বয়স আট বছর পার হয়েছে এবং তারা ভোট দেবে। এটা 'সংবাদযোগ্য' ঘটনা তার কারণ তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার। এর 'আবেদন' পাঠকের আবেগের (emotion) কাছে। ভোট নিয়ে গুচ্ছ খবরের ভিড়েও গঙ্গা-যমুনার খবরটি পাঠকের মনের নরম কোণে দাগ কাটবে। একেই বলে 'মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ' সংবাদ বা Human-interest news।

৪.৩.২ বৈশিষ্ট্য

মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন—

(১) মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের মূল আবেদন পাঠকের মানবিক আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণতার কাছে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

(২) সাধারণভাবে সংবাদের ক্ষেত্রে কি, কখন, কোথায়, কিভাবে ঘটল বা কারা ঘটালো'র মতো পয়েন্টগুলো যে রকম ও যে ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে তা সে ভাবে হয় না। এখানে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যতিক্রমধর্মীতা। ঘটনার স্থানকাল পাত্রপাত্রীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল বিষয়টি পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার অনুভূতিপ্রবণতায় নাড়া দিতে পারবে কিনা।

(৩) সাধারণ সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাৎক্ষণিকতা বা 'immediacy'। ঘটনা কতটা 'টাটকা' তা অন্যতম প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের তা হয় না। আজকের খবর কালকে বাসি, অর্থাৎ তা সংবাদ— এমনটা এক্ষেত্রে ঘটেনা।

(৪) সাধারণভাবে, সংবাদ-যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন বিষয় বা ঘটনা 'সংবাদ' হিসেবে গুরুত্ব পাবার সময় ঘটনার সাম্প্রতিকতম পরিণতি বা চূড়ান্ত পরিণতি কী, সেটাই নজর করা হয়, অর্থাৎ সংবাদ সাধারণভাবে চূড়ান্ত পরিণতিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পয়েন্ট। এটাই হার্ডনিউজের রীতি। সেকারণেই সংবাদ প্রতিবেদনে থাকে ইন্ট্রো বালাড। প্রথমেই পাঠককে 'পরিণতি' অংশটি ধরিয়ে দিয়ে খবর পরিবেশন শুরু করা হয়। মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রেও 'চূড়ান্ত পরিণতি' বা Climax অবশ্যই থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংবাদ-পরিণতি হিসেবে চূড়ান্ত পরিণতিটি সাধারণ হার্ডনিউজের মত করে প্রাসঙ্গিক বা বিচার্য নয়। ফলে লেখার ক্ষেত্রে প্রচলিত ইন্ট্রো-রীতি ও মানবিক আবদেন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। যেমন ধরা যাক, 'মানবশিশু পাহারায় তিন কুকুর'— এই যে সংবাদটি। এর চূড়ান্ত পরিণতি কী? কিন্তু যদি হাসপাতালে বাচ্চাকে খেয়ে ফেলত কুকুর, তাহলে তার সংবাদ হিসেবে মেজাজ হতো আলাদা, তার ইন্ট্রোলিডও পৃথক হতো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সাধারণভাবে সফট নিউজ বা নরম সংবাদ।

৪.৩.৩ মানবিক আবেদনমুখী দৃষ্টিকোণ

মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসে, যা আধুনিক সংবাদ প্রতিবেদন রীতিতে চালু হয়ে উঠছে নজরকাড়া ভাবে।

এ আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, হয়তো শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রতিবেদন হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ একটি সংবাদ হয় মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে, নয় পারে না।

কিন্তু এটা হলো মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সম্পর্কে একটি একমাত্রিক ধারণা। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাংবাদিকরা মনে করেন যে কোন সংবাদযোগ্য ঘটনাতে হার্ডনিউজ বার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদনকে দেখতে হবে, তাতে মানবিক আবেদনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন খবর করা যায় কিনা। কোন সংবাদযোগ্য ঘটনার 'হার্ডনিউজ'-এর একটা দিক যেমন থাকে তেমনি থাকতে পারে মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ একটি বা একাধিক দিক।

৪.৪ সঙ্গীত সমালোচনা বা পর্যালোচনা

ইংরেজি 'মিউজিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংগীতবিদ্যা। আবার কবিতায় সুরারোপ করাও মিউজিকের পর্যায়ে পরে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য মিউজিক রিভিউ বলতে এখানে ক্যাসেট রিভিউ এবং সাম্প্রতিক সময়ের সিডি রিভিউকে বোঝানো হল।

গান বা সঙ্গীত বিনোদনের এক বিশেষ মাধ্যম। গানের বিশাল বাজারকে সামনে রেখে ছোটবড় বহু ক্যাসেট কোম্পানি গড়ে উঠেছে। ক্যাসেটের পাশাপাশি গানের সিডিও তৈরি হচ্ছে। এইসব কোম্পানিগুলি ক্যাসেট এবং সিডি সংবাদপত্র অফিসে পাঠান রিভিউ-এর জন্য।

৪.৪.১ সমালোচনাকারী

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে সংবাদপত্রের সাংস্কৃতিক বা বিনোদনের পৃষ্ঠার দায়িত্বে থাকেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁরা নিজে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে মিউজিক রিভিউ করিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সংবাদপত্র দফতরগুলিতে বহু ক্যাসেট আসে রিভিউ-এর জন্য। কিন্তু সবগুলিই রিভিউ করা সম্ভব হয় না। সংবাদপত্রগুলি তাই বেছে বেছে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী গুটিকয়েক মিউজিক রিভিউ করে থাকে। 'ক্যাসেট আমাদের পছন্দ' কথাগুলি তাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় স্পষ্টভাষায় উল্লেখ থাকে।

৪.৪.২ সঙ্গীত সমালোচনা কী

মিউজিক রিভিউয়ে ক্যাসেটের নাম, কে বা কারা গেয়েছেন তাদের বয়স, প্রকাশক কোম্পানীর নাম এবং ক্যাসেটটির দাম উল্লেখ করতে হয়। ক্যাসেটটিতে কটি গান আছে সে কথাও তুলে ধরতে হয়। তবে ভাল মিউজিক রিভিউয়ে গায়কের কণ্ঠমাধুর্য, সুর ও তাল-লয়ের ওঠানামা প্রসঙ্গে সমালোচক তাঁর মতামত প্রকাশ করে থাকেন। নতুন শিল্পীদের দুর্বলতা যেমন তুলে ধরে, তেমনি শিল্পীর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়। মিউজিকের নতুন আঙ্গিক, গানের খামতি বা কোন গানটি আরো একটু ভালো করা যেত, এ বিষয়গুলিও সমালোচক তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন।

৪.৪.৩ ছবির ব্যবহার

মিউজিকে ক্যাসেট, অ্যালবামের প্রচ্ছদের ছবি, গায়ক-গায়িকার ছবি দিয়ে সমালোচনাটিকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়।

৪.৪.৪ মিউজিক রিভিউ-এর প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকস্তরে মিউজিক বা গানের একটা বড় বাজার রয়েছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সংগীতপ্রিয় শ্রোতা রয়েছেন, যারা নতুন নতুন শিল্পী ও তাদের গান সম্পর্কে আগ্রহী। তাদের প্রিয়শিল্পীর নতুন ক্যাসেট প্রকাশিত হল কিনা তা জানতে চান। আবার নতুন শিল্পীরও সন্ধান করেন তারা।

মিউজিক রিভিউ শ্রোতাদের ওই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। এদিক থেকে বিচার করলে মিউজিক রিভিউ-এর সংবাদমূল্যও কম নয়। পাঠক এই রিভিউ পড়ে ক্যাসেট বা সিডি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৪.৫ পুস্তক সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনা বা বুক রিভিউ-এর জন্য কোন পূর্বনির্ধারিত সর্বসম্মত বিধিনিয়ম নেই। রিভিউ-লেখকের নিজস্ব কুশলতা, কাগজের নীতি, বইয়ের ধরন, পাঠকের রুচি-চাহিদা— এসবের ওপর নির্ভর কর তা গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাই বাঁধাছক অচল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমী দেশগুলিতে এবং সম্প্রতি আমাদের দেশে সীমিত ভাবে বেতার, দূরদর্শনে পুস্তক সমালোচনার চল থাকলেও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রেই তা জনপ্রিয়। চলতি রীতি অনুযায়ী দৈনিক সংবাদপত্রে বুক রিভিউ প্রকাশিত হয় সপ্তাহের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে। যেমন—আনন্দবাজার পত্রিকায় শনিবার প্রকাশিত হয় বুক রিভিউ 'পুস্তক পরিচয়' শিরোনামে। আজকাল সংবাদপত্রে রবিবার 'বই' এই শিরোনামে বুক রিভিউ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৪.৫.১ সমালোচনাকারী

বই রিভিউ করার জন্য অনেক সংবাদপত্রে নিজস্ব স্টাফ থাকে। তবে আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বই রিভিউ করানো হয়। অধ্যাপক, গবেষকরাই মূলত একাজ করে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা কাগজের বেতনভোগী নিয়মিত কর্মী নন। নির্দিষ্ট সমালোচনার ভিত্তিতে সংবাদপত্র থেকে অর্থ পেয়ে থাকেন।

৪.৫.২ সমালোচনা কী

বুক রিভিউ বলতে বোঝায় কোন বই সম্পর্কে সম্ভাব্য পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আনন্দবাজার পত্রিকার বুক রিভিউ সংক্রান্ত সাপ্তাহিক বিশেষ পাতাটির নামই দেওয়া হয়েছে 'পুস্তক পরিচয়'। বইয়ের বিষয়বস্তু, বইয়ের দাম, প্রকাশক, লেখকের স্টাইল ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঠককে জানানো। বিশেষজ্ঞ জন ড্রিউই তাঁর 'বুক রিভিউ' গ্রন্থে আদর্শ বুক রিভিউ বলতে তেমন লেখাকেই উল্লেখ করেছেন যে লেখায় একদিকে থাকবে বইটির প্রাথমিক পরিচয়, অন্যদিকে থাকবে রিভিউ লেখকের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ নিজস্ব মূল্যায়ন।

৪.৫.৩ পাঠক কারা

সার্থকভাবে পুস্তক সমালোচনা করতে হলে তার পাঠকমহল এবং পাঠক চাহিদা সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়—

(ক) সাধারণ পাঠক বা লাইব্রেরিওয়ালারা বইপত্র কেনার জন্যে রিভিউ পড়েন এবং পড়ে বই সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তৈরি করেন।

(খ) অনেকে পড়েন কোন প্রকাশনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা কী মনে করছে তা জানার জন্য।

(গ) অনেক সময় সব বই সকলের পক্ষে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই রিভিউ পড়েই বইটি সম্পর্কে আপাত ধারণা করে নিতে চান।

(ঘ) আবার অনেকে পড়েন শুধুই পড়ার জন্য। সম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম বা সংবাদ প্রতিবেদন পড়ার মতন নেহাতই তাৎক্ষণিক আকর্ষণ।

৪.৫.৪ পুস্তক সমালোচনার বৈশিষ্ট্য

সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বুক রিভিউ করতে গেলে কিছু রীতি বা নিয়ম মেনে চলা উচিত—

(ক) একজন বিশেষজ্ঞের মতে— "The reviewer should convey to the reader the news of the book, the who, what, when, where and 'how' of the book and the why." অর্থাৎ বইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

(খ) লেখকের পরিচয়।

(গ) একই বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত অন্যান্য লেখা এবং একই লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

(ঘ) লেখকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সাফল্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া।

(ঙ) সমকালীন প্রেক্ষাপটে বইটির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করা।

(চ) রিভিউ লেখককে বইটি সম্বন্ধে তাঁর মত বা মূল্যায়নকে যুক্তিপূর্ণ বা স্পষ্টভাষায় পেশ করতে হয়।

(ছ) রিভিউ লেখাটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা হয়ে উঠতে হবে। রিভিউ-এ যে বইটি সম্বন্ধে লেখা সেই বইটির ওপর নির্ভরশীল হবে না। রিভিউ লেখাটি যেন সুখপাঠ্য হয়।

৪.৫.৫ পুস্তক সমালোচনার নিয়ম

সঠিকভাবে বই নির্বাচন করা রিভিউ-এর ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। সংবাদপত্রগুলিতেও বহু বই আসে সমালোচনার জন্য ; কিন্তু সব বই রিভিউ করা সম্ভব হয়না, তাই ঝাড়াই-বাছাই করতেই হয়।

শুধু বই নির্বাচন করলেই হল না, পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে আগাম প্রস্তুতি দরকার। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বই ও প্রকাশনা জগৎ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব ওয়াকিবহাল থাকা। সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ও সাময়িক পত্রগুলির বই রিভিউ-সংক্রান্ত পাতাগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। বই ও লেখকদের নিয়ে বেতার ও দূরদর্শন যে সকল অনুষ্ঠান করে তা শোনা ও দেখা প্রয়োজন। বই সম্বন্ধে সাম্প্রতিক তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার নিউজলেটার, বুলেটিন, বিজ্ঞাপন, প্রকাশন সমিতির মুখপত্রগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যাসের গুরুত্ব তো রয়েছেই।

রিভিউ-এর প্রধান মতই হচ্ছে বইটি ভালো করে পড়া। অভিযোগ, রিভিউ লেখকরা বহুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ না পড়েই বই রিভিউ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে কিছু খামতি থেকে যায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ প্রতিবেদনের একটি খসড়া তৈরি করে নেওয়া উচিত। সাথে সাথে পয়েন্টগুলো লিখে নেওয়া উচিত। এতে রিভিউ করতে সুবিধা হয়।

৪.৫.৬ মাধ্যম নির্বাচন

রিভিউ কোন মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তা লেখায় হাত দেবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ প্রত্যেকটি মাধ্যমেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। রিভিউ লেখককে দেখে নিতে হবে তিনি কোন পত্রিকার

জন্য লিখছেন, না কি কোন জনপ্রিয় সাময়িকপত্রের জন্য লিখছেন না কি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য লিখছেন। এছাড়া বেতার, দূরদর্শনে বই রিভিউ সম্পূর্ণ আলাদা।

৪.৫.৭ সমালোচনা লেখার পদ্ধতি

রিভিউ-এর বিষয়বস্তুকে খসড়া থেকে সাজিয়ে লেখার জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। অনেকে মনে করেন লেখার আগে কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে। যা মানসিক দূরত্বের জন্য দরকার। 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর ডঃ অ্যালেনসিন ক্লেয়ার উইলের কথা অনুযায়ী—"Sleep over your review. Do not attempt to write a review immediately upon completing a book. Think about the book and decide upon your approach before sitting down to typewriter."

- **শিরোনামে লেখা :** প্রতিটি রিভিউ প্রতিবেদনেরই একটা উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। লেখ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিরোনাম গঠন করতে হয়, যা হবে রিভিউ-এর সামগ্রিক মূল্যায়নের একটি চুম্বক। রিভিউ প্রতিবেদনের প্রথম ধাপ তার শিরোনাম, ফলে এমন শিরোনাম গঠন করতে হবে যা পাঠককে পুরো প্রতিবেদনটি পড়তে উৎসাহিত করে।

- **নির্দেশিকা ও ছবি :** যে কোন রিভিউ লেখাতেই পাঠক যাতে এক ঝলকে জানতে পারেন, সেজন্য বইয়ের নাম, লেখকের নাম, বইয়ের দাম, প্রকাশকের নাম— ইত্যাদি বিষয়গুলি মোটা হরফে রিভিউ লেখার গোড়ায় বা সব শেষে জুড়ে দেওয়া হয়। এই অংশকে বলে নির্দেশিকা।

এছাড়া খবরের কাগজে ও ম্যাগাজিনে সংশ্লিষ্ট বইটির প্রচ্ছদের ছবি দেওয়াও প্রচলিত রীতি। এর ফলে পাঠক বইটির দৃশ্যরূপটিও পেয়ে যান। আবার অনেক সময় বইটির মধ্যে ব্যবহৃত কোন ফটো বা স্কেচ প্রাসঙ্গিক মনে হলে রিভিউ-এর মধ্যে পুনঃমুদ্রিত করা হয়।

৪.৫.৮ পুস্তক সমালোচনায় সাংবাদিকতা সুলভ লেখা

'রিভিউ' শব্দটির মধ্যে বিশেষজ্ঞ সুলভ গাম্ভীর্যের আভাস থাকলেও, তা বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা হয় না। তার লক্ষ্য যত বেশি সংখ্যক পাঠককে আকর্ষণ করা। তাই রিভিউ লিখন কৌশল সংবাদিকতা সুলভ লেখার বাইরে নয়। সার্থক রিভিউ সাংবাদিকতারই অংশ। জন ড্রিউই র মতে বই রিভিউতে সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিবেদন এবং ফিচারের লক্ষণগুলি বর্তমান। রিভিউতে বর্ণনা করতে হয় সংবাদের ঘটনা, বিবরণী পেশ করার মতন। সম্পাদকীয়তে যেমন থাকে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন— তেমনি থাকে রিভিউতেও। আবার লেখকের মতামতও এতে থাকে। ফলে রিভিউ অনেকটা কলাম লেখার মত।

রিভিউ লেখার শৈল্পিক কৌশল লেখকের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। সংশ্লিষ্ট বইটি পড়তে পাঠককে উৎসাহিত করার বিষয়টি তাকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

- **প্রয়োজনীয় সতর্কতা :** বই রিভিউ করার সময় কিছু সতর্কতা ও নীতি অবলম্বন করতে হয়—

(১) কথনো কোন বন্ধু বা নিকটাত্মীয়ের লেখা বই রিভিউ করা উচিত নয়। তাহলে সঠিক বিচারের ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে।

(২) রিভিউতে কখনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেষপ্রসূত কোন সমালোচনা করা উচিত নয়।

(৩) উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বই রিভিউ লেখা অনুচিত।

৪.৬ সিনেমা সমালোচনা

জনমানসে সিনেমা আজ বেশ জনপ্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই সাংবাদিকতায় এই জনপ্রিয় বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। টেলিভিশনের পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলিও সিনেমা-সংক্রান্ত ফিচার, রিভিউ ইত্যাদি প্রকাশ করছে নিয়মিত।

৪.৬.১ সিনেমা সমালোচনা কী

সিনেমা রিভিউ বলতে বোঝায় সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া কোন সিনেমা সম্পর্কে সম্ভাব্য দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয় কিন্তু বহুমাত্রিক। গল্প, পরিচালক, নায়ক, নায়িকা থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয় এই সমালোচনায়। এছাড়া থাকে সমালোচকের মতামত। এই মতামত কখনো সরাসরি, আবার কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে।

৪.৬.২ সমালোচনাকারী

সংবাদপত্রগুলি তাদের বিশেষ ও দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে। তবে আজকাল দক্ষ ও সিনেমা পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের দিয়েই সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে। যেমন আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র 'পত্রিকা'য় শতাব্দী রায়, কখনো বা প্রভাত রায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখরা সিনেমা রিভিউ করে থাকেন।

৪.৬.৩ সমালোচনা শৈলী

সিনেমা রিভিউ-এর মধ্যে ফিচারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রিভিউ লেখকের লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব পাঠকের কাছে সিনেমাটির বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা। সিনেমার মূল আকর্ষণই হল বিনোদন। সেজন্য রিভিউকে গুরুগম্ভীর করে পরিবেশন করা উচিত নয় ; আকর্ষণীয় ভাবে তাকে তুলে ধরতে হয়।

রিভিউ লেখার আকর্ষণীয়তাকে বজায় রেখেই রিভিউ-এ সিনেমার বহুমাত্রিক বিষয়কে সঠিক বিন্যাসে সাজাতে হয়। সংশ্লিষ্ট সিনেমার গল্প, অভিনয়, মিউজিক, গান, ক্যামেরার কাজ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। এরই সঙ্গে থাকে অন্যান্য দেশি-বিদেশি সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটির তুলনামূলক আলোচনা। নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রীর অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি, বা অভিনয়কলার ইতিবাচক দিকটি রিভিউ লেখক তুলে ধরেন আকর্ষণীয় ভাবে। এমনকি সিনেমা হলের শ্রোতা-দর্শকদের প্রতিক্রিয়া, হলগুলিতে শ্রোতা-দর্শকদের ভিড় ইত্যাদি তুলে ধরে রিভিউ লেখক সিনেমাটির সাফল্যের আগাম ধারণা তুলে ধরতে চান।

৪.৬.৪ সমালোচনা করার নিয়ম

সিনেমা রিভিউ-এ পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে সিনেমা জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা

প্রয়োজন। সিনেমা রিভিউ বহুমাত্রিক কাজ, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সিনেমা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানা জরুরী। সিনেমা রিভিউ-এর প্রধান শর্তই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটি খুঁটিয়ে দেখা। দেখতে দেখতেই সিনেমাটির রিভিউ কি হতে পারে সে ব্যাপারে একটা খসড়া কল্পনা করে নিলে ভাল হয়। সিনেমাটির দেখার পর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি লিখে নেওয়া দরকার। এতে রিভিউ লিখতে সুবিধা হয়।

এতো গেল একটা দিক। রিভিউ করতে গেলে সিনেমা রিভিউ এবং সিনেমা-সংক্রান্ত পত্রিপত্রিকা, ম্যাগাজিনগুলি পড়া দরকার। আজকাল বহু ভারতীয় সিনেমা বিদেশি সিনেমার ধাঁচে, পশ্চিমী লেখকদের গল্প, উপন্যাস অবলম্বনেও নির্মিত হচ্ছে। ফলে পশ্চিমী সিনেমা ও সেসব দেশের গল্প, উপন্যাস লেখকদের লেখা-পত্র সম্পর্কে জানা থাকাটাও দরকার। আর এসব তথ্য আদতে রিভিউ লেখককে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত তথ্য রিভিউ-এর বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে। পাঠকও পেয়ে যান নানা প্রকার অজানা তথ্য।

- **শিরোনামে লেখা ঃ** প্রতিটি সিনেমা রিভিউ প্রতিবেদনের একটা উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। ফিল্ম সমালোচনার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শিরোনাম লিখতে হয়। রিভিউ-এর মূল্যায়নটি প্রতিফলিত হয় এই শিরোনামের মধ্যে। কিন্তু দেখতে হবে শিরোনাম যেন পাঠককে টেনে নিয়ে যায় পুরো রিভিউটি পড়ার দিকে।

- **নির্দেশিকা ও ছবি ঃ** সিনেমার নাম, প্রধান প্রধান চরিত্রাভিনেতাদের নাম তুলে ধরা হয় এই নির্দেশিকায়। সিনেমাটিতে ওই ব্যক্তিরা কে কেমন অভিনয় করেছেন তা জানতে শ্রোতা-দর্শকের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে। রিভিউ পড়ে অনেকেই সংশ্লিষ্ট ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তোলে সিংশ্লিষ্ট সিনেমার ছবি। সিনেমার কোন বিশেষ মুহূর্তের ছবি এক্ষেত্রে উপযুক্ত। হিন্দী 'লগান' ছবির দলবদ্ধ অভিনেতার ছবির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ছবিটি 'লগান' সিনেমার লোগোতে পরিণত হয়েছিল।

৪.৬.৫ জনপ্রিয়তার কারণ

গড়পরতা বেশিরভাগ মানুষের বিনোদনের উৎস সিনেমা। সিনেমা-সংক্রান্ত গান, মিউজিকে ইত্যাদির রমরমার দিকে নজর ফেললেই আন্দাজ করা যায় সিনেমার জনপ্রিয়তা ঠিক কোথায়। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ সিনেমা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। সিনেমা রিভিউ এই অভাব পূরণ করতে চায়।

সিনেমার দর্শক শ্রোতা রিভিউ পড়ে তার ভাল-লাগা না-লাগার দিকটিতেও মিলিয়ে নিতে চান। আবার অনেকে রিভিউ পড়ে ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

সিনেমা পরিচালক তার ছবির সাফল্য সম্পর্কে আগাম ধারণা করে নিতে পারেন। সিনেমার ত্রুটি-বিচ্যুতিও রিভিউ লেখক তুলে ধরেন। ফলে পরিচালক সেই সব ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারেন। নবাগত নায়ক-নায়িকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আলোচনা করেন রিভিউ লেখক। অন্যান্য পরিচালক তাদের ছবিতে অভিনয় করানোর বিষয়টি ভাবতে শুরু করেন। অর্থাৎ সিনেমা রিভিউ অন্য পরিচালকদের ভাবনার সূত্র জুগিয়ে দেয়।

৪.৭ নাট্য সমালোচনা

সংগীত, মিউজিকের মতো নাটকের বিশেষ আবেদন আছে সাধারণ মানুষের কাছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে তো বটেই এমনকি আমাদের দেশেও নাটকের একটা ইতিহাস আছে। আছে নাট্যধারার উত্থান-পতন। অর্থাৎ আমাদের কাছে নাটকের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাবে গড়ে উঠেছে। ফলে শুধুমাত্র নাটক-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও নাট্য-সংক্রান্ত আলোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করছে।

৪.৭.১ নাটক সমালোচনা কী

নাটক সামালোচনা বলতে নাট্য ঘটনাকে হুবহু বর্ণনা করা বোঝায় না। নাটকের মূল ভাবনা বা বক্তব্য, প্রধান চরিত্র ও তার প্রকাশভঙ্গির টানাপোড়েন, নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি নিয়েই নাট্যসমালোচনার বিন্যাস গড়ে ওঠে। সংবাদপত্রে বরাদ্দ পাতায় রিভিউকে যথার্থ ভাবে তুলে ধরতে হয়।

৪.৭.২ সমালোচনা করার নিয়ম

প্রতিটি বিনোদন মাধ্যমের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা জানি আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের সূচনা ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরেই। সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নাট্যসাহিত্য প্রবাহিত হয়েছে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। রিভিউ লেখককে এই উত্থান-পতন তথা নাট্য-ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়।

আজকের দিনে নাট্য-সংক্রান্ত বহু পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুল খুটিয়ে পড়া দরকার। রিভিউ লেখককে তাঁর লেখার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে আহরণ করে নিতে হয়। ফলে নাট্য-সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনার অভ্যাস না থাকলে একাজ সহজ নয়।

এই অভ্যাসের পাশাপাশি নিয়মিত নাটক দেখাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমালোচক একজন সাধারণ দর্শক-শ্রোতা নন, তার দৃষ্টি থাকে অনেক গভীরে। যে নাটকটির রিভিউ লেখা হবে সেই নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য, নাট্যচরিত্র, নাটকে ভাবনা, পরিচালকের প্রায়োগিক দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক নজর থাকা দরকার।

নাটকের প্রেক্ষাপট, নাট্যকলার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন আঙ্গিক যথাযথভাবে অনুধাবন করা জরুরী। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে বহু নাটকের প্রেক্ষাপট, ঘটনা গড়ে উঠেছে ইতিহাসকে ঘিরে। কখনো বা নাটকে উঠে এসেছে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা বা বৃত্তান্ত। লোকসংস্কৃতির নানা দিক নাটকে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলি থেকে অন্ধকারে থেকে সার্থক রিভিউ সম্ভব নয়। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস রাখতে হয় রিভিউ লেখককে।

৪.৭.৩ সমালোচনা লেখার কৌশল

নাটক দেখার পরে পরেই রিভিউ-এর চূড়ান্ত লেখায় হাত না দেওয়াই ভাল। লেখার পূর্বে বিষয়টি আত্মস্থ করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মূল ঘটনা, চরিত্রগুলি সম্পর্কে একটা খসড়াপত্র অর্থাৎ রিভিউ-এর বিন্যাসটি সাজিয়ে নিলে ভাল হয়।

নাট্যগোষ্ঠীর নাম, নাটকের নাম, মূলচরিত্র ইত্যাদি তথ্যকে গোড়াতেই তুলে ধরতে হয়। মূলচরিত্রকে সামনে রেখে নাট্যঘটনা কি ভাবে পড়তে পড়তে এগিয়ে গেল তা আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। কিন্তু প্রসঙ্গগুলি এমনভাবে উপস্থাপন ও শেষ করতে হয় যাতে পাঠক রিভিউ পড়েন এবং নাটকটি দেখার কৌতূহল বোধ করেন।

নাট্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করার পাশাপাশি রিভিউ লেখক তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। এই মতামত কখনো স্পষ্ট, কখনো বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে।

৪.৮ প্রদর্শনী সমালোচনা

বুক রিভিউ, সিনেমা রিভিউ-এর মতো প্রদর্শনী রিভিউ আজকের সাংবাদিকতায় বিশেষ জনপ্রিয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র, তা ইংরেজিই হোক আর বাংলা, নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট পাতায় নিয়মিত প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতি শনিবার বুক রিভিউ প্রকাশ [পুস্তক পরিচয়] করার সাথে সাথে প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে।

৪.৮.১ সমালোচনাকারী

প্রদর্শনীর বিষয়, ধরন অনুযায়ী দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে প্রদর্শনী রিভিউ করান হয়। আজকের দিনে প্রদর্শনীর বিষয়গত বৈচিত্র্য বেড়েছে। চিত্রকলায় রঙ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বিষয়-সংক্রান্ত প্রদর্শনী রিভিউ করা শক্ত। আবার ভাস্কর্য ও উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে রিভিউ করা সহজ হয়।

৪.৮.২ প্রদর্শনী সমালোচনা লেখার নিয়ম

এই রিভিউ-এ গোড়াতেই প্রদর্শনীর বিষয়, প্রদর্শনীটি কোথায় চলছে তুলে ধরতে হয়। এরপর রিভিউ লেখকের দায়িত্ব প্রদর্শনীকারের বা কারদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয় পর্বে প্রদর্শনীকারের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সংক্ষেপে কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। শিল্পীর জন্ম, শিল্পীর জীবন এবং প্রয়োজন শিল্পীর পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচয়সূত্র গড়ে তোলেন রিভিউ লেখক।

এইভাবে রিভিউ লেখক শিল্পীর শিল্পে বা প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুতে পাঠককে টেনে আনেন। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মারফত শিল্পীর বা প্রদর্শনীকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেন। দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা, সমকালীন প্রেক্ষিতে সেই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গেও রিভিউ লেখক তাঁর মতামত তুলে ধরেন।

৪.৮.৩ চিত্রকলা ও রং প্রসঙ্গ

চিত্রকলায় নানা রঙের ব্যবহার, রঙের মাত্রাগত প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। কেননা রঙের এই ব্যবহার বিশেষ অর্থবাহী। উষ্ণ ও উজ্জ্বল বর্ণের সংঘাত বিশেষ এক নান্দনিক পরিমণ্ডল রচনা করে। আবার শিল্পী প্রশান্ত রায় (১৯০৮-১৯৭৩) জলরঙেই কাজ করতেন। কালো কালি দিয়ে কালো ও সাদার মধ্যবর্তী অজস্র সূক্ষ্ম স্তরগুলি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মুন্সিয়ানা ছিল অতুলনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে

চিত্রকলা-সংক্রান্ত কোন প্রদর্শনী রিভিউ করতে গেলে রঙ সম্পর্কে ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে চিত্রকলা রিভিউ করা অসম্ভব।

৪.৮.৪ শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

প্রদর্শনী রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয়ের দিক থেকে সামঞ্জস্য রেখে একটি শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়। সাধারণ পাঠক যাতে রিভিউটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেজন্য প্রদর্শনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবি রিভিউ প্রকাশের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়, নিচে দিতে হয় শিল্পীর নাম।

৪.৯ সাক্ষাৎকার গ্রহণ

সাক্ষাৎকার মারফত সাক্ষাৎদাতার নিজস্ব বাক্যে, তথ্যে কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে মতামত, কারণ তুলে ধরা হয়। চলতি কোন ঘটনাকে ঘিরে সাক্ষাৎদাতার মতামতকে সামনে রেখে অন্যান্য পাঠক, শ্রোতা-দর্শকরা তাদের মতামত সম্পর্কে একটা সমীকরণ টানতে পারেন।

৪.৯.১ সাক্ষাৎকার কী

কোনও ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি উপায় সাক্ষাৎকার। প্রতিবেদনকে জীবন্ত, মানবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য একটি ঘটনা, কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে ঘিরে তার আশপাশের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রিপোর্টকে সার্বিক অর্থে সুন্দর ও তথ্যবহুল করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রিপোর্টার বা ঘটনা অনুসন্ধানকারীর এই যে আলাপ-আলোচনা এটাই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার সাংবাদিকতার একটি বিশিষ্ট দিক।

৪.৯.২ সাক্ষাৎকারের ধরন

উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, প্রশ্নোত্তরশৈলী, বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর সাক্ষাৎকারের ধরন নির্ভর করে। সাক্ষাৎকারগুলি হল—

(ক) সংবাদ সাক্ষাৎকার ঃ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে কিংবা খুব শিগ্‌গির ঘটতে যাচ্ছে এমন কোনও ঘটনার সবাদকে কেন্দ্র করে যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়— সেটাই সংবাদ সাক্ষাৎকার। মূলত সাম্প্রতিক কোনও সংবাদের বিষয়বস্তুর ওপর কর্তৃপক্ষের মতামত সংগ্রহ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদানকারী যা বলেন সেটাই হল বিষয়। যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি সংবাদসূত্র মাত্র।

রাজনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অপরাধ, আবিষ্কার, খেলাধূলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি যে কোনও বিষয়ে সংবাদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার ঃ এ ধরনের সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিই প্রধান। এর মাধ্যমে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে যে দিকগুলি পাঠকের মনে কৌতূহল বা জানার ইচ্ছেকে প্রভাবিত করে সাংবাদিক সেই সেই দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে সাংবাদিকের সৃজনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(গ) সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার ঃ এক্ষেত্রে কোনও একটা বিষয়ের ওপর একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সকলের মতামত থেকে একটি মূল সুর বেরিয়ে আসে। সাংবাদিক সেই মূল বক্তব্যই তুলে ধরেন পাঠকের কাছে।

(ঘ) দলগত সাক্ষাৎকার ঃ একে সংবাদ সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়, বরং কোনও বিশেষ দল কিংবা গোষ্ঠীর একদল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। যেমন— পাটকল-ধর্মঘট প্রতিবেদন করতে গেলে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে মালিক পর্যন্ত সকলেরই মতামত শুনতে হয়। এখানে সবার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ভারসাম্যমূলক সংবাদ প্রকাশে এ ধরনের সাক্ষাৎকার সহায়ক।

৪.৯.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি

সাক্ষাৎকার গ্রহণে পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতি ছাড়া সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া ঠিক নয়। তবে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি কী হবে তা নির্ভর করে বিষয়ের প্রকৃতির ওপর।

কোনও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে যাবার আগে সাক্ষাৎদাতার কাছে কি জানতে হবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে অসংলগ্ন প্রশ্ন করলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যেতে পারে। খুনের ঘটনায় দারোগার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্যকে সামনে রেখেই প্রশ্ননির্বাচন জরুরী। স্বাভাবিক কারণেই এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পূর্বে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নমালা তৈরি করে নিলে সুবিধা হয়।

আবার এমনও হতে পারে যে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বিষয়ের পরিবর্তন করতে হতে পারে। ধরা যাক খুনের মামলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি ওই নির্দিষ্ট খুনের ঘটনা এড়িয়ে ওই ধরনের খুনের ব্যাপারে কোনও রাষ্ট্রীয় তদন্ত বা নীতির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে বিষয় পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ-পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সাক্ষাৎদাতার মেজাজ-মর্জি সম্পর্কেও আগাম ধারণা করে নিতে হয়। অনেকেই মনে করেন সাক্ষাৎদাতার ছবি দেখলে এ ব্যাপারে আগাম ধারণা আন্দাজ করা যায়।

৪.৯.৪ সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়ম

সাক্ষাৎকার গ্রহণপর্বই সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাক্ষাৎকার-প্রদানকারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রথম কাজ হল যথাসময়ে, যথাস্থলে উপস্থিত থাকা এবং দেখা করা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার শুরুতে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া তৈরির দিকে নজর দিতে হয়। আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই মূল প্রশ্নের দিকে এগোতে হয়। আলোচনাচক্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এরপর প্রয়োজন সাক্ষাৎকারের গভীরে প্রবেশ করা। কিছু কিছু প্রশ্নে সাক্ষাৎকার-প্রদানকারী এতে বিরত ও অস্বস্তিবোধ করলে তা মোকাবিল করার কৌশলও ঠিক রাখতে হবে। এরপরই সাক্ষাৎকারীকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এরজন্য আবার হাল্‌কা কথাবার্তায় ফিরে আসতে হবে।

● **বক্তব্য লেখা ঃ** সাক্ষাৎকারদানকারী যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন তা হুবহু টুকে নিতে হবে। নোটবুকে লেখার আগে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাত্কারদানকারী যে কথা বলবেন তা যদি ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ করা না হয় তবে রিপোর্ট লেখার সময় অসুবিধা হবে। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আরও অসুবিধা হতে পারে। রিপোর্টার বিপদে পড়তে পারেন।

● **রেকর্ড করা ঃ** নোট নেবার সময় অসুবিধা দেখা দিলে টেপরেকর্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা যাবে কি না সে ব্যাপারে অনুমতি নিতে হব। অনেকে টেপরেকর্ডিং পছন্দ করেন না। ব্যাপারটি আগেই জানার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিস্তৃত নোট নেবার চেষ্টা করতে হব। সাক্ষাৎকারের পর কেউ কেউ আবার চূড়ান্তভাবে কী ছাপা হবে তা দেখতে চান। রিপোর্টার যদি মনে করেন তা দেখালে ক্ষতির কারণ নেই তবে তা দেখাতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য লুকিয়ে টেপরেকর্ডিং করা উচিত নয়। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় নোটবুক এবং স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করা জরুরী।

অনেক সময় আবার সাক্ষাৎকারদানকারী ব্যক্তি কথা বলার সময় বলতে পারেন 'অফ দি রেকর্ড' যার অর্থ এখন যা বলছি তা ব্যবহার করা যাবে না। 'অফ দি রেকর্ড' বলার সঙ্গে সঙ্গে টেপরেকর্ডিং বা নোট নেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। 'অফ দি রেকর্ড'-এর অন্তর্গত কথাবার্তা প্রতিবেদনে ব্যবহার করা উচিত নয়। এমন কোন কথা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয় যা সাক্ষাৎকার দানকারীর ক্ষতি করে। সে কারণে 'অফ দি রেকর্ড'-এর বিষয়টি স্মরণে রাখা উচিত।

● **প্রশ্ন করার কৌশল ঃ** সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার আগে কিছু প্রশ্ন তৈরি করা জরুরী। তবে এসব প্রশ্নের কোনটি আগে-পরে করতে হবে তা নির্ধারণ করা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনও স্পর্শকাতর প্রশ্ন দিয় সাক্ষাৎকার শুরু করলে সাক্ষাৎকারের আসল উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। একারণে হালকা প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করা বাঞ্ছনীয়। সেনসেটিভ এবং কঠিন প্রশ্নগুলি শেষের দিক তুলে ধরা উচিত। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বড় প্রশ্ন করা অনুচিত এবং প্রশ্নে নিজের মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়।

● **সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ঃ** সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান বা পরিবেশ কী হবে তা নির্ভর করে সাক্ষাৎকারের বিষয় ও ব্যক্তিত্বের ওপর। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের স্থান যেমন কোন রেলস্টেশন হতে পারে না তেমনি একজন আদিবাসীর সাক্ষাৎকারের স্থান পাঁচতারা হোটেলের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ হলে বেমানান লাগে। সাক্ষাৎকারের পরিবেশ যথাযথ ও অনুকূল না হলে আলাপচারিতায় ছেদ পড়তে পারে এবং তার আসল বৈশিষ্ট্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

৪.৯.৫ লেখন শৈলী

সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার স্টাইল প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্টাইল। সে ব্যাপারে লেখকের নিজস্বতা থাকতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎকার নেবার পর যা জরুরী সেটি হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাক্ষাৎকার লিখে ফেলা। এতে তথ্য হারিয়ে যাবার ভয় কম থাকে। সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন লেখার পরও কিছু কাজ বাকি থাকে। তা হল প্রয়োজন বোধে প্রতিবেদন সাক্ষাৎকার-দানকারীকে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় কাটছাঁট বা সংযোজন-

বিয়োজন করে নেওয়া যেতে পারে। তবে সাক্ষাৎকার-দানকারী ব্যক্তি প্রতিবেদন ছাপা হবার আগে তা দেখতে চাইলেও সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী তা দেখাতে বাধ্য নন। কীভাবে লিখবেন ও ছাপবেন সে স্বাধীনতা তার আছে। অবশ্য তথ্য বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন হতেই হয়।

সাক্ষাৎকার আধুনিক সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রতিটি গণমাধ্যমই এই বিষয়টির ওপর বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছে। টিভি চ্যানেলগুলিতে সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠানের রমরমা। সাক্ষাৎকার এতটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে তা পৃথক পেশাদারিত্বের দাবি রাখে।

৪.১০ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ পরিচালনা

স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ-সংক্রান্ত ধারণা পশ্চিমী ধারণাজাত। ভারতীয় সাংবাদিকতাতেও এই বিষয়টি আজকে বিশেষ জনপ্রিয়। এ ধরনের সাংবাদিকতায় বিশেষ নজরদারির দাবি রাখে।

৪.১০.১ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ কী

কোন সংবাদ যা কোন একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এককভাবে সংগ্রহ করে এবং তা প্রকাশ করে তাকে স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ বলে। অর্থাৎ যে সংবাদ অন্যান্য সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নাগালের বাইরে থেকে যায়, কিন্তু একটিমাত্র সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান তা প্রথম সন্ধান করে এবং তা প্রকাশ করে তাই স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ। যে কোন সংবাদপত্র এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের জন্য আগ্রহী হয়।

৪.১০.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

সম্ভাব্য সংবাদমূলক ঘটনা বা বিষয়টি জানার পর সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক গোপনে বিভিন্ন সূত্র মারফত পর্যাপ্ত তথ্য, ঘটনা সত্যতা জানার দিকে এগোতে থাকেন। বিভিন্ন তথ্য উৎসগুলির কাছে সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে যাচাই করে নেওয়া জরুরী। কোন একটা তথ্য প্রকাশিত হলে জনমানসে কি তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেই প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক হবে সে সম্পর্কে আন্দাজ করে নেওয়া দরকার।

- **সংবাদের সূত্র সম্পর্কে গোপনীয়তা ঃ** সাধারণভাবে আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে সাধারণ সংবাদগুলিতে সাংবাদিক সংবাদ উৎস বা সূত্রের উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ভর করে সংবাদসূত্র প্রকাশ করা না-করার বিষয়টি। প্রয়োজনে সংবাদসূত্র গোপন করা সাংবাদিক সুলভ আচরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

এক্সক্লুসিভ সংবাদসংগ্রহের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য উৎস বা সূত্র গোপন করা স্বাভাবিক ঘটনা। কোন সূত্র তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইলে একজন সাংবাদিকের তা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। গোপনীয়তা রক্ষা না করলে সাংবাদিক যেমন তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, তেমনি তথ্য উৎসও কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে পারেন। সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, একবার সংগ্রহে সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। ফলে সাংবাদিককে সেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়।

- **তথ্যসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ঃ** কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংগঠন থেকে এক্সক্লুসিভ তথ্য পেতে হলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে ওই সব উৎসগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক

গড়ে তুলতে হয়। এক্সক্লুসিভ ধরনের তথ্য, সংবাদ পাওয়া যাবে কিনা বা উৎসগুলি তা দেবে কিনা সেটা নির্ভর করে একজন সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। এই বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলার বিষয়টি পাঠ্যপুস্তক নির্ভর নয়, তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর।

তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, তথ্য উৎসগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে তোলা জরুরী। সাক্ষাৎ, ফোন ইত্যাদির মারফত বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। তথ্য উৎসের কাছে নিশ্চিত করে তোলা একটা আবিশ্যিক পূর্বশর্ত।

● **কিছু সতর্কতা মেনে চলা দরকার ঃ** সাধারণ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এক্সক্লুসিভ সংবাদের ক্ষেত্রেও কিছু সাধারণ সতর্কতা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। যেমন—

(ক) তথ্যগত বিচ্যুতি পরিপূর্ণভাবে যাচাই করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তথ্যগত ভুলত্রুটি নানাপ্রকার বিপদ ডেকে আনতে পারে।

(খ) প্রয়োজন অনুসারে বা তথ্য উৎসের মত অনুযায়ী তথ্যসূত্রের গোপনীয়তার বিষয়টিকে মেনে চলা দরকার।

(গ) মানহানি-সংক্রান্ত বিষয়টিকেও এ প্রসঙ্গে বিবেচনায় না রাখলে চলে না।

(ঘ) সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা, সত্যতা এবং ভালসাম্যমূলক সংবাদ তৈরির দিকে নজর রেখেই সংবাদ পরিবেশন করতে হয়, যা সাংবাদিকতার মৌলিক দাবিও বটে।

৪.১১ চিত্র সাংবাদিকতা

লিপি উদ্ভাবনের আগে মানুষ ছবির সাহায্যে তার কথা প্রকাশ করেছে, যোগাযোগ সাধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ছবি দিয়েই মানুষের সাংবাদিকতার শুরু। সেই প্রাচীনতম আবিষ্কার ছবির ব্যবহার আজকের সাংবাদিকতায় এক অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষ হাজারো কথা বলে একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থ নাও বোঝাতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র ছবিই সেই একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থকে সরলভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কিভাবে? স্বাভাবিক কারণেই চিত্রসাংবাদিকতার বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

আমরা প্রতিদিন নানারকম সংবাদপত্র পড়ে থাকি— সেটা দৈনিক, সাপ্তাহিক, সংবাদ ম্যাগাজিন যাই হোক না কেন— সেসব সংবাদপত্রে সংবাদ, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পাতার বিভিন্ন অংশ জুড়ে থাকে ছবি বা ফটোগ্রাফ। কারণ সংবাদ পরিবেশনা শুধু লিখেই হয় না। ফটোগ্রাফ বা চিত্রের মাধ্যমে যে সংবাদ পরিবেশন রীতি তাকেই বলে ফটো জার্নালিজম বা চিত্রসাংবাদিকতা।

এখানে ফটো স্বাভাবিকভাবেই স্টিল ফটোগ্রাফ বা স্থিরচিত্র। পরবর্তীকালে চিত্রপরিবেশনায় যখন গত সঞ্চার করা সম্ভব হল এবং যখন এই গতিশীল মাধ্যমকে বেতারের সাহায্যে ঘরে ঘরে পৌঁছানো সম্ভব হল তখন তার একটি স্বতন্ত্র গণমাধ্যমের জন্ম হল, যা টেলিভিশন নামে পরিচিত। টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনাই হল টেলিভিশন সাংবাদিকত। ফটো জার্নালিজমের আলোচনা আমরা অবশ্য স্থিরচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

৪.১১.১ চিত্রসাংবাদিকতার অর্থ

ইংরাজি ফটোগ্রাফি (Photography) শব্দটি এসেছে গ্রীকশব্দ 'ফটোস' (photos) এবং 'গ্রাফোস' (graphos) থেকে। 'ফটোস' শব্দের অর্থ আলো। 'গ্রাফোস' মানে লেখা। দুটো মিলিয়ে হল 'আলো দিয়ে লেখা'।

চিত্রসাংবাদিকতায় ফটো লিখিত সংবাদ প্রতিদিনের পার্শ্ববর্তী শোভা হবে না, তা হবে স্বতন্ত্র একটি সংবাদ প্রতিবেদন। সে কারণে আধুনিক ধারণায় সংবাদচিত্রী বা News Photographer একজন সাংবাদিক হিসেবেই বিবেচিত হন। যেহেতু অন্যান্য সাংবাদিকের মতই তার কাজ সংবাদ নিয়েই। তিনি সংবাদ খোঁজেন, সংবাদ পরিবেশন করেন। শুধু কলমের বদলে তাঁর হাতিয়ার ক্যামেরা। সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে পাঠক ছবি শুধু দেখেন না, তিনি ফটো পড়েন।

৪.১১.২ চিত্রসাংবাদিকতায় ফটো

চিত্রসাংবাদিকতা প্রথম শুরু হয় জার্মানীতে। সাংবাদিকতায় ফটোর ব্যবহার শুরু হয়েছে ফটোগ্রাফির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে। কারণ, ফটোগ্রাফ হলেই তা সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ব্যবহার করা যায় না। তার জন্য চাই মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশ।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮১৩ সালে দুজন ফরাসী জোসেফ এন নিপসে এবং লুই জ্যাক মান্তে দাগরে সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফির সূত্রপাত করেন। এঁরাই ধাতব পাতের ওপর দৃশ্যের ছবি তোলার পদ্ধতি বার করেন। ১৮৩৯ সালে ইউলিয়াম এইচ এফ ট্যালিকট সিলভার ক্লোরাইডের প্রলেপ দেওয়া কাগজের ওপর ফটোগ্রাফ তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮৪০ সালে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জন ডব্লিউ ড্রেপার সর্বপ্রথম মানুষের মুখের ছবি পুনর্নির্মাণ করেন। এতে এক্সপোজারের সময় লেগেছিল পাঁচ মিনিট। ১৮৫১ সালে শুরু হয় কলোডিয়ানযুক্ত ভিজে প্লেটের ব্যবহার। কলোডিয়ান হল ইথার ও গলিকটলের দ্রবণ। এই ভিজে প্লেটের সাহায্যে ম্যাথু ব্রাডি নামে একজন ফটোগ্রাফার আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ফটো তুলেছিলেন। প্রথম চিত্রসাংবাদিক বলা হয় ব্র্যাডিকেই।

১৮৭০-র দশকে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৮৮৯ সালে জর্জ ইস্টম্যান একটি কোম্পানী খোলেন। ইস্টম্যানই প্রথম স্বচ্ছ ফিল্মের ব্যবহার শুরু করেন। এর ফলে আর ভারি কাচের প্লেট লাগতো না। ক্যামেরা অনেক হাল্কা হয়ে যায়।

১৮৯৭ সালে আমেরিকায় এম এইচ হুগান প্রথম হাফটোন স্টিরিওটাইপ তৈরি করেন খবরের কাগজে ব্যবহারের জন্য। হাফটোনের প্রথম ছবি নিউনিয়র্ক ট্রিবিউন-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ২১শে জানুয়ারি।

১৯১২ সালে চালু হয় স্পীড গ্রাফিক প্রেস ক্যামেরা। এর এক দশকের মধ্যেই আসে জার্মান লাইকা ও রলিফ্লেক্স ক্যামেরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা চিত্রসাংবাদিকতাকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছিল তার পিছনে এই প্রযুক্তিগত ক্রমোন্নতিই ছিল প্রধান সহায়।

ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে রঙীন ফটো তোলা সম্ভব হয় ১৯৩৫ সাল থেকে।

অবশ্য চিত্রসাংবাদিকতা শুধু ক্যামেরা বা ফিল্মের উন্নতির ওপরই নির্ভর করে না। মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশের ওপরও তা নির্ভর করছে। কারণ ফটো হলেই হল না, তা কাগজে ছাপতে হবে। রোটারি প্রেসের

আবিষ্কার ফটোর ব্যবহারকে সুবিধাজনক করে দিয়েছিল। অফসেট আরও সুবিধা করে দেয়। এখন মাল্টিমিডিয়ার যুগে কাজের আরও সুবিধা।

এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, চিত্রসাংবাদিকতার বিকাশের জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফটো পাঠানোর পদ্ধতির বিকাশের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দ্রুততা সংবাদপত্রকে সাহায্য করে ফটোগ্রাফের সংবাদমূল্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে। বিশশতকের গোড়া থেকে তার মারফৎ ফটো পাঠানো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। বিশ্বে প্রথম তার মারফৎ ফটোগ্রাফ (wire photograph) পাঠানো সম্ভব হয় আমেরিকায় ১৯২৪ সালে।

এখন তো ফ্যাক্সের সাহায্যে বিশ্বের যে কোন জায়গার রঙীন ছবি পর্যন্ত লেনদেন করা যায়। এছাড়া কম্পিউটার সংযোগ মারফৎ ই-মেলের সাহায্যেও ফটো লেনদেন এখন বাংলা সংবাদপত্রেও চালু।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, টেলিভিশন চালু হবার পর টিভিও সূত্র বা Source হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খবরের কাগজের অফিসে বসে টিভির পর্দায় ভাসমান ছবি তুলে নিয়ে তা কাগজে ছাপা হচ্ছে।

ফটো লেনদেনে প্রযুক্তিগত বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ সংস্থাগুলিও ফটো সার্ভিস শুরু করেছে। যেমন-— কলকাতায় 'ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ'। এখন সংবাদ সংস্থাও টেলিপ্রিন্টারে সংবাদের লিখিত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে ফটোও যোগান দিচ্ছে। বিশ্ব সংবাদ সংস্থা হিসেবে প্রথম ফটো সার্ভিস শুরু করে ১ জানুয়ারি ১৯৩৫ সালে আমেরিকার 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এ.পি)। ভারতে সংবাদ সংস্থা ইউ এন আই প্রথম ফটো সার্ভিস দিতে শুরু করে ১৯৮৬ সালে। সংবাদ সংস্থা পি টি আই ফটো সার্ভিস শুরু কর ১৯৮৭ সালে। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে সংবাদপত্রে ফটোর কদর বেড়েছে।

৪.১১.৩ চিত্রসাংবাদিকতার গুরুত্ব

সংবাদপত্রে চিত্রসাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদ পরিবেশন এবং কাগজকে পাঠকদের কাছে দর্শনধারী করে তুলতে ফটোগ্রাফের সঠিক ব্যবহার অবিশ্বাস্য ফল দিতে পারে।

সংবাদপত্রে ফটোগ্রাফ ছাপা হয় নানা ভাবে। কখনও সংবাদের সহযোগী হিসেবে। যেমন ধরা যাক ব্রিগেডে বামফ্রন্টের সমাবেশের প্রতিবেদনের লিখিত বিবরণের সঙ্গে সমাবেশে ভাষণরত জ্যোতি বসুর ছবি। কখনও বা স্বতন্ত্রভাবে একটি ফটোগ্রাফ প্রতিবেদনের কাজ করে। এখানে ফটোগ্রাফের সঙ্গে কোন লিখিত প্রতিবেদন থাকে না। ফটোগ্রাফ ছাপা হয় ফিচারের সঙ্গে, চিঠিপত্রের সঙ্গে, এমনকি রিভিউ-এর সঙ্গে। এছাড়া রয়েছে ফটো-ফিচার। যেমন, কলকাতায় বন্‌ধ পালিত হয়েছে। পরের দিন একপাতা বা আধপাতা জুড়ে একাধিক ছবি— শুনশান হাওড়া ব্রিজ, চৌরঙ্গীর ফাঁকা রাস্তায় ক্রিকেট লড়াই, অথবা হাওড়ার জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা স্তব্ধ লঞ্চের সারির ফটো। একে বলে ফটো-ফিচার।

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় সংবাদপত্র ফটোগ্রাফের ব্যবহার সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিল না। যে ফটো ব্যবহার করা হত তাও ছিল গৌণ বিষয়। কিন্তু এখন অবস্থা সে রকম নয়। ইংরেজি তো বটেই ভারতীয় ভাষার কাগজগুলিও এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সংবাদচিত্রকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ছাপার ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থার ব্যবহার চিত্রসাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করেছে। ফটোগ্রাফ-সংক্রান্ত পৃথক বিভাগই থাকছে কাগজগুলিতে। ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে সাংবাদিকতায় ফটোগ্রাফ অব্যর্থ উপাদান হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ফটোর গুরুত্বের পিছনে নানা কারণও উল্লেখ করা যায়—

(১) চীনা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যার বাংলা অর্থ— একটি ফটো হাজার শব্দের সমতুল। ফটোর সাহায্যে কোন বিষয় বা ঘটনার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটির পরিচয় দেওয়া সম্ভব। দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়া বিমানের ফটো থাকলে পাঠকের কাছে যা প্রতিক্রিয়া হয় তা ভাষায় বর্ণনা দিয়ে লাভ করা অসম্ভব।

(২) ফটো সহজবোধ্যভাবে কোন বিষয়কে পরিবেশন করতে পারে। সাধারণ পাঠকের এতে সুবিধা হয়।

(৩) ফটোর বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। কোন বিষয় লিখে বলা এক, ফটো থাকলে মানুষ চোখেও তা দেখে নিতে পারেন। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।

(৪) ফটোর আবেদন সবার কাছে। নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত পাঠকের পক্ষে ফটো অনুধাবন যোগ্য। এই সার্বজনীন আবেদন উল্লেখযোগ্য।

(৫) ফটো পাঠককে রিলিফ দেয়। কাগজের পাতাভর্তি অক্ষর বিন্যাস পাঠকের মধ্যে একঘেয়েমি আনতে পারে। মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি পাঠককে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

(৬) ফটোগ্রাফ কাগজকে আকর্ষণীয় করে। আজকের দিনে পাঠক চান দৃশ্যরূপ। পৃষ্ঠাসজ্জার সময় তাই ফটোর সঠিক বিন্যাস পাঠকমহলে কাগজকে জনপ্রিয় করে। অনেকে মনে করেন, টেলিভিশনের যুগে দৃশ্যময়তার প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বেড়েছে। মানুষ এখন দেখতে চান বেশি। সে কারণে সংবাদপত্রও আজকাল ফটোগ্রাফ ব্যবহারের দিকে বেশি ঝুঁকছে।

৪.১১.৪ সংবাদচিত্র

সাংবাদিকতার অঙ্গ হিসেবে চিত্র বা ফটোর ব্যবহারে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কোন ফটোই সংবাদপত্রে ছাপার জন্য বিবেচিত হয় না। ছাপার জন্য দরকার সংবাদ উপাদান সমৃদ্ধ সংবাদচিত্র বা News photo। এমনি সাধারণ ফটোর সঙ্গে সংবাদচিত্রের এখানেই পার্থক্য। চিত্রসাংবাদিকতায় ছবি তোলা থেকে শুরু করে সম্পাদনা এবং তা ছাপা হয় সংবাদকে বিবেচনায় রেখে।

আর সংবাদ মানে যেহেতু সক্রিয়তা (activity), তাই সংবাদচিত্রের থাকবে অ্যাকশন। একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়—"Every news picture must tell a story at a glance. The best pictures show life happening. They show suspended animation."

● **ভাল সংবাদচিত্র কী ঃ** সংবাদচিত্রের গুণাগুণ বিচার করেই তা ছাপার জন্য বিবেচিত হয়। ছাপার জন্য সংবাদচিত্র নির্বাচন করতে গেলে সাধারণত দুটি দিকের ওপর নজর দিতে হয়— (১) টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ, (২) সম্পাদকীয় মূল্য।

● **টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ ঃ** টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ বলতে বোঝায় ফটোর প্রিন্টের মান, ফটোর সাইজ বা আকার। প্রিন্টের মান বলতে বোঝায়, ফটোগ্রাফকে কাগজে ছাপার পর তার মান কী হবে এটা বুঝতে হয়। অনেক সময় ছাপার পর দেখা যায় ফটো হয় খুব হালকা হয়ে গেছে, নয়তো কালো হয়ে গেছে। এটা মূল ফটোর কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ছবি 'ম্যাটপেপারের' বদলে গ্রসী পেপারে ছাপা হলেই ভাল হয়।

● **সম্পাদকীয়মূল্য ঃ** সম্পাদকীয় মূল্যের অর্থ হল ফটোর সংবাদমূল্য। ছবিটির আবেদন ইত্যাদি বিষয়। এক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হল ছবিটি পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে কিনা, দ্বিতীয়ত, ছবিটি প্রভাব ফেলতে পারে কিনা, তৃতীয়ত, ছবিটি পাঠককে তৃপ্তি দেবে কিনা।

উল্লেখ্য, ভালো ফটো লিখিত সংবাদ প্রতিবেদনকে একটা দৃশ্যময় মাত্রা (visual dimension) দেয়। সংবদচিত্র সংবাদপত্র পাঠকের দ্রুততায় সাহায্যকরে পাঠককে।

৪.১১.৫ সংবাদচিত্র সম্পাদনা

সংবাদপত্রের মতো সংবাদচিত্রেরও সম্পাদনা করা প্রয়োজন। এই সম্পাদনার উদ্দেশ্য হল ফটোগ্রাফের সঠিক, প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক সংবাদমূল্যকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ জন্যই সংবাদচিত্র কোন সাইজে যাবে তা দেখতে হয়। সংবাদের গুরুত্ব কেমন তার ওপরই নির্ভর করে ফটোটি এক কলমে যাবে না পাঁচ কলমে যাবে।

ছবির আকার (Shape) কী হবে তাও ঠিক করত হয় সম্পাদনায় সময়। এমনিতে ফটো বর্গাকারে ছাপার চলেনই। কারণ এ ধরনের ফটো নিষ্প্রাণ লাগে। ফটো সাধারণভাবে আয়তাকারে ছাপা হয়। কিন্তু আকার বলতে ছবিটি চওড়া করে না লম্বা করে ছাপা হবে তাও বোঝায়। যেমন কোন পঁচিশ তলা বাড়ির মাথায় আগুন লাগলে যদি দুকলমে চওড়ায় লম্বা করে বসালে যেমন লাগবে, পাঁচকলমে কিন্তু ততটা খুলবে না। সম্পাদনা যিনি করছেন তাকে এটা বুঝতে হবে।

সম্পাদনার কারণেই অনেক সময় ফটোকে কাটছাঁট করতে হয়। পরিভাষায় একে বলে ক্রপিং (cropping)। ফটোগ্রাফের মধ্যে সংবাদ মূল্যের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়াই হল ক্রপিং।

৪.১১.৬ ক্যাপশন ও সূত্র

ক্যাপশন হল ফটোর বিষয় সম্পর্কে পরিচয়জ্ঞাপক লিখিত বিবরণ। সাধারণত দুই থেকে তিনটি বাক্যে তা লেখা হয়।

ক্যাপশন লেখার প্রাথমিক দায়িত্ব ফটোগ্রাফারেরই। তবে অনেক সময়ই তা পরিমার্জনের দায়িত্ব থাকে সাব-এডিটর অথবা চিফ সাব-এডিটরের ওপর।

যে কোন রকমভাবে ফটোর বিষয়বস্তু লিখে দিলেই ক্যাপশন লেখা হয় না। যেমন ধরা যাক, প্রথম পাতায় বাঁদিকে লিড ছাপা হয়েছে ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জনসভার খবর। খবরের ডান দিকে ধরা যাক তিনকলম জুড়ে ব্রিগেডে ভাষণরত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবি ছাপা হবে। এই ফটোর ক্যাপশনে 'ভট্টাচার্য ভাষণ দিচ্ছেন' লেখার দরকার নেই। কারণ তা অতি স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে। বরং লেখা যেতে পারে 'বুধবার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে'। ক্যাপশনে কোথায় এবং কবে ছবি তোলা হয়েছে তার উল্লেখ থাকা ভাল। এবং প্রয়োজন বুঝে অবশ্যই কার বা কী ঘটনার ছবি তা বলে দিতে হবে। বাংলা কাগজের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ হয়তো দরকার নেই, কিন্তু ওড়িশার কি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ফটো হলে দরকার আছে।

এছাড়া ক্যাপশন পরিস্থিতি অনুযায়ী লিখতে হয়। সেদিক থেকে ক্যাপশনকে আমরা তিনটি ধরনে ভাগ করতে পারি—

(১) যখন ফটো ও লিখিত প্রতিবেদন পাশাপাশি ছাপা হবে তখন ক্যাপশন হবে সংক্ষিপ্ত।

(২) প্রতিবেদন প্রথম পাতায় এবং ফটো প্রথম পাতায় যখন, তখন ক্যাপশন বিস্তৃততর।

(৩) লিখিত প্রতিবেদন নেই, শুধুমাত্র ফটোই ছাপা হলে, ক্যাপশনের মধ্যেই ফটোর প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা ছ-সাতটি বাক্যে বিবৃত করতে হয়।

অবশ্য সবসময়ই যে ক্যাপশন ছাপা হবে তারও দরকার নেই। যেমন ধরা যাক রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর ছবি ছাপা হয়েছে প্রথম পাতায়। সঙ্গে রাজীবের তিন কলমের মুখের ফাইল ফটো। এধরনের ফটোর নিচে নাম লেখার দরকার নেই।

ক্যাপশন প্রসঙ্গেই চলে আসে সোর্স বা ফটো-সোর্সের উল্লেখ করা। সাধারণত, ক্যাপশনের সঙ্গেই ফটোগ্রাফারের নাম উল্লেখ করা হয়, অথবা থাকে 'নিজস্ব চিত্র'। সংবাদ সংস্থার পাঠানো হলে সংবাদ সংস্থার নাম দিতে হয়।

৪.১১.৭ নৈতিকতা

সংবাদের মতো সংবাদচিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কোড অব এথিকস্ বা নীতি মেনে চলতে হয়। আজকাল কাগজের বিক্রি বাড়াতে যৌন আবেদনমূলক ফটো ছাপার প্রবণতা বেড়েছে। একাজ অনৈতিক। এছাড়া দাঙ্গা, ধর্ষণের মতো স্পর্শকাতর ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও সতর্কতা দরকার। যেমন প্রচলিত রীতি হল ধর্ষিতা মহিলার ছবি না ছাপা।

সেইসঙ্গেও সংবাদের সঙ্গে সাযুজ্যহীন ছবি ছাপাও উচিত নয়। ফটো কখনো মিথ্যা কথা বলে না একথা সত্যি। কিন্তু তা আপেক্ষিক সত্য। ফটো সত্যি বলছে কিনা নির্ভর করছে যে বা যারা তা ব্যবহার করছে তার ওপর। লেখার মতো ফটোও বিকৃত করা যায় অতি সহজে। ছবি তোলার কারসাজিতে সমাবেশের জমায়েতে কতমানুষ ছিল সে সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যায়। কারও গম্ভীর মুখের ছবি ছাপা হবে নাকি হাসি মুখের তার ওপর পাঠকদের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই নির্ভর করে। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরা নক্ করা হচ্ছে তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভরশীল। এতে ঘটনার মাত্রা বদলে দেওয়া যায়। সে জন্য সংবাদচিত্রীকেও বস্তুনিষ্ঠতার নীতি মেনে চলা উচিত।

৪.১১.৮ ফটোগ্রাফার সংবাদিক কিনা

সাংবাদিকতায় ফটোগ্রাফারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির ঘাটতি থাকলেও ১৮৫৫ সালের ওয়াকিং জার্নালিস্ট অ্যাক্ট সাংবাদিক হিসেবে সংবাদচিত্রী বা নিউজ ফটোগ্রাফারদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আইন অনুযায়ী সংবাদচিত্রীরা বেতনক্রম ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে সাব-এডিটর ও রিপোর্টারদের সমতুল্য। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের বেতনক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য গঠিত বাচওয়াত কমিটির রিপোর্টে (১৯৮৯) সংবাদচিত্রীদের দায়িত্বেরও উল্লেখ আছে স্পষ্টভাবে—"News photographer is a person who covers news events of public interest through photographs."

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রগুলিতে চিফ নিউজ ফটোগ্রাফারের পদও থাকে। যাঁর দায়িত্ব হচ্ছে নিউজ ফটোগ্রাফারদের দায়িত্ব বন্টন করা ও তাদের কাজের তদারকি করা। বাচওয়াত কমিটির রায় অনুযায়ী, চিফ

নিউজ ফটোগ্রাফার পদটি সংবাদপত্রে চিফ রিপোর্টার ও চিফ সাব-এডিটর পদের সমতুল্য। এ থেকে নিউজ ফটোগ্রাফারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। সংবাদচিত্রীদের সাংবাদিক হিসেবে সাব্যস্ত করার কারণ রিপোর্টার মতো তাঁদেরও দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদ পরিবেশন। সংবাদের সন্ধান ও সংবাদ পরিবেশনা তাঁর কাজ। সংবাদপত্রের চাহিদা অনুযায়ী সংবাদচিত্র তাঁকে যোগান দিতে হয়।

৪.১১.৯ ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের গুণাবলী

(১) সংবাদচিত্রী বা নিউজ ফটোগ্রাফার যেহেতু সাংবাদিক তাই সংবাদ অনুভূতি বা সংবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকে তাঁর প্রাথমিক গুণ। সেজন্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নীতি ও সংবাদ পরিবেশনার ধরন সম্পর্কে তাকে সজাগ ও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(২) ফটোগ্রাফার হিসেবে তাকে দক্ষ হতে হবে। ফটোগ্রাফি, ক্যামেরা, ফিল্ম, মুদ্রণরীতি এসব ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হবে স্বচ্ছ।

(৩) ক্যামেরা চালানোর দক্ষতায় একজন ভালো ফটোগ্রাফার হওয়া যায়, কিন্তু ভালো নিউজ ফটোগ্রাফার হবার জন্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এজন্য নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস থাকা প্রয়োজন।

(৪) তাকে উদ্যমী ও পরিশ্রমী হতে হবে। সংবাদ সংগ্রহের মতো, সংবাদচিত্র সংগ্রহ করাও সহজ কাজ নয়। নানা প্রতিকূলতা থাকে। সংবাদচিত্রীকে ঘটনাস্থলে থাকতেই হবে। পুলিশের লাঠিচার্জ, দাঙ্গা, বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালনা— যাই ঘটুক তাকে সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতেই হবে। এজন্য সাহস দরকার।

(৫) দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। সঠিক মুহূর্তে সঠিক দৃশ্যটাকে ক্যামেরায় বন্দী করতে হয়। স্টুডিওতে ছবি তোলার মতো গুছিয়ে আস্তে ধীরে কাজ করার সময় সংবাদচিত্রী পান না, অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। এখানে তাই দ্রুত সঠিক সংবাদ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে ফটো তোলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

(৬) সংবাদচিত্রীর মধ্যে একটি শিল্পীমন থাকতে হবে। সংবাদপত্রের ব্যস্ত গড়পড়তা পাঠকের মন ফটোর ওপর আটকে রাখতে হলে ফটোকে জীবন্ত ও অনুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। এমন কিছু যা ছবির ফ্রেম ছাপিয়ে যাবে। নোয়াখালির দাঙ্গার সময় সফররত গান্ধীজির লাঠি হাতে সাঁকো পার হবার বিখ্যাত সেই ফটো। তা শুধু ডকুমেন্ট নয়, সেই মুহূর্তের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

(৭) অবশ্য ভালো ফটোগ্রাফার একদিনে জন্ম নেয় না। নিরন্তর চর্চা, নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণই ভালো সংবাদচিত্রী তৈরি করে।

৪.১২ অনুশীলনী

১) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

ক) সংবাদে মানবিক আবেদন বলতে কি বোঝায়?

খ) সাংবাদিক হিসেবে ফিচারের বিষয় নির্বাচন কেমনভাবে করবেন?

গ) 'অফ দি রেকর্ড' কি? এ বিষয়টিকে কি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

ঘ) সংবাদচিত্রে ক্যাপশন কিভাবে লেখা উচিত?

ঙ) একজন বুক রিভিউয়ার হিসেবে আপনি কোন কোন নিয়ম মেনে চলবেন?

চ) ভিডিও, সিডি প্রকাশের যুগে সিনেমা রিভিউ কী জরুরী বা কার এবং কেন সিনেমা রিভিউ পড়েন?

ছ) মিউজিক রিভিউ কী?

জ) নাটক দেখার পরে পরেই চূড়ান্ত রিভিউ লেখা উচিত নয়— এ বিষয়ে যুক্তি দিন।

ঝ) সাধারণ ফটো ও সংবাদ ফটোর পার্থক্য আছে কি?

ঞ) সংবাদ ফটো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২) রচনভিত্তিক ও বিশ্লেষণমূলক উত্তরের প্রশ্ন :

ক) চটকদার সংবাদপ্রবণতার যুগে মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ কি কোন প্রভাব ফেলতে পারে? উত্তরের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দিন।

খ) সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত ফিচার প্রকাশ করে। পাঠক হিসেবে আপনি কি ধরনের ফিচার পড়েন? কেন পড়েন?

গ) ফিচারের দায়িত্বে থাকলে আপনি কোন কোন বিষয়কে নির্বাচন করবেন? যুক্তি দিয়ে বোঝান?

ঘ) সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলতে একজন সাংবাদিক কি কি ভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

ঙ) সাক্ষাৎকার কী? সাক্ষাৎকারের ধরন অনুযায়ী কোন সাক্ষাৎকার কী ভাবে পরিচালনা করা দরকার?

চ) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চিত্রসাংবাদিকতায় কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?

ছ) চিত্রসাংবাদিকতা কী? আজকের দিনে চিত্র বা ফটোবিহীন সংবাদপ্রকাশ কি সম্ভব? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

জ) যে কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানে স্কুপ নিউজের কদর আছে— সাংবাদিক হিসেবে এক্ষেত্রে আপনি কী কী পদক্ষেপ নেবেন?

ঝ) অভিযোগ বই-পাঠকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তবুও বড় বড় সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত বুক রিভিউ প্রকাশ করছে কেন? এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

ঞ) একজন রিভিউয়ার কী ভাবে প্রদর্শনী রিভিউ করবেন?

ট) নাট্যসমালোচক বা রিভিউয়ার হিসেবে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ্য :

১. রিপোর্টিং — সুধাংশু শেখর রায়

২. সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র — সুধাংশু শেখর রায়

৩. সাংবাদিকতা পরিচিতি — সম্পাদনা : রোল্যান্ড ই উলসলে
৪. ফটো সাংবাদিকতা — নীরোদ রায়
৫. The Professional Journalism — John Hohenberg
৬. Professional Journalism — M. V. Kamath
৭. Book Reviewing —Drewry John Eldrige
৮. Film — Heinzkill Richard
৯. Guide Book to the Drama — Vargas Lais
১০. Writing the Feature Article — Steigleman, Walter Allen
১১. Writing and Selling Feature Articles — Patterson Hallen Marguerite.

সহায়ক গ্রন্থ :

১. Here is the News — Partha Sarathi Rongswami
২. News Reporting and Press Photography — Amar Nath
৩. The Publishing and Review of Reference Sources — Bill Katz and Robin Kinder
৪. (The) Book Review Digest — H. W. Wilson
৫. Figures of Light — Kauffmann Etanby
৬. A Guide to Critical Reviews — Salem James M.

শব্দসূচি

Human Interest	—	মানসিক আবেদন
Emotion	—	আবেগ
Immediacy	—	তাৎক্ষণিকতা
News Value	—	সংবাদযোগ্যতা / সংবাদমূল্য
Climax	—	চূড়ান্ত পরিণতি
Soul	—	আত্মা
Rivew	—	সমালোচনা
News Photographer	—	সংবাদচিত্রী
News Photo	—	সংবাদচিত্র
Activity	—	সক্রিয়তা
Visual Dimension	—	দৃশ্যময় মাত্রা
Shape	—	আকার

একক ৫ □ প্রতিবেদন লেখার পরের কাজ

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ সাংবাদিকদের কাজ
৫.২.১ কর্মক্ষেত্র
৫.২.২ সম্পাদক — Editor
৫.২.৩ নির্বাহী সম্পাদক — Executive Editor
৫.২.৪ সহকারী সম্পাদক — Assistant Editor
৫.২.৫ বার্তা সম্পাদক — News Editor
৫.২.৬ মুখ্য অবর সম্পাদক — Chief Sub-Editor
৫.২.৭ মুখ্য প্রতিবেদক — Chief Reporter
৫.২.৮ বিশেষ সংবাদদাতা — Special Correspondent
৫.২.৯ অবর সম্পাদক — Sub-Editor
৫.২.১০ প্রতিবেদক ও সংবাদদাতা — Reporter & Correspondent
৫.২.১১ স্তম্ভকার — Columnist
৫.২.১২ বিষয়বস্তু নির্বাচন
৫.২.১৩ সংবাদ সংস্কার
৫.২.১৪ লিখন পদ্ধতির সমতা বিধান
৫.২.১৫ সংবাদ প্রদর্শন কলা
৫.৩ সারাংশ
৫.৪ অনুশীলনী
৫.৫ উত্তর-সংকেত
৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে এই বিভাগটিতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদন লেখার ও তার পরবর্তী কাজকর্মের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

৫.১ প্রস্তাবনা

সংবাদপত্রের একটি স্তম্ভ হল তার সম্পাদকীয় বিভাগ। এই বিভাগে নিযুক্ত যে সব কর্মী সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন বিষয়বস্তু রচনা করেন এবং সেই কাজে সহায়তা করেন তাঁদের সব্যরই পরিচয় সাংবাদিক। কোন পদাধিকারী সাংবাদিক কি কাজ করেন তা এই এককটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.২ সাংবাদিকের কাজ

আপনাদের আগেই বলেছি, সাংবাদিকরা সবাই এক রকমের কাজ করেন না। সম্পাদকীয় দপ্তরে রোজ নানা ধরনের বিষয়বস্তু আসে ও রচিত হয়। সেই কাজে এবং তা চূড়ান্তভাবে ছাপার জন্য যারা নিযুক্ত থাকেন বা সহায়তা করেন তাঁরা সবাই সাংবাদিক বলে স্বীকৃত হন। কিন্তু তাঁদের সকলের কাজের ক্ষেত্র এক নয়। যেমন— সাব-এডিটর, রিপোর্টার, সহকারী সম্পাদক ইত্যাদি।

সাব-এডিটর যে কাজ করেন রিপোর্টার তা করেন না। তেমনি সহকারী সম্পাদকের কাজের সঙ্গে সাব-এডিটর বা রিপোর্টারের কাজের কোন মিল নেই।

আপনারা এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখককে যে কাজ করতে হয়, সাব-এডিটর বা রিপোর্টারকে তা করতে বলা হয় না। প্রত্যেক নির্দিষ্ট পদের সাংবাদিককে নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়।

৫.২.১ কর্মক্ষেত্র

এই বিষয়ে আরও আলোচনার আগে আপনাদের জানা দরকার, সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ এবং পদবিন্যাস সম্পর্কে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা আছে। তার শ্রেণি ও পদের ওপর তার কর্মক্ষেত্র নির্ভর করে।

[*মনে রাখবেন, সম্পাদকীয় বিভাগে অবর সম্পাদক, প্রতিবেদক ইত্যাদি কথা চালু হয়নি। তাই আমরা এরপর থেকে অযথা পরিভাষা ব্যবহার না করে সাব-এডিটর, রিপোর্টার, চিফ রিপোর্টার ইত্যাদি চালু ইংরেজি কথাগুলি ব্যবহার করতে থাকব।*]

১৯৫৮ সালের জুন মাসে ভারত সরকার সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন, ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদি করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তার ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বেতনভুক সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ এবং পদবিন্যাস করে দেওয়া হয়েছে।

পরে এই ব্যাপারে আরও কয়েকবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। সর্বশেষ জারি করা বিজ্ঞপ্তিটির (The Gazette of India Extraordinary, Part II – Section 3 – Sub-section ii, December 5, 2000) ভিত্তিতে সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ ও পদবিন্যাসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঃ

শ্রেণি — Group	পদ — Category
১ — 1	সম্পাদক — Editor
১এ — 1A	নির্বাহী সম্পাদক — Executive Editor

	আবাসিক সম্পাদক — Resident Editor
	সহযোগী সম্পাদক — Associate Editor
	যুগ্ম সম্পাদক — Joint Editor
	উপ সম্পাদক — Deputy Editor
১বি — 1B	সহকারী সম্পাদক — Assistant Editor
	সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখক — Leader Writer
	— Chief of News Bureau
	বার্তা সম্পাদক — News Editor
	বিশেষ সংবাদদাতা — Special Correspondent
২ — 2	Deputy or Assistant News Editor
	Chief Reporter
	Chief Sub-Editor
	Sports Editor
	Commercial Editor
	Film Editor
	Magazine Editor
	Cartoonist
	Chief of Statistical or Research Division
	Chief News Photographer
	Chief Librarian
	Chief Index Assistant
	Chief Calligraphist
	Chief Artist
	Principal Correspondent in State capitals accredited to the State Government,
	Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent and other sectional or batch leads, not played in a higher category.
২এ — 2A	Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor
	Chief Reporter or Senior Reporter
	Senior Correspondent
	Senior Calligraphist
	Senior Artist
	Senior Librarian
	Senior Index Assistant and Senior Reference Assistant

৩ — 3	Sub Editor Reporter Correspondent News Photographer Artist Calligraphist including Katibs, Librarian Index Assistant Chief Proof Reader
৩এ — 3A	Proof Reader including Advertisement Proof Reader and Planner
৪ — 4	All Working

এই তালিকা দেখে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রতিটি সংবাদপত্রে উক্ত প্রতিটি পদের জন্য সাংবাদিক নিয়োগ করা কি আইনত বাধ্যতামূলক?

গেজেটে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তালিকায় যে সব পদের উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটিতে কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক নিযুক্ত করতে পারেন, নাও পারেন ("All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of Newspaper establishment")।

এই সব সাংবাদিকরা কে কি কাজ করবেন তার সংজ্ঞা (Functional Definition) ঐ বিজ্ঞপ্তির দ্বিতীয় তালিকায় (Second Schedule) বর্ণনা করা হয়েছে। বইয়ের পরিশিষ্টে তা সংযোজিত হল। কারণ, আমাদের আলোচনার মধ্যে কয়েকটি পদের সাংবাদিকের কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। আমরা কতকগুলি বাছা বাছা পদের সাংবাদিকের কাজের ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হব।

বিভিন্ন পদের সাংবাদিকদের কাজের প্রকৃতি জানার আগে সংবাদপত্র কাকে বলে তা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার।

১৮৬৭ সালে ইংরেজ শাসনকালে The Press and Registration of Books Act চালু হয়। সেই আইনে পরে একটি ধারা যুক্ত করে সংবাদপত্রকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ওই ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র মানে জনসাধারণ সম্পাদিত সংবাদ এবং তার ওপর মন্তব্যের যে কোন মুদ্রিত বিবরণ ("Newspaper means any printed periodical work containing public news or comments on public news.")।

৫.২.২ সম্পাদক

এবার আমাদের আলোচনার বিষয় খবরের কাগজের সম্পাদক। প্রথমেই জেনে রাখুন, আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খবরের কাগজের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যায় তার সম্পাদকের নাম ছাপা বাধ্যতামূলক। এই বিধি অগ্রাহ্য করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। প্রকাশক ও মুদ্রাকরকেও এই অপরাধে দায়ী করা হবে।

৫.২.১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইন অনুযায়ী খবরের কাগজের সম্পাদকের সংজ্ঞা হল—"Editor means

the person who controls the selection of the matter that is published in a newspaepr." — "খবরের কাগজে প্রকাশিত বিষয়বস্তু মনোনয়নের ক্ষমতা যার হাতে থাকে সেই ব্যক্তি সম্পাদক।"

৫.২.১ অনুচ্ছেদে উল্লখিত ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে সম্পাদকের কাজের সংজ্ঞা (Functional Definition) প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল— "Editor means a person who directs and supervises the editorial side of a newspaper." — যে ব্যক্তি খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগটি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন তিনি সম্পাদক।

অর্থাৎ, আইন অনুযায়ী কোন খবরের কাগজে বেআইনি কোন খবর, মন্তব্য বা অন্য কোন বিষয় ছাপা হলে তার জন্য সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন (The editor who controls the selection of matter for publication in the newspaper "would be liable for any offensive matter"— ৫.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)। এই দায়বদ্ধতার ব্যাখ্যা হল, অশ্লীল, মানহানিকর, হিংসায় প্ররোচনামূলক কোন খবর বা মন্তব্য প্রকাশিত হলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বা সরকার আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এই অপরাধে সম্পাদকও অন্যতম অভিযুক্ত হবেন। তখন তিনি আদালতকে এই কৈফিয়ৎ দিয়ে পার পাবেন না যে, এটা আমার লেখা নয়' বা 'এটা আমার আপত্তি সত্ত্বেও ছাপা হয়েছে' বা 'এটা আমাকে অন্ধকারে রেখে প্রকাশিত হয়েছে'। অভিযুক্ত সম্পাদকের এই সব সাফাইয়ে আদালত কান দেবেন না। অপরাধ সাব্যস্ত হলে সম্পাদককে সাজা ভোগ করতে হবে।

খবরের কাগজের আইন কানুন সম্পর্কে সম্পাদকের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

প্রথমেই বলি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতের সংবিধানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা নেই। যা আছে তা হল — বক্তৃতা দেবার এবং মনের ভাবনাচিন্তা প্রকাশের অধিকার : Right to freedom of speech and expression" — Article 19(1)(a).

এই অধিকার আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনবিধিতে নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত। এই ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আদালত ঠিক করে দিয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মনের ভাবনাচিন্তা প্রকাশের অধিকারের অন্তর্গত একটি বিষয়। আদালতের এই ব্যাখ্যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হয়ে আছে।

কিন্তু কোন দেশে, কোন শাসন ব্যবস্থার নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা অবাধ নয়, বরং সীমাবদ্ধ। এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নাম করে খবরের কাগজে যা ইচ্ছা তাই লেখা চলে না। তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন আইন ও তার ধারা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের, বিশেষ করে সম্পাদকদের এই সব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

এই সব আইনের মধ্যে রয়েছে— Indian Penal Code-এর কয়েকটি ধারা, Contempt of Courts Act 1971, The Press and Registration of Book Act 1867, Indian Telegraph Act 1885, Indian Post Office Act 1898, Official Secrets Act 1923, The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, The Young Persons (Harmful Publications) Act 1956, Criminal Brochure Code 1973, The Press Council Act 1978 ইত্যাদি এবং ভারতের সংবিধানের ১৯(২) ধারা।

এখানে যে সব আইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সংবিধানের ১৯(২) ধারাটি তার নির্যাস। এই ধারায় বলা হয়েছে— Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall effect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

অর্থাৎ, খবরের কাগজের মাধ্যমে মনের ভাবনাচিন্তা প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারের নামে দেশের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বা সংহতি বিপন্ন করে এমন বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকার সংবিধান কাউকে দিচ্ছে না। এই অধিকারের অপব্যবহার করে দেশের নিরাপত্তার ক্ষতি করে এমন কিছু সরকারি গুপ্ত তথ্য খবরের কাগজে প্রকাশ করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নামে হিংসায় উসকানিদান এবং আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারকে হিংসাত্মক উপায়ে, উৎখাত করতে উৎসাহদান করা বেআইনি কাজ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে বলে সামাজিক পরিবেবাকে কলুষিত করা এবং অশ্লীল ও অশোভন বিষয় প্রকাশের আইনসঙ্গত মাধ্যম খবরের কাগজ নয়। এ সব ছাড়া, বিচারাধীন বিষয়ে কোন পক্ষ অবলম্বন করে কোন কিছু লেখা বা মন্তব্য করা, কারো নামে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও অমূলক সংবাদ প্রকাশ করা বা যে কোন অপরাধে উসকানি দেওয়া হলে সেই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ধরনের কোন বিষয় যাতে প্রকাশ না হয় তার দিকে বিশেষ করে সম্পাদকের সদাসতর্ক থাকতে হবে। এই ব্যাপারে কোন গাফিলতি ধরা পড়লে সম্পাদককেই তার দাম দিতে হবে।

খবরের কাগজকে যদি একটি নৌকা বলে কল্পনা করা যায় তাহলে সম্পাদক তার কাণ্ডারী।

খবরের কাগজকে যদি একটি ট্রেন বলে ভাবা যায় তাহলে সম্পাদক তার ইঞ্জিনচালক।

খবরের কাগজকে যদি একটি সিনেমা বলে কল্পনা করা যায় তাহলে সম্পাদক হলেন তার Director বা পরিচালক।

নৌকা বানচাল হলে দায়ী হন কাণ্ডারী।

ট্রেন লাইনচ্যুত হলে দোষ হয় ইঞ্জিনচালকের।

সিনেমা ফ্লপ করলে বদনাম হয় পরিচালকের।

আর খবরের কাগজে পাঠকদের টানতে না পারলে ব্যর্থতার দায় বর্তায় সম্পাদকের ঘাড়ে।

সার্থক ও সফল সম্পাদকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত পাঠকদের আকর্ষণ করা ও ধরে রাখা। কারণ, তাঁরাই খবরের কাগজের প্রভাব প্রতিপত্তির একমাত্র উৎস। যে কাগজের পাঠক যত বেশি তার প্রভাবও তত বেশি। পাঠক টানার দৌড়ে যে কাগজ পিছিয়ে পড়ে তার ধার ও ভার ততই কম।

সুতরাং পাঠক টানার কৌশল ও নীতি সম্পাদকের জানা থাকা দরকার। শুধু তা হলেই তিনি যুদ্ধ জয় করতে পারবেন না। একজন জেনারেলই যদি লড়াই করতে পারতেন তাহলে সেনাবাহিনীতে নানা পদমর্যাদার

কমিশন্ড অফিসার এবং সৈনিকের প্রয়োজন থাকত না। সম্পাদকের অধীনস্থ সাংবাদিকরাই হলেন তাঁর বাহিনীর অফিসার ও সৈনিক।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাংবাদিকদের নির্বাচন করতে সম্পাদক কী মাপকাঠি ব্যবহার করবেন?

এই ব্যাপারে অ্যাডলফ এস ওখস (Adolph S. Ochs) একটি মাপকাঠি চালু করে গেছেন। তিনি বর্তমান The New York Times — দ্য নিউইয়র্ক টাইমস (এরপর থেকে আমরা নিউইয়র্ক টাইমস বলব) পত্রিকার জনক। ১৮৯৬ সালে প্রায় দেউলিয়া নিউইয়র্ক টাইমস কিনে তিনি তাকে নতুন জীবন দেন।

তিনি বাল্যকাল থেকেই খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন তিনি থাকতেন আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের একটি ছোট শহর সাট্যানুগায় (Chattandoga)। বড় হয়ে তিনি সেখান থেকে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করতেন। পরে তিনি নিউইয়র্ক টাইমস কিনে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন এবং ধীরে ধীরে তাকে পৃথিবীর ১০টি বড় খবরের কাগজের মধ্যে একটিতে পরিণত করেন।

সাংবাদিক নিয়োগে তাঁর মাপকাঠি ছিল, এই কাজের জন্য বাজারে যে সব লোক রয়েছে তাঁদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ (Best) তাঁদের খুঁজে বের করা এবং নিউইয়র্ক টাইমসে টেনে আনা। নিউইয়র্ক টাইমসে কাজ দেবার পর নির্দিষ্ট কাজের ব্যাপারে তাঁদের ওপর আস্থা রাখা। তাঁদের কাঁধের ওপর দিয়ে হাতের কাজে উঁকি না দেওয়া। তাঁরা নির্দিষ্ট কাজ ঠিকঠাক করছেন কিনা তা ভেবে মাথা গরম করে রাতের ঘুম পণ্ড না করা। যার ওপর আস্থা রাখা যাবে না তাঁকে নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় বিভাগে ঠাঁই না দেওয়াই ছিল ওখসের নীতি।

তাঁর সৃষ্ট এই ঐতিহ্য আজও সব খবরের কাগজে সাংবাদিক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকা উচিত। যে ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটবে সেই কাগজ সমস্যা ডেকে আনবে।

সম্পাদকের সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্ক বুঝতে গেলে সিনেমার পরিচালকের সঙ্গে ছবির কুশীলবদের সম্পর্কের উদাহরণ টানা যায়। রবি ঘোষ, তপেন চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত এই ত্রিমূর্তিকে সত্যজিৎ রায় খুঁজে বার করে উপযুক্ত ভূমিকায় না নামালে গুপী গাইন বাঘা বাইন একটি চিরকালের চলচ্চিত্র হত না। অন্যভাবে বলা যায়, সত্যজিৎ রায়ের হাতে পড়েছিল বলেই ঘোষ-চট্টোপাধ্যায়-দত্তের অভিনয় প্রতিভার বিকাশ ও সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল।

শিক্ষিত ও দক্ষ সাংবাদিক নিয়োগ করেই সম্পাদকের কাজ শেষ হয় না। তখন তাঁকে সম্পাদনার নীতি নির্ধারণ করতে হয়। সেই নীতি কাগজে প্রতিফলিত করার দিকে তাঁকে নজর রাখতে হয়।

সংবাদপত্র সম্পাদনার সাধারণ নীতি কি হওয়া উচিত? এই বিষয়েও আমরা ওখস সাহেবের পথ অনুসরণ করতে পারি। ১৮৯৬ সালে নিউইয়র্ক টাইমসের কর্তৃত্ব হাতে নেবার সময় তিনি ঘোষণা করেন — "To give the news impartially without Fear or Favour Regardless of any Party, Sect or Interest Involved" — কোন স্বার্থে না জড়িয়ে, দল অথবা গোষ্ঠীর পরোয়া না করে ভয় বা সুবিধার লোভের বশীভূত না হয়ে পত্রপাতহীন খবর পরিবেশন— এই ছিল নিউইয়র্ক টাইমসের নীতি, এই ছিল তার ধর্ম।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই নীতি প্রতিটি সংবাদপত্রের পক্ষে সর্বকালে গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য।

এই সাধারণ নীতির সঙ্গে একটি পরিপূরক নীতিও চালু করেছিলেন ওখস। সেটি আজও নিউইয়র্ক

টাইমস সগৌরবে ও সবিনয়ে শিরোভূষণ রূপে বহন করে। সেটি হল, এই কাগজে পাওয়া যাবে "All the News that's Fit to Print" — ছাপার যোগ্য যাবতীয় খবর।

এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, ওখস সাহেব ঠিক করেছিলেন, খবর শুধু খবর হলেই তা নিউইয়র্ক টাইমস ছাপবে না। বিচার করে দেখবে খবরটি সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশন করা যায় কিনা। খবরটি জানা জরুরী কিনা। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সমকামিতা, যৌনতা, দৈহিক ব্যাপারে এবং এই রকম বিষয়ে কোন খবর নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস মাতামাতি করবে না। কারণ পরিবারের ছেলে মেয়ে যুবক কিশোর বৃদ্ধ মা বোন সবই যখন খাবার টেবিলে জড়ো হন তখন ওই সব বিষয়ে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করা হয় না। পারিবারিক খাবার টেবিলে যে খবর পরিবেশন করা যায় না, সেই খবর তাঁর কাগজে ছাপার যোগ্য নয়, এই ছিল ওখস সাহেবের অনুশাসন।

কিন্তু যুগ বদলায়। সেই সঙ্গে বদলায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা, রুচি, ভাল মন্দর বিচারবোধ। অবস্থার চাপে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিযোগিতায় জিততে অনেক আপস করতে হয়, অনেক কিছু মেনে নিতে হয়। নিউইয়র্ক টাইমসকেও তাই করতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তার প্রথম পাতার সব চেয়ে ওপরে ছাপা ওই সাতটি শব্দ মুছে দেওয়ার কথা আজও কেউ বলেন না। আজও তার প্রথম পাতার বাঁদিকের কোণে চতুষ্কোণের মধ্যে ছাপা হয়ে চলেছে "ছাপার যোগ্য যাবতীয় সংবাদ"।

২০০২ সালের আগস্ট মাসে নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় নীতিতে আরও একটা বড় রকম পরিবর্তন এল। কাগজটির সম্পাদক হাওয়েল্ রেইনস (Howell Raines) ঘোষণা করলেন, তাঁর কাগজে সমকামীদের বিবাহের খবরও প্রকাশিত হবে।

এই বিষয়ে দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার কলকাতা সংস্করণে ২০-৮-২০০২ তারিখে প্রকাশিত খবরের কিছুটা অংশ নিচে তুলে দিচ্ছি—

New York Times to publish gay, lesbian unions

New York: The New York Times, one of the most respected newspapers in the US, said on Sunday it was changing its policy to publish formal gay and lesbian unions, joining scores of other dailies.

Editor Howell Raines said in Sunday's editions the change to "Wedding/Celebrations" from "Weddings" in the long-running Sunday Styles section will begin next month.

Gay and lesbian activists hailed the move.

"We are delighted that The New York Times has changed its policy because it is in many ways the preeminent newspaper in this country," said a spokesman of the Gay & Lesbian Alliance.

Until Sunday, The New York Times had a written policy not to include same-sex unions.

"In making this change we acknowledge the newsworthiness of a growing and visible trend in society toward public celebrations of commitment by gay and lesbian couples," Rains said.

নিউইয়র্ক টাইমসের জনক ওখসসাহেবের বিচারে যা ছিল অশিষ্ট, অশালীন, অশ্লীল, অপ্রয়োজনীয় তেমন খবরাখবর শুধু আমেরিকা বা ইউরোপের খবরের কাগজগুলিতে ছাপা হয় না, কলকাতার কয়েকটি কাগজেও ওই রকম খবর স্থান পাচ্ছে। যেমন—

কাগজ গ, ১২-৬-২০০২, "Sex No Bar As Money Tops Teen Priority."

কাগজ ঝ, ৩০-৬-২০০২, "Should Homosexuality be legalised?"

কাগজ ক, ৩০-৬-২০০২, "শিক্ষকের যৌন পীড়নের শিকার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আত্মঘাতী।"

কাগজ ঙ, ২-৭-২০০২, "NY gay parade sees wigs and weddings."

এই চারটি খবর কী পাঠকদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ? পরিবারের বড়রা ছোটদের সঙ্গে, ছোটরা বড়দের সঙ্গে কি দ্বিতীয় খবরটি নিয়ে নিঃসংকোচে বিতর্ক করতে পারে? আলোচনা করতে পারে? আপনার ভাই বা বোন কি আপনাকে বলতে পারে, সমকামিতা আইনসিদ্ধ হওয়া উচিত। এই বিষয়ে বিতর্ক করা কি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনের পরিচয়?

প্রথম খবরটির বিষয়বস্তু হল, স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা হাত খরচ জোগাড় করার জন্য যৌন ব্যবসায় নেমে পড়েছে। তাই হয়ত পড়ছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় কতজন? খুব কম বললেও বেশি বলা হয়। তাহল এটা নিয়ে খবর করা কেন? পাঠকদের কাছে কী বার্তা পাঠাচ্ছে এই খবর? স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের কোন পথের ঠিকানা দিচ্ছে এই সংবাদ? কাদের কাছে এই খবর এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল?

তৃতীয় খবরটি মারাত্মক। শিরোনামের সঙ্গে খবরের বিস্তর গরমিল। শিরোনামে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে, শিক্ষকের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেছে। এমন কী অপরাধী শিক্ষকের নামও খবরে লেখা হয়েছে।

যে শিক্ষকের যে দোষ প্রমাণ হল না তাঁর মাথায় সেই অপরাধের বোঝা এই খবরে চাপিয়ে দেওয়া হল। একটি কিশোরকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্যও প্রকারান্তরে দায়ী কর হল তাঁকে। একে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা বলা চলে না। বরং একে পীত সাংবাদিকতার (Yellow Journalism)-এর একটি দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করা যায়।

খবরে জানা যাচ্ছে, এই ব্যাপারে অভিযোগ ওঠার পর থেকে ওই শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমরা ওই শিক্ষককে পীত সাংবাদিকতার নির্যাতনের শিকার বলে বর্ণনা করতে পারি।

এই রকম খবর প্রকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা সম্পাদকের পদমর্যাদার সঙ্গে খাপ খায় না। পর্নোগ্রাফির (Pornography) সঙ্গে খবরের কাগজের তফাত সম্পর্কে সজাগ থাকা সম্পাদকেরই দায়িত্ব। পর্নোগ্রাফিকে সম্পাদক কোন অজুহাতেই খবরের মর্যাদা দিতে পারেন না।

নিউইয়র্ক শহরে সমকামীদের বর্ণাঢ্য মিছিল চতুর্থ খবরটির বিষয়বস্তু। এই রকম খবরের তৃষ্ণায় এখানকার পাঠকদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে এমনটা ধরে নেওয়ার কোন কারণ আছে কি? নেই।

এই খবরটি চোখে পড়ার পর আপনার ভাই বা বোন যদি জানতে চায়, কাদের বলে, আপনি পারবেন তাকে খোলা মনে বুঝিয়ে দিতে? নিশ্চয় পারবেন না। তাহলে কিসের জন্য এই খবর? কার জন্য এই খবর? সম্পাদককেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

এই সুযোগে আমরা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা জানা দরকার।

১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ সহযোগী সম্পাদক রূপে ওই কাগজে যোগ দেন। প্রথম দিন থেকেই তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন। এক বছরের মধ্যেই তিনি আনন্দবাজারের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে আনন্দবাজারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হলে তিনি যুগান্তরে আসেন। কিন্তু যুগান্তরের সঙ্গেও তারঁ সম্পর্ক বেশিদিন টেঁকেনি। 'অরণি', 'স্বরাজ', 'সত্যযুগ' হয়ে ১৯৫১ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় ফিরে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিল, "বাংলার সংবাদপত্র জগৎ এই অসীম শক্তিমান লেখকের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে" (১৭ অক্টোবর, ১৯৫৪)।

তাঁর সম্পর্কে এই নিবন্ধে বলা হয়েছিল, "সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ, তীক্ষ্ণধী শক্তিমান লেখক। সংবাদপত্র জগতে এইরূপ সব্যসাচীসদৃশ শক্তিমান লেখক আর কেহ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। যে কোনো বিষয় লইয়াই তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যে কোন বিষয় লইয়াই তিনি অনবদ্য বলিষ্ঠ ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলার সংবাদপত্র-সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে তাহর তুলনা নাই।"

খবরের কাগজ ও তার সম্পাদককে সত্যেন্দ্রনাথ কি চোখে দেখতেন? এই প্রশ্নের জবাব মিলবে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশনে। ১৯৩৮ সালে কৃষ্ণনগরে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণের বিষয় ছিল সংবাদ-সাহিত্য।

ভাষণে সংবাদপত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হউক আর যৌথ কারবারই হউক, সংবাদপত্রের আসল প্রভু জননায়ক, জনতা মহারাজ, গভর্নমেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতা। ইহাদের পরস্পরের বিপরীত স্বার্থ ও অভিপ্রায়ের ঘাত-সংঘাত সংবাদপত্রের উপর সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে।"

সংবাদপত্রের চরিত্র এত কম কথায় কিন্তু এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার মধ্যে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের গভীর চিন্তাশক্তির একটু পরিচয় পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের মালিক একই সঙ্গে চান দেশের নেতাদের ভালবাসা, দেশের মানুষদের বিশ্বাস, সরকারের আস্থা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা।

যে কাগজের প্রতি নেতা প্রসন্ন থাকেন সেই কাগজের মর্যাদা তত বাড়ে। কিন্তু নেতা ও জনতাদের স্বার্থের সংঘাত হলে মালিক সংকটে পড়েন। নেতা ও জনতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে সরকার রুষ্ট হয় এমন কিছু লিখে ফেলার ঝুঁকি কর্তৃপক্ষ চট করে নিতে চান না। তার ওপর রয়েছে বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থ। তার মেজাজ বিগড়ে গেলে কাগজের অর্থভাণ্ডারে টান পড়ে যাবে। কোন কর্তৃপক্ষই কী সাধ করে তা চাইবেন? কেউ না। তাহলে সম্পাদক কী করবেন? কোন দিকে যাবেন?

এইসব কথা ভেবেচিন্তে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কৃষ্ণনগরে ভাষণে বলেছিলেন, "সম্পাদককে এই সব চাপ, পাল্টা চাপ, স্রোত, চোরা স্রোত স্বীকার, অস্বীকার, উপেক্ষা, ক্ষমা করিয়াই দৈনন্দিন কাজ করিতে হয়।"

তাঁর এই ভাষণের আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে। তাই জানাই, তিনি আরও বলেছিলেন, "সম্পাদকের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে সংবাদপত্র পরিচালিত হয় না, অথচ প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা ও অপবাদের ভাগ সম্পাদকদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। সম্পাদক অতি মানব নহেন। দোষত্রুটি অপূর্ণতা যেমন সাধারণ

মানুষের আছে, তেমনি সম্পাদকেরও আছে। কিন্তু তাহা স্মরণ রাখিয়া কেহ তাহাকে রেহাই দেয় না। সম্পাদককে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবে, সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে; সামান্য অসাবধান হইলেই আইন তাহাকে দংশন করিবে। ধনী ও বড়লোকেরা তাঁহাদের ঢাক পিটাইতে অস্বীকার করিলে ক্রুদ্ধ হন, নেতারা তাঁহাদের বিবৃতি বড় বড় হরফের শিরোনামা দিয়া প্রকাশ না করিলে বিষণ্ণ হন, মন্ত্রীদের দোষত্রুটি উদ্ঘাটন করিলে তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়া বড় বড় ডাণ্ডা বাহির করেন, পুলিশ ও সিভিলিয়ানতন্ত্র তাঁহাদের নিরুদ্বিগ্ন ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপর প্রাত্যহিক কটাক্ষ ও সমালোচনা দেখিয়া দণ্ডে দণ্ডে ঘর্ষণ করেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদকদের অবস্থার এই বিশ্লেষণ আজও বহুলাংশে বহাল রয়েছে কি না তা আপনারা ভেবে দেখতে পারেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তো অনেক পরে এলেন। তারও আগে মঞ্চ আলো করে আবির্ভূত হয়েছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ। শিশিরকুমার আর মতিলাল দুই ভাই মিলে যশোর জেলার একটি গ্রাম থেকে হঠাৎ একটি সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বার করে ফেললেন। পত্রিকাটির নাম দিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদক শিশিরকুমার বিদেশি রাজের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাতে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন শিশিরকুমার। তা হল, সরকার ও তার হুকুম বরদারদের 'প্রকৃত কর্মনীতি ও কর্মকৌশল উদ্ঘাটিত' করা। কারণ, বিদেশ থেকে মানদণ্ড হাতে করে এ দেশে প্রবেশ করে তার রাজদণ্ড হাতে তুলে নেওয়ার 'কঠিন ও ক্লান্তিকর দায় থেকে দেশের মানুষকে অব্যাহতি দিয়ে তাদেরই স্বার্থে ও কল্যাণে নিজেরা সেই' গুরুভার বোঝা বইছেন। 'সদাশয় সরকার' ও তার আমলাদের সেই 'মহানুভবতার প্রতিদান' দেওয়াই অমৃতবাজারের ব্রত। অমৃতবাজার নিরন্তর সরকার ও প্রশাসনের মুখোশ খুলে দিয়ে সেই কাজ করবে।

শিশিরকুমার ও মতিলাল সততা, নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে তাঁদের ব্রত পালন করেছিলেন। শিশিরকুমার এক সময়ে তাঁর কাগজকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই ক্যামেরায় যদি অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বাস্তবতা ফুটে ওঠে তাহলে তিনি নাচার।"

সোজা কথায়, ওই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শিশিরকুমার ও মতিলাল তাঁদের সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি ঘোষণা করে দিলেন। সেই নীতির সারমর্ম হল, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকরা নিরপেক্ষ নন। তাঁদের পক্ষপাতিত্ব নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত দেশবাসীর পক্ষে। বিদেশি শোষকদের বিরুদ্ধেই তাঁরা কলম চালাবেন।

এই দুঃসাহসিক নীতির জন্য তাঁরা একই সঙ্গে রাজশক্তির মনে সম্ভ্রম ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তাঁরা প্রথমে লোভ দেখিয়ে ঘোষভ্রাতাদের বশ করার চেষ্টা করল। সেই কাজে সরাসরি উদ্যোগ ছিল বাংলার লাটসাহেব স্যার অ্যাশলি ইডেনের। কিন্তু লাটসাহেবের দেওয়া ক্ষমতার উপঢৌকন ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন শিশিরকুমার।

অপমানিত লাটসাহেব তাতে চটলেন। এবার তিনি চেষ্টা করলেন আইনের ফাঁস দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার কণ্ঠরোধ করার। সেই মতলবে ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদন করানো হল একটি কালা আইন। তার নাম ছিল Vernacular Press Act — দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলির কলমে আইনের লাগাম পরানো। ভারতীয়

জনসাধারণের মনে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার জন্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলিতে রাজদ্রোহমূলক লেখা বন্ধ করতে এই আইন রচনা করা হয়েছিল।

আইনের কায়দাকানুন দেখে বুদ্ধিমান ঘোষভ্রাতাদের বুঝতে দেরি হল না যে এই দমনমূলক আইনের আসল লক্ষ্য ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক কাগজ অমৃতবাজার পত্রিকা। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে যে কোন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত দ্বিভাষিক কাগজকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়েছিল।

ঘোষভ্রাতারা আইনের লক্ষ্য বুঝলেন কিন্তু ভয় পেলেন না। সাগরপারের প্রভুরা চলেন ডালে ডালে, ভেতো বাঙালি সম্পাদক চলেন পাতায় পাতায়। আইন পাস হবার সাতদিন পরে ২১ মার্চ অমৃতবাজারের নতুন সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। সেটি হাতে নিয়ে আইনের জনক ও রক্ষাকর্তাদের চোখ চড়কগাছে উঠল। তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, অমৃতবাজারের সেই সংখ্যাটি আগাগোড়া ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। ইংরেজি ভাষা ভারতের দেশি ভাষা নয়, বিদেশি ভাষা। অমৃতবাজারকে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সাতদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষায় প্রকাশ করে অ্যাশলিসাহেবের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোয় পরিণত করে দিলেন শিশিরকুমার-মতিলাল জুটি।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের দুঃসাহসী কীর্তিকলাপ জানার পাশাপাশি যুগান্তরের এক ডাকসাইটে সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও আপনাদের কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। তিরিশের দশকে অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যুগান্তর নামে একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ বার করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর বিবেকানন্দ যুগান্তরের সম্পাদকপদে যোগ দেন। পরে তিনি একটানা ২৫ বছর ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখার ধারে ও ভারে রাজশক্তি মাঝে মাঝেই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হত। আনন্দবাজারে একবার 'সাহিত্যে সরকারি দৌরাত্ম্য' শিরোনামে তাঁর লেখা একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পড়ে। তার সাজা হিসাবে সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিল।

চল্লিশের দশকে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু দুর্গত মানুষদের ত্রাণ সাহায্য করতে বিদেশি সরকার কার্পণ্য ও ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই দেখায়নি। সরকারের এই অমানবিক হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের কলমের মুখে তুফান ছোটে। রচিত হয় এক ঐতিহাসিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ, 'ঝড়ের বন্ধন মুক্তি'। ব্রিটিশ সরকার বদলা নিতে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করে একটানা তিন দিন যুগান্তরের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।

পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের মেয়ে এষা দে এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, "'ঝড়ের বন্ধন মুক্তি'র ক্লিপিং কলকাতার কলেজে কলেজে উৎসাহী ব্যক্তিরা সেঁটে দিয়েছিলেন। এইরকম মারমুখী সম্পাদকীয় লেখায় সেদিন বাঙ্গালীজাতির চোখে বাবার যে গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাতে মালিক পক্ষ সম্পূর্ণ ভাগীদার ছিলেন। অর্থাৎ রাজরোষ ও ব্যবসায়ে লোকসানের চেয়ে নির্ভীক, বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শই যে বড় তা দু পক্ষই সমানভাবে বিশ্বাস করতেন" (শারদীয় আজকাল, ১৪০৮)।

কিন্তু সম্পাদক-মালিক মধুযামিনীর মিষ্টতা দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পানসে হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকের পদ হারালেন। তারও দশ বছর পরে ক্ষুব্ধ বিবেকানন্দ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে সখেদে লিখলেন, "খবরের কাগজে সম্পাদক হিসাবে যার নাম ঘোষিত হয়ে থাকে, নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁর কিছুটা সম্মান ও কিছুটা

স্বাধিকার থাকে। পাছে সেই সম্মানটুকু এবং সেই স্বাধিকারের সুযোগ নিয়ে সম্পাদক মশাই কখনও কখনও এমন কিছু লিখে বসেন, যাতে এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গায়ে আঁচড়টুকু লাগতে পারে কিংবা কোন কোন দিক দিয়ে মালিকপক্ষের স্বার্থের উপর কিছুটা আঘাত পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় গত দুই দশক ধরে সংবাদপত্রের মালিকেরা একটা সোজা পথ অবলম্বন করেছেন, অর্থাৎ তাঁরা নিজেরাই সম্পাদকের আসন দখল করে নিয়েছেন।"

আরও পরে ১৯৮৩ সালে প্রেস ক্লাব, ক্যালকাটার বিশেষ সংখ্যায় বিবেকানন্দ আরও চাঁচাছোলায় ভাষায় অনুযোগ করেছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে "সংবাদপত্রে সম্পাদকের বা সম্পাদকীয়ের অবমূল্যায়ন ঘটেছে।"

বিবেকানন্দের এই সব বক্তব্য অনেকাংশে সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়ে থাকে। কোন কোন সাংবাদিক মনে করেন এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন, মালিক সম্পাদক মানেই অযোগ্য সম্পাদক, সব ক্ষেত্রে তা ঠিক নয়। কারণ, প্রতিযোগিতার যুগে পেশাদারী দক্ষতাহীন অযোগ্য সম্পাদক অচল। সুতরাং উপযুক্ত সাংবাদিক নিয়োগ করে তাঁদের সাহচর্যে মালিককেও সম্পাদক হিসাবে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতেই হয়। মালিক-সম্পাদক যদি সে দিকে নজর না দিয়ে শুধুই ছড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁর খবরের কাগজের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলতে বেশি সময় লাগার কথা নয়।

সম্পাদকের কথা এবার শেষ হবে। শেষের শুরু হিসাবে আরও গুটি কয়েক প্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই।

মূলত কলকাতা এবং মুম্বাইয়ে এক ডজন দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রতাপ কুমার। তা ছাড়া টাইমস অব ইন্ডিয়া, অমৃতবাজার পত্রিকাসহ আরও চারটি কাগজের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা খবরের কাগজের উৎপত্তি, বিনাশ এবং সেই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাবার জন্যই এখানে প্রতাপকুমারকে টেনে আনা হল। সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় 'পদ্মপত্রে জলবিন্দু' নামে একটি ধারাবাহিক রচনায় (৩-৮-২০০২) প্রতাপকুমার জানিয়েছেন:

যুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে বাংলায় ভারত এবং ইংরেজিতে ইস্টার্ন এক্সপ্রেস নামে দুটি দৈনিক কাগজ বেরত। ভারত কাগজের সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল মাখনলাল সেনের। বাজারে তাঁর এমনই দাপট যে মানুষ বিশ্বাস করে আনন্দবাজার পত্রিকা তিনিই গড়েছিলেন।

মাখনলালের কাগজ চালাবার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু অর্থ ছিল না। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল রামনাথ গোয়েঙ্কার। রামনাথ দক্ষিণ ভারতে কাগজ চালাতেন। পরে বোম্বেতেও কাগজ বার করেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের পর তিনি পূর্ব ভারতে পা রাখলেন কলকাতায়। সেই সূত্রে মাখনলালের সঙ্গে যোগাযোগ হতে দেরি হলনা।

কিন্তু লোকসানের অঙ্ক বাড়তে থাকায় মাখনলাল-রামনাথ জুটি কলকাতা জয় করার আগেই ভেঙে গেল। এই সংকটকালে আর একজন মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী এগিয়ে এসে মাখনলালের হাত ধরলেন। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ ডালমিয়া।

দেশ স্বাধীন হবার পর বোম্বের প্রাচীন ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া (প্রবীণ মানুষরা আদর করে বলেন Old Lady of Buri Bunder) ইংরেজ মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেন রামকৃষ্ণ। তাঁর সিন্দুকে তখন অঢেল টাকা। এ হেন ডালমিয়া ভারত বাঁচাতে মাখনলালের অংশীদার হলেন। তখন সার্কুলার রোডের ওপর সূরি লেনে ভারতের অফিস।

নতুন ব্যবস্থায় প্রতাপকুমারকে ভারতের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন শেঠজি। কিন্তু প্রতাপকুমার কাজ করতে গিয়ে মাখনলালের সহযোগিতা পেলেন না। ফলে শেঠজির নির্দেশে একদিন নোটিশ দিয়ে ভারত বন্ধ করে দেওয়া হল।

অদম্য শেঠজি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও দমলেন না। তিনি কলকাতা থেকে বাংলা হিন্দি ও ইংরেজি কাগজ বার করবেন। তার সফল ব্যবস্থাপনার ভার দিলেন প্রতাপকুমারকে। কনভেন্ট রোডে ল্যাজারাস কোম্পানির প্রকাণ্ড কাঠের কারখানা এবং সংলগ্ন খালি জমিতে অফিস করে কাগজ বার করার আয়োজন চলতে লাগল। ফ্রান্স থেকে কেনা রোটারি যন্ত্রে ভারত ছাপা হত। সুরি লেন থেকে সেই মেশিন খুলে আনা হল কনভেন্ট রোডের অফিসে।

কাগজের সম্পাদক হবার জন্য উদ্যোক্তারা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ডাকলেন। তিনি সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। তাঁরই পরামর্শে বার্তা সম্পাদক হলেন সুকুমার মিত্র।

প্রতাপকুমারের ওই বর্ণনা থেকে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের কাঠামো সম্পর্কে আপনাদের ধারণা একটু স্বচ্ছ হল বলে ধরে নিচ্ছি।

সাপ্তাহিক বর্তমানের ১০-৮-২০০২ তারিখের সংখ্যায় প্রতাপকুমারের লেখা থেকে আরও জানা গেল। নতুন বাংলা কাগজটির নামকরণ নিয়ে জল কিছুটা ঘোলা হয়েছিল। শেঠজির প্রস্তাব, কাগজের নাম হোক ধর্মযুগ। প্রতাপকুমার প্রতিবাদ করলেন। তখন শেঠজির প্রস্তাব, তপযুগ। সে প্রস্তাবও টিঁকল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সত্যযুগ। সত্যযুগে অন্যদের সঙ্গে এলেন গৌরকিশোর ঘোষ আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নীরেন্দ্রনাথ আগে অন্য বাংলা কাগজে একই কাজ করেছেন। আর এলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা সবাই সাহিত্যিক।

নীরেন্দ্রনাথের বাড়তি দায়িত্ব রবিবারের সাময়িকী সম্পাদনা। তিনি সে কাজ আগে করেননি। তাই হয়ত সাময়িকী সম্পাদনার প্রচলিত ধারা তাঁকে বন্দী করতে পারেনি।

কাগজে ছোটদের পাতা এবং সিনেমা থিয়েটারের পাতাও ছিল। ওই পাতা দুটি সম্পাদনার ভার পেলেন গৌরকিশোর। তাঁর ব্যতিক্রমী জন এবং রসবোধ এই পাতাদুটির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ? প্রতাপকুমার জানাচ্ছেন, "সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপরে চারটের সময় অফিসে আসতেন। রাত নটা অব্দি তাঁকে অফিসে পাওয়া যেত। তিনি তখন দিগ্বিজয়ী সম্পাদকীয় লেখক। তাঁর অলঙ্কারবহুল ধ্বনি, মাধুর্যমণ্ডিত লেখা সহজেই পাঠকদের আকৃষ্ট করত। তখনও দেখেছি, পরে আরও নানা স্থানেও দেখেছি বড় সম্পাদকেরা নিজেদের লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কাগজে আর কী হচ্ছে, সব মিলিয়ে কাগজের কেমন রূপ হল তা নিয়ে খুব মাথা ঘামাতেন না।"

৫.২.৩ নির্বাহী সম্পাদক

খবরের কাগজের নির্বাহী সম্পাদককে সম্পাদকের সমতুল্য পদাধিকারী বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তিনি সম্পাদক নন। অথচ সম্পাদকের বকলমে তিনিই সম্পাদকীয় দপ্তর পরিচালনা করেন। তবে নির্বাহী সম্পাদকের রাশ থাকে সম্পাদকের হাতে।

এই কারণে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, "Executive Editor means a person who assists in the editorial and production functions of a newspaper, whether or not he supervises the work of Resident Editor, Assistant Editor etc." — অর্থাৎ, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় দফতরের কাঠামোয় সম্পাদকের পরেই নির্বাহী সম্পাদকের স্থান।

নির্বাহী সম্পাদকের গুণাবলী এবং কাজকর্ম সম্পর্কে আরও কিছু জানতে গেলে বেন ব্রাডলি এবং অ্যাব রোসেনথাল সম্পর্কে আপনাদের কিছু কথা জানান দরকার। প্রথমে আমরা বেন ব্রাডলি সম্পর্কে জানব। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে The Washington Post — দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর পর থেকে আমরা বেন ব্রাডলিকে শুধু বেন এবং দ্য ওয়াশিংটন পোস্টকে শুধু পোস্ট বলে উল্লেখ করব।

পোস্টের প্রতিষ্ঠা ১৮৭৭ সালে। এখন আমেরিকার কংগ্রেস সদস্য ও সেনেটারদের দিনের পাঠ্য বস্তুটি হল পোস্ট। পোস্টের পাতায় চোখ বুলিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির দিনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পোস্ট বরাবর এত প্রভাবশালী ও সফল খবরের কাগজ ছিল না। ১৯৩৩ সালে লোকসানের বোঝা বইতে বইতে কাগজটি লাটে ওঠে। দেউলিয়া পোস্টের বিষয়সম্পত্তি বেচে দেনাদারদের পাওনা মেটান ছাড়া আর উপায় রইল না। কাগজের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠল অনিশ্চিত।

এই দুঃসময়ে পোস্টকে পুনর্জীবন দিতে নিলাম ঘরে হাজির হলেন মেয়ার (Mayer) দম্পতি। ইউজিন এবং অ্যাসনেস মেয়ার আট লাখ ২৫ হাজার ডলার মূল্য গুণে দিয়ে পোস্টের মালিকানা কিনে নিয়ে কাগজ চালু রাখলেন। কিন্তু তাঁরা কাগজের টাকাকড়ির দিকটা সামলে উঠতে পারলেন না। পোস্টের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আগে যেমন টালমাটাল ছিল পরেও তাই থেকে গেল। তখন মেয়ার দম্পতি পোস্টের হাল তুলে দিলেন তাঁদের কন্যা ক্যাথরিনের স্বামী ফিলিপ গ্রেহামের হাতে। মেয়ারদের জামাতাকে আমরা এরপর থেকে ফিল বলেই উল্লেখ করব।

পোস্টকে ফিল পোক্ত বনেদের ওপর দাঁড় করাতে সফল হলেন। কিন্তু নিজের তৈরি সাম্রাজ্য ভোগ করার জন্য তিনি নিজেই বেশি দিন টিঁকলেন না। Robin Webb — রবিন ওয়েব নামে এক মহিলা কর্মচারীর সঙ্গে ফিল অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তাঁদের উভয়ের সম্পর্ক এমন মাত্রায় পৌঁছল যে শোনা যেতে লাগল স্ত্রী ক্যাথরিনের সঙ্গে তিনি দাম্পত্য সম্পর্কে চুকিয়ে বুকিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করবেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সফল সংবাদপত্র পরিচালক ফিলের জীবনে ব্যর্থতার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল অন্যদিক থেকে। দেখা গেল তিনি প্রচণ্ড মাত্রায় মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর আচার-ব্যবহার ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে উঠল। মানসিক অবসাদ ধীরে ধীরে গ্রাস করল পোস্টের অভিভাবক ফিলকে।

কিন্তু যোগ্য বাপের যোগ্য মেয়ে ক্যাথরিন পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার জন্য ফিলকে চিকিৎসা করিয়ে আস্তে আস্তে সুস্থ করে তুললেন। তবে সেই অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হল না। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি নিজের ডানদিকের রগে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন।

ফিল আত্মহত্যা করার পর পোস্ট পরিচালনার দায়িত্ব চলে গেল ক্যাথরিনের হাতে। তাঁর পরিচালনার গুণে পোস্ট বেঁচে গেল। কাগজ চলতে লাগল ভালভাবেই। কিন্তু তাতে ক্যাথরিনের মন ভরল না। পোস্ট কি করলে আরও, আরও, আরও ভাল চলে সেই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল, একজন নতুন চৌখস সম্পাদক চাই। কে হতে পারে তাঁর সেই স্বপ্নের সম্পাদক? এই ভাবনার মধ্যেই তাঁর একদিন Benjamin Crowninshielf Bradlee — বেন ব্রাডলির কথা মনে ভেসে উঠল। ব্রাডলি তখন 'Newsweek'-এর ওয়াশিংটন ব্যুরোর প্রধান। ক্যাথরিন তাঁর সম্পর্কে নানা দিক দিয়ে খোঁজখবর নিলেন। তাতে তাঁর মনে হল, তিনি যে পরশ পাথরটি খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেছেন। তবু পা ফেলার আগে আরও দুজন প্রবীণ, বিচক্ষণ ও নিঃস্বার্থ সাংবাদিকের সঙ্গে বেন-এর ব্যাপারে কথা বললেন। তাঁরা হলেন স্তম্ভ লেখক ওয়াল্টার লিপম্যান এবং জেমস রেস্টন। তাঁরা উভয়েই বেন-এর প্রশংসা করে বললেন, ক্যাথরিন যেমনটি চাইছেন তেমনটি করার উপযুক্ত লোক বেন।

অতএব আর দেরি না করে ক্যাথরিন সিদ্ধান্ত নিলেন বেনকে তিনি পোস্টে আনছেন। কিন্তু প্রথমেই তো তাঁকে সবার মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাই তাঁকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদ বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটর পদে নিয়োগ করা হল। ক্রমশ তিনি পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক হয়েছিলেন।

নির্বাহী সম্পাদক হবার পর বেন তাঁর সহকর্মীদের অল্প কয়েকটি কথায় তাঁর লক্ষ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "I want to have impact on this town. I want to know that they are reading us." — অর্থাৎ ওয়াশিংটন শহরের ওপর আমি পোস্টের প্রভাব বিস্তার করতে চাই। আমি জানতে চাই, ওয়াশিংটনবাসীরা পোস্ট পড়ছে।

ক্যাথরিনও ঠিক তাই চাইছিলেন। অতএব বেন পোস্টের খবরের খাসমহলে প্রভুত্ব করতে লাগলেন। তা করার জন্য তিনি বেশ সকাল সকাল পোস্টের দফতরে এসে কাজে হাত দিতেন। বাড়ি ফিরতেন কাগজের শহর সংস্করণ প্রেস থেকে বের হবার পর। আবার বেলা না গড়াতেই দফতরখানায় দেখা যেত বেনকে। অফিসে তিনি মাঝেমাঝেই রিপোর্টার এবং সাব-এডিটরদের মহল্লায় টহলদারি করতেন।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, কোন (নির্বাহী) সম্পাদক ধাড়ি ঈগল, কেউ ছুঁচো, আর কেউ বা ধূর্ত চটপটে শেয়াল। আমাদের বেনসাহেব সেটাই। ধূর্ত শেয়াল বেন ব্রাডলির জমানায় পোস্টে প্রকাশিত একটি খবর আমেরিকাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই খবরটির শিরোনাম ছিল 'জিমির জগৎ'। আর একটি খবর দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তার বিষয়বস্তু ছিল 'ওয়াটারগেটের কেলেঙ্কারি'।

রিপোর্টারদের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে আপনারা ওই দুটি বিশেষ খবর সম্পর্কে আরও কিছু কথা জানতে পারবেন।

ব্রাডলি যখন পোস্টে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করছেন সেই সময়ে নিউইয়র্ক টাইমসে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক এ এস রোসেনথাল। তিনি যখন নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার ছিলেন তখন তাঁর নামাঙ্কিত রিপোর্টে ওই নামই ছাপা হত। তাঁর পুরো নাম ছিল আব্রাহাম মাইকেল রোসেনথাল।

রিপোর্টার থেকে তিনি ধাপে ধাপে নির্বাহী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এই পদ অর্জন করতে হয়েছিল।

রিপোর্টার হিসাবে তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন। কলেজের ছাত্র থাকার সময়ে তিনি সাংবাদিকতা আরম্ভ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন কলেজ ক্যাম্পাসের খুচরো খবর যোগানদার আংশিক সময়ের এক তুচ্ছ রিপোর্টার। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যেও সার আছে। ফলে তিনি শীঘ্রই নিউইয়র্ক টাইমসে পাকা চাকরিতে বহাল হলেন। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর। আঁদ্রে গ্রোমিকো তখন রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ী প্রতিনিধি। রাষ্ট্রসংঘ দফতরে গ্রোমিকোর চালচলন অবলম্বনে একটি ফিচার লিখে ওপরওয়ালাদের নজর কাড়লেন অ্যাব। ফলে পদোন্নতি হল তাঁর। এবার তিনি রাষ্ট্রসংঘে নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টারের পদে নিযুক্ত হলেন। এই কাজে তাঁর প্রতিভা আরও বিকশিত হল। তা দেখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বৈদেশিক সংবাদদাতার পদ দিলেন। প্রথম কর্মস্থল দিল্লি। দিল্লি থেককে ওয়ারশ। ওয়ারশ থেকে টোকিও।

বেন ব্রাডলির লক্ষ্য ছিল ওয়াশিংটন শহর পোস্টের মুঠোয় আনা। ওদিকে নিউইয়র্ক টাইমসের কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, নিউইয়র্ক শহরে অন্য কোন কাগজকে মাথা তুলতে দেওয়া হবেনা। তার জন্য দরকার কাগজের মেট্রোপলিটান বা মেট্রো বিভাগের স্থবিরতা কাটিয়ে আরও ঝকঝকে টগবগে চনমনে করে তোলা। সেই দায়িত্ব দিয়ে অ্যাবকে টোকিও থেকে টেনে আনা হল নিউইয়র্কে।

মেট্রোর দায়িত্ব নিয়ে অ্যাব সেই বিভাগে দুরমুশ পিটতে আরম্ভ করলেন। তরুণ রিপোর্টারদের চাঙ্গা করে তাদের ভাল ভাল খবর আনার দৌড়ে নামিয়ে দিলেন। ডেস্কের মাহাত্ম্য কমিয়ে সাব-এডিটরদের কোণঠাসা করে দিলেন। ছোকরা রিপোর্টারদের কাজপাগল করে তুলতে তিনি মোটা হারে মাইনে বাড়াবার এবং রিপোর্টে তাদের নামাঙ্কনের ব্যবস্থা করে ফেললেন। এই কড়া দাওয়াইয়ে যথেষ্ট সুফলও পাওয়া গেল। কিন্তু প্রবীণ রিপোর্টার এবং কোণঠাসা সাব-এডিটররা ঘোঁট পাকিয়ে অ্যাবের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কান ভাঙ্গাবার অভিযানে নেমে গেল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। কারণ, কর্তৃপক্ষ ততদিনে টের পেয়েছেন, অ্যাব পরিচালিত মেট্রো নিউইয়র্কবাসীদের মন ভোলাতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মেট্রো বিভাগে অ্যাবের দাপট অক্ষুণ্ণ রইল।

সত্তরের দশকে অ্যাবকে কাগজের ম্যানেজিং এডিটরের পদে বসান হয়। সেই পদে থাকার সময়ে তিনি নিজের পেশাগত জীবনের এবং নিউইয়র্ক টাইমসের জীবনের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। বিষয় ছিল 'পেন্টাগন পেপার্স'। ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন ফৌজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের গোপন প্রমাণপত্র ছিল 'পেন্টাগন পেপার্স'-এ। তা নিউইয়র্ক টাইমসের হস্তগত হয়। সম্পাদকীয় বিভাগের ওপরতলায় ওই রিপোর্ট ছাপা হবে কিনা তা নিয়ে জোর বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এক পক্ষের মত ছিল, এই রিপোর্ট নিউইয়র্ক টাইমস ফাঁস করলে নানা দিক থেকে বিপদ আসতে পারে। তাই ওই রিপোর্ট চেপে যাওয়া হোক।

অন্য পক্ষের মত ছিল, এই রিপোর্ট চেপে গেলে তা কাগজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা তথা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে ১৯৭১ সালের ১৩ জুন 'The Mcnamara Papers' শিরোনামে ভিয়েতনামে পেন্টাগনের সরাসরি যুদ্ধের গোপন প্রমাণ ফাঁস হয়ে গেল।

পরের পাঁচ বছর নিউইয়র্ক টাইমস অ্যাবের সম্পাদনায় অনেক বড় বড় খবর ফাঁস করল বটে কিন্তু কাগজের আর্থিক অবস্থায় মন্দার ভাব প্রকট হয়ে উঠল। কাগজের খরচ বাড়ছে, রোজগারও বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় মুনাফার হার বাড়ছে না। কাগজ বিক্রি বাড়ছে না। বিজ্ঞাপন থেকে আয়ও বাড়ছে না। বাড়ছে শুধু খরচ। এই অবস্থা চলতে দিলে লোকসানের ধাক্কা আসতে দেরি হবে না। লোকসান সামাল দিতে জোর

করে খরচ কমালে কাগজের মান পড়তে থাকবে। নিম্ন মানের নিউইয়র্ক টাইমস-এর পায়ের তলা থেকে জমি সরতে শুরু করবে।

দিগন্তে সেই দুর্দিনের মেঘ ঘনাতে দেখে কাগজের মালিক পাঞ্চ স্যুলজবার্গারের (Punch Sulrberger) মন ভারি হয়ে উঠল। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি অ্যাব রোসেনথাল এবং রবিবারের সাময়িকীর সম্পাদক ম্যাক্স ফ্রাবেকলের কাছ থেকে পরিকল্পনা চাইলেন। দুজনের কারো কাছেই পাঞ্চ মনের কথা ভাঙলেন না। তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন দুজনের মধ্যে যা পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হবে তাঁকেই পরবর্তী নির্বাহী সম্পাদক নিযুক্ত করবেন।

এই প্রতিযোগিতায় অ্যাবই জিতলেন। পুরস্কার পেলেন নিউইয়র্ক টাইমসের নির্বাহী সম্পাদকের পদ। তাঁর দক্ষ পরিচালনার গুণে নিউইয়র্ক টাইমস ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল।

১৯৮৬ সালে পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক বেন ব্রাডলি এবং নিউইয়র্ক টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক অ্যাব রোসেনথাল উভয়েই কয়েক মাসের ব্যবধানে ৬৫ বছর বয়সে পা দিলেন। সেই সঙ্গে ঘনিয়ে এল দুজনের অবসর নেবার সময়।

এই উপলক্ষে অ্যাব রোসেনথালের সাংবাদিক জীবন এবং তিনি কী ভাবে নিউইয়র্ক টাইমসকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন এই বিষয় নিয়ে পোস্ট তিন কিস্তি ফিচার প্রকাশ করল। তারপর বেন ব্রাডলির কানে এল, অ্যাব তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে বলেছেন, আমার অবসর গ্রহণ নিয়ে পোস্ট তিন কিস্তি লেখা ছাপল বটে, তবে বেন অবসর নিলে নিউইয়র্ক টাইমস এক অনুচ্ছেদের বেশি খবর ছাপবে না।

এই কথা কানে যেতেই বেন চিঠি পাঠালেন— "অ্যাব, অনুচ্ছেদটি এই রকম হবে। ওয়াশিনটন পোস্টের ৩০ বছরের নির্বাহী সম্পাদক বেঞ্জামিন সি ব্রাডলি আজ অবসর নিয়েছেন। তাঁর বয়স এখন ৭০ বছর। —ও কে (OK) বেন।"

৫.২.৪ সহকারী সম্পাদক

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে Assistant Editor — সহকারী সম্পাদকের ভূমিকা নির্দেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "Assistant Editor means a person who regularly assists the Editor in the discharge of his duties generally in relation to the comments and opinions and writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism." অর্থাৎ, সহকারী সম্পাদকের কাজ হচ্ছে সম্পাদকের কাজে নিয়মিতভাবে সাহায্য করা। তাই তিনি সম্পাদকের সহকারী। তাঁর কাজের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে পড়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা, মন্তব্য করা, মতামত প্রকাশ করা এবং সমালোচনামূলক নিবন্ধ লেখা।

বুঝতেই পারছেন, একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে এতরকম কাজ এক হাতে সুসম্পন্ন করা অসম্ভব। তার জন্য তাঁর চারটি হাত এবং চার হাতে লেখার মত মগজের ক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে তা সম্ভব নয়। তাই রাজ্য বা জাতীয় স্তরের খবরের কাগজগুলিতে একাধিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করতে হয়। এই ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নেই। তবে ওই ধরনের কাগজে সম্পাদককে সাহায্য করার জন্য চার পাঁচজন সহকারী সম্পাদক তো লাগেই।

সহকারী সম্পাদকের বিশেষ বিশেষ দিকে আগ্রহ ও জ্ঞানের বিষয় জেনে নিয়ে সম্পাদক তাঁদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন। কেউ কেউ সম্পাদকীয় নিবন্ধ বা টিকা টিপ্পনি লেখার ভার পান। সম্পাদকীয় লেখক সহকারী সম্পাদকদের মধ্যেও কাজের ভাগ থাকে।

কেউ জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেন। কাউকে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতে হয়। রাজ্য-রাজনীতি সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন আর কেউ।

সম্পাদকের কাছে লেখা সাধারণ মানুষের চিঠি, স্তম্ভ লেখকদের রচনা, ফিচার ইত্যাদি সম্পাদনা, পুস্তক সমালোচনার ভারও সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে সম্পাদক বন্টন করে দেন।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের স্তম্ভ লেখকদের মধ্যে অনেকেই একাধিক কাগজে একই লেখা পাঠিয়ে থাকেন। তাঁদের লেখার একমাত্র ভাষা ইংরেজি। সুতরাং হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত কাগজে ইংরেজিতে লেখা স্তম্ভ তরজমা করে নিতে হয়। সেই কাজের দায়িত্বও কোন না কোন সহকারী সম্পাদকের হাতে দেন সম্পাদক।

সম্পাদকীয় পাতার কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্যই সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন সম্পাদক। তার অন্যথা হলে মাঝে মাঝে কাজ পণ্ড হতে পারে।

খবরের কাগজের কাজ চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে। সুতরাং সহকারী সম্পাদকরা সুবিধা মত দফতরে এলেন, ইচ্ছা হলে যখন খুশি একটা লেখা ফেলে দিয়ে সরে পড়লেন এমনটা হতে দেওয়া যায় না। তাই নির্দিষ্ট সময়ে সহকরী সম্পাদকরা দফতরে এসে যান। সেই সময়টা সাধারণত বেলা ১২টা থেকে ১টা মধ্যে।

সকলে সমবেত হবার পর সেই দিনের বিভিন্ন কাগজের বড় বড় খবরগুলির নানা দিক নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করেন। তারপর সম্পাদক তার সহকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁদের মতামত শুনে সেদিন কি কি বিষয়ে কি ভাবে লেখা হবে তা সম্পাদকের নির্দেশে ঠিক হয়ে যায়। তারপর লেখা শুরু।

সন্ধ্যার মধ্যে কপি প্রস্তুত করে ফেলতে হয়। কারণ, সম্পাদকীয় পাতা রাত আটটা নটার মধ্যে ছাপার জন্য তৈরি করে ফেলা দরকার। তৈরি কপি ছাপার জন্য ছেড়ে দেওয়ার আগে সহকারী সম্পাদকরা যে যার লেখার চূড়ান্ত প্রুফে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। এই কাজটাও তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

এবার আমরা একটি সম্পাদকীয় এবং তার পটভূমি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করব।

২০০২ সালের মাঝামাঝি সময়ে গুজরাট মন্ত্রীসভা একটি প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করার জন্য সুপারিশ করল। রাজ্যপাল সেই সুপারিশ বিধি মেনে গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে রাষ্ট্রপতি গুজরাট বিধানসভা ভেঙে দিলেন।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলল। বিধানসভা ভেঙে দেবার সুপারিশ করার অধিকার রাজ্য মন্ত্রীসভার আছে। সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী মন্ত্রীসভার আইনসঙ্গত কোন সুপারিশ রাজ্যপাল খারিজ করতে পারেন না। তিনি সেই সুপারিশ অনুমোদন করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি বিধানসভা ভেঙে দেবার সুপারিশ রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে দিলেন। আইনের পথ ধরে আসা এই সুপারিশ রাষ্ট্রপতি আইন অনুযায়ী অনুমোদন করতে বাধ্য।

সুতরাং তিনিও সেটাই করলেন। ফলে গুজরাট বিধানসভার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই তা ভেঙে গেল। এবার বল চলে গেল দিল্লির নির্বাচন সদনে। নির্বাচন সদনে নির্বাচন কমিশনের দফতর। এই দফতরের প্রধান কর্মকর্তা জেমস মাইকেল লিংডো। তিনি দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commissioner)। নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যেমন আইনের শেষ কথা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারও নির্বাচন করার ব্যাপারে শেষ কথা।

ওদিকে গুজরাট সরকারের বিরোধী দলগুলির নেতারা আওয়াজ তুললেন, কয়েক মাস আগে রাজ্যে ভয়ংকর অশান্তি এবং হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। অবস্থা এখনও অস্বাভাবিক। হাজার হাজার মানুষ ভিটা ছাড়া। তাঁদের নির্বাচনে অংশ নেবার মত পরিস্থিতি নেই। অবস্থা আরও না থিতোলে অবাধ এবং ন্যায্য (free and fair) নির্বাচন সম্ভব নয়।

গণতন্ত্র শুধু সরকারের নয়, বিরোধী পক্ষেরও। সুতরাং নির্বাচন কমিশন গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেখানকার পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখতে কমিশনের কয়েকজন অফিসারকে গুজরাটে পাঠিয়ে দিলেন। কমিশনের এই পদক্ষেপে গুজরাটের শাসক দলের নেতারা তাঁদের অসন্তোষ গোপন করলেন না। কিন্তু কমিশন তার পরোয়া করল না।

অফিসাররা সরেজমিন তদন্ত সেরে রাজধানীতে ফিরে কমিশনকে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। তারপর যা ঘটল তাতে গুজরাটের শাসক দলের নেতাদের রক্তচাপ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু লিংডো তাঁর সিদ্ধানেত অটল অবিচল। লিংডো এবং কমিশনের আরও দুজন সদস্য আমেদাবাদ, বরোদা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় গিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁদের কাছ থেকে লিখিত স্মারকলিপি গ্রহণ করলেন। তারপর দিল্লি ফিরে কমিশনের বৈঠক করে লিংডো ঘোষণা করলেন, ২ অক্টোবরের মধ্যে গুজরাটে অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচন করার পরিস্থিতি নেই। সুতরাং কমিশন অক্টোবরের মধ্যে গুজরাটে নির্বাচন করবে না।

লিংডোর এই ঘোষণায় গুজরাটের শাসক দলের নেতারা ক্ষোভে ও ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তাঁদের নেতা মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরোদায় ২০ আগস্ট এক জনসভায় বললেন, Some journalists asked me recently has James Michael Lingdoh come from Italy? I said, I don't have his *Janampatri*. I will have ask Rajiv Gandhi. Then the journalists said, "Do they meet in Church?" I replied, "May be they do" (Experts from a translated tape, The Indian Express, 26-8-2002)।

২১ আগস্ট বিভিন্ন খবরের কাগজে লিংডোর বিরুদ্ধে মোদীর ওই সব মন্তব্যের সারাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্য হিন্দুস্তান টাইমস (The Hindustan Times)-এর সহকারী সম্পাদকরা পরদিন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, স্বশাসিত সাংবিধানিক সংস্থার প্রধানকে নিয়ে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এইরকম আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। কঠোর ভাষায় এই কাজের সমালোচনা করা উচিত। সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করা উচিত লিংডোকে নিয়ে মোদীর ওই বদরসিকতা অশোভন, অবাঞ্ছিত এবং নীচতার পরিচয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ আগস্ট দ্য হিন্দুস্তান টাইমস-এ নিম্নে উদ্ধৃত সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল—

Shut Up, Mr Modi

Anger and frustration over the Election Commission's move to delay the Gujarat polls seem to have made Narendra Modi resort to the kind of vituperative utterances which are outrageous even by his own fairly low standards. He may have thought that he was cracking a joke when he wondered whether Chief Election Commissioner J.M. Lyngdoh was an Italian, but it was a remark in extremely poor taste. That Mr Modi is unfit to be a chief minister was evident during the riots when he fiddled while Gujarat burnt. But his latest diatribe against a person holding a high constitutional position underlines a meanness of attitude which is shocking in a person heading a government. In a way, Mr Modi may have set a record of being nasty since it is difficult to think of any other chief minister making so egregious a comment. It is a remark which is offensive enough when directed at a politician. But when used against the chief of an autonomous institution, it is unbelievably crude.

The Sangh parivar, of course, has been using abusive epithets against Mr Lyngodh right from the time when he went to Gujarat. Outfits like the VHP have been asking why he doesn't evince the same kind of interest in the refugees from Kashmir, while an RSS spokesman presumed that the CEC was getting his own back against the Hindus for the attacks on Christians in Gujarat earlier. The contretemps in Gujarat have at least extracted an admission from the RSS that the Christians were targeted, for which none other than the saffron camp could have been responsible. Posters and advertisements have also appeared in Gujarat accusing the EC of favourable the minorities.

If anyone presumed that such despicable moves were the handiwork of the more excitable element in the Sangh parivar, Mr Modi has dispelled that impression. Of all the parties, it is the BJP and its fraternal outfits in the Hindutva camp, including the Shiv Sena, which base their campaigns not on politics but on slanderous attacks focusing on religion and community. The reason is obvious. Throughout their history, the RSS and the Jan Sangh-BJP have tried to whip up atavistic sentiments against the minorities to garner the votes of the majority community. Mr Modi is merely being true to that detestable saffron tradition.

দ্য হিন্দুস্তান টাইমসের এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতেই বিষয়টি থামল না। জল আরও খানিকটা গড়াল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাজের সাংবিধানিক আলোচনা করার বদলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে মোদী যে কাজটা মোটেই ভাল করেননি সে কথা প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন। মোদীকে ভর্ৎসনা করে তিনি ২৪ আগস্ট একটি বিবৃতি প্রচার করলেন। সেই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট (The Telegraph, 25-8-2002))—

Atal ticks off Modi for Lyngdoh slander

RADHIKA RAMASESHAN

New Delhi, Aug. 24: Prime Minister Atal Behari Vajpayee tonight issued a hard-hitting statement against Gujarat chief minister Narendra Modi for his intemperate and personal remarks against chief election commissioner J.M. Lyngdoh.

Expressing distress at the "undignified controversy", Vajpayee said: "I may have differences over the decision or the attendant observations of the Election Commission with regard to the Assembly polls in Gujarat . There are constitution means to deal with such matters but no one should use improper language or make indecorous insinuations in expressing their views."

The note of censure struck by Vajpayee was aimed directly at Modi, who was quoted as saying at a public rally near Vadodara on Tuesday: "Some journalists asked me recently, 'Has James Michael Lyngdoh come from Italy?' I said I don't have his *janam patri*, I will have to ask Rajiv Gandhi. Then the journalists said, 'Do they (Lyngdoh and Sonia) meet in church?' I replied, 'May be they do'."

But given that Modi has an influential section of backers in the BJP, Vajpayee pulled off a balancing act by making a veiled criticism of Lyngdoh as well.

"Both are high constitutional authorities and must be given the respect that is their due," he said. "It must be recognised by one and all that maturity of our democracy lies in all its institutions working within their constitutional limits, respecting each other's domain and maintaining proper balance."

Vajpayee then appealed to "all those concerned" to put an immediate end to the "unseemly" row. The DMK, too, slammed Modi's remarks as "uncivil".

Vajpayee's grim view follows human resources development minister M.M. Joshi's unexpected criticism of Modi yesterday before RSS brass in Nagpur. "No one, not even a chief minister, should make such remarks against a constitutional authority," he had said.

Since the elevation of L.K. Advani as deputy Prime Minister, Joshi is considered one of the few Vajpayee-backers left in the Cabinet. Observers feel Joshi's remarks were a reflection of the Prime Minister's disquiet.

But Advani, now in the UK, continued to back Modi. In an interview to BBC London, he asserted that the poll panel could not hold up elections in Gujarat and dismissed the "propaganda" against Modi as "bereft of factual content". He also has the backing of BJP chief M. Venkaiah Naidu, indicated by the party's refusal to rap Modi.

Though the BJP rallied behind Modi at the Goa national executive in April, sections in the party had been uneasy about his handling of the riots and the flak it provoked worldwide.

It emerged later that Modi's quit offer was stage-managed, but BJP sources said there was relief among a majority when he announced he would step down. Within minutes, four Advani loyalists — all Cabinet ministers — protested, forcing the gathering to fall in line. Vajpayee, reportedly keen to get rid of Modi, had no option but go along with the "general mood".

লিংডোর বিরুদ্ধে মোদীর ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোদীর ওই বক্তব্যের নিন্দাতেও ব্যাপারটি থামল না। কারণ, দ্য টেলিগ্রাফের ওই রিপোর্টে পরিষ্কার দেখা গেল, সঙ্ঘ পরিবারের মধ্যে মোদীর সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং ২৬ আগস্ট দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে অস্বস্তিকর একটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করল—

"**The PM has spoken—** The big question : Will the Gujarat Chief Minister care to listen to him?"

লিংডো-মোদী-বাজপেয়ী কাণ্ড নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখকদের চিন্তাভাবনা প্রসঙ্গে এখানেই ইতি টেনে আমরা এবার আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে নজর দেব।

১৯৬৩ সালে সংসদে একটি আইন রচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিল। সংস্থার কাজ ছিল বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প পরিচালনা। ট্রাস্টের ইউ এস-৬৪ নামে প্রকল্পটি সবচেয়ে বেশি লাভজনক, জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য প্রকল্পে পরিণত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের উদ্বৃত্ত টাকাকড়ি ইউ এস-৬৪ প্রকল্পে লগ্নি কর বার্ষিক ২০ শতাংশ হারেও লভ্যাংশ অর্জন করেছিল।

কিন্তু দুর্নীতির কারণে ইউ এস-৬৪ সহ ইউনিট ট্রাস্ট একটি রুগ্ন সংস্থায় পরিণত হয়। এর ফলে লগ্নিকারীরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই অবস্থায় ৩১-৮-২০০২ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি ইউ এস-৬৪ প্রসঙ্গে অর্থলগ্নিকারীদের স্বার্থ কিছুটা রক্ষা করতে ট্রাস্টের সব প্রকল্পগুলি পরিচালনা ব্যবস্থায় মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে ইউনিট ট্রাস্টকে ১৪৫৬১ কোটি টাকা দেবার জন্য সুপারিশ করল কমিটি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অত্যন্ত প্রভাবশালী কমিটির এই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদকদের কামরায় ঝড় তুলল। এই সিদ্ধান্ত কতটা বলিষ্ঠ, কতটা জনস্বার্থবাহী তা নিয়ে সহকারী সম্পাদকরা চুলচেরা আলোচনা করলেন। তারপর তাঁরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখলেন। দ্য টেলিগ্রাফ ২ সেপ্টেম্বর ইঙ্গিত করল, রুগ্ন ইউ টি আইকে নতুন রক্ত দেবার নাম করে ১৪৫৬১ কোটি টাকা ঢেলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে কেন্দ্রের শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থ। এই সিদ্ধান্ত ভোট ধরার ফাঁদ, "Clearly, the government now has state elections in 2003 in mind and May 2003 is not that far away from Central elections either. This is part of Mr. Jaswant Singh's overall strategy of winning back the middle-class. The poor don't matter."

নয়াদিল্লির দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর (The Indian Express) সহকারী সম্পাদকরা একই দিনে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করলেন। তাঁরা বললেন, ইউ টি আই-এর এই দুর্দশার জন্য আসলে সরকারই দায়ী। তাহলে তারা ইউ টি আইকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে এত সময় নিল কেন?

এক্সপ্রেসের সম্পাদকীয় নিবন্ধটির পূর্ণ বয়ান—

Some sense at least But watch out for the downside of the UTI move

Why did it take so long, is the question that comes to mind immediately when discussing the Rs 14,500 crore UTI bail-out-cum-reforms package announced by the government. After all, the government knew it was really responsible for all the commitments made by UTI to its investors, so there was little point wasting several months in announcing it would guarantee all UTI's promises. All that the delays resulted in, really, was to depress the stock markets further. Since market participants knew UTI was short by over Rs 14,500 crore, in the US-64 as well as various MIP schemes, and since everyone expected UTI to make distress sales of its equity holdings, the sensex was kept low. And keeping the sensex low further increased the hole in UTI's coffers. None of this is rocket science or complicated financial modelling — UTI's chief has been shouting this from the rooftops for several months now.

That apart, the move to split UTI, and to privatise one pat of it, is a good move — based on the current asset-split, over 40 per cent of UTI's various investment schemes fall under what's called UTI-II, the part which will be sold. UTI-II essentially comprises those investment schemes run by UTI in which there are no guarantees on returns. The balance, or UTI-I, will comprise of US-64 and various assured-return schemes for which the bailout has been announced, and this will be retained by the government. Purists will criticise the move as half-hearted, and argue that the government should have sold UTI entirely, as the Malegam committee had proposed. But that was an unimplementable suggestion, as there would be few takers for a scheme with such huge liabilities. Not bailing out UTI was never an option — the government refusing to honour its financial commitment, and that too on such a large scheme, would have hit confidence in the entire financial system, and this would have been too big a risk to take. Why do you think the US government spent over $200 bn bailing out various Savings & Loan institutions in the late nineties?

There is, also, a related issue that is beginning to look quite serious now — the issue of government debt. Today, the total debt adds up to around 58 per cent of GDP, and the UTI bailout package itself will contribute another 0.5 per cent of GDP to this. Add to this the expected costs of the bailout packages for IDBI and IFCI — to be announced later this week — and the total could add up to another one per cent of GDP. With interest payments on this mounting debt now accounting for half the government's total revenue expenses every year, India could well be moving towards a debt-trap. That, after UTI, is the next crisis to watch out for.

কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান (The Statesman) পত্রিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক এই বিষয়ে কলম ধরতে দু'দিন বেশি সময় নিলেন বটে কিন্তু তারপর তা দিয়ে যা বেরল তা সবচেয়ে বেশি মারমুখী। ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয় শিরোনামেই তা স্পষ্ট, "ইউ টি আই গুচ্ছ — গরিববিরোধী, বাজারবিরোধী, জুয়াচোর রক্ষাকারী" ("UTI package — Anti-poor, Anti-market, Pro-crook")

এতে কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইউ টি আই বাঁচাবার খরচটা আসবে কার থেকে? করদাতাদের পকেট থেকে তো? কিন্তু তারা সবাই তো ইউ টি আইতে টাকা লগ্নি করেনি? তাহলে তাদের টাকায় দানসাগর কেন?

দ্য স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় নিবন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সোজাসুজি জানতে চাওয়া হল, "ইউ টি আই-এর তহবিলের যে সব মাতব্বর ছায়াচ্ছন্ন নানা সংস্থার শেয়ারে লগ্নির জন্য দায়ী তাদের কি ব্যবস্থা হবে?"

এই সব সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির পূর্ণ পাঠ অথবা রূপরেখা পড়ে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারলেন একই বিষয়ে বিভিন্ন কাগজ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ওপর মন্তব্য করতে পারে। তাছাড়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে অত্যন্ত কঠোর এবং আক্রমণাত্মকভাবে সরকারের সমালোচনা করতে পারা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে খবরের কাগজের এই স্বাধীনতা শুধু স্বীকৃত নয়, তা সুরক্ষিতও।

৫.২.৫ বার্তা সম্পাদক

খবরের কাগজে বার্তা সম্পাদকের ভূমিকা কি? এই প্রশ্নের জবাবে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি (১.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন) বলেছে, "News Editor means a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper" — অর্থাৎ, বার্তা বিভাগের কাজকর্মে সমন্বয় করা এবং তদারক করা বার্তা সম্পাদকের কাজ। কাগজের প্রতিটি সংস্করণে প্রকাশিত খবরের দায়দায়িত্ব তাঁর।

খবরের কাগজের প্রধান উপাদান খবর। তার মধ্যে থাকে স্থানীয় সংবাদ, রাজ্যের সংবাদ, জাতীয় সংবাদ এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ।

মালদা, মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙ্গন স্থানীয় সংবাদ।

কম বৃষ্টিপাতের দরুন খরা বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার স্থানীয় সংবাদ।

পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচন স্থানীয় সংবাদ।

বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন রাজ্যভিত্তিক সংবাদ।

কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সর্বাত্মক আন্দোলন, বন্‌ধ, রাজনৈতিক কাজকর্ম রাজ্যভিত্তিক সংবাদ।

রাজ্যের বাজেট, উন্নয়নের পরিকল্পনা, তা রূপায়ণে সাফল্য বা ব্যর্থতা; মহাকরণে, নব সচিবালয়ে, বিধাননগরে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রীর দপ্তরের কাজকর্ম, বৈঠক সিদ্ধান্ত এ সবই রাজ্যভিত্তিক সংবাদ।

তেমনি দেশের রাজধানীতে সরকারি কার্যকলাপ, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের আগমন ও কার্যকলাপ, সংসদের অধিবেশন ইত্যাদি জাতীয় স্তরের সংবাদ।

ওয়াশিংটন, বেজিং, ইসলামাবাদ, কাবুল, ঢাকা, কাঠমান্ডু, মস্কো, লন্ডন প্রভৃতি স্থান থেকে পাওয়া বড় বড় ঘটনা আন্তর্জাতিক সংবাদ। সেই সব ঘটনা ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত হলে তা ভারতের কাগজগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তা না হলেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা পাঠকরা জানতে আগ্রহী। সুতরাং সেই ধরনের খবরও ছোট করেই হোক বা বড় করেই হোক কাগজে স্থান দিতে হয়।

এতরকম সূত্র থেকে নিত্য অনেক রকম খবর বার্তা বিভাগে এসে জমা হয়। সেই সব খবর যথাযথ ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থাপনার জন্য ডেস্ক এবং রিপোর্টিং উভয় উপবিভাগের মধ্যে সমন্বয় করেন বার্তা সম্পাদক। তাঁর সিদ্ধান্ত যথাসময়ে ঠিকভাবে পালিত হল কি না সে দিকেও তাঁকেই নজর রাখতে হয়।

বিশেষ করে আপৎকালীন ঘটনা বা অবস্থার খবর প্রকাশনায় কাগজের সাফল্য বা ব্যর্থতা বার্তা সম্পাদকের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। সেই রকম কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেলে বার্তা সম্পাদক কি ভাবে কাজ করেন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। 'সাংবাদিকের স্মৃতিকথা' (ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা – ৭০০ ০০৩) বই থেকে তা নেওয়া হয়েছে। সেই সময়ের পটভূমি ছিল এই রকম—

স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের মতবিরোধ তুঙ্গে। কংগ্রেস ছেড়ে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নতুন দল গড়লেন। তার নাম দিলেন স্বরাজ পার্টি।

এই বিরোধের প্রতিফলন ঘটল কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি কাগজে। তার একটি ছিল গান্ধী ও কংগ্রেসের সমর্থক 'সার্ভেন্ট'। অপরটি ছিল স্বরাজ পার্টির সমর্থক 'ফরোয়ার্ড'। সার্ভেন্টের সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। বিধুভূষণ ছিলেন সার্ভেন্টের বার্তা সম্পাদক।

তিনি সকালেই অফিসে গিয়ে বার্তা বিভাগে কাজে বসে পড়তেন। বেলা বারটা পর্যন্ত কাজ করে তিনি মধ্যাহ্নভোজের জন্যে বাড়ি যেতেন। বেলা একটার মধ্যে আবার অফিস, আবার একটানা কাজ। এমনই একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত। দার্জিলিং থেকে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মাত্র দু লাইনের টেলিগ্রামে খবর এল, চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনাবসান হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন দাস তো শুধু চিত্তরঞ্জন দাস নন, তিনি যে দেশবন্ধু। সুতরাং মাত্র দু লাইনের খবর দিয়ে পাঠকদের সংবাদের ক্ষুধা মিটবে না। এই অবস্থায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই খবর পরিবেশন করতেই হবে। "সারা দেশের কান্নাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে"। তার ব্যবস্থা করতে বিদ্যুৎগতিতে সমন্বয়ের কাজে লেগে গেলেন বিধুভূষণ। তিনি প্রথমেই চিফ রিপোর্টারকে প্রত্যেকের কর্তব্য (assignment) বুঝিয়ে দিলেন। কাজের মধ্যে ছিল দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত খবর যোগাড় করা। তা পাওয়া যাবে দেশবন্ধুর শ্যালক এস এন হালদার এবং তাঁর দুই জামাতার কাছ থেকে। এই বিষয়ে তাঁদের কাছে যে সব চিঠি ও তার ছিল সে সবের কপি সংগ্রহ করতে হবে। শরৎচন্দ্র বসু এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর কাছ থেকেও এই বিষয়ে তথ্য যোগাড় করতে হবে।

এই সব খবরের সঙ্গে দিতে হবে দেশবন্ধুর জীবনী। তার তথ্য চট করে কোথায় পাওয়া যাবে? বিধুভূষণ এক লহমায় নির্দেশ দিলেন, জি ন্যাটশন কর্তৃক প্রকাশিত দেশবন্ধুর জীবনী গ্রন্থটি কিনে আনতে হবে। তা থেকেই লেখা হবে দেশবন্ধুর পরিচয়। তাছাড়া, জননেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে রিপোর্টাররা শ্রদ্ধাঞ্জলী যোগাড় করলেন। এই সব খবর কিভাবে কোথায় ছাপা হবে তা চিফ সাব-এডিটরকে বুঝিয়ে দিলেন বিধুভূষণ।

"খুব দ্রুত কাজ চললো। আমরা কি করছি বাইরের লোক তা জানতেই পারলো না। রাত দুটো পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে দেশবন্ধুর" যথাযোগ্য স্মৃতিতর্পণের ব্যবস্থা করলেন সার্ভেন্টের বার্তা সম্পাদক বিধুভূষণ।

"পরের দিন আশাতীত ঘটনা। ত্রিশ হাজার কপি সার্ভেন্ট বিক্রি হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার পরও ভিড়, তারপরও চাহিদা। সার্ভেন্ট চাই।

"দিতে পারি না। মফঃস্বল থেকে চিঠির তাড়া আসে দয়া করে সে দিনের একখণ্ড কাগজ পাঠান।"

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণের খবর পরিবেশনে বার্তা সম্পাদকের ভূমিকা সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা হয়েছে। এই বিবরণ বিশ্লেষণ করলে আপনারা দেখবেন, বিধুভূষণ জানতেন দেশবন্ধুর নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত জীবনী চট করে কোথা থেকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, আপৎকালে বিভিন্ন বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাঁর জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক খবরটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন সে সম্পর্কেও তাঁর স্বচ্ছ ধারণা থাকে দরকার। সেই সঙ্গে দরকার সেই সব উপাদান কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। বার্তা সম্পাদকের আরও দরকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ একলহমায় বোঝার মত ঘ্রাণশক্তি, পাঠকের নাড়ীজ্ঞান। পাঠক কাগজ থেকে কি চায় তা বুঝতে না পারলে খবরের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ভুল হয়ে যাবে। এই সবের সঙ্গে চাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করার মত মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা। এ সবের সঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা থাকলে তিনি তো বার্তা বিভাগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন। খবরই হয়ে উঠবে তাঁর ধ্যানজ্ঞান বিলাস বিশ্রাম স্বপ্ন। তবেই একজন সাংবাদিক সফল বার্তা সম্পাদকের মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জন করতে পারবেন।

খবরের কাগজে বার্তা সম্পাদকের ভূমিকা ও কাজকর্ম সম্পর্কে এতক্ষণ যে সব কথা বলা হল তা সাবেকি ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতি দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ও মুদ্রণ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে খবর কাজ সম্পাদনার রীতি নীতি এবং কাঠামোও বদলে যাচ্ছে। সেই সূত্রে দেশে ও বিদেশে অনেক বড় বড় কাগজে বার্তা সম্পাদকের পদ লোপ পাচ্ছে অথবা তার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। বার্তা সম্পাদকের কাজ চলে যাচ্ছে নতুন নতুন পদাধিকারীর হাতে।

এই ব্যাপারে Benjamin Crowninshield Bradlee — বেঞ্জামিন ক্রাউনিনশিল্ড ব্রাডলিকে পথপ্রদর্শক বলা ধরা হয়। ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজে ১৯৬৫ সালে তিনি নির্বাহী সম্পাদক হয়ে যোগ দেন। পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক হবার আগে তিনি নিউজউইকের ওয়াশিংটন ব্যুরোর প্রধান ছিলেন। পোস্টকে মন্দা দশা থেকে উদ্ধার করে চাঙ্গা করার জন্য তিনি নিউজ ডেস্ককে তিনটি আলাদা উপবিভাগে ভাগ করে দিলেন— বৈদেশিক, জাতীয় এবং স্থানীয় ডেস্ক। তিনজন ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটরকে ওই তিনটি ডেস্ক পরিচালনার ভার দেন তিনি।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই নতুন ব্যবস্থা চালু করে বার্তা বিভাগে বার্তা সম্পাদকের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করে দেওয়া হল। এর পেছনে হয়ত বেনের যুক্তি ছিল, একজন প্রধান পদাধিকারীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সংবাদ ক্ষেত্রকে পরিচালনা করা খুবই শক্ত কাজ। তার বদলে এক একজন মূল পরিচালকের মধ্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় খবরের ক্ষেত্রকে ভাগ করে দিলে নানা রকম সুবিধা হবে। নির্বাহী সম্পাদকের কাছে ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটরদের দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবে।

৫.২.৬ মুখ্য অবর সম্পাদক

পদের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সাব-এডিটরদের মধ্যে যিনি মধ্যমণি তিনিই মুখ্য অবর সম্পাদক। আমরা এরপর থেকে তাকে চিফ সাব বলে উল্লেখ করব। খবরের কাগজে চিফ সাব-এডিটরকে সংক্ষেপে চিফ সাব বলেই উল্লেখ করা হয়।

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী "Chief Sub-Editor means a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the paper or in a particular edition or part of it" — অর্থাৎ যিনি বার্তা বিভাগে নির্ধারিত পালার (Shift) কাজ পরিচালনা করেন তিনিই চিফ সাব। ভারপ্রাপ্ত পালায় নিউজ ডেস্ক তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। পালায় কর্মরত সাব-এডিটররা কাজের নির্দেশ পান চিফ সাবের কাছ থেকে। তাঁরা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলেন কি না তা নজরে রাখাও চিফ সাবের কাজ। কোন খবর কোন পাতার কোন স্থানে কতটা জায়গা নিয়ে ছাপা হবে তাও তিনিই ঠিক করেন। সংক্ষেপে বলা যায়, কাগজের নির্দিষ্ট পালায় নিউজ ডেস্কের চালকের আসনে থাকেন চিফ সাব।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আপনি তিনটি নতুন কথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন— শিফট, নিউজ ডেস্ক এবং সাব-এডিটর। সাব-এডিটরদের বিষয় আমরা পরে জানব। সেই সঙ্গে জানব নিউজ ডেস্ক কাকে বলে। আপাতত আমরা শিফট বা পালা কথাটির বিষয় জেনে রাখি।

খবরের কাগজের বিভিন্ন সংস্করণ দিনের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় প্রকাশিত কাগজ আমরা দেখে থাকি। এগুলির মধ্যে প্রভাতী কাগজগুলিতে দিনের ২৪ ঘণ্টা সময়কে পালায় বা শিফটে ভাগ করে কাজ চালাতে হয়।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত — সাধারণত এই চারটি পালায় প্রভাতী খবরের কাগজে কাজ হয়। হঠাৎ কোন খুব বড় ঘটনা ঘটে না গেলে সকালের পালা প্রায় গুরুত্বহীন শিফট। একজন সাব-এডিটরই সেই পালায় নিউজ ডেস্কে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। হাল আমলে তাঁর কাজ মাঝে মাঝে সংবাদ সংস্থার কম্পিউটার মনিটরে দৃষ্টিপাত করা। সাবেক আমল হলে কম্পিউটার মনিটরের বদলে টেলিপ্রিন্টার থেকে ওপরে দেওয়া খবর বোঝাই কাগজের দিকে নজর রাখতে হত তাঁকে।

এই রকম হালকা কাজের শিফটে চিফ সাবের দরকার হয় না। চিফ সাব ডেস্কের ভার নেন দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতের পালায়। খবরের চাপ সব চেয়ে বেশি বাড়ে সন্ধ্যার পালায়। রাতের পালায় সাধারণত বড় বড় খবরের চাপ থিতোতে থাকে। তখন মাথা চাড়া দেয় কাগজের প্রথম পাতা সাজাবার চাপ। চিফ সাবের পরিচালনায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ এগোতে থাকে বার্তা বিভাগের নিউজ ডেস্কে।

আপনারা জেনেছেন সাব-এডিটররা তাঁদের কাজের নির্দেশ পান চিফ সাবের কাছ থেকে। কোন সাব-এডিটরকে রিপোর্টারদের কপি দেখার ভার দেন চিফ সাব। বাংলা কাগজ হলে সংবাদ সংস্থার (News Agency) সরবরাহ করা খবর আর কাউকে তরজমা করতে বলেন চিফ সাব। সেই সঙ্গে তিনি বলে দিতে থাকেন "টপ (Top)", "২ কলম", "বড় জোর কুড়ি লাইন", "অ্যাঙ্কর (Anchor)" ইত্যাদি শব্দ। সাব-এডিটররা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেন, খবরের আয়তন ও অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন চিফ সাব।

জটিল ও বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্য চিফ সাব নিজের হাতে নেন। তা সামলাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাব-এডিটরদের হাত থেকে সম্পাদনা হয়ে আসা খবরগুলিতে চোখ বোলাতে থাকেন। প্রয়োজনে সেগুলি ফের ঘসামাজা করে দেন। কোন কপি তাঁর মনে না ধরলে তা ফের লিখতে বলেন বা সময় থাকলে নিজেই নতুন করে লিখে ফেলেন। এই সব কারণে পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ সাবকে বার্তা সম্পাদকের সমতুল্য পদাধিকারী বলে মনে করা হয়। যারা অতটা মনে না করেন তাঁরাও স্বীকার করেন বার্তা সম্পাদকের চোখ ও ডান হাত পালার চিফ সাব। কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হলে চিফ সাব অবশ্যই বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে মুখোমুখি অথবা টেলিফোনে পরামর্শ করে নেন।

খবরের কাগজে দুপুরের পালা এবং রাতের পালার মাঝখানে থাকে সন্ধ্যার পালা। এই পালা দুপুর ও রাতের পালার মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে থাকে বলে সন্ধ্যার পালাকে Mid Shift বা মাঝের পালা অথবা Link Shift বা সংযোগকারী পালা বলেও অভিহিত করা হয়।

মাঝের পালার চিফ সাব দুপুরের পালার চিফ সাবের কাছ থেকে খবরের স্রোত সম্পর্কে যা যা জানার তা জেনে নেন। ছুটির আগে তিনি রাতের চিফ সাবকে একই বিষয়ে অবহিত করে অফিস থেকে বিদায় নেন। এই ব্যবস্থার ফলে তিনটি পালার চিফ সাবই চট করে কাজে হাত দিতে পারেন।

সাধারণত প্রতিদিন রাত আটটা নটার মধ্যে চিফ সাব জানতে পারেন কলকাতায়, দিল্লিতে, ওয়াশিংটনে, কাবুলে বা শিলিগুড়িতে কি কি বড় বড় ঘটনা ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি খবরের কপি সাব-এডিটরদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। তাঁরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। তারই মধ্যে তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন পরদিনের কাগজের প্রধান খবর কোনটি হওয়া উচিত। সেই খবরটির ব্যবস্থা তিনি নিজেই সাধারণত করে থাকেন।

চিফ সাবের মাধ্যমে বার্তা সম্পাদকও মাঝে মাঝে খবরের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানছেন। বার্তা সম্পাদক চিফ সাবকে পরামর্শ দিচ্ছেন। চিফ সাব কোন সমস্যায় পড়লে বার্তা সম্পাদকের নির্দেশ চাইছেন।

এই সব কর্মপ্রবাহের মধ্যে সংবাদ চিত্রগুলি এসে যাচ্ছে। চিফ সাব ছবি যাচাই করে তা খবরের সঙ্গে ছাপার জন্য বাছাই করছেন। লম্বা চওড়ায় কোন ছবির কি মাপ হবে তা বলে দিচ্ছেন। তারই মধ্যে সাব এডিটরদের তৈরি কপি চিফ সাবের হাতে আসছে। তিনি সে সব পড়ে কিছু করণীয় থাকলে করছেন। সে পর্ব মিটিয়ে কপি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে পরের দিনের কাগজ তৈরিতে মাঝের পালাকে ব্যবহার করেন চিফ সাব।

মাঝের পালা সাঙ্গ হলে জেগে ওঠে রাতের পালা। রাতের পালা পরের দিনের কাগজ তৈরির শেষ পর্ব। এই পর্ব শেষ হয় বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে মাঝের পালা এবং রাতের পালার চিফ সাবের বৈঠকে। এই বৈঠকের প্রধান কাজ পরের দিনের কাগজের প্রথম পাতাটি তৈরির সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়ে রাতের পালার চিফ সাফ নিউজ ডেস্কে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসেন। তাঁর সেই আসন নিউজ ডেস্কে সাব এডিটরদের মাঝখানে, নয়ত নিউজ রুমের কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আলাদা ডেস্কে অবস্থিত হতে পারে। তাঁর আসনের অবস্থান যে খানেই হোক না কেন তাঁকে সাব এডিটরদের কাছাকাছি থাকতে হয়।

অভিজ্ঞ সাব-এডিটরদের সহযোগিতায় প্রথম পাতার অঙ্গসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ হয়। ক্রমে এগিয়ে আসে কাগজ ছাপা আরম্ভ হবার সময়। ছাপার আদেশ (Print Order) দেবার আগে চিফ সাবের শেষ কাজ পুরো প্রথম পাতার চূড়ান্ত প্রুফে (Blanket Proof) সতর্কভাবে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। এই কাজের উদ্দেশ্য হল, কোথাও কোন ভুল থেকে গেছে কিনা তা শেষবারের মত দেখে নেওয়া। এই কাজে অবহেলা হলে নানা রকম ভুল থেকে যেতে পারে। শিরোনামে ভুল থাকতে পারে, চিত্র পরিচিতিতে ভুল থাকতে পারে, একই খবর দু'জায়গায় বসে যেতে পারে। কিন্তু এক খবরের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য খবরের ছবি লেগে যেতে পারে।

বিশ্বাস করুন, এমন অবাঞ্ছনীয় ঘটনা কালেভদ্রে হলেও ঘটে থাকে। এমন বিভ্রাটও ঘটেছে যে চিত্র পরিচিতিতে সাংসদকে বিধায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন খবরে তাঁকে বিধায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে চিত্রগ্রাহক ঐ চিত্র পরিচিতিতে সাংসদকে বিধায়ক বলে বর্ণনা করেছেন ভুলের জন্য তিনি দায়ী। যে সাব-এডিটর সেই ভুলটি সংশোধন করতে ব্যর্থ হলেন তাঁর দায়িত্বও এই ব্যাপারে কম নয়। চিফ সাবের চোখে এই ভুল ধরা পড়ল না বলে তিনিও এই ব্যাপারে সমান দোষী হবেন।

এই ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আপনাদের বোঝার সুবিধা হবে। ২৫-৮-২০০২ তারিখে এক কাগজে একটি ছবির ক্যাপশন—

শনিবার সুতানুটি উৎসবের উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। মঞ্চে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক বিপ্লব দাশগুপ্ত ইত্যাদি।

ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিপ্লব দাশগুপ্ত নামে কোন বিধায়ক ছিলেন না। তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত একজন রাজ্যসভা সদস্যের নাম বিপ্লব দাশগুপ্ত। ডেস্কের এক মুহূর্তের অবহেলায় বিপ্লব দাশগুপ্ত সাংসদ থেকে বিধায়ক হয়ে গেলেন। আরও লজ্জার কথা, খবরে কিন্তু বিপ্লব দাশগুপ্তকে সাংসদ বলেই বর্ণনা করা হয়েছিল। এবার আপনারা দেখবেন শিরোনামে উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ের ঘটনা। ১-৯-২০০২ তারিখে 'ট' কাগজের প্রথম পাতায় দুটি খবর পাশাপাশি উল্টো-পালটা শিরোনামে প্রকাশের দৃষ্টান্ত—

সোনিয়ার পাশে সাধন

ইউ এস-৬৪ সমেত অন্যান্য আমানতে বিরাট ক্ষতির মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু দিন চলার পর এবার ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়াকে বাঁচাতে এগিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিং শনিবার ইউ টি আই-কে মোট ১৪ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে সরকার ইউ টি আই-কে দুভাগে ভেঙে দিচ্ছে। প্রথমভাগে ইউ এস-৬৪-র জন্য ধার্য হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন পলিসির জন্য মোট ৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ইউ এস-৬৪ নিয়ে বিরাট আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে শুরু হয়েছিল অচলাবস্থা। আমানতকারীরা অনেকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন টাকা ফেরত পাওয়ার আশা। অতি স্বল্প মূল্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল কেনা সার্টিফিকেট বিক্রির হিড়িক। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ অনেকটা নিশ্চিন্ত করবে গ্রাহকদের। অন্যদিকে সরকার শর্তসাপেক্ষে জানিয়েছে, একমাত্র অবশ্যফেরতযোগ্য অর্থের ক্ষেত্রেই তারা সাহায্য দেবে। সরকার ইউ এস-৬৪-র ক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয়ের সময় ২০০৩ পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে। এদিকে এই ১৪ হাজার কোটি টাকা সরকার টাকায় নয়, বরং বাজারে বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে ইউ টি আইকে দেবে।

ইউনিট ট্রাস্ট চাঙ্গা

বিদেশিনী-বিতর্কে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল কংগ্রসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সাধন পান্ডে। শনিবার তিনি বলেন, আমাদের দল এখন যেকোনও অন্য দলের থেকে সম-দূরত্বের অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু জয়ললিতা যে-ভাবে বিদেশিনী ইস্যুতে সোনিয়া গান্ধীর প্রধামন্ত্রিত্বের বিরোধিতা করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। মানুষ যাকে চাইবেন, লোকসভায় যাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। জয়ললিতাও তো একবার সমর্থন করে চিঠি দিয়েছিলেন। সাধনবাবু বলেন, কোনদিন দেখব পাকিস্তানে জন্মের কারণে উনি লালকৃষ্ণ আদবানির উপপ্রধানমন্ত্রিত্বের বিরোধিতা করছেন। সাধনবাবুর এহেন বিবৃতিতে চাঞ্চল্য তুঙ্গে। কারণ, গান্ধী-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভাল। তৃণমূলের মধ্যেও তিনি 'প্রো-কংগ্রেস' ঘরানা বলে পরিচিত। এদিকে এদিকে 'খবরের কাগজ'-এ প্রকাশিত সুদীপ ব্যানার্জির বক্তব্য নিয়ে দলে ব্যাপক জলঘোলা হচ্ছে। নিজের বাড়িতে বসে অপস রায়, বৈশ্বানর চ্যাটার্জি, সজল ঘোষের সামনে মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করেছিলেন সুদীপবাবু। সেসব কথা ফাঁস হয়ে যেতেই চূড়ান্ত অস্বস্তি।

'গ' কাগজে ১০-৯-২০০২ তারিখে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম ছিল, "Mamata tea cup woes brim over"। চার কলম লম্বা শিরোনামের এই খবরের মধ্যে Special Correspondent লিখলেন—

Sources said Mamata has also decided to appoint Nitish Sengupta, MP from Tamluk, the in-charge of the Delhi unit of the party.

এই খবর পড়ার আগে জানা ছিল না যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দিল্লি শাখা আছে। সত্যসত্যই তা আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাবার চেয়ে একটি বড় ভুলের দিকে আমরা বরং নজর দিই। খবরে নীতীশ সেনগুপ্তকে সাংসদ বলা হয়েছে। তাতে কোন ভুল হয়নি। ভুলটা হয়েছে তাঁকে তমলুকের সাংসদ বানিয়ে দেওয়া। আসলে তমলুকের সাংসদ সিপিআইএম দলের লক্ষ্মণ শেঠ। আর নীতীশবাবু কাঁথির সাংসদ।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত চিহ্নিত করে যে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে তা ভাঙার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক আন্দোলনের ডাক দেয়। ৯-৯-২০০২ তারিখে 'খ' কাগজে একটি রিপোর্ট লেখা হল—

দলের সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেন, তাঁদের সঙ্গে আর কেউ না থাকলেও তাঁরা একাই এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

এ ক্ষেত্রে ভুলটা হয়েছে অশোক ঘোষের পদাধিকার বর্ণনায়। তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নন, শুধুই সম্পাদক। ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠনতন্ত্রে প্রাদেশিক কমিটিতে সাধারণ সম্পাদকের পদ নেই। সাধারণ সম্পাদকের পদ আছে সর্বভারতীয় কমিটিতে।

খবরের কাগজ প্রকাশনায় কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার আগে একটি বড় চতুষ্কোণ বা ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতিবিশিষ্ট টেবিলে যাবতীয় খবর এসে জড়ো হত। ওই টেবিলকে বলা হত নিউজ ডেস্ক, সংক্ষেপে ডেস্ক। খবর ছোট করা, বড় করা, নতুন করে লেখা, শিরোনাম লেখা সবই হত ডেস্কে। ডেস্কের মাঝখানে বসতেন পালার চিফ সাব। সেখানে বসেই চিফ সাব খবরের গুরুত্ব, অগ্রাধিকার ও স্থান নির্বাচন করতেন। ডেস্কেই ছিল চিফ সাবের রাজত্ব।

৫.২.৭ মুখ্য প্রতিবেদক

এই অনুচ্ছেদে আমরা মুখ্য প্রতিবেদক কথাটি আর ব্যবহার করব না। কারণ, সাংবাদিকদের কাছে মুখ্য প্রতিবেদক কথাটি চালু নয়। তার বদলে আমরা এর পর থেকে বরাবর চিফ রিপোর্টার বলে উল্লেখ করব।

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে চিফ রিপোর্টারকে এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "Chief Reporter means a person who is in-charge of all reporters at a centre of publication, supervises their work and also regularly report and interprets all news of legislative, political or general importance." — অর্থাৎ, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের সর্বেসর্বা তাঁদের চিফ রিপোর্টার। তাঁর এই পদাধিকারকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব—

তিনি কাগজের প্রধান দফতরে কাজ করেন। সেই দফতরে যে সব রিপোর্টার কাজ করেন তাঁরা সবাই চিফ রিপোর্টারের অধীন। তাঁদের কাজের তদারক করেন চিফ রিপোর্টার। তিনিই রিপোর্টারদের কাজ বুঝিয়ে দেন এবং তাঁদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেন। কোন রিপোর্টারের কাজে গলদ, খুঁত বা ফাঁক থাকলে তিনি সেই রিপোর্টারকে উপযুক্ত নির্দেশ দেন। তার সঙ্গে চিফ রিপোর্টার নিজেও রোজ কিছু না কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর লেখেন, তার পটভূমি বর্ণনা করেন বা তা বিশ্লেষণ করেন।

ধরুন, তখন বিধানসভার অধিবেশন চলছে। সেই দিন পুলিশ বাজেটের জন্য অর্থবরাদ্দের দাবি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতার প্রারম্ভিক ভাষণ এবং পুলিশমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ শোনার জন্য চিফ রিপোর্টার বিধানসভায় যাবেন। তিনি খবরের মুখবন্ধ লিখতে পারেন। কিম্বা কোন পয়েন্ট নিয়ে প্রাসঙ্গিক মালমশলা সংগ্রহ করে একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখতে পারেন।

বিশেষ প্রতিনিধি, রাজনৈতিক সংবাদদাতা থেকে আরম্ভ করে স্টাফ রিপোর্টার পর্যন্ত সবাই রিপোর্টার। তাঁরা সবাই কিন্তু চিফ রিপোর্টারের অধীনে কাজ করেন না। শুধু স্টাফ রিপোর্টারদের নিয়েই চিফ রিপোর্টারের বাহিনী গঠিত হয়।

রাজ্যের বা দেশের অন্যান্য রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ শহরে, রাজধানীতে বা জেলায় যে সব রিপোর্টার কাজ করছেন তাঁদেরও চিফ রিপোর্টার পরিচালনা করেন না। তাঁদের পরিচালনা করার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

চিফ রিপোর্টারের পরের দিনের কাজ শুরু হয় আগের দিন রাতে। তিনি একটি ডায়েরি রাখেন। তাকে বলা হয় Assignment Book — দায়িত্বের খাতা। পরের দিনের প্রত্যাশিত খবরগুলির তালিকা তাতে লিখে ফেলেন চিফ রিপোর্টার। যেমন— মহাকরণ, লালবাজার, কর্পোরেশন, শিক্ষা, বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠক, বিধানসভা, ধর্মতলায় পথ অবরোধ, শিল্প মহাসঙ্ঘের সেমিনার, বিরোধী দলনেতার সাংবাদিক বৈঠক ইত্যাদি।

প্রত্যাশিত খবরের এই বিষয়গুলির বাঁ দিকে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত রিপোর্টারদের নাম সংক্ষেপে লিখে দেন। ধরুন কোন রিপোর্টারকে বিধানসভায় যেতে হবে। তাঁর নাম অনির্বাণ চৌধুরী। চিফ রিপোর্টার তালিকার যেখানে বিধানসভা লেখা আছে তার বাঁ পাশে সংক্ষেপে লিখে দিতে পারেন অ চৌ।

রিপোর্টাররাও ছুটির পর বাড়ি যাবার আগে চিফ রিপোর্টারের কাছ থেকে পরের দিনের কাজের দায়িত্ব জেনে নেবেন।

অপ্রত্যাশিত খবরের জন্যও রিপোর্টিং বিভাগকে তৈরি রাখেন চিফ রিপোর্টার। বড় বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন কাগজের রিপোর্টিং বিভাগে ২৪ ঘণ্টাই লাল সঙ্কেত জারি আছে। হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে তার খবর পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারকে ঘটনাস্থলে দৌড়তে হয়।

তেমন ঘটনা দিনে রাতে যে কোন সময়ে ঘটে যেতে পারে। মাঝরাতে কোথাও বাড়ি ভেঙে পড়ে কিছু লোকের মৃত্যু হতে পারে। শেষরাতে বিবাদীবাগের কোন বহুতল অফিস বাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে কোন বাড়িতে বিস্ফোরণে অনেক লোক হতাহত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে এই ধরনের খবর যোগাড় করার জন্য দায়িত্ব বন্টনের খাতায় Day এবং Night হলে দুটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। এই দুটি কাজও রিপোর্টারদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে বন্টন করেন দেন চিফ রিপোর্টার। এই কাজগুলি সারার পর চিফ রিপোর্টারের ছুটি মেলে।

কাজের দিন নির্ধারিত সময়ে দফতরে পৌঁছে চিফ রিপোর্টার তখন বিভাগে উপস্থিত রিপোর্টারদের কাছ থেকে সে দিনের খবরের অবস্থা বুঝে নেন। ডেস্কে গিয়েও দেশ-বিদেশের কোথায় কি ঘটছে বা ঘটতে পারে তাও জেনে নেন। সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকের ডাকে দিনের মধ্যে একবার বা একাধিকবার বৈঠক করেন চিফ রিপোর্টার। বার্তা বিভাগের কাজে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্যই চিফ রিপোর্টারকে এইসব দায়িত্ব পালন করতে হয়। কারণ, সারা দিন ধরে ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যাশিত পথে বইতে পারে, নাও পারে। বেলা ১২টার বৈঠকে চিফ রিপোর্টার তাঁর কাজের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রত্যাশিত খবরের যে তালিকা দিলেন তার ভিত্তিতে পরের দিনের কাগজ বের করার খসড়া পরিকল্পনা তৈরি হল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা তৈরি হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কোন বড় ব্যাপার ঘটল। তখন আগের তৈরি পরিকল্পনা সংশোধিত হল বিকাল ৪টার বৈঠকে।

শেষ বৈঠক রাত আটটা বা নটায়। তখন দেখা গেল অবস্থার আরও বড় ধরনের পরিবর্তন করতে হল। পরিবর্তিত পরিকল্পনায় চিফ রিপোর্টারের এলাকার আরও কিছু খবর দরকার। সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব বন্টন করতে হয় চিফ রিপোর্টারকেই। রিপোর্টারদের কপি পরীক্ষা করা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয় কাজ। সেই কাজটি প্রথমে করেন চিফ রিপোর্টার।

রিপোর্টাররা কাজ সেরে অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখে তা চিফ রিপোর্টারকে দেন। তিনি তা খুঁটিয়ে পড়েন। এই কাজকে বলে কপি পরীক্ষা (Check) করা। এই সময়ে তিনি দেখেন ব্যক্তি, স্থান, প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা, তথ্য নির্ভুল কিনা, মুখবন্ধ ঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা। বাক্যগঠন ও শব্দ প্রয়োগ যথাযথ হয়েছে কিনা সেদিকেও তাঁকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। লেখায় অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক বিবরণ এবং ব্যক্তিগত মন্তব্য থাকলে তা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলার কাজও চিফ রিপোর্টারই করেন। এই সব পর্ব মিটিয়ে তিনি পরীক্ষায় পাস করা স্টাফ রিপোর্টারের কপি সম্পাদনার জন্য ডেস্কে পাঠিয়ে দেন।

চিফ রিপোর্টারকে বার্তা সম্পাদকের অধীনে কাজ করতে হয়। রিপোর্টারদের কাজের কোন ব্যর্থতার জন্য চিফ রিপোর্টারকে বার্তা সম্পাদকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর ওই শহর থেকে প্রকাশিত অন্যান্য খবরের কাগজে পরদিন প্রকাশিত হলে এবং অন্য একটি কাগজে তা প্রকাশিত না হলে তাকে Miss — হাতছাড়া বলা হয়। সেই বিশেষ খবরটি রিপোর্টিং বিভাগ থেকে ডেস্কে না এসে থাকলে তারও জবাবদিহি করতে হয় চিফ রিপোর্টারকে।

৫.২.৮ বিশেষ সংবাদদাতা

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি (১.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন) অনুযায়ী "Special Correspondent means a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or otherwise at the headquarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such." — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে খবর লেখেন এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকেন তিনি বিশেষ সংবাদদাতা। তাঁর কাজের বিষয় রাজ্য আইনসভা, সংসদ, রাজনৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ঘটনা। তাঁর সরকারি স্বীকৃতিপত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি দেশের রাজধানীতে, এক বা একাধিক রাজ্যের রাজধানীতে, বিদেশে বা মূল কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হতে পারেন বা বিশেষ কোন ঘটনার খবর সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হতে পারেন।

এই সংজ্ঞা থেকে আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন, রাজনৈতিক সংবাদদাতা, বৈদেশিক সংবাদদাতা, সমর সংবাদদাতা, সংসদীয় সংবাদদাতাও বিশেষ সংবাদদাতা শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁদের সকলেরই সরকারি পরিচয়পত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। দিল্লিতে সংসদের লোকসভা, রাজ্যসভা ও সংসদের সেন্ট্রাল হল বলে পরিচিত লবিতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করার ছাড়পত্র সরকরি পরিচয়পত্র। দিল্লিতে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পি আই বি) নানা দিক বিচার বিবেচনা করে সাংবাদিকদের এই পরিচয়পত্র দিয়ে থাকে। সংসদের সচিবালয় থেকেও পরিচয়পত্র নিতে হয়। পি আই বি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন একটি বিভাগ। এই বিভাগের মাথা Principle Information Officer — মুখ্য তথ্য আধিকারিক।

দিল্লিতে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লক এবং রেল ভবন, শ্রমশক্তি ভবন, উদ্যোক্তা ভবন ইত্যাদি ভবনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রবেশাধিকার পেতে গেলেও পি আই বি'র দেওয়া পরিচয়পত্রটি সঙ্গে থাকা দরকার। অবশ্য উঁচু মহলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সূত্রগুলির সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকলে ওই পরিচয়পত্র ছাড়াও কাজ করা যায়। তবে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত তৎপরতার কারণে সব পদের সংবাদদাতাদের সরকারি পরিচয়পত্র থাকা ও তা সঙ্গে বহন করা বাঞ্ছনীয়।

এই সুযোগে আমরা একজন সংসদীয়, সংবাদদাতার কাজের ধরন তাঁর নিজের মুখেই শুনব। তাঁর নাম অজিত ভট্টাচার্য। ৬-৮-২০০২ তারিখে The Asian Age — দ্য এশিয়ান এজ পত্রিকায় তিনি লিখেছেন—

পঞ্চাশের দশকে তিনি দ্য স্টেটসম্যানের হয়ে সংসদের কাজকর্ম রিপোর্ট করতেন। প্রতিদিনের অধিবেশনের সংক্ষিপ্তসার ৫০০ শব্দের মধ্যে বেশ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে রিপোর্ট করা ছিল তাঁর কাজ।

প্রেম ভাটিয়া তখন স্টেটসম্যানের চিফ অব ব্যুরো। তাঁর নির্দেশ ছিল অধিবেশন সাদামাটা হলে অজিত ভট্টাচার্য একটি আলাদা রিপোর্ট লিখবেন। তার বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব থাকতে হবে।

তেমন বিষয় মিলবে কোথায়? পিছনের বেঞ্চ থেকে কোন সাংসদ হঠাৎ কোন চমকপ্রদ বক্তব্য পেশ করে সাদামাটা অধিবেশনেও রঙের ছোঁয়া লাগাতে পারেন। কোন মন্ত্রীর তুচ্ছ কোন ভুল থেকেও একটা ভাল খবরের খোরাক মিলে যেতে পারে।

দিল্লিতে নিযুক্ত বিভিন্ন বড় বড় কাগজের সংসদীয় সংবাদদাতারা অধিবেশনের দিকে নজর রাখেন কিন্তু

তার কোন সাধারণ রিপোর্ট পাঠান না। তাঁদের তরফে সে কাজটা করে পি টি আইয়ের রিপোর্টাররা। তাঁরা অধিবেশন চলাকালে কিছুক্ষণ বাদে বাদে অধিবেশনের রিপোর্ট টেলিপ্রিন্টার মারফৎ তাঁদের গ্রাহকদের কাছে পাঠাতে থাকেন।

রাজনৈতিক সংবাদদাতারাও বিশেষ সংবাদদাতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা কী ভাবে কাজ করেন তা Michael Dobbs তাঁর House of Cords নামে একটি রাজনৈতিক থ্রিলারে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তার কিছুটা অংশ আপনাদের জানাচ্ছি—

ধরুন ব্রিটেনে হাউস অব কমন্স বা সংসদের নির্বাচনের ফল ঘোষিত হল। দেখা গেল ক্ষমতাসীন দল আবার জিতেছে বটে কিন্তু তাদের গরিষ্ঠতা কমে গেছে। ভোটের আগের ১২০ আসনের গরিষ্ঠতা কমে ২০ তে নেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কাগজের রাজনৈতিক সংবাদদাতারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করে গরম গরম খবর লেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা জানতে চান—

(১) বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী হেনরি কলিনগ্রিস কি ফের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরতে পারবেন ? সংসদীয় দল কি তাঁকে ফের নেতা বলে মেনে নেবে ? নাকি আর কাউকে ডাকবে ? তেমন হলে কার সম্ভাবনা বেশি ? তিনি কি নবীন প্রজন্মের কোন সংসদ ? নাকি কোন পোড়খাওয়া প্রবীণ রাজনীতিক ? দলনেতা নির্বাচনের দৌড়ে কে কার থেকে কতটা এগিয়ে আছে ?

(২) হেনরিকে সংসদীয় দল ফের নেতা মেনে নিলে মন্ত্রিসভার গঠন কেমন হবে ? কারা ছাঁটাই হবেন? কাদের ভাগ্য প্রসন্ন হবে ? মন্ত্রী এবং দপ্তরে বড় রকম ওলোট-পালট করা হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ? মন্ত্রী না হতে পারায় বা শাঁসালো দপ্তর না মেলায় বিক্ষুব্ধ মন্ত্রী ও তাঁদের সমর্থকরা আয়ারাম গয়ারামের ভূমিকা নিয়ে হেনরির গদি উল্টে দিতে পারে কি না ?

এই সব স্পর্শকাতর ও জটিল প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য টাটকা খবর সাতসকালে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দিতে না পারলে খবরের কাগজের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে যাবে। কিন্তু কে দেবে এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব ? জবাব দিতে পারেন হেনরি স্বয়ং। কিন্তু তখন তিনি মফঃস্বলের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লন্ডনের পথে।

তিনি লন্ডনে ফিরে ওপরতলার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মন্ত্রিসভা গড়া নিয়ে মতবিনিময় করার পর তাঁর চিন্তাভাবনার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই।

কয়েক ঘণ্টা পরে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রীর নিবাস থেকে তাঁর প্রেস সচিব কর্তৃক প্রচারিত একটি সোজাসাপটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে এই বিষয়ে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হল। সেই বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হল, পুনর্নির্বাচিত সব মন্ত্রী ফের মন্ত্রী হবেন। তাঁদের সকলের দপ্তরও বহাল থাকবে। দলের প্রবীণ পদাধিকারীরা প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে সবুজ সংকেত দিয়েছেন।

নতুন মন্ত্রীসভা গড়া নিয়ে ভাবি শাসকদলের এই নীতিগত ঘোষণা অনতিবিলম্বে সব কাগজ এবং সংবাদ সংস্থার দপ্তরে ঢেউ তুলল। কৌতূহলের ঢেউ। ওপরতলা থেকে রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের কাছে প্রবল তাগিদ এল, এই খবরের পিছনের খবর চাই। গুজব নয়, খাঁটি খবর। মনগড়া কল্পকাহিনীর লোক ঠকান ফাঁকিবাজি নয়, চাই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ। The Daily Telegraph — দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের রাজনৈতিক সংবাদদাতা মিস ম্যাটি স্টোরিনও পত্রপাঠ যুদ্ধে লেগে গেলেন। কিন্তু সূত্র ? কে দেবে ম্যাটিকে খবরের অন্তরালের

খাস খবর? পুনর্নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, দলের চেয়ারম্যান, একাদিক্রমে সপ্তমবার সংসদে নির্বাচিত গরিষ্ঠ নেতা মান্যবার স্যামুয়েল উইলিয়মস কেউই এই ব্যাপারে প্রেসের কাছে মুখ খুলবেন না। তাহলে উপায়? ম্যাটি ভাল করেই জানেন, উপায় একটা বার করতেই হবে। অতএব নানা দরজায় ধাক্কা মারলেন ম্যাটি। নানা লোকের বৈঠকখানায় ফোন বাজল তাঁর। কিন্তু সবই বিফল। কোথাও এতটুকু আলোর খোঁজ পাওয়া গেল না। তাহলে ম্যাটি কি হেরে যাবেন?

হাল ছেড়ে দেবার আগে মিস ম্যাটি আর একবার ফোন করলেন, বিদায়ী সরকারের প্রবীণ সংসদীয় মন্ত্রী এবং চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোহার্টের বাড়িতে। ম্যাটি আগেও কয়েকবার ফ্রান্সিসকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনবারই কেউ সাড়া দেননি। এবারও ম্যাটির সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল।

তবুও ম্যাটি হাল ছাড়লেন না। গাড়ি হাঁকিয়ে হানা দিলেন ফ্রান্সিসের বাড়িতে। বাইরে থেকেই বোঝা গেল বাড়ির মধ্যে আলো জ্বলছে। ম্যাটি দরজার কলিং বেল বাজালেন। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললেন ফ্রান্সিস নিজেই। তাঁর মনে হল, তরুণীটিকে আগে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর নাম বা পরিচয় কিছুই তাঁর স্মরণে এল না। তাই কিছুটা আশ্চর্য হয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

— আমি টেলিগ্রাফের ম্যাটি। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল। ভেতরে আসতে পারি?

— আমি দুঃখিত মিস। গত একটা মাস প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। আমি বড় ক্লান্ত। আপনি বরং পরে একদিন আসবেন। কেমন?

এই বলে ফ্রান্সিস তরুণী সংবাদ শিকারীটির প্রায় মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ম্যাটি চট করে খোলা দরজার দুটি পাল্লার ফাঁকে তার ডান হাতটা একটু ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, মিঃ আর্কোহার্ট, আমি আজ বিকাল থেকে আপনার সঙ্গে ফোনে বা মুখোমুখি কথা বলার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু একবারও সে সুযোগ পাইনি। আমি জানি আপনি খুবই ক্লান্ত। আপনার এখন বিশ্রাম নেওয়াও দরকার। আমার সঙ্গে কথা বলার এটা উপযুক্ত সময় নয়। তবুও আমি আপনাকে বিরক্ত করছি। আপনি শুধু আমাকে বলুন, বিদায়ী মন্ত্রীসভায় কোন নাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে আসল কারণটা কী?

— দুঃখিত, আমি কিছু বলব না। বলতে পারব না।

এই কথা শোনামাত্র ম্যাটি তাঁর তীর নিক্ষেপ করেন, তাই নাকি? দারুণ খবর। তবে আমার মনে হয়, খবরটা কাল সকালের টেলিগ্রাফে বেরলে আপনার সুবিধা হবে না।

মেয়েটার কথা শুনে ঝুনো রাজনীতিক ফ্রান্সিস হতবাক। বলে কী? কী দারুণ খবর? একটু দ্বিধা করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, খবরটা কী?

— কেন, মন্ত্রীসভা গড়া নিয়ে গত রাতে শাসকদলের ওপরতলায় প্রচণ্ড মতভেদ। কোনরকম রদবদলের সম্ভাবনা খারিজ করে দেওয়ায় কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী অসন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সংসদীয় মন্ত্রী ও চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোহার্ট। তিনি এবার আরও বড় দায়িত্ব পাবার জন্য আশা ও চেষ্টা করেছিলেন। ডাউনিং স্ট্রিট তার সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত নীতির সমর্থনে একটি কথাও বলতে চাননি।" আমার এই খবরটাই তো ছাপা হবে কালকের টেলিগ্রাফে।

ফ্রান্সিসের বিস্ময়ের সঙ্গে এবার যুক্ত হয় আতঙ্ক। জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সত্যসত্যই এই খবর লিখবে নাকি?

— কি যে বলেন স্যার। তাই কি লেখা যায়? এ সব তো বানানো গল্প। কিন্তু কি করব স্যার, কেউ আসল খবর না দিলে চাকরি বজায় রাখার জন্য দু'চার লাইন বানানো খবরই তো লিখতে হবে। ঠিক বলছি না স্যার? কেউ পর্দার আড়ালের খবর না দিলে সেটা জানার জন্য আমাকে তো ধ্যানে বসতেই হবে। আপনি আমাকে সত্য কথাটা না জানিয়ে ধ্যানে বসতে বাধ্য করছেন না কি? ধ্যানে না বসলে খবর বানাবার মালমশলা পাব কোথা থেকে?

ফ্রান্সিস এসব বোলচাল শুনে বুঝে গেলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। রিপোর্টারটাকে খবরের কিছু খোরাক না দিলে তাঁকে বিক্ষুব্ধ বলে দাগি করে দেবে টেলিগ্রাফে। সুতরাং মন্দের ভাল হিসাবে মেয়েটার সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ গল্প করার পন্থাটাই বেছে নিলেন তিনি। তাই দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে ম্যাটিকে বললেন, ভেতরে এস।

ম্যাটিকে বৈঠকখানায় বসিয়ে ফ্রান্সিস বললেন, কি জানতে চাও জিজ্ঞাসা কর। আমি সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করব।

ফ্রান্সিসকে এত সহজে কাবু করে ফেলা যাবে তা ম্যাটি ভাবেনি। এখন ফ্রান্সিসকে নরম হতে দেখে ম্যাটি বুঝে গেল, সত্যসত্যই পর্দার আড়ালে একটি কিছু বড় গোলমাল আছে। তাতে একটা বড় ভূমিকা আছে ঘুঘু সংসদীয় মন্ত্রীর। অতএব ম্যাটি তার কাঁধের ব্যাগের ভেতর থেকে নোটবই বার করে। তাকে নোটবই বার করতে দেখে ফ্রান্সিস বলেন, না, না। কোন কথা নোট করা চলবে না। কথা হবে লবির আইন মেনে।

ব্রিটিশ সংসদের লবিতে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ। স্থানটি মন্ত্রী, এম পি এবং সংসদীয় ও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে প্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের কথাবার্তার অলিখিত শর্ত, প্রয়োজনে প্রাপ্ত বিবরণ বা ভাষ্য সংবাদে ব্যবহার করা চলবে কিন্তু তার একটি অক্ষরও বক্তার মুখে বসান চলবে না। বক্তার পরিচয় প্রকাশ করাও মানা। কোন সাংবাদিক এই শর্ত অমান্য করলে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী এবং এম পি'র মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সুতরাং খবরের দায়ে কোন সাংবাদিক লবি আইন ভাঙেন না।

ফ্রান্সিসের কথা মেনে নিয়ে ম্যাটি নোটবইটি আবার ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিলেন। লবির আইনে দুজনের কথা এগোল এইভাবে।

ফ্রান্সিস বললেন, আমরা নতুন সরকার গড়ার পর একটুও দেরি না করে কাজে নেমে পড়তে চাই। নতুন মন্ত্রী এবং পুরান মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর অদলবদল করলে তাতে প্রথম প্রথম প্রচুর অসুবিধা সৃষ্টি হবে। নতুন মন্ত্রীরা দায়িত্ব বোঝার জন্য সময় নেবেন। পুরান মন্ত্রীদের নতুন নতুন দফতরে পাঠালে তাঁর একই সমস্যায় পড়বেন। তাই আমরা পুরান ব্যবস্থাই বহাল রাখছি। এই হল প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের নেপথ্যের কারণ।

ম্যাটি বুঝল, ফ্রান্সিস চালাকি করছেন। তাই সে বলল, এতো ডাউনিং স্ট্রিটের বক্তব্যের রেকর্ড বাজালেন আপনি। এর জন্য লবির আইন মানার দরকার কি? তাহলে ভোট প্রচারে আপনাদের বক্তব্যের কী পরিণতি। প্রধানমন্ত্রী, আপনি, আপনারা সবাই বলেছিলেন, নতুন উদ্যম, নতুন স্বপ্ন, নতুন রক্ত হবে আপনাদের নতুন সরকারের চালিকা শক্তি। বলেননি? তাহলে ভোটের পর পুরানো বোতলে পুরানো মদ কেন? নতুন খেলোয়াড়দের দিয়ে নতুন করে দল গড়ে কেন মাঠে নামার সাহস পেলেন না প্রধানমন্ত্রী? আপনাব বক্তব্যে আমার এইসব প্রশ্নের কোন জবাবই মিলল না। মন খুলে বলুন তো, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই কি মন্ত্রীসভা গড়ার শ্রেষ্ঠ উপায়?

— তুমি কি করে ভাবলে আমি অন্য কিছু বলব ? আমি সরকারের চিফ হুইপ। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি পুরো আনুগত্য এই পদের প্রধান শর্ত। সুতরাং তিনি যা চান তার প্রতি আমার সমর্থন ছাড়া আর কি থাকবে ?

— সে তো ঠিক মিস্টার চিফ হুইপ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আপনার আনুগত্যের এবং নতুন মন্ত্রীসভা গড়া নিয়ে তাঁর নীতির প্রতি আপনার সমর্থনের পূর্ণ বিবরণ ঠিকঠাক থাকবে। কিন্তু মিস্টার আর্কোহার্ট কি বলেন ? পুরান দফতরে পুনর্বহাল হয়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি সফল হল ? আপনার জবাব আমি লবির আইন মেনেই লিখব। আপনার আমার এই আলোচনা তৃতীয় কেউ কোনদিন জানবে না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনি তাতে খুশি হননি।

— তাহলে শোন, তোমার অনুমান কিছুটা ঠিক। আমি এতে সন্তুষ্ট নই। শুধু আমি নয়, পুরান মন্ত্রীরা সবাই অসন্তুষ্ট। কারণটা খুব সহজ। পুরান মন্ত্রীরা সবাই ওপরে উঠতে চায়। আরও ক্ষমতার জন্য সবাই পাগল। সবাই চায় বিদেশ, জাহাজ, খনি, স্বরাষ্ট্র দফতরের মত বেশি বাজেটের বিভাগ। বেশি বাজেট মানে বেশি কর্তৃত্ব। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি কাউকে কাউকে তাদের পছন্দসই বিভাগ দিতে চান তো অন্যের মুখের গ্রাস কাড়তে হবে। তাতে এই রকম স্বল্প গরিষ্ঠতার সরকারে বড় রকম ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর গদি টলে যেতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই তিনি কোনরকম রদবদলের ঝুঁকি নেবার সাহস করলেন না।

— তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে নির্বাচনের ফল বেরতেই সরকারি দলে ক্ষমতার লড়াই, ল্যাং মারামারি, খেয়োখেয়ি আরম্ভ হয়ে গেছে ?

— ব্যাপারটা এইভাবে বলা যায়। অন্যভাবেও দেখা যায়। অনেক মন্ত্রী ও সাংসদ সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তাঁরা ভাবছেন, এত কম গরিষ্ঠতা এবং দুর্বল প্রধানমন্ত্রী এই সরকারকে পুরো মেয়াদ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কিনা। অনেকেরই আশঙ্কা, তা সম্ভব নয়। দেড় দু'বছরের মধ্যে সংসদের অন্তর্বর্তী নির্বাচন নিয়েও একটা উত্তেজনা আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীও সেটা টের পেয়েছেন। তাই তিনি স্থিতাবস্থা বজায় রেখে গদি বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

— তার মানে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পুরো টিম নেই ?

— ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছে।

— তাহলে গোলমেলে মন্ত্রীদের তিনি ছেঁটে ফেলছেন না কেন ?

— ওই যে বললাম, ভয় পাচ্ছেন। তাই গোলমেলে মন্ত্রীদের হজম করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের সংখ্যা তো কম নয়।

— এই অবস্থায় তিনি মন্ত্রীসভা গড়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাই কী শ্রেষ্ঠ পন্থা?

— আমি যদি টাইটানিকের ক্যাপ্টেন হতাম তাহলে সামনে এক বিরাট হিমশৈলকে এগিয়ে আসতে দেখলে বলতাম না, সবাই তৈরি হন, আমরা ডুবতে চলেছি।

— তার বদলে আপনি কি করতেন ?

— আমি হিমশৈলটাকে পাশ কাটিয়ে বিপদ কাটাবার শেষ চেষ্টা করতাম।

— প্রধানমন্ত্রীকে আপনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ?

ফ্রান্সিস বললেন, ম্যাটি, অনেক বলেছি, আর একটি কথাও নয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে চিফ হুইপ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কি বলেছেন বা বলেননি সেটা লবির আইন মেনেও বলা যায় না। এবার তুমি চট করে উঠে পড়, কেমন?

— আর মাত্র একটা প্রশ্ন। পার্টির চেয়ারম্যান আজ সবচেয়ে বেশি সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন। তিনি কি চান?

— তিনি তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসভাজন তরুণ প্রজন্মের কোন মন্ত্রীকে নতুন দলনেতা করে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতে চান। নিশ্চয় জানতে চাও তিনি কে? নিজের বুদ্ধি থাকলে বুঝে নাও তিনি কে হতে পারেন। দয়া করে এবার সত্যসত্যই যাও। আমি খুব ক্লান্ত।

ম্যাটি চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করে তিনি কি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মাইকেল স্যামুয়েল?

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে বৈঠকখানার দরজা খুলে দেন।

পরদিন টেলিগ্রাফের প্রথম পাতায় রাজনৈতিক সংবাদদাতা ম্যাটি স্টোরিনের নামাঙ্কিত খবরটি ছিল এই রকম—

মন্ত্রিসভার দপ্তর বন্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহের মুখে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ম্যাটি স্টোরিন

১৪ জুন : নির্বাচন পরবর্তী মন্ত্রিসভার দপ্তর বন্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হেনরি কলিনগ্রিজ পরস্পরবিরোধী চাপের মুখে পড়েছেন। কয়েকজন নবীন সাংসদ মন্ত্রী হতে জোরদার লবি করছেন। অন্যদিকে কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী আগের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব আশা করছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সকলকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় তিনি পুরান মন্ত্রিসভার বিজয়ী সদস্যদের সকলকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পুনর্নির্বাচিত সংসদীয় মন্ত্রী ও চিফ হুইপ ফ্রান্সিস আর্কোয়ার্ট ওই সিদ্ধান্তকে জোরাল সমর্থন জানিয়েছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানাচ্ছে, চিফ হুইপ দলের সাংসদদের বোঝাচ্ছেন, এখন ক্ষমতার জন্য ইঁদুর দৌড়ের সময় নয়, পূর্ণ উদ্যমে কাজের মধ্যে দিয়ে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময়।

কিন্তু শাসক দলের অন্দরমহলে ভিন্ন মতও মাথা চাড়া দিয়েছে। একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী নতুন দলনেতা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সরকারকে পুরো মেয়াদ টেঁকাবার জন্য চেষ্টা করতে চায়। নতুন দলনেতার পদে কে যোগ্যতম প্রার্থী হতে পারেন তা নিয়ে বিচার বিবেচনা পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে।

এই ব্যাপারে দলের চেয়ারম্যান লর্ড উইলিয়ামস যার দিকে ঝুঁকবেন সে দিকেই পাল্লা ভারি হবে। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মাইকেল স্যামুয়েল। সুতরাং দলনেতার পদে আশু বা অদূর ভবিষ্যতে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে মিস্টার স্যামুয়েলকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিরোধী দলের মুখপাত্র বিজয়ী দলকে টাইটানিক এবং প্রধানমন্ত্রীকে তার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শাসকদলের ঘরের মধ্যে আগুন ধরে গেছে। তা নেভাবার শক্তি বা সমর্থন কোনটাই প্রধানমন্ত্রীর হাতে নেই। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে দেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরিস্থিতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এবার বিদেশে নিযুক্ত কোন বিশেষ সংবাদদাতাকে কী রকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে খবর যোগাড় ও সরবরাহ করতে হয় তা আমরা দেখব।

ধরা যাক, মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশের রাজধানীতে উইক এন্ডের রাতে একটি বড় ঘটনা ঘটল। সেই রাজধানীতে নিযুক্ত কোন বৈদেশিক সংবাদদাতা তখন কী করবেন? জন গ্রিসাম তাঁর 'দ্য ব্রেদরেন' নামে উপন্যাসে এই রকম একটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেই সাংবাদিককে খবর দেবার তখন কেউ নেই। তাই বলে তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন না। তাঁর খবর—

"আমেরিকান দূতাবাসে একটি সান্ধ্য পার্টি চলাকালে প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ। রাত তখন দশটা কুড়ি। হতাহতের সংখ্যা নিয়ে কোন সরকারি তথ্য নেই। তবে সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই অনেক। দূতাবাস এলাকাটি সেনা জওয়ানরা ঘিরে রেখেছে। এই বোমা বিস্ফোরণের দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে এ কাজ ——এরা, এরা অথবা ——এরা করে থাকতে পারে। এগুলি সবই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংগঠন।"

সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কিভাবে একটি সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট লেখা যায় এই কাল্পনিক সংবাদটি তার একটি উত্তম উদাহরণ। অভিজ্ঞতা ও উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তিনি এই রিপোর্টটি লিখেছিলেন।

এ থেকে আমরা বুঝলাম, যেখানে ঘটনার বিবরণ দেবার জন্য কেউ নেই অথচ সংবাদটির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ প্রতিনিধিকে কর্তব্য পালন করতে হয়। ডেডলাইনের (Deadline)-এর মধ্যে তাঁর খবর প্রকাশনা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে হয়। এর জন্য তঁর্ক অনুমানের ওপর নির্ভর করে কিন্তু সতর্কভাবে পা ফেলতে হয়। অনুমানের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে তিনি গল্পের গরুকে গাছে চড়িয়ে দিলে তিনি নিজে এবং তাঁর কাজ দুই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে হাসির খোরাক হবে।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এক্ষেত্রে 'ডেডলাইন' কথাটি কী তাৎপর্য বহন করছে।

প্রকাশনার কেন্দ্রের বাইরে থেকে যারা খবর পাঠান বা বিশেষ কোন খবর যোগাড় করার জন্য কেন্দ্র থেকে যাদের বাইরে পাঠান হয় সেই সব সংবাদদাতা বা রিপোর্টারদের কাছে ডেডলাইন কথাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর যোগাড় করা খবর ডেডলাইন পার হবার যথেষ্ট আগে ডেস্কে না পৌঁছলে সে খবর পরবর্তী সংস্করণে ছাপা যায় না। কারণ, ডেডলাইন পার হওয়া মাত্র কাগজ চিফ সাব ছাপতে বলে দেন। ফলে রিপোর্টারের খাটুনি এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল দুইই বরবাদ হয়। খবরটি কাগজে ধরাতে না পারার দরুন পাঠকরা তা থেকে বঞ্চিত হন।

আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Wisconsin) অধ্যাপক ব্রুস ওয়েস্টলি (Bruce Westley) বলেছেন, ডেডলাইন হল, "The last moment at which copy may be accepted in order to meet a particular edition."

উদাহরণ সহকারে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক। ধরুন, মুর্শিদাবাদ জেলার আহিরণের কাছে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে নদীতে পড়ে গেল। কলকাতার একটি কাগজ সেই খবর জানল বিকাল চারটায়।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ চিফ রিপোর্টার একজন পাকা রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারকে গাড়ি করে দুর্ঘটনাস্থল রওনা করে দিলেন। নানা কারণে তাঁদের গাড়ি যখন বহরমপুরে ঢুকল তখন রাত ১১টা।

বহরমপুর থেকে গাড়িতে আহিরণ যেতে আরও দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ রাত সাড়ে ১২টার আগে তাঁদের আহিরণ পৌছান সম্ভব নয়। দুর্ঘটনাস্থলে তাঁদের কমসে কম আধঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। তার পরে সেখান থেকে বহরমপুর রওনা হতে হতে রাত একটা বাজবে। বহরমপুরে তাঁরা যখন ফিরবেন তখন রাত আড়াইটা বেজে যাবে। ওদিকে শহর সংস্করণে ছাপার জন্য খবর প্রিন্টারের হাতে রাত দুটোর মধ্যে না পৌছলে খবর বরবাদ।

সুতরাং রিপোর্টার সে বোকামি না করে বহরমপুরেই সাময়িক যাত্রা বিরতি করলেন। সবার আগে চলে গেলেন সরকারি এমার্জেন্সি কন্ট্রোল রুমে। সেই কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়েছে জেলাশাসকের দফতরের একটি বড় ঘরে। কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে রয়েছেন একজন সহকারী জেলাশাসক। দুর্ঘটনাস্থলের সঙ্গে তাঁর রেডিও টেলিফোনে যোগাযোগ আছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে চৌকশ রিপোর্টার বহরমপুরে বসেই আহিরণের অবস্থার প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করে ডেডলাইনের অনেক আগেই দফতরে খবর পাঠিয়ে দিলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার আহিরণে অনেক কাজ করে ও ছবি তুলে সেই বহরমপুরেই ফিরলেন। আহিরণ থেকে কলকাতায় খবর পাঠাবার ব্যবস্থা নেই। বহরমপুর থেকে তাঁর ফোন কলকাতায় চিফ সাব ধরে বললেন, কাগজ ছাপা শুরু হয়ে গেছে। আজ বরং তোমরা কোথাও বিশ্রাম নাও। কাল দেখা হবে।

ডেডলাইনকে মান্য না করলে রিপোর্ট এবং রিপোর্টারের এই দশাই হয়ে থাকে।

এবার আমাদের আলোচনার মধ্যে আসছেন সমর সংবাদদাতা (War Correspondent)। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। যুদ্ধের রিপোর্ট করতে যারা ফ্রন্টলাইনে এগিয়ে যান তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আর ঘরে ফেরেন না। এমনই ঘটেছে ২০০১ সালে আফগানিস্তানের যুদ্ধে।

তালিবান উচ্ছেদের যুদ্ধের তাজা খবর সংগ্রহ করতে যারা আফগানিস্তানের রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফিরেছেন। ফেরেননি আটজন। তালিবান অধিকৃত অঞ্চলে সাংবাদিকরা ছিল অবাঞ্ছিত। তালিবান যুদ্ধবাজদের চোখে সাদা চামড়ার সাংবাদিক মানেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। আর গুপ্তচরের শাস্তি একটাই— মৃত্যু।

অথচ খবর চাই, যুদ্ধের টাটকা, তাজা, চোখে দেখা খবর। সেই অমূল্য নিধির সন্ধানে ২০০১ সালের ১২ নভেম্বর উত্তরের জোটের সেনাবাহিনীর সঙ্গে এগোচ্ছিলেন একদল সাংবাদিক। হঠাৎ তাঁরা পড়ে যান তালিবান যোদ্ধাদের গুলির মুখে। এই হামলায় নিহত হন (১) রেডিয়ো ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনালের শ্রীমতি জোহানি সাটন — Johane Sutton, আর টি সি রেডিয়োর পিয়েরে বিলাড — Pierre Billad, জার্মানির স্টার্ন ম্যাগাজিনের ভোলকার হ্যান্ডলাইক — Volkar Handloik।

এই ঘটনার পরেও সাংবাদিকের দল রণক্ষেত্র ছাড়লেন না। জোহানি, পিয়েরে এবং ভোলকার নিহত হবার এক সপ্তাহ পরে ১৯ নভেম্বর জালালাবাদ-কাবুল সড়ক ধরে কয়েকজন দুঃসাহসী সাংবাদিক এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তালিবান দস্যুর দল প্রেসের গাড়ি থামিয়ে চারজন সাংবাদিককে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনে। তারপর পাথর দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে তাঁদের চরম যন্ত্রণা দেয়। অবশেষে সেই অর্ধমৃত সাংবাদিকদের গুলি করে মেরে ফেলে তালিবান ঘাতকরা। তাঁরা হলেন রয়টার্সের অস্ট্রেলিয়ান ক্যামেরাম্যান হ্যারি বার্টন — Harry Burton, পাকিস্তানে কর্মরত রয়টার্সের ক্যামেরাম্যান আজিজ হায়দারি, মিলানের খবরে কাগজ কোরিয়ের ডেলা সেরা-র (Corriere della Serra) সাংবাদিক শ্রীমতি মারিয়া গ্রাজিয়া কুটুলি — Maria Grazia Cutuli এবং মাদ্রিদের এল মুনডো (El Mundo) কাগজের রিপোর্টার জুলিয়ো ফুয়েন্টেস — Julio Fuentes।

তারপর ২৭ নভেম্বর আফগানিস্তানের তালোকান (Taloqan) শহরে খুন হন উলফ স্ট্রমবার্গ (Ulf Stromberg)। তিনি এবং আরও কয়েকজন সাংবাদিক ওই শহরের একটি বাড়িতে বাসা নিয়ে কাজ করছিলেন। ডাকাতরা সেই বাড়িতে ঢুকে স্ট্রমবার্গের বুকে গুলি করে তাকে খুন করে।

আফগানিস্তানে তখন যুদ্ধের খবর যোগাড় করে তা প্রকাশনা বা সম্প্রচার কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য এলাহি আয়োজন করতে হয়েছিল। রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান, টেলিভিশনের জন্য ভিডিয়ো ক্যামেরাম্যান তো বটেই সেই সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং অনুবাদকদেরও দলে নিতে হয়েছিল। অনুবাদক ছাড়া কে বুঝবে স্থানীয় ভাষা ও উপভাষার কথাবার্তা? এবিসি নিউজের দলে ছিলেন সাংবাদিক ও কর্মী মিলিয়ে নয়জন মানুষ। তাঁদের দলপতি ছিলেন জিম উটেন — Jim Wooten।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দলে দলে সাংবাদিক পাকিস্তানের দিক দিয়ে জড়ো হচ্ছিলেন আফগানিস্তানের জালালাবাদে। তাঁদের সকলের লক্ষ্য তোরাবোরা অথবা কাবুল।

কাবুলে তালিবানদের আত্মসমর্পণ আসন্ন; তোরাবোরায় ওসামা বিন লাদেনের সন্ধান। কিন্তু কেউ কাউকে নিজের মতলব ভাঙছেন না। জালালাবাদের একমাত্র সরাইখানায় জিম উটেনের সঙ্গে মোলাকাত হয় গেল ওয়াশিংটন পোস্টের কিথ রিচবার্গের (Keith Richburg)। জিমকে হ্যালো, হাই করে কিথ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?

জিম বললেন, আপাতত এখানেই।

দিনটা ছিল ১৮ নভেম্বর। পরদিন সকলে যে যার যানবাহনে লটবহর ভরতি করে রওনা দিলেন কাবুলের দিকে। জিমের দলে নয়জন কর্মীর মধ্যে ছিলেন তিনজন প্রোডিউসার, দুজন ভিডিয়ো ক্যামেরাম্যান, দুজন অনুবাদক, গাড়ির চালক এবং জিম স্বয়ং। লটবহরের মধ্যে ছিল বই, মানচিত্র, ল্যাপটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, বিছানা, পিঠে ঝোলান বোঁচকা, ক্যামেরা, ক্যামেরা বসাবার তেপায়া, আলোর সরঞ্জাম, মাইক্রোফোন, অডিয়ো মিক্সচার, ফিউস, ব্যাটারি, চার্জার, জেনারেটার, ভিডিয়ো টেপ, স্যাটেলাইট ভিডিয়ো ফোন, খাবার, জল, ইলেকট্রিক তার ইত্যাদি। এবিসি নিউজের ভাড়া করা গাড়িতে যাত্রীর থেকে তখন মালপত্রই বেশি। তারই মধ্যে ঠাসাঠাসি করে এবিসি নিউজের ইউনিট চলল কাবুল। জালালাবাদ থেকে কাবুল গাড়িতে তিন ঘণ্টার পথ। ওই পথে তখন গাড়ি বলতে শুধুই 'প্রেস'।

এবিসি'র দক্ষিণ আফ্রিকান ভিডিয়ো ক্যামেরাম্যান টিম ম্যানিংকে জিম বলে দিয়েছিলেন, পথে জীবন্ত কিছু দেখলে ছবি তুলে নেবে। কিন্তু পথ তো জনশূন্য। ছবি তোলার উপাদান কোথায়? হঠাৎই ক্যামেরাম্যান চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বলল। তার কথায় গাড়ি থামালো চালক। টিম নেমে গেল ক্যামেরা বাগিয়ে। তার ক্যামেরার চোখ কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ের দিকে। তারা কয়েকটি অবাধ্য উটকে ঠিকানায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত মেয়েরাই জিতল। উটগুলি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল একটি টিলার আড়ালে।

ইতিমধ্যে তাদের থেমে থাকা গাড়িকে পেরিয়ে অন্যান্য সাংবাদিকদের গাড়ি এগিয়ে গেল ধুলোর ঝড় উড়িয়ে। ধুলো থিতোবার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করল এবিসি নিউজের গাড়ি। সেই ফাঁকে টিম দেখল, একজন লোক একটি দলছুট ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার পালের দিকে। টিমের ক্যামেরায় সেই দৃশ্যেরও কিছুটা অংশ বন্দি হল।

এইসব পর্ব মিটিয়ে এবিসি'র গাড়ি আবার চলতে শুরু করল কাবুলের পথে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আর একটা গাড়ি ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে এবিসি নিউজের গাড়ি থামিয়ে দিল। তারপর গাড়ির সামনের আসন থেকে এক যাত্রী নেমে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওদিকে আর এগিয়ো না। ওদের মেরে ফেলেছে। তোমরা গেলে তোমাদেরও মেরে ফেলবে।

লোকটি আফগান। তাকে শান্ত করে জানা গেল, তালিবান ঘাতকরা টাঙ্গি আব্রিসাম গ্রামের কাছে তিনটি গাড়ি থামিয়ে পাঁচজন বিদেশি সাংবাদিককে পিটিয়ে, পাথর দিয়ে থেঁতলে এবং গুলি করে মেরে ফেলেছে। পরে জানা গেল, পাঁচজন নয়, চারজন সাংবাদিক খুন হয়েছেন সেই গ্রামে। স্থানটি থেকে কাবুল মাত্র ৫০ মাইল দূরে। পঞ্চম সাংবাদিক এপি'র ক্যামেরাম্যান খালিদ কাজিহা (Khalid Kazziha) কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছে।

ওদিকে টাঙ্গি আব্রিসাম গ্রামের কঠিন প্রান্তরে সারা রাত পড়ে রইল নিহত চার সাংবাদিকের মরদেহ। কিন্তু যেসব সাংবাদিক বেঁচে ছিল মৃত সহকর্মীদের জন্য শোক করার, চোখের জল ফেলার অবকাশ তাদের ছিল না। জালালাবাদে ফিরে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সাংবাদিক নিধনের এই খবর যে যার কেন্দ্রে পাঠাতে।

রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সমর সংবাদদাতাদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হয়? কোন কোন বিশেষ গুণ থাকলে একজন দক্ষ সমর সংবাদদাতা হওয়া যায়?

এই দুটি প্রশ্নে ফরাসি ঔপন্যাসিক জুল ভের্ণ তাঁর মাইকেল স্টগফ : রাশিয়ার রাজদূত উপন্যাসে উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। ১৮৭৬ সালে তিনি উপন্যাসটি লিখেছিলেন।

উপন্যাসের দুটি আকর্ষণীয় পার্শ্ব চরিত্র দুই রিপোর্টার। একজন ইংরেজ, অন্যজন ফরাসি। প্রথমজন লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার। দ্বিতীয় কোন কাগজের লোক তা প্রকাশ করে না। কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করলে রহস্যের ভঙ্গিতে বলে, আমার বোন ম্যাডালিন, তার পক্ষ থেকে আমি সংবাদ শিকার করি। ইংরেজ সাংবাদিকের নাম হ্যারি ব্লাউন্ট, ফরাসি সাংবাদিকের নাম অলসাইড জোলিভেট। মস্কোয় ক্রেমলিন প্রাসাদে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে এইভাবে—

"তাদের চারদিকে নিত্য যা-কিছু ঘটছে কিছুই তাদের এড়িয়ে যেতে পারে না। ফরাসি লোকটির সদাজাগ্রত দৃষ্টি, এবং ইংরেজ ভদ্রলোকটির সকল ব্যাপারে কানদুটি সজাগ রাখবার অদ্ভুত ক্ষমতা। একজনের চোখে পৃথিবীর সবকিছুই যেন ধরা পড়ে এবং অপরজনের কানের কাছে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর সকল রকম গোপন মন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, ভালমন্দ ব্যাপার।

সাংবাদিক হিসাবে সংবাদ শিকারে তারা দুজনেই অতিরিক্ত উৎসাহী। কোন সূত্র পাওয়া গেল কি— অমনি তারা সচকিত হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ এবং সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে তারা কোন রকম বিপদ-আপদকেই গ্রাহ্য করে না, কিছুতেই বিচলিত হয় না। ঘোড়দৌড়ের জকি যেমন বাজিমাত করার জন্যে মরি-বাঁচি করে ঘোড়া ছুটোয়, কর্তব্যের ডাকে তাদেরও ছিল তেমনি মরি-বাঁচি মনোভাব।"

ক্রেমলিনে এক সান্ধ্য উৎসবে তাদের দুজনের মোলাকাত হল। অলসাইড বললেন, বোনকে আগেই জানিয়েছি, "এই বিরাট উৎসব গৃহের ভেতর এক টুকরো অদৃশ্য মেঘ ঘনিয়েছে; তারই কালো ছায়া পড়েছে মহামান্য জারের মুখের ওপর।"

হ্যারি বিষয়টা টের পেলেও প্রথমে লুকোতে চেষ্টা করল। বলল, কোথায় দেখলে কালো ছায়া? আমার কাছে তো বেশ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়।

হ্যারি ব্লাউন্টের চালাকি অলসাইড জোলিভেটের চোখ এড়াল না। হাসিমুখে সে বলল, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ডেলি টেলিগ্রাফের পাতায় উজ্জ্বল ভাষায় চালানো তোমার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

হ্যারি ব্লাউন্ট দমে গেল। বুঝতে পারল বৃথা চেষ্টা। তাই সে বলল, তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে, বিদ্রোহী দল সীমান্ত ও ইরকুটসক প্রদেশের টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে জানার পরও তিনি কেমন নির্বিকার ছিলেন।

অলসাইড এবার হো-হো করে হেসে উঠল, "ওহো, তা হলে তুমিও জেনে ফেলেছ?"

হ্যারি বলল, "নিশ্চয়।"

এবার আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাংবাদিকের দেখা পাব মস্কো-নিজনি নভগরড ট্রেনের দুটি কামরায়। দুজনেরই কানে যাচ্ছিল কামরার যাত্রীদের এলোমেলো কথাবার্তা। যাত্রীদের বেশির ভাগই ব্যাপারী। তারা চলেছে নিজনি-নভগরডের মেলায়।

একটি কামরার যাত্রী অলসাইড জোলিভেট আলাপ জমিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে খবরের রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হল। যাত্রীরা ভাবল, লোকটা হয়ত স্পাই। সঙ্গে সঙ্গে তারা মুখে কুলুপ এঁটে দিল।

জোলিভেট তাতে দমলেন না। চুপিসাড়ে নিজের ডায়েরিতে খবর লিখে ফেললেন।

যাত্রীরা ভারি সতর্ক। যুদ্ধের আলোচনায় খুব হুঁশিয়ার।

হ্যারি ব্লাউন্ট কিন্তু মুখটি বুজে যাত্রীদের কথা শুনে যাচ্ছে। তারা সবাই তাতার বিদ্রোহের টাটকা খবর নিয়ে আলোচনায় মত্ত। ব্লাউন্ট তাল বুঝে নোট করলেন, সহযাত্রী ব্যবসায়ীরা ভারি উদ্বিগ্ন। যুদ্ধের কথা ছাড়া তাদের মুখে অন্য কথা নেই।

এইভাবে দুই রিপোর্টার নানা বিপদ আপদের মধ্যে দিয়ে পৌঁছলেন ওমস্কের ভলিভান শহরের ফ্রন্টলাইনে। সেখানকার টেলিগ্রাফ অফিস থেকে হ্যারি ব্লাউন্ট লন্ডনে ডেলি টেলিগ্রাফে খবর পাঠালেন।

রাশিয়ান ও তাতার বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ। রাশিয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও নিদারুণ ক্ষতি। তাতারদের কামানের গোলায় দুটি গির্জায় আগুন লেগে গেছে। সে আগুন লকলকে শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণ দিকে।

ব্লাউন্টের পর প্যারিসে খবর পাঠালেন অলসাইড জোলিভেট, লোকজন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। রাশিয়ানরা পরাজিত। তাদের তাড়া করেছে তাতার সেনা। একটি ছয় ইঞ্চি গোলা এইমাত্র টেলিগ্রাফ অফিসের দেওয়াল ভেঙে দিল। এমন গোলা আরও বিস্ফোরিত হতে পারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গুলি লেগে পড়ে গেলেন লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের বিশেষ সংবাদদাতা হ্যারি ব্লাউন্ট। এমন বিপদেও অবিচলিত অলসাইড জোলিভেট খবর পাঠিয়ে যাচ্ছেন, গুলি লেগে ডেলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা হ্যারি ব্লাউন্ট এইমাত্র আহত হয়ে পড়ে গেলেন।

খবরের এই অংশটুকু পাঠিয়েই টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানিবাবু ঘোষণা করলেন, না আর হবে না। লাইন কেটে গেল।

এই না বলে কেরানিবাবু আলনা থেকে টুপিটি পেড়ে জামার আস্তিন দিয়ে দু'বার ঝেড়ে জানলা ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তাই দেখে আহত হ্যারিকে কাঁধে তুলে চম্পট দেবার চেষ্টা করলেন অলসাইড জোলিভেট। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে একদল তাতার বিদ্রোহী হুড়মুড় করে টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকে পড়ে বন্দি করল দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিপোর্টারকে।

রাশিয়ার রাজদূতের অভিযান শেষ হল তাতার বিদ্রোহীদের পরাজয়ে। বিজয় উৎসবের সমারোহের খবরও হ্যারি ব্লাউন্ট এবং অলসাইড জোলিভেট বিশদভাবেই পাঠালেন তাঁদের অফিসে।

তারপরেই তাঁদের কাছে নির্দেশ এল, পিকিঙ রওনা হও। সেখানে একটা জটিল সমস্যার জট পাকিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর সংগ্রহের নেশায় দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী হাত ধরাধরি করে রওনা দিলেন চিনে।

৫.২.৯ অবর সম্পাদক

এই অনুচ্ছেদে আমরা Sub-Editor কে অবর সম্পাদক না বলে সাব-এডিটর বলেই উল্লেখ করব। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Sub-Editor means a person who receives, selects, shortens, summarises, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions."— অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খবর গ্রহণ করেন, ছাপার জন্য খবর বাছাই করেন, খবর ছোট করেন, তার সারাংশ লেখেন, সম্প্রসারিত করেন, তরজমা করেন, সম্পাদনা করেন, খবরের শিরোনাম লেখেন এবং এর মধ্যে কয়েকটি কাজ অথবা সবগুলি কাজ করেন, তিনি সাব-এডিটর। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ না থাকলেও প্রয়োজনে কপি নতুন করে লিখতে পারেন সাব-এডিটর।

সাব-এডিটরের কাজের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সাব-এডিটরের কাজ খবর গ্রহণ করা। স্টাফ রিপোর্টার বা স্থানীয় সংবাদদাতারা যে সব খবর পাঠান তা সবই সাব-এডিটরের হাতে পৌঁছয়। প্রতিদিন তাঁর হাতে নানা বিষয়ে অনেক খবর আসে। তাঁকে সেগুলি পড়তে হয়। প্রথম দফার পড়ার উদ্দেশ্য হল পরদিনের কাগজের জন্য কোন কোন খবর নেবেন তা বাছাই করা। খবরের গুরুত্ব এবং তা কখন ঘটল ও কোন সময়ে তা ডেস্কে পৌঁছাল তা বিচার করে ছাপার ব্যাপারে খবরের অগ্রাধিকার স্থির করেন সাব-এডিটর। সাধারণত বাসি খবর ও এঁটো খবর তিনি বাজে কাগজের ঝুড়িতে নির্বাসন দেন। দিনের খবর দিনের মধ্যে না এলে বাসি হয়ে যায়। অন্য কাগজে আগেই বেরিয়ে যাওয়া খবর এঁটো খবর বলে বিবেচিত হয়।

রিপোর্টারের লেখা খবর সাব-এডিটরের পছন্দ না হলে তিনি তা নতুন করে লেখেন (Rewrite)। নতুন করে লেখার পর যা দাঁড়ায় তা রিপোর্টারের পছন্দ না হতেও পারে। তেমন অবস্থা প্রায়ই হয়। তাই রিপোর্টারের সঙ্গে সাব-এডিটরের বন্ধুত্ব হওয়া শক্ত।

রিপোর্টারের কপি পড়ে সাব-এডিটর মনে করতে পারেন, রিপোর্টার খবরটি ঠিকভাবে লিখতে পারেননি।

মুখবন্ধ ঠিক হয়নি। বিশদ বিবরণেও নানা অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর বিবরণ ও ব্যক্তিগত মন্তব্য অনুপ্রবেশ করেছে। তার ওপর এই খবরটির যতটা স্থান প্রাপ্য তার থেকে লেখাটি বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় রিপোর্টারের কপিটি সাব-এডিটর নতুন করে লিখে ফেলেন। সেটাই তাঁর কাজ। একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। নিচে উদ্ধৃত খবরটি মন দিয়ে পড়ুন—

পরীক্ষককে ফাঁসাতে ছাত্রীর খাতা লোপাট

হিংসা অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশ যাই হোক, তা মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই ঘটনা হতেই পারে। পরীক্ষক শিক্ষিকাকে জব্দ করতে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আস্ত খাতা লোপাট করে দিয়ে 'দারুণ' এক চাল চেলেছিলেন প্রধান পরীক্ষক। ফাঁসিয়েও প্রায় দিয়েছিলেন পরীক্ষককে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধরা পড়ে গিয়েছেন প্রধান পরীক্ষক। পরীক্ষার্থীও পেয়েছে তার প্রাপ্য নম্বর। সেই প্রধান পরীক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরিয়েছে পর্ষদ। সভাপতি হরপ্রসাদবাবু জানিয়েছেন, 'ইংরেজির প্রধান পরীক্ষক সুসন্তোষকুমার দাসকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইতিমধ্যেই আমরা দিয়েছি। সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেছে। এরপরও উনি উত্তর না পাঠালে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব।' এই ঘটনা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীসহ প্রশাসনের সব স্তরেই সভাপতি কথা বলছেন। অভিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক সুসন্তোষবাবু বলেছেন, 'এনিয়ে আমি কিছু বলব না। যা বলার পর্ষদ বলবে।'

পর্ষদের কথায়, অভিনব ঘটনা। বিগত ৫২ বছরে এরকম ঘটনার নজির খুবই কম আছে। বারাসতের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বচ্ছশিলা বসুর কাছে ২০০২ সালের মাধ্যমিকের ইংরেজি পত্রের খাতা গিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্বচ্ছশিলাদেবী খাতা দেখে জমা দেন প্রধান পরীক্ষকের কাছে। নিয়মানুযায়ী কত খাতা জমা দিলেন আর 'রিসিভ কপি' তুলে দিতে হয় পরীক্ষকের হাতে। কিন্তু স্বচ্ছশিলাদেবী পর্ষদকে যা জানিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে বারবার চাওয়ার পরও প্রধান পরীক্ষক তা দেননি। এরপরই দিন সাতেক বাদে প্রধান পরীক্ষক স্বচ্ছশিলাদেবীকে ফোন করে বলেন, একটা খাতা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। স্বচ্ছশিলাদেবীর কাছে থেকেই নাকি খোয়া গিয়েছে। একাধিকবার ফোন করেই তাঁকে এই কথা বারবার বলেন প্রধান পরীক্ষক।

এরই মধ্যে নম্বরের তালিকা অথবা 'অ্যাওয়ার্ড লিস্ট' প্রধান পরীক্ষক জমা দিয়ে আসেন পর্ষদে। এখানেও একটু অসততার আশ্রয় নেন প্রধান পরীক্ষক। প্রত্যেক প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক এবং ট্যাবুলেটরের কাছেই কম্পিউটারে তৈরি রোল নম্বর ছাপানো অ্যাওয়ার্ড লিস্ট পাঠানো হয়। তাতেই নম্বর লিখে জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু প্রধান পরীক্ষক হাতে লেখা অ্যাওয়ার্ড লিস্ট জমা দেন পর্ষদে। স্বচ্ছশিলাদেবী যে খাতাগুলি দেখেছিলেন তার একটার পাশে লেখা ছিল 'নট ফাইন্ড'। অর্থাৎ খাতা হারিয়ে গিয়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে স্বচ্ছশিলাদেবী গোটা ঘটনা জানিয়ে চিঠি দেন পর্ষদে। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় মেদিনীপুরের শালবনী নীচু নৌসারি গার্লস হাইস্কুলের তন্দ্রা বসুর ফলাফল অসমাপ্ত। মার্কশিটে ইংরেজিতে লেখা অনুপস্থিত।

শুরু হয়ে যায় হৈচৈ। সভাপতি দু'জনকেই ডেকে পাঠান। পরীক্ষক আসল অ্যাওয়ার্ড লিস্ট জমা দেওয়ার পরই দেখা যায় তন্দ্রা বসু আসলে পেয়েছে ৩০ নম্বর। গত মাসে তন্দ্রাকে নতুন মার্কশিট তুলে দিয়েছে পর্ষদ। সভাপতির কথায়, 'গোটা ঘটনা দুঃখজনক, শিক্ষক সমাজের কাছে লজ্জাজনক। এরকম ঘটা একজন শিক্ষক হয়ে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কেন উনি এই কাজ করলেন তা আমরা বুঝতেও পেরেছি। তবে ওনার উত্তর পাওয়ার পরই তা বলব। ৩১ জুলাই ওঁকে শোকজ করা হয়েছে।'

স্বচ্ছশিলাদেবীর বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয় তিনি নেই। কিন্তু গোটা ঘটনা সত্যি বলে তাঁর তরফে জানানো হয়েছে।

এই কপিটি যোগ্য সাব-এডিটরের হাতে পড়েছিল কিনা তা জানা যাচ্ছে না। আমরা ধরে নিচ্ছি তা পড়েনি। পড়লে কপিটি অবশ্যই নতুন করে লেখা হত।

যোগ্য সাব-এডিটর খবরের প্রথম বাক্যটি সবার আগে কেটে দিতেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্য দুটিরও ছুটি নেবার কথা। তিনি খবরটি নতুন করে লিখলে তা এই রকম হতে পারত—

ছাত্রীর খাতা লোপাট, তদন্তে পর্ষদ

২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক ছাত্রীর ইংরেজির খাতা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে তদন্ত করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষকের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। পর্ষদ সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত প্রধান পরীক্ষকের জবাব পাওয়ার পর তা বিবেচনা করা হবে।

পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, বারাসাত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বচ্ছশিলা বসু এক দফা খাতা পরীক্ষা করেন। খাতাগুলি ফেরত পাবার পর প্রধান পরীক্ষক সুসন্তোষ কুমার দাস জানান, তিনি একটি খাতা পাননি। স্বচ্ছশিলা দেবী দাবি করেন, তিনি সব খাতা ফেরত দিয়েছেন।

এই বিরোধ পর্ষদে পৌছলে খোঁজখবর শুরু হয়। অবশেষে জানা যায় ছাত্রীটি ইংরেজিতে ৩০ নম্বর পেয়েছে। তখন তাকে নতুন মার্কশিট দেওয়া হয়েছে।

এমন ঘটনা কি ভাবে ঘটল এবং এর জন্য কে দায়ী তা নিয়ে পর্ষদ তদন্ত করছে। এই ব্যাপারে প্রধান পরীক্ষক কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে স্বচ্ছশিলা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

সাব-এডিটরের হাতে রিপোর্টারের লেখা খবরটির এই পরিবর্তিত রূপ দেখে তিনি খুশি হবেন কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ বিষয়। সাব-এডিটরের দ্বারা পুনর্লিখিত কপিটি চিফ সাব আরও ছোট করে দিতে পারেন। শেষ অনুচ্ছেদটি তিনি অনায়াসে বাদ দিতে পারেন। কারণ প্রথম অনুচ্ছেদেই তদন্তের ইঙ্গিত রয়েছে। খবরে পুনরাবৃত্তি সব সময় বর্জনীয়।

মূল খবরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যগুলি ছেঁটে ফেলে বাদ দেওয়ার কারণ হল, বক্তব্যের বিষয়বস্তু রিপোর্টারের নিজস্ব মন্তব্য, একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট। লেখার মধ্যে দিয়ে বিনা প্রমাণে পরীক্ষককে বাঁচাতে প্রধান পরীক্ষককে খলনায়ক সাজানো হয়েছে। রিপোর্টে এই সব কেরামতি চলে না। তা সব সময় বর্জনীয়। সেই অপ্রীতিকর কাজটি করতে হয় সাব-এডিটরকে। তা না করলে সাব-এডিটর দোষী হবেন।

রিপোর্টারের অজ্ঞতা এবং সাব-এডিটরের অসতর্কতায় শব্দ প্রয়োগে ভুলের একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। 'খ' কাগজে ২-৮-২০০২ তারিখে এই খবরটি বেরিয়েছিল—

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : অতিরিক্ত পণের টাকার দাবিতে বিয়ের তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেলুড়ের এক যুবককে শুক্রবার সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল হাওড়া জেলার প্রথম অতিরিক্ত দায়রা আদালত।

রিপোর্টারের দেওয়া এই কপি পড়ে সাব-এডিটরের বোঝা উচিত ছিল তথ্যে মারাত্মক ভুল আছে। রিপোর্টারকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে সাব-এডিটরের বলা উচিত ছিল, "কিসসু হয়নি। কপি ঠিক করে দিন। একটা সামান্য ব্যাপারও যদি না জানেন তাহলে রিপোর্টার হন কেন? যান, কপি নতুন করে লিখে আনুন।"

সন্দেহ নেই, সাব-এডিটরের কথাগুলি খুবই কড়া। কিন্তু, কথাগুলি সবই ঠিক। আপনি বুঝতে পারছেন ভুলটা কী ?

আমি আপনাকে সাহায্য করছি। দেখুন, কপিতে লেখা হয়েছে, 'আদালত সাজা দিয়েছে, "স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে"।

ভুলটা এখানেই হয়েছে। আদালত কোন অভিযোগে কাউকে কখনও সাজা দেয় না, দিতে পারে না। আইন সে অধিকার কাউকে দেয়নি। কোন ব্যক্তির নামে কোন অভিযোগ থাকতেই পারে। তা নিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলাও হতে পারে। সেই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতেও পারে। আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে অভিযুক্তকে সসম্মানে মুক্তি দিতে পারে। আর, বিচার করে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যই অপরাধী তাহলে আদালত তাকে সাজা দেবে।

এই রিপোর্টে সে কথাই লিখতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞতাবশত রিপোর্টার 'অপরাধে' না লিখে 'অভিযোগে' লিখে কাজ সেরেছেন। এই অপরাধেই তাকে অতগুলি কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন সাব-এডিটর। তা করে তিনি ঠিকই করেছেন। আর এই রকম ঘটনা ঘটে বলে সাব-এডিটরদের সঙ্গে রিপোর্টারদের বনিবনা হয় না।

এবার আপনি নিচের খবরটি পড়ুন। খবরটি ৩১-৮-২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে প্রকাশিত হয়েছে—

লিয়েন্ডারের সঙ্গিনী মার্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার : বছর তিনেক আগে গ্র্যান্ড স্লামে লি-হেশ জুটির দাপট দেখে তিনি দ্বিতীয়জনকে বেছে নিয়েছিলেন সে বারের উইম্বলডন মিক্সড ডাবলসে তাঁর সঙ্গী হিসাবে। এ বার তিনি, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মিক্সড ডাবলসে নামছেন বাঙ্গালোরের পরিবর্তে কলকাতার ছেলেকে নিয়ে।

লিয়েন্ডার পেজ-নাভ্রাতিলোভা জুটি ভারতীয় সময় শনিবার ভোরে প্রথম রাউন্ডে খেলবেন শীর্ষ বাছাই অস্ট্রেলীয় জুটি টড উডব্রিজ-রেনে স্টাবের বিরুদ্ধে। চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও তিনি নাভ্রাতিলোভা বলেই এই ম্যাচ সংগঠকরা রেখেছেন ফ্লাশিং-মিডোর ঐতিহ্যময় গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে। মিক্সড ডাবলসের ক্ষেত্রে যা সচরাচর ঘটে না।

নিউইয়র্কে যোগাযোগ করে অবশ্য জানা যাচ্ছে, মেয়েদের টেনিসের কিংবদন্তী খেলোয়াড় যেমন মহেশের ফর্মে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে পার্টনার বেছেছিলেন, লিয়েন্ডারের ক্ষেত্রে ঠিক তার ঠিক উল্টো। এ টি পি ট্যুর ডাবলসে লিয়েন্ডারের ফর্ম ইদানীং খারাপ যাওয়ায় গ্র্যান্ড স্লাম মিক্সড ডাবলসে তাঁর নিয়মিত পার্টনার লিজা রেমন্ড এ বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে মাইক ব্রায়ানকে নিয়ে খেলছেন। তাঁর ও লিজার জুটির এই মুহূর্তে বাছাইয়ের মর্যাদা পাওয়া কঠিন হবে বলে প্রাক্তন উইম্বলডন জুটি পেশাদারি কারণেই ফ্লাশিং মিডোতে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। লিজা-মাইক জুটি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে দ্বিতীয় বাছাই। কিন্তু লিয়েন্ডারও এমন একজনকে কোর্টে সঙ্গিনী পাচ্ছেন, যাঁর সঙ্গে খেলার সুযোগ ঘটায় মহেশ একদা বলেছিলেন, "নাভ্রাতিলোভার পাশে খেলার অভিজ্ঞতা আমার টেনিসজীবনের অন্যতম সেরা সম্পদ হয়ে থাকল।" তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, বছর তিনেক আগে উইম্বলডনে নাভ্রাতিলোভার প্রথম পছন্দ ছিলেন নাকি লিয়েন্ডারই। কিন্তু সে বার লিজাকে আগেই কথা দিয়ে ফেলায় লি-র পক্ষে মার্টিনার সঙ্গী হওয়া সম্ভব হয়নি।

কোন দক্ষ সাব-এডিটর এইভাবে কপিটি ছাড়তেন না। কারণ এর মুখবন্ধ নিয়ম মেনে লেখা হয়নি। তাই তিনি প্রথমেই মুখবন্ধটি ছাঁটাই করে দিতেন। কপিটি নতুন করে লিখলে তা এইরকম দাঁড়াতে পারত—

মার্টিনার জুটি লিয়েন্ডার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের মিক্সড ডাবলসে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার জুটি হচ্ছেন লিয়েন্ডার পেজ। শনিবার ভোরে মার্টিনা-লি জুটির প্রথম রাউন্ডের লড়াই শীর্ষ বাছাই অস্ট্রেলীয় জুটি টড উডব্রিজ-রেনে স্টাবের সঙ্গে।

তিন বছর আগেই আন্তর্জাতিক টেনিসের কোর্টে এই ভারত-মার্কিন যুগলবন্দী হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে বার লি আগেই লিজা রেমন্ডের জুটি হবেন বলে কথা দিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তখন লি-র পক্ষে মার্টিনার জুটি হওয়া সম্ভব হয়নি।

এ বার তা সম্ভব হওয়ায় টেনিসপ্রেমীরা একটি ঐতিহাসিক ম্যাচ দেখার আশায় উদগ্রীব হয়ে আছেন।

একই খবর 'ক' কাগজে কত চমৎকারভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে তা দেখুন—

Paes teams up with Navratilova

Leander Paes will team up with Martina Navratilova of USA in the mixed doubles. The Indo-American due will open against Rennae Stubbs and Todd Woodbridge of Australia. Mahesh Bhupati and Elena Likhovtseva of Russia will play against the pair of Iroda Tulyaganova of the Uzbekistan and Cyril Suk of Czech Republic.

Agencies

একই বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি খবর দুটি কাগজে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনামূলক বিচার করলে আপনি নিজেই বুঝতে প্যারবেন সুসম্পাদনা কাকে বলে। দক্ষ ও যোগ্য সাব-এডিটরই বা কাকে বলা যায়। আমার মতে, ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত খবরটি নিশ্চিতভাবেই সুসম্পাদিত।

সাব-এডিটরের কাজ কপি ঠিক করা। কাগজের পাতার সংখ্যা ও প্রকাশের সময়ের ওপর সেই কাগজে কতজন সাব-এডিটর দরকার তা নির্ভর করে। একটি Tabloid — ট্যাবলয়েড মাপের সান্ধ্য দৈনিকের পক্ষে চার পাঁচজন সাব-এডিটরে কাজ চালান যায়।

একটি ছয় পাতার Broadsheet — ব্রডশিট প্রভাতী দৈনিক পাঁচ ছ'জন সাব-এডিটর দরকার হয়। এই হিসাবে আট দশ বা বারো পাতার পুরো মাপের প্রভাতী দৈনিকে প্রত্যেক শিফটে গড়ে আট থেকে দশ জন সাব-এডিটর নিযুক্ত করতে হয়।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজ যথা আনন্দবাজার পত্রিকা, নবভারত টাইমস (হিন্দী), তান্থি (তামিল), ইনাড়ু (তেলেগু), মালয়ালা মনোরামা (মালয়ালাম) প্রভৃতি কাগজের সাব-এডিটরদের একটা কাজ সংবাদ সংস্থার পাঠান কপি তরজমা করা। আর একটা কাজ রিপোর্টারদের কপির বিষয়বস্তুর ভুল ঠিক করে দেওয়া।

তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়, নাম, স্থান, সংখ্যা যাতে নির্ভুল হয়। বাক্যগঠন ও বানান নির্ভুল করাও তাঁর কাজ। বেআইনি কোন বিষয় লেখা হল কিনা তা লক্ষ্য রাখাও তাঁর কর্তব্য।

এই সব দায়িত্ব সামলাবার পর তিনি শিরোনাম লিখে তা কি মাপে ও কোন টাইপে ছাপা হবে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেবেন। হাই-টেক যুগে অবশ্য এই পদ্ধতি অচল হয়ে গেছে। এখন মাপ ও টাইপের ব্যাপারটা ছাপাখানায় পাঠাবার দরকার হয়না। সাব-এডিটররাই নিজ নিজ কম্পিউটারে এই কাজ সম্পন্ন করেন। যে খবরের কাগজে সেই সুযোগ নেই সেখানে অবশ্য সম্পাদিত কপি কম্পিউটার রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে সাব-এডিটরদের কাজ সারতে হয়। তা না হলে কাগজ ছাপায় দেরি হয়ে বন্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে।

তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে রিপোর্টারদের কপি বারবার নানাভাবে পরীক্ষা করা সাব-এডিটরদের বড় দায়িত্ব। তা না হলে রামের জীবনাবসান হলে সেই খবরের সঙ্গে শ্যামের ছবি ছাপা হওয়ার মত কেলেঙ্কারি ঘটা অসম্ভব নয়। কিম্বা নবনির্বাচিত সাংসদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চিত্রাভিনেত্রীকে সংসদের স্ত্রী বলে ক্যাপশন লেখার গলদও ঘটে যেতে পারে। বাস্তবে, সিপিআইএম নেতা পি রামমূর্তির মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে ওই পার্টির এক জীবিত নেতার ছবি ছেপেছিল কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিক। কর্নাটক থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভা

সাংসদ বিজয় মালিয়ার ছবিতে দৃশ্যমান এক মহিলাকে তাঁর স্ত্রী বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। ঐ মহিলা আসলে ছিলেন এক চিত্রাভিনেত্রী।

সাব-এডিটরদের এই রকম গাফিলতির জন্য সম্পাদককে কাগজের পরের সংখ্যায় ভুল সংশোধন ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

৫.২.১০ প্রতিবেদক ও সংবাদদাতা

প্রথমেই জানাই, এই বইয়ে আমরা এরপর থেকে প্রতিবেদক কথাটি ব্যবহার না করে তাঁকে রিপোর্টার বলেই উল্লেখ করব।

১.২.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "Reporter means a person who gathers and presents news at a particular centre"— অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে খবর যোগাড় করেন এবং প্রদান করেন তিনি রিপোর্টার।

এখন শব্দগত অর্থে রিপোর্টারের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা গেল। লক্ষ্য করলে দেখবেন রিপোর্টার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে কাজ করেন। তাঁর কাজ খবর যোগাড় করা এবং সংগ্রহ করে খবর ছাপার যোগ্য করে লিখে ফেলা।

এক্ষেত্রে বিশেষ কেন্দ্রটি হল কাগজটির প্রকাশনাস্থল। ধরুন কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'ক' নামে একটি খবরের কাগজ। সেই অফিসে যুক্ত থেকে যাঁরা খবর যোগাড় ও যোগান দেবার কাজ করেন তাঁরা সেই কাগজের রিপোর্টার।

তাঁরা কী করেন? খবর যোগাড় করে, লিখে, যোগান দেন। আপনারা দ্বিতীয় পত্রের প্রথম পর্যায়ের (Module) ১ এককে খবর কাকে বলে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নিয়েছেন। সুতরাং আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি না। আমি শুধু আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, রিপোর্টারকে সব সময় মনে রাখতে হয়, "খবরের কাগজ কী, খবর কী?"

সেই সঙ্গে আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, খবরের একটি সংজ্ঞা হল, "News is something which actually happened and which we learn about for the first time." — যা বাস্তবে ঘটেছে সে বিষয়ে প্রথম জানতে পারাই খবর। বিষয়টি কোন দুর্ঘটনা হতে পারে, কোন অস্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য, বিবৃতি, ঘোষণা, সিদ্ধান্ত, অভিযোগ, প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া হতে পারে। রিপোর্টার এই ধরনের বিষয়ের বিবরণ যোগাড় করে তা চটপট লিখে ফেলে চিফ রিপোর্টারের হাতে দেন।

বাস্তবে আমাদের চার পাশে, জগৎ সংসারে প্রতিনিয়ত অনেক কিছু ঘটে চলেছে, অনেকে অনেক কথা বলে চলেছেন। তার সবই কিন্তু খবর বলে গণ্য হয় না। তার মধ্যে শুধু যেগুলি জানার জন্য কিছু মানুষের, অনেক মানুষের, বহু মানুষের কৌতূহল এবং আগ্রহ আছে সেগুলি খবর বলে বিবেচিত হয়। এই ধরনের বিষয়গুলি চিনে নেবার মত চোখ, কান ও নাক থাকলে তবেই একজন পাকা রিপোর্টার হওয়া যায়। একে বলে খবর চেনার জ্ঞান বা News sense।

রিপোর্টারকে একরকম খবর নিয়ে যেতে থাকলে চলে না। তার কাছে খবরের রকমফের আছে —

প্রত্যাশিত খবর এবং অপ্রত্যাশিত খবর। কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে সভা হবে, মিছিল হবে, ধরনা হবে, অবরোধ হবে, সাংবাদিক সম্মেলন হবে, পরীক্ষার ফল ঘোষণা হবে, পরীক্ষা নেওয়া হবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শহরে আসবেন, তিনি কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এই রকম অনেক কিছু ঘটনার খবর রিপোর্টার যোগাড় করেন ও লেখেন। এর মধ্যে সবগুলির প্রত্যাশিত খবরের পর্যায়ে পড়ে।

এর বাইরে যা যা ঘটে সে সব অপ্রত্যাশিত খবরের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা, মৃত্যু ইত্যাদি। আগে থেকে বলে কয়ে কোথাও আগুন লাগে? লাগে না। আগে থেকে জানান দিয়ে দুটি গাড়িতে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে? লাগে না। আগে থেকে ঘোষণা করে কেন বিশিষ্ট বা অতিবিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়? হয় না। এর সবকিছুই ঘটে যায় হঠাৎ। সেই জন্যই এগুলি অপ্রত্যাশিত খবর।

অপ্রত্যাশিত খবরের গুরুত্ব, বলা ভাল চমক, প্রত্যাশিত খবরের তুলনায় বেশি। সুতরাং এইরকম খবরের বিস্তারিত বিবরণ পাঠক বেশি করে জানতে চায়। তার তৃষ্ণা মেটাবার দায়িত্ব রিপোর্টারের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।

আবার প্রত্যাশিত ঘটনাও অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নিতে পারে। প্রত্যাশিত ঘটনার ঝড় তোলা অপ্রত্যাশিত পরিণতিও সময় সময় ঘটে যায়। তার মধ্যে তো কোন কোন প্রত্যাশিত ঘটনার অপ্রত্যাশিত পরিণতি দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দেয়। যেমন ধরুন, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারির শীতার্ত অপরাহ্নে যে সব রিপোর্টার দিল্লিতে গান্ধীজির প্রার্থনা সভার খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা কি জানতেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে নাথুরাম গড়সে নামে এক আর এস এস স্বেচ্ছসেবকের পিস্তলের গুলিতে কি ঘটতে যাচ্ছে?

১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর দ্বিপ্রহরে যে সব সাংবাদিক ডালাস শহরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন ফিৎজেরল্ড কেনেডির সরকারি সফর রিপোর্ট করেছিলেন তাঁরা কি কেউ জানতেন লি হার্ভে অসওয়াল্ড নামে এক প্রাক্তন নৌসেনার টেলিস্কোপিক রাইফেল থেকে নিক্ষিপ্ত মৃত্যুদূত কোন লক্ষ্যকে বিদীর্ণ করতে যাচ্ছে?

১৯৭২ সালের ১৭ জুন তারিখের ওয়াশিংটন পোস্টের ম্যানেজিং এডিটর হাওয়ার্ড সাইমনসের ঘুম ভাঙাল টেলিফোনের ঝনঝন শব্দ। তিনি তখন কি বুঝেছিলেন এই ঘণ্টাধ্বনিতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের ক্ষমতার মৃত্যুঘণ্টা বাজছে? তখন তিনি শুধু জেনেছিলেন, ওয়াটারগেট আবাসনে ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী দফতরে রাত আড়াইটায় সিঁধ কেটে চুরির চেষ্টা হয়েছিল। পাঁচজন চোর ধরাও পড়েছে। এই সিঁধেল চুরির ঘটনার পিছু ধাওয়া করে পোস্টের কয়েকজন রিপোর্টার ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ফাঁস করে নিক্সনকে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছিলেন।

১৯৯১ সালের ২১ মে মধ্যরাতে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুর গ্রামে রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী সভার খবর যে সব রিপোর্টার কভার করার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিলেন ধানু নামে এল টি টি ই'র এক মানবী বোমা আর কয়েক মুহূর্ত পরে কি মহা সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে?

প্রত্যাশিত ঘটনা কি ভাবে কোন আগাম আভাস না দিয়ে আচমকা অপ্রত্যাশিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় সে সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা দেবার জন্য ঐ তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

রিপোর্টারদের মধ্যে কয়েকজন রুটিন অনুযায়ী অফিসে বসে থাকেন। বাকিরা বেরিয়ে পড়েন যে যা নির্দিষ্ট কাজে। যারা অফিসে থাকেন তাঁরা শুধুই আড্ডা মেরে কালক্ষেপ করেন না। ফোনের পর ফোন করে

নানা সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। কোন সূত্র থেকে কোন খবরের আঁচ পেলেই সেখানে ছুটে যান। কাজের সময় রিপোর্টারদের হাঁটলে চলে না, ছুটতে হয়।

খবর যোগাড় করতে যে সব রিপোর্টার বাইরে যান তাঁরা কাজ মিটলেই অফিসে ফিরে আসেন। সাধারণত সন্ধ্যার মধ্যে তাঁরা অফিসে ঢুকে পড়েন। ওপরওলারাও দেরি না করে রিপোর্টারদের কাছ থেকে খবরের রূপরেখা জেনে নেন। সেই পর্ব মিটলে রিপোর্টাররা যে যার খবর লিখতে বসে পড়েন।

শুধু ভাল খবর যোগাড় করেই রিপোর্টারের কাজ শেষ হয় না। তা ভালভাবে লেখার বিদ্যাও তাঁর থাকা দরকার। ১৫-৫-২০০ তারিখে 'খ' কাগজে প্রকাশিত এই রিপোর্টটি দেখুন—

হেদুয়ার সুইমিং পুলে কিশোরী সাঁতারুর ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: মঙ্গলবার সকালে উত্তর কলকাতার হেদুয়ার (আজাদ হিন্দ বাগ) সুইমিং পুলে এক কিশোরী সাঁতারুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। পূজা জালান (১৫) নামে নবম শ্রেণীর ওই ছাত্রী গত চার বছর ধরে ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। সে প্রতিদিন হেদুয়ায় সাঁতার কাটত। এদিনও ভোর ৫টা নাগাদ পূজা তার তিন বোনকে নিয়ে জলে নামে। ৬টা সময় তিন বোন জল থেকে উঠে পড়লেও সে ওঠেনি। এরপর খোঁজা-খুঁজি শুরু হয়। অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেনাররা ব্যর্থ হলে কুমোরটুলি থেকে ডুবুরিরা এসে বেলা ১০টা নাগাদ প্রায় ১৫ ফুট জলের তলা থেকে পূজার দেহ উদ্ধার করে।

হেদুয়ার সুইমিং পুলে এর আগে ক্লাব সদস্য কোনও পাকা সাঁতারুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়নি। শহরে অন্যান্য সুইমিং পুলেও এই ধরনের ঘটনার কথা বিশেষ শোনা যায়নি। ফলে এই ঘটনাকে নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে সব ছোট ছেলে মেয়ে হেদুয়ায় সাঁতার শিখতে যায়, তাদের অভিভাবকরা এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাব ঘরের সামনে কিছু অভিভাবক এদিক বিকালে কার্যত বিক্ষোভ দেখান। হেদুয়ার তিনটি সাঁতার ক্লাবই এদিন সাঁতার বন্ধ রাখে।

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাসিন্দা পূজা ৯৯ সালে প্রশিক্ষণ শেষ করে সাঁতারুর স্বীকৃতি পায়। তার এই মৃত্যুকে ঘিরে নানান অভিযোগ উঠেছে। বাড়ির লোকের অভিযোগ, সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের অবহেলার জন্য তার মৃত্যু হয়েছে। সাঁতার কাটার সময় ট্রেনার ঠিকমতো নজর রাখেননি। ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সনৎ ঘোষ অবশ্য এই অভিযোগ স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, সম্ভবত জলের মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পূজার মৃত্যু হয়েছে। সুরেশবাবু অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর ভাইঝি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। ডি সি ডি ডি (১) সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস দায়ের করা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী ধাপের তদন্ত হবে। পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদেরও জেরা করেছে।

পূজার বাড়ির লোকের অভিযোগ, পুল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়না। জলে কাদা-মাটি ও আগাছা আছে। তাতে আটকে মৃত্যু হতে পারে। পুলের তলায় কোনও জাল ছিল না। নিজস্ব ডুবুরি না থাকায় দেহ তুলতে দেরি হয়েছে। আগে তুললে হয়ত বাঁচানো যেত। তাঁদের আরও অভিযোগ, ট্রেনার থাকলেও তাঁরা বিশেষ নজরদারি রাখেন না। সাঁতার শুরু ও শেষ করার সময় যে সই করানোর কথা তা করানো হয় না। সনৎবাবু অবশ্য এই সব বলেছেন, যারা সাঁতারু হয়ে যায়, ট্রেনার তাদের ওপর নজর রাখের না। পুকুরের জল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। তাই আগাছা বা কাদায় আটকে মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

ওপরের খবরটি একটি মোটামুটি আদর্শ রিপোর্ট বলে বিবেচনা করা যায়। শিরোনামেই স্পষ্ট 'কী' ঘটেছে। তারপর রয়েছে সংবাদের পরিভাষায় মুখবন্ধ। 'কবে', 'কখন', 'কোথায়' এবং 'কী' এই চারটি প্রশ্নের

জবাব মুখবন্ধের প্রথম বাক্যটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে নিহত কিশোরীটির বয়স উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে সে কত বছর ধরে সাঁতার কাটছে। এই দুটি প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাঁতার না-জানা একটি ছেলে বা মেয়ে জলে ডুবে মারা গেলে তাকে একটি দুর্ঘটনা বলে ধরা যেত। কিন্তু সাঁতার জানা একটি পনের বছর বয়সের মেয়ে জলে জুবে মারা গেলে সেটি নিছক দুর্ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যাবে না। তার সঙ্গে এক বা একাধিক ব্যক্তির কর্তব্যে অবহেলার প্রসঙ্গও এসে যাবে। খবরে জানানো হয়েছে, এ ক্ষেত্রে মৃত কিশোরীর বাড়ির লোকেরা সেই অভিযোগই করেছেন।

এখানেই খবরটি শেষ হয়নি। তা হলে খবরটি অসম্পূর্ণ হত। ফলে খবরের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হত। তা যাতে না হয় তার জন্য খবরে অভিযুক্তদের বক্তব্যকেও স্থান দেওয়া অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে রিপোর্টার দক্ষতা, সততা ও সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই খবরে জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সম্পাদক কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তাহলে সম্পাদকের কাছে প্রশ্ন থেকে যায়, ১৯৯৯ সালে পাকা সাঁতারুর স্বীকৃতি পাওয়া এক কিশোরীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ কী? সম্পাদক জবাব দিয়েছেন, সম্ভবত হঠাৎ অসুস্থতা এই মৃত্যুর কারণ। তাঁর দাবি, "পুকুরের জল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। তাই আগাছা বা কাদায় আটকে মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না।"

এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, পুলিশ কি সম্পাদকের এই কৈফিয়ৎ মেনে নেবে? সম্পাদকে একতরফা বয়ানের ভিত্তিতে পূজা জালানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর আর কোন তদন্ত কি হবে না?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে রিপোর্টার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের বক্তব্য সংগ্রহ করে জেনেছেন ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী ধাপের তদন্ত হবে। ইতিমধ্যেই ক্লাবের কর্মকর্তাদের জেরার মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভও করে দিয়েছে পুলিশ।

এই রিপোর্ট লিখতে গিয়ে রিপোর্টার মোটামুটি চমৎকারভাবে ভাষার ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করুন, রিপোর্টকে সেনসেশানাল বা চমকপ্রদ করার কোন চেষ্টা নেই। বিশেষণের ব্যবহার নেই। নিজস্ব মন্তব্যও কিছু নেই। এই রকম ভাষাই রিপোর্টের আদর্শ ভাষা।

ইংরেজি রঙ্গসাহিত্যের স্রষ্টা পি জি উডহাউস তাঁর 'থ্যাঙ্ক ইউ জীভস' উপন্যাসের এক জায়গায় (অনুবাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) কয়েক লাইনে এই ব্যাপারে যে আচরণবিধি বেঁধে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করার দাবি রাখে। তিনি লিখেছেন, "বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষা যদি গুরুত্বসম্পন্ন না হয়, তাহলে প্রকাশের দৈন্য থেকে যায়।"

সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ছোট ছোট বাক্যে অলংকারহীন নিছক দরকারী তথ্য পরিবেশন করাই উত্তম সংবাদ লেখার চাবিকাঠি।

নিচে আমরা আর একটি রিপোর্ট অবিকল উদ্ধৃত করছি। ২৪-৩-২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল। আপনি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন, রিপোর্টের মুখবন্ধটি নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছে। বিশদ বিবরণে অবশ্য সামান্য সম্পাদনা করা দরকার ছিল। যথা— দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে 'স্বামীর' পর তার নাম লেখা দরকার ছিল। তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'ছেলের বৌ' লেখার বদলে পুত্রবধূ লেখা উচিত ছিল।

এন্টালিতে মা ও তিন শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

স্টার্ফ রিপোর্টার: শনিবার সকালে শিয়ালদহের কাছে একটি পরিবারের চার সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। চার জনের মধ্যে রয়েছে একটি এক বছরের ছেলে, তিন ও পাঁচ বছরের দুটি মেয়ে এবং তাদের মা। কলকাতা পুলিশের ডি সি (ই.সি ডি) সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রহস্যজনক এই মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। ঘটনাটি আত্মহত্যা না হত্যা, তাও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ময়না তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।

মাত্র মাস তিনেক আগেই এই গৃহবধূর স্বামী মারা যান। এদের পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলই প্রতিবেশিরা জানিয়েছেন। ঘটনার পর এই গৃহবধূর শ্বশুর ও শাশুড়ি বেপাত্তা। পুলিশ তাদের খুঁজছে। এদের বাড়ি বিহারের ছাপরা জেলায়। শ্বশুর-শাশুড়িকে না পাওয়ায় এই গৃহবধূর এবং তাঁর এক বছরের শিশুপুত্রের নামও বলতে পারেনি পুলিশ। দুটি মেয়ের নাম পুনম ও সোনম বলে জনা গিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকার শিবতলা লেনে। এই গলির ৬/১ নম্বরে ছোট ছোট ঘরে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের বাস। তারই একটি ঘরে থাকেন কামেশ্বর সাউ (৬০)। শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে তাঁর সব্জির ব্যবসা। তিনি ছাড়াও তাঁর স্ত্রী সুশীলা, ছেলের বৌ (২২) এবং তিন ছোট ছোট নাতি-নাতনি সেখানে থাকতেন। কলকাতাতেই বাবার সঙ্গে সব্জির ব্যবসা করতেন সুখবিন্দর। মাত্র মাস তিনেক আগে বিহারে গিয়ে তিনি মারা যান। প্রতিবেশিরা জানিয়েছেন, সুখবিন্দর মারা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের বিহার থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন কামেশ্বর। অনেকে বলেছেন, প্রায় ছ'বছর আগে সুখবিন্দরের বিয়ের পর থেকেই তাঁরা এখানে রয়েছেন। এ নিয়ে নিশ্চিত করে পুলিশও কিছু বলতে পারেনি।

এই দিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, কামেশ্বরের ঘরটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশী প্রবীর দে জানিয়েছেন, ব্যবসার কাজে রোজ রাতে বেরিয়ে যান কামেশ্বর, ফেরেন পরদিন দুপুরে। শুক্রবার রাতেও কামেশ্বর কাজে বেরিয়ে যান। সকাল দশটায় তাঁর স্ত্রী সুশীলা তেল কিনতে বেরিয়ে যান। আধঘণ্টা বাদে তিনি ফিরে এসে বৌমা ও তিন নাতি-নাতনিকে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখে লোক মারফত খবর পাঠান স্বামীর কাছে।

এবার কয়েকটি দুর্বল রিপোর্টের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ২১-৩-০২ তারিখে 'জ' কাগজে বৈদ্যুতিন সামগ্রীর মেলার একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। খবরে পাঠকদের জানান হয়েছিল, "বিশ্বমানের বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যাবে এখানে।" রিপোর্ট পড়ে বোঝা গেল কী কোন কোন সামগ্রীর কথা বলা হচ্ছে ? বোঝা গেল না। সেটা রিপোর্টের একটা দুর্বলতা। "পাওয়া যাবে" মানে কী ? দেখতে পাওয়া যাবে ? কিনতে পাওয়া যাবে ? বোঝা গেল না। এটা রিপোর্টের আর একটা দুর্বলতা। সামগ্রীগুলি "বিশ্বমানের" এই সার্টিফিকেট কে দিল ? রিপোর্টার ? তাঁর সে বিদ্যা বা অধিকার আছে ? প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ ? তা হলে সে কথা পরিষ্কার করে না বলা রিপোর্টের আর একটি দুর্বলতা।

নিচে উদ্ধৃত রিপোর্টটিও দুর্বল রিপোর্টের আর একটি দৃষ্টান্ত—

বেপরোয়া গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার: বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে মোটরগাড়ী চালাইয়া লিণ্ডসে স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে কোন ফারমের হেড ড্রাফ্টসম্যান শ্রী ডি কে গ্যাডগিলকে চাপা দিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে রজব আলি নামক একজন মোটর ড্রাইভার পুলিশ প্রসিকিউটার শ্রীবীরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত বুধবার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জে এন মল্লিক তাহাকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত হইতে হয়তো বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হইবে।

উদ্ধৃত রিপোর্টটি ১৬-৭-১৯৫২ তারিখে 'ক' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। রিপোর্টার এবং সাব-এডিটর দু'জনের কেউই লক্ষ্য করলেন না যে খবরের পশ্চাদপটটি সামনে চলে এসেছে এবং আশু ঘটনাটি তাকে অনুসরণ করছে। আজ কোন দক্ষ রিপোর্টার চলিত ভাষায় খবরটি লিখলে তা এই রকম দাঁড়াত—

স্টাফ রিপোর্টার: গাড়ি চাপা দিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার অপরাধে গাড়ির চালককে ছ'মাস কারাদণ্ড দিল আদালত। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট জে এন মল্লিক অপরাধী চালককে দু'শ টাকা জরিমানাও করেছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে অপরাধীর আরও তিন মাস কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে আদলত।

পুলিশ প্রসিকিউটার বীরকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪(ক) ধারায় রজব আলি নামে একজন মোটর ড্রাইভারকে আদালতে অভিযুক্ত করেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছিল, বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে মোটরগাড়ি চালিয়ে ওই ব্যক্তি লিণ্ডসে স্ট্রিট ও চৌরঙ্গি রোডের মোড়ে এক ব্যক্তিকে চাপা দেয়। সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বেসরকারি কর্মচারী ওই ব্যক্তির নাম বি কে গ্যাডগিল।"

রিপোর্টারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকলে তিনি নিজেই রিপোর্টটি এইভাবে লিখতেন। উল্টোভাবে লিখে সাব-এডিটরের কাজ বাড়াতেন না। সাংবাদিককে সব সময় মনে রাখতে হয় খবর লেখার কাজে শব্দ (Word) এবং সময় খুব দামি।

এবার আমরা 'সংবাদদাতা' নিয়ে আলোচনা করব। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদদাতা ও Correspondent সমার্থক শব্দ। বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদদাতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Correspondent means a person who gathers and despatches by wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication." — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রকাশনা কেন্দ্র ছাড়া অন্য যে কোন জায়গা থেকে খবর যোগাড় করে তা তারযোগে, ডাকযোগে বা অন্য কোন উপায়ে পাঠান তিনিই সংবাদদাতা।

বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা আর ঠিক এই রকম নেই। বরং অনেকটা বদলে গেছে। প্রথমেই বুঝে নিন, এখন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের ক্ষেত্রে যারা সেই রাজ্যের মফস্‌সল এলাকা থেকে প্রকাশনা কেন্দ্রে খবর পাঠান তাঁরা সংবাদদাতা বলে পরিচিত হন। তাঁরা প্রধানত জেলা সদরকে কেন্দ্র করে কাজ করেন। তাঁরা কেউই আর তারযোগে বা ডাকযোগে খবর পাঠান না। এখন খবর পাঠাবার প্রধান মাধ্যম টেলিফোন ও টেলিফ্যাক্স। তারও পরে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে e-mail এসে গেছে।

কিন্তু এ সব মাধ্যম ব্যবহার করা খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এসবের খরচ কাগজের কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হয়। আজ থেকে এদিক ওদিক ২০ বছর আগেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সব সংবাদদাতাই ছিলেন অবৈতনিক। লেখার প্যাড, কিছু খাম, কপি করে খবরের কাগজ এবং ডাকটিকিটের দামের বেশি আর কিছু তাঁদের দেওয়া হত না। তাতেই তাঁরা স্থানীয় এলাকার খবর পাঠিয়ে সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, আসানসোল ও দুর্গাপুরের মত শহরে কর্তৃপক্ষ বেতন, ভাতা ইত্যাদি দিয়ে নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করতেন। এখন সে অবস্থা প্রতিযোগিতার চাপে অনেকটাই বদলে গেছে। কোন কোন কাগজ জেলা সদরগুলিতে পুরো সময়ের পেশাদার নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করছেন।

কোন পটভূমিতে সংবাদদাতা প্রথা চালু হয়েছিল তা আপনাদের সংক্ষেপে বলছি। পাঠকরা দেশ ও বিদেশের খবর পড়েই সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তাঁরা রাজ্যের নানা জায়গার খবর জানতে চাইতেন। পশ্চিমবঙ্গের খবর মানে তো শুধু কলকাতার খবর নয়। কলকাতার বাইরে যে পশ্চিমবঙ্গ ছড়িয়ে আছে তাও তো এই

রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সুতরাং সেই সব এলাকার খবরও পাঠকরা তাঁর কাগজে পড়তে চান। তাঁদের সেই চাহিদার চাপেই সংবাদদাতা প্রথা চালু করতে হয়েছিল। সেই প্রথা উন্নত হতে হতে পুরো সময়ের নিজস্ব সংবাদদাতার রূপ নিয়েছে। তাঁদেরও স্টাফ রিপোর্টারের মতই খবর যোগাড় করে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রকাশনা কেন্দ্রে পাঠিতে দিতে হয়। সেই খবর ডেস্কে চলে যায়। সেখানে তা রিপোর্টারের কপির মতই সাব-এডিটরের সম্পাদনার পর ছাপাখানায় যায়।

সংবাদদাতাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছেন। নিচের কপিটি তাঁর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। খবরটি ২৮-৭-২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল—

ফোর্ট উইলিয়াম কারখানা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া: শনিবার সকালে কোন্নগরের ফোর্ট উইলিয়াম কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ওই কারখানার প্রায় সাড়ে চারশো শ্রমিক বেকার হলেন। এ দিন সকালের শিফটে কাজে যোগ দিতে এসে কারখানার গেটে শ্রমিকেরা সাসপেনশন অব অপারেশনের নোটিস দেখতে পান। যদিও কারখানা বন্ধ নিয়ে কোনও অশান্তি এ দিন হয়নি। মন্দার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ওই কারখানাটিতে অচলাবস্থা চলছিল। এর আগেও দড়ি ও তার তৈরির এই কারখানাটি দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস বন্ধ ছিল। মন্দা কাটাতে শ্রমিকদের বেতনের ১৫ শতাংশ কেটে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে কারখানার শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে চুক্তিও করেন। শ্রমিকেরা কারখানা বাঁচানোর স্বার্থে তা-ও মেনে নেন। শেষে কারখানাটি বন্ধই হয়ে গেল।

নিচের খবরটি তার উল্টো উদাহরণ। ওই 'ক' কাগজেই মঙ্গলবার ৩-৯-২০০২ তারিখে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল, "লাঞ্ছিত যুবকের আত্মহত্যার জেরে মহিলা হস্টেলে ভাঙচুর"।

শিরোনামটি ঠিক আছে। কিন্তু নিজস্ব সংবাদদাতা খবরের মুখবন্ধে লিখেছেন, "এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে স্থানীয় একটি মহিলা হস্টেলে ভাঙচুর চালাল জনতা।"

মুখবন্ধের এই বাক্যটি পড়ে আপনি 'কোথায়' এবং 'কবে' প্রশ্নের জবাব পেলেন? পেলেন না। এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আপনাকে মুখবন্ধের দ্বিতীয় বাক্যটিতে পৌঁছতে হবে। সেখানে নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন, "রবিবার রাতে ঘটনাটা ঘটেছে বরাহনগরের ঝুলনতলায়"।

মুখবন্ধের দুটি বাক্যকে এক করা যায়। তা না করতে পারা নিজস্ব সংবাদদাতার অযোগ্যতা। এই অযোগ্যতা যে সাব-এডিটরের নজরে পড়ে না তিনিও তাঁর কর্তব্য পালনে গাফিলতি করলেন।

এবার দেখুন, বাক্য দুটিকে এক করে লিখলে তা কী রকম হয়— "রবিবার এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে অনেক রাতে বরাহনগরের ঝুলনতলায় একটি মহিলা হস্টেলে ভাঙচুর চালায় জনতা।"

এই এক বাক্যের মুখবন্ধের মধ্যে দিয়ে কী কেন কবে কোথায় এবং কারা এই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। নিজস্ব সংবাদদাতার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা থাকলে মুখবন্ধটি এ ভাবেই লিখতেন কি না তা আপনাদের ভেবে দেখতে বলি। প্রশিক্ষণের একটা বড় দিক ছোট ছোট বাক্যে, ছোট ছোট অনুচ্ছেদে, গুরুত্ব অনুযায়ী তথ্যগুলি পরপর সাজিয়ে, কোন বাড়তি কথা ব্যবহার না করে খবরটি লিখতে শেখা।

নিচের খবরটি তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। খবরটি ২০-৮-২০০২ তারিখে 'গ' কাগজে প্রকাশিত হয়ছিল—

Abu Nidal dies of gunshot wounds

Ramallah, Aug. 19 (Reuters): Palestinian guerrilla commander Abu Nidal, one of the world's most wanted men, was found dead from gunshot wounds in his Baghdad home, Palestinian sources said today.

A senior Palestinian official said Abu Nidal, 65, died under "mysterious conditions" and it was unclear whether he was killed or committed suicide. The account could not be independently verified.

Abu Nidal, a sworn enemy of Yasser Arafat and any Palestinian leader who sought accommodation with Israel, led a dissident Palestinian militant organisation high on Washington's list of groups it considered terrorist.

His Fatah Revolutionary Council group was blamed for attacks in 20 countries in which hundreds of people were killed or wounded, mostly during the 1970s and 1980s.

Abu Nidal was accused of masterminding gun and grenade attacks on Israeli and US airline check-in-desks, killing 19 people and injuring more than 100 in Rome and Vienna in December 1985. In his absence, an Italian court later sentenced him to life in prison for the Rome attack. His group was held responsible for an attack in June 1982 on Israel's ambassador in London, Shlomo Argov. The attack, which seriously wounded Argov, prompted Israel's invasion of Lebanon days later to root out Palestinian guerrilla groups.

Senior Palestinian sources said their contacts in Iraq had confirmed a report in the Palestinian *Al-Ayyam* newspaper which said today that Abu Nidal's body had been found with gunshot wounds and that he died three days ago.

Abu Nidal's brother, Mohammed al-Bana, said he knew nothing of his condition or whereabouts — but he had not spoken to Abu Nidal for about four decades.

"We heard the news (about his death) from the media. I haven't talked to him for a long time, 40 years or so. I spoke to friends and relatives in Arab countries to check this out, they didn't know he was in Baghdad," Mohammed al-Bana told Qatari satellite television station al Jazeera. Arab sources had said two years ago that Abu Nidal, suffering from an unidentified type of cancer, had moved to Baghdad for treatment.

Iraq has never commented on whether the guerrilla leader was in Baghdad. Abu Nidal, meaning "Father of the Struggle", was the nom de guerre of Sabri al-Bana, the head of the Fatah Revolutionary Council, which broke with the Palestine Liberation Organisation in 1974, saying it was too moderate.

"In the 1970s and 1980s, Abu Nidal was considered something of a bin Laden, a man of terror who had his hand in everything," veteran Israeli commentator Yossi Melman told Israeli army radio. Melman said Abu Nidal was believed to have worked "at the behest of many governments and intelligence agencies—Iraqi, Syrian, Libyan — and was especially active against the PLO and Arafat's senior entourage. He even tried to assassinate Arafat."

Born in the Mediterranean port town of Jaffa to wealthy Palestinian parents, Abu Nidal and his family were driven out to the West Bank during the 1948 West Asia War which accompanied Israel's creation.

খবরটির বিষয়বস্তু আবু নিদালের মৃত্যু। আবু নিদাল কে? প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে তার জবাব আছে। তিনি কীভাবে মারা গেলেন? দ্বিতীয় বাক্যে তার উত্তর আছে। তিনি কোথায় মারা গেলেন। তৃতীয় বাক্যটি মন দিয়ে পড়লেই তা জানতে পারবেন।

রামাল্লায় নিযুক্ত রয়টার্সের সংবাদদাতার সামনে আবু নিদালের মৃত্যু হয়েছে কি? না, হয়নি। তাহলে রয়টার্স কীভাবে নিদালের মৃত্যুর খবর জানল। এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে।

প্রকাশিত খবরের বাকি তথ্যগুলি গুরুত্বের দিক থেকে নিশ্চয় কম। কিন্তু ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন বিরোধের পটভূমিতে তা অপ্রয়োজনীয় নয়। সেই জন্যই নিদালের মৃত্যুর খবরের সঙ্গে তা পাঠকদের আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। রয়টার্সের সংবাদদাতা সেই কর্তব্য সুষ্ঠুভাব পালন করেছেন। এর সঙ্গে তুলনা করে রবিবার ১৮-৮-২০০২ তারিশে 'ক' কাগজে ৮ কলম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরটি দেখুন—

ধূপগুড়ি সিপিএম অফিসে কেএলও-র বেপরোয়া গুলি, হত ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়িঃ শনিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহরের কেন্দ্রস্থলে সিপিএমের জোনাল কমিটির অফিসে এ কে-৪৭ ও এ কে-৫৬ রাইফেল নিয়ে আততায়ীদের সশস্ত্র হামলায় অন্তত ৪ জন নিহত এবং ১৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তার মধ্যে ৫ জনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গোপাল চাকির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। হামলাকারীরা কেএলও জঙ্গি বলে সিপিএম এবং পুলিশ, উভয়েই প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছে। আহতদের ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শনিবার রাতে কলকাতায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ, রবিবার বিকেলে সিপিএম রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল বার করবে। জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএম সম্পাদক মানিক সান্যাল জানিয়েছেন, ঘটনার প্রতিবাদে কাল, সোমবার জেলায় ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দিন সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি বাজারের মধ্যে সিপিএমের জোনাল কমিটি অফিসে প্রায় ২৫ জন নেতা-সদস্য বসে বৈঠক করছিলেন। সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ এলাকায় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। সেই সময় এক জন যুবক দোতলা পার্টি অফিসের নিচতলায় গিয়ে বনমালী রায় আছেন কি না জানতে চায়। আধো অন্ধকারের মধ্যে সেই যুবকের সঙ্গে পার্টিকর্মীরা যখন কথা বলছিলেন, তখনই সেখানে তিনটি মোটর সাইকেলে করে ৬ জন জঙ্গি গিয়ে থামে। মোটর সাইকেলগুলির স্টার্ট বন্ধ না-করেই তারা পার্টি অফিসের সামনে একটি বোমা ফাটায়। তার র এ কে-৪৭, এ কে-৫৬ রাইফেল ও ৯ মিমি পিস্তল থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়ে। এর পর তারা গুলি চালাতে চালাতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায়। সেখানেই ছিলেন গোপাল চাকি-সহ অন্যান্য নেতারা।

গোপালবাবু জঙ্গিদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পাঁচ মিনিট ধরে হামলার পরে জঙ্গিরা মেঠো পথ ধরে পালায়। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে শুয়ে ধূপগুড়ি জোনাল কমিটির সদস্য তপন রাহা রায় বলেন, "আচমকা ওরা ঢুকে পড়ল। কিছু বোঝার আগেই দোতলায় উঠে সকলকে জখম করে পালিয়ে গেল।" তপনবাবুর গলায় গুলি লেগেছে। পুলিশের সন্দেহ, কেএলও-র 'অ্যাকশন স্কোয়াডের কমান্ডার' টম অধিকারীই এই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন, "আহতদের মধ্যে কয়েক জন সিপিএম নেতা কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। তাঁদের অধিকাংশই সংজ্ঞাহীন। তাই এখনই ঘটনা নিয়ে সবিস্তার কিছু বলা সম্ভব নয়।" তবে ওই হামলার ঘটনায় কেএলও জঙ্গিরা যে জড়িত, সেই ব্যাপারে পুলিশ সুপারের খুব একটা সংশয় নেই। জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএম নেতৃত্ব তো বটেই, দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসও ঘটনার পিছনে কেএলও জঙ্গিরাই রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

ভর সন্ধ্যাবেলায় জমজমাট ভিড়ের মধ্যে বোমা ফাটিয়ে, গুলি চালিয়ে দুঃসাহসিক হানার ঘটনায় গোটা ধূপগুড়ি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হামলার কয়েক মিনিট পরে বাসিন্দারা এতটাই আতঙ্কিত হয় পড়েছেন যে গোটা ধূপগুড়ির সমস্ত দোকানপাট, বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাটও শুনশান। জলপাই-গুড়ি জেলা সিপিএমের সম্পাদক মানিক সান্যাল খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান। রাতে সেখানে মিছিলও করে সিপিএম।

শনিবার রাতে কলকাতায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, "পুলিশও বলেছে, আমরাও বলছি, এই কাজ কেএলও জঙ্গিদের। আমাদের পার্টি অফিসে যখন বৈঠক চলছিল তখন কেএলও জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। অতে রাত পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গোপাল চাকিও আছেন।

পরবর্তী কর্মসূচি কী হবে তা রবিবার সকালে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব বৈঠকে বসে ঠিক করবেন।" তবে, গোটা ঘটনায় সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব অত্যন্ত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন। অনিলবাবু বলেন, "কেএলও পরিকল্পনা মাফিক এই ধূপগুড়ির এলাকাটি বেছে নিয়ে সিপিএমের নেতাদের উপর আক্রমণ হানছে। এর আগেও এক জেলা কমিটির সদস্য এবং সুভাষ সরকার নামে আরও এক জন জোনাল কমিটির সম্পাদককে কেএলও জঙ্গিরা খুন করে।" রাতেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও ঘটনাটি জানানো হয়। এরপরে কি সিপিএম নেতৃত্ব উত্তরবঙ্গের নেতাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করবে? পুলিশকে কি আরও নিরাপত্তা দিতে বলা হবে? জবাবে অনিলবাবু বলেন, "সে ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ, টেলিযোগাযোগ বারবার ব্যাহত হওয়ায় রাতে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। বিস্তারিত তথ্য জানার পরই এই ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।" সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর রাজ্য সম্পাদক কার্তিক পাল এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। তৃণমূল নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই দায়ী। কারণ, আমরা গত তিন বছর ধরে বলছি, পশ্চিমবঙ্গ উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি হয়ে গিয়েছে। আর উত্তরবঙ্গই এদের করিডর। কিন্তু বুদ্ধবাবু বারবার আমাদের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এখন উগ্রপন্থীরা তাঁদের অফিসই আক্রমণ করছে।"

রাজ্য পুলিশের আই জি (আইন-শৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায় জানান, "এই ঘটনায় ৬ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। চার-পাঁচ জন দুষ্কৃতী সিপিএমের জোনাল অফিসে ঢুকে গুলি চালায়। এটা কেএলও জঙ্গিদের কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।"

বুঝতেই পারছেন নিজস্ব সংবাদদাতার কাজের জায়গা জলপাইগুড়ি জেলার সদর। ধূপগুড়ি স্থানটা সেখান থেকে বেশ দূরে। সন্ধ্যায় এই হামলা ঘটেছে ধূপগুড়িতে। সে খবর জলপাইগুড়ি পৌঁছতে খানিকটা সময় লেগেছে। তারও পরে সংবাদদাতা এই খবর জেনেছেন। ফলে তাঁকে প্রচণ্ড তাড়াহুড়ার মধ্যে বিশদ

বিবরণ যোগাড় করে সরাসরি বা শিলিগুড়ি আঞ্চলিক দফতরের মাধ্যমে কলকাতায় পাঠাতে হয়েছে। ফলে কপিতে কিছু দূর্বলতা থেকে গেছে। সাব-এডিটরের উচিত ছিল এত বড় খবরটি মন দিয়ে সম্পাদনা করে আরও চোখা করে তোলা।

একবার ভেবে দেখুন তো খবরের মুখবন্ধে "শহরের কেন্দ্রস্থলে" শব্দ দুটি জুড়ে দেওয়া দরকার ছিল কিনা। ছিল না। কপিটি ভালভাবে সম্পাদনা করলে কেমন হত তা মূল কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন—

শনিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহরে সিপিএমের জোনাল কমিটির দপ্তরে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিবর্ষণ। গুলিবিদ্ধ হয়ে কমপক্ষে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু। গুরুতর আহত ১৩ জন। পুলিশ এবং সিপিএম নেতারা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা কেএলও জঙ্গি।

সিপিএমের এই অফিসটি ধূপগুড়ি বাজারের মধ্যে অবস্থিত। লেভেলক্রসিংয়ের মধ্যে এই হামলা ঘটে। হামলাকারীরা গুলি চালাবার আগে জানতে চায় বনমালী রায় অফিসে আছেন কিনা। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং দলের প্রথম সারির জেলা নেতা।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গোপাল চাকি অন্যতম। এই আক্রমণের সময় তিনি আরও অনেকের সঙ্গে দফতরে বসে একটি বৈঠকে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল ৭ জন। তারা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রথেকে গুলিবর্ষণ করতে করতে পার্টি অফিসের দোতলায় উঠে যায়।

তিনটি মোটর সাইকেলে ৬ জন জঙ্গি পার্টি অফিসের সামনে আসে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দলের আর একজন সদস্য এসেছিল পায়ে হেঁটে। পাঁচ মিনিটের হামলায় চারজনকে হত্যা করে হামলাকারীরা মেঠো পথ দরে পালায়।"

এরপর মূল কপির বাকি অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে তা অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় হত না। কিন্তু মূল কপিতে তথ্য সাজানোর অগ্রাধিকার স্থির করায় গলদ ছিল। পুনর্লিখিত কপিতে তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সেই কাজটি সংবাদদাতা নিজেই করলে সব থেকে ভাল হত।

আপনি স্টাফ রিপোর্টারই হোন বা সংবাদদাতাই হোন, আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, রিপোর্ট আর রম্যরচনা, রিপোর্ট আর সাহিত্য এক নয়। সম্পূর্ণ আলাদা। রিপোর্টে শুধুই প্রয়োজনীয় কথা থাকবে। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা লিখে পাণ্ডিত্য জাহির করার সুযোগ রিপোর্টার ও সংবাদদাতার থাকে না।

এই মৌলিক নিয়মটি কোন কোন রিপোর্টার জানেন না বা মানেন না। তাই আমরা দেখি তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা নিয়ে ম্যাকিনশের অনুসন্ধান সম্পর্কে 'ঠ' কাগজে ২০-৬-২০০২ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্ট আরম্ভ করা হয়েছে এইভাবে—

"There is a Chinese proverb that says a journey of a thousand miles, begins but with one small steps."

আসল বিষয়টি এর পর আপনাদের জানাচ্ছি। তা থেকে আপনারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন ওপর কথাগুলি ফালতু লেখা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে রিপোর্টার অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য জাহির করে রিপোর্টটি মাটি করেছেন। ওই রিপোর্টের সারবস্তুটি হল—

"West Bengal has the potential to capture almost a 15% share of the domestic IT market by 2010" state industries minister Nirupam Sen told reporters quoting from the McKinsey report, after a meeting of the state advisory board of industries.

এটি জানার পর আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন ওই রিপোর্টের মুখবন্ধে চিনা প্রবাদকে টেনে আনার কোন দরকার ও সুযোগ ছিল না।

একই রকম অপকর্মের আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই খবরটি ২০-৮-২০০২ তারিখে 'এ' কাগজে ছাপা হয়েছিল—

ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার চন্দ্রকোণা রোডে প্রায় চার একর বাস্তু জমির মালিকানা ছিল বনেদি সেন-পরিবারের। রাজনৈতিক চাপে, প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় সেই বিপুল পরিমাণ জমির মালিকানা পেয়ে গেল স্থানীয় 'স্টেশনপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব'। ওই জমির অন্যতম স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সেন পিতৃপুরুষের জমি উদ্ধারের জন্য স্থানীয় সি পি এম নেতা দীপক সরকার, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জেলার ডাকাবুকো মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ থেকে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দরবার করেছেন। গিয়েছেন জেলাশাসক এম বি রাও এবং জেলার পদস্থ ভূমিসংস্কার আধিকারিকদের কাছে। মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ যে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তা জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে, দীপঙ্করবাবু হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন বিশ্বখ্যাত সেতারি রবিশঙ্কর কিংবা জনপ্রিয়তম লেখক বুদ্ধদেব গুহ বা সংগীতবিদ কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বরা। বিমান বসু সুশান্ত ঘোষকে বিষয়টি 'দেখতে' বলেছেন। আর সুশান্ত দীপঙ্করবাবুকে জানিয়েছেন 'বিমানদা তো আপনাকে আইনের পথে যেতে বলেছেন। আপনি সে রাস্তায় যান।' দীপঙ্করবাবুর প্রশ্ন, 'আইনকে বেআইন দিয়ে ঘিরে ফেলে এখন আমাকে বেআইনের বিরুদ্ধে আইনি পথ দেখানো হচ্ছে। বামফ্রন্ট যে 'যুগান্তকারী' ভূমিসংস্কারের কথা বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে, এই কি তার নমুনা?'

মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ অবশ্য বিষয়টিকে একেবারেই আমল দেননি। তিনি বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে যে জমি খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই জমির নানা বেআইনি দলিল বিলি করে সেনারা লাখ-লাখ টাকা রোজগার করেছেন। বারবার আদালত এবং ট্রাইবুনাল তাঁদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। সর্বোপরি, এলাকার মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে। তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই সব বুঝতে পারবেন। সেন-পরিবার দেড় একর জমি থানার জন্য দান করে বাকি জমি অধিকার করতে চেয়েছিল। সাধারণ মানুষ তা রুখে দিয়েছে।'

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা গড়বেতা, এলাকা চন্দ্রকোণা রোড, মৌজা সারবেড়া, জে এল নং ৪৬৬, খতিয়ান নং ২৮ এবং ২০৯-এর অধীনে চারটি হাল দাগ সংখ্যায় (১১৯/৩৪৫, ১১৯/৩৪৮, ১১৯/৩৪৭, ১১৯/৩৪৬) মোট জমির পরিমাণ ৩.৮৮ একর। এই বিপুল পরিমাণ জমির আনুমানিক দাম প্রায় দেড় কোটি টাকা। অঞ্চলের বনেদি জমিদার সেন-পরিবার এই জমি থেকে দেড় একর জমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেক্টরেটকে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে অঞ্চলে একটি সম্পূর্ণ থানা এবং পুলিশ আবাসনের জন্য ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দান করার প্রস্তাব করে। নিকটবর্তী গড়বেতা থানার দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার। ফলে চন্দ্রকোণা রোডে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খুবই করুণ। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে অঞ্চলে একটি সর্বদলীয় 'নাগরিক মঞ্চ' তৈরি হয়েছে। এ-বছরের পুলিশ বাজেটে চন্দ্রকোণা রোডে থানা গড়ার কথা বলা হয়। স্বভাবতই পুলিশ ডিরেক্টরেট গত বছরের ১৬ এপ্রিল সেনদের জমি-দান গ্রহণ করতে সম্মত হয় লিখিতভাবে। পুলিশ প্রশাসন জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকের কাছে জমির বিস্তৃত বিবরণ জানতে চেয়ে চিঠি লেখে গত বছরের ১৫ জুন। আজ পর্যন্ত সেই চিঠির কোনও জবাব না দিলেও ১২ জুলাই জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সংশ্লিষ্ট ব্লক আধিকারিককে নির্দেশ দেন ওই জমির মালিকানা স্থানীয় 'স্টেশন পাড়া স্পোর্টিং ক্লাব'-এর নামে পরিবর্তিত করতে। ২০ জুলাই সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস থেকে সেনদের পৈতৃক বাড়ির দেওয়ালে শুনানির জন্য সমন ঝুলিয়ে দিয়ে আসে সরকারি কর্মীরা। জমির এক শরিক আইনজীবী-সহ ২৩ জুলাই সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত উপস্থিত থাকলেও, সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসার বিকেল পাঁচটার পর একতরফা শুনানি করে বেলাবেলি জমির মালিকানা পাল্টে দেন।

সি পি এম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ইতমধ্যেই প্রায় চার একর জমিকে 'খেলার মাঠ' হিসেবে দাবি করছে। এ-ব্যাপারে সকলেই একাট্টা। কিন্তু, এ-ক্ষেত্রে দীপঙ্করবাবুর সাফ জবাব, 'চার একর জমিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা হয় না। এখানে খেলার মাঠের কোনও চিহ্ন, গোলপোস্ট ইত্যাদি কখনও ছিল না। যদি খোলা মাঠে কেউ খেলেও, তাতে মাঠটা তাদের হয়ে যায় না। গড়ের মাঠে যুগ-যুগ ধরে খেলাধুলো হয়, তাতেও জমির মালিকানা ফৌজিদেরই থাকে। তা ছাড়া, 'এলাকার উন্নতির' কথা কেবল রাজনৈতিক দলগুলিই ভাবে, তা নয়। আমরাও ভাবি। সেজন্য বিভিন্ন সময়ে এলাকায় একমাত্র হাইস্কুল (ছাত্রাবাস-সহ), বালিকা বিদ্যালয় ও দুটি ফুটবল মাঠের জন্য আমাদের পরিবার জমি দান করেছে। সর্বোপরি, যে-ক্লাবের নামে জমির মালিকানা পাল্টে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসার, তারা নিজেরাই ২০০০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ওই জমিতে দুর্গাপুজোর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব করার অনুমতি চেয়েছিল আমার কাছে। অন্য দিকে পুলিশ প্রশাসনও জমিতে একটি বোর্ড লাগিয়ে নিজেদের আধিপত্য জানিয়েছিল। পরে অবশ্য কে বা কারা তা উপড়ে ফেলে।' দীপঙ্করবাবুর খেদ, 'আমি জানি না, মেঘের আড়ালে থেকে কোন ইন্দ্রজিৎ খেলাটা খেলছেন! তিনি কতবড় যোদ্ধা যে তাঁর প্রভাবের রাজ্যের 'পরিচ্ছন্ন ও জনদরদী' সরকার সাধারণ মানুষের জন্য নিবেদিত দেড় কোটি টাকার দানও তুচ্ছ করতে পারে!'

ওই রিপোর্টটির মুখবন্ধের প্রথম বাক্য "ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল" লিখে সংবাদদাতা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেননি, নিজের কাজ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনারা কেউ যেন এভাবে খবর লেখার জন্য প্ররোচিত হবেন না।

লক্ষ্য করুন, খবরে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে 'ডাকাবুকো' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন মন্ত্রীকে এমনভাবে বর্ণনা করবেন না।

খবরে লেখা হয়েছে, মন্ত্রী "গোটা বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত"। 'গোটা' এবং 'সম্পূর্ণ' কথা দুটি লেখার কোন দরকার ছিল না। মন্ত্রী "বিষয়টি জানেন" লিখলেই পাঠক ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন।

এই রকম আরও কিছু অনাচারের দৃষ্টান্ত এই খবরে রয়েছে। তা ছাড়া খবরটি ছোট আকারে লেখা যায়। এই খবরের গুরুত্ব থানা তৈরির জমি বেদখলে। সেন পরিবারের স্বার্থ বড় করে দেখে ও বোঝাতে গিয়ে সেই আসল ঘটনাটিই চাপা পড়ে গেছে।

হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান নয়, তেমনি সব রিপোর্টার-এরও যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার বিচার সমান হয় না। তাঁদের সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) হুকুম পেলেই যে কোন বিষয়ে, যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে খবরের সন্ধানে ছুটে যান রিপোর্টার। নির্দিষ্ট কাজ না পেলে তাঁরা বসে থাকেন না বা আড্ডা মারেন না। নিজের গরজে খবর খুঁজে বেড়ান। এই রকম রিপোর্টার কাগজের সম্পদ।

(খ) যে রিপোর্টাররা নির্দিষ্ট কাজের বা গিঠের বাইরে কাজ করতে চান না, তাঁরা মধ্যম মানের রিপোর্টার।

(গ) আর বাকিরা রিপোর্টার হয়েছেন কিন্তু উপহার উপঢৌকন সংগ্রহ এবং পানভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া কোন কষ্টসাধ্য কাজে উৎসাহ পান না, তারা অধম রিপোর্টার।

উত্তম রিপোর্টারের টেলিফোনের ডায়েরি সব সময় পকেটে থাকে। তাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর লেখা থাকে। কোন নম্বর বদল হলে তিনি তা নিজের ডায়েরিতে সংশোধন করে নেন। সেই ডায়েরি তিনি কখনও বেহাত করেন না, এমনকি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকেও দেখান না।

উত্তম রিপোর্টার ফ্রি পাস বা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট যোগাড় করার জন্য ছোঁক ছোঁক করেন না। উত্তম রিপোর্টারের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রত্যেক দিনের কাগজের প্রথম পাতায় স্থান আদায় করে নেওয়া।

উত্তর রিপোর্টার সরকারি পরিচয়পত্র বা প্রেস কার্ডের অপব্যবহার করেন না। তিনি কখনও ভোলেন না যে প্রেস কার্ড আত্মরক্ষার ঢাল নয়। প্রেস কার্ড একটি পবিত্র নথি। প্রেস কার্ড তার প্রতি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের বিশ্বাসের অভিজ্ঞান।

নিরাপত্তার কারণে সংরক্ষিত এলাকায় পেশাগত কাজে তাঁর প্রবেশের ছাড়পত্র প্রেস কার্ড। পুলিশের ব্যারিকেড বা গুলি বিনিময়ের উত্তপ্ত ও বিপজ্জনক অঞ্চলে তাঁর অবস্থানের অনুমতিপত্র এই প্রেস কার্ড।

প্রেস কার্ড আছে বলে উত্তম রিপোর্টার কখনও আইনের সীমা অতিক্রম করেন না। উত্তম রিপোর্টার ভুলেও নিজেকে ধর্মের ষাঁড় ভেবে তাঁর পবিত্র পেশার অমর্যাদা করেন না। আর, উত্তম রিপোর্টার কখনও সজ্ঞানে মিথ্যা লিখে কাউকে প্রতারণা করেন না।

কোন রিপোর্টারের পক্ষে মিথ্যা লেখা পাপ। এ কাজ পেশাগত নৈতিকতার বিরোধী। তার মানে কী এই যে, রিপোর্টার পুরো সত্য ছাড়া কিছু লিখবেন না?

পুরো সত্য লেখা রিপোর্টারের কাজ নয়, তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ধরুন, একজন জননেতা ব্রিগেড

প্যারেড গ্রাউন্ডের মঞ্চ থেকে এক ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন। সত্য লিখতে গেলে তাঁর ভাষণের পুরোটাই লিখতে হয়। কিন্তু কাগজে তার জায়গা কোথায়? তার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? পাঠক কী দু'পাতা জোড়া দীর্ঘ ভাষণের পূর্ণ বিবরণ কোন দিন পড়ে দেখেন?

তা হলে রিপোর্টার ওই ভাষণের কতটুকু লিখবেন? ওই ভাষণের যে সব অংশ জনসাধারণের জানা দরকার বলে রিপোর্টারের মনে হবে তিনিই সেই নির্বাচিত অংশটুকুই লিখবেন। কিন্তু সেই নির্বাচিত অংশটুকু যেন সত্য হয়, তাতে যেন মিথ্যার খাদ না মেশে। নির্বাচিত অংশটুকু যেন বিকৃত করে লেখা না হয়। এইভাবে খবর লিখলেই রিপোর্টার পেশাগত সততা রক্ষা করতে পারবেন।

এই বিষয়ে ওয়াল্টার লিপম্যানের কিছু কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সালে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"..... news and truth are not the same thing, and must be clearly distinguished. The function of news is to signalise an event, the function of truth is to bring to light the hidden facts, to set them into relation with each other, and make a picture of reality on which men can act."

তা সত্ত্বেও সজ্ঞানে মিথ্যা লিখে নিজের, কাগজের ও পেশার মুখে চুনকালি দেবার দৃষ্টান্ত আছে।

১৯৮০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন পোস্টে একটি খবর প্রকাশিত হল। খবরটির শিরোনাম 'জিমির জগৎ' (Jimmy's World)। এই খবরে রিপোর্টার মিস জেনেট কুক (Janet Cooke) জানালেন, জিমি নামে একটি বালককে হেরোইনের নেশায় পোক্ত করে তুলছে তার মায়ের বন্ধু। জিমির স্বপ্ন বড় হয়ে মাদকের ব্যবসায় নেমে পড়া। ব্যবসা করতে গেলে হিসাবপত্র জানতে হবে। তাই সে শুধু অঙ্ক শিখতে স্কুলে যায়। অন্য কোন বিষয় তার ভাল লাগেনা। আর হ্যাঁ, হেরোইনের ইঞ্জেকশান নিতে তার মজাই লাগে।

এই খবরে আমেরিকা তোলপাড়। মেয়র ব্যতিব্যস্ত। পুলিশের ঘুম নেই। পোস্টের কর্তাব্যক্তিদের কাছে পাঠকদের চিঠির স্রোত, জিমিকে উচ্ছন্নে যেতে দেবেন না। ওকে বাঁচান।

কিন্তু কোথায় জিমি। সারা ওয়াশিংটনে চিরুনি তল্লাসি চালিয়ে জিমিকে পাওয়া গেল না।

তার ছ'মাস পরে শ্রেষ্ঠ রিপোর্টের জন্য জেনেট কুককে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হল। কিন্তু কয়েকদিন পরে প্রমাণ পাওয়া গেল মিস কুক নিজের সম্পর্কে অসত্য বিবরণ দাখিল করেছেন। তা করতে গিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর লেখা 'জিমির জগৎ' ভিত্তিহীন ব্যাপার। জিমি নামে সেই মাদকাসক্ত বালকের কোন অস্তিত্বই নেই। ফলে মিস কুকের চাকরি গেল।

এ সব ঘটনার এক বছর পরে জাতীয় টেলিভিশনে এক অনুষ্ঠানে ফিল ডোনাহুর (Phil Donahue) প্রশ্নের জবাবে মিস কুক স্বীকার করলেন, জিমির খবরে ছিটেফোঁটা সত্য নেই। খবটাই মনগড়া।

তিনি কেন এ কাজ করেছিলেন?

মিস কুক জানালেন, চমকপ্রদ, চাঞ্চল্যকর, সাড়া জাগানো খবরের তাগাদায় দিশাহারা হয়ে তিনি 'জিমির জগৎ' সৃষ্টি করেছিলেন। জেনেট কুকের জিমির জগৎ প্রকাশিত হয়েছিল ওয়াশিংটন পোস্টের মেট্রোপলিটান বিভাগে। তখন সেই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন বব উডওয়ার্ড কার্ল বার্নস্টাইনের সঙ্গে বব ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়ায় রিচার্ড নিক্সনকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিতে হয়েছিল।

এই চাঞ্চল্যকর দুনিয়া কাঁপানো খবর তাঁরা যখন ফাঁস করেছিলেন, তখন তাঁরা ছিলেন অতি সাধারণ রিপোর্টার। একটি আপাততুচ্ছ খবরের পিছনে ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে কত বড় ঘটনা ঘটতে পারে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি তার প্রমাণ।

প্রথম খবর ছিল, ওয়াশিংটন শহরে ওয়াটারগেট আবাসনে ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কমিটির দপ্তরে সিঁধ কেটে চুরির চেষ্টা হয়েছিল। সেই অপকর্ম করার সময় পাঁচজন লোক ধরা পড়েছে। দিনটি ছিল শনিবার, তারিখ ১৭ জুন, ১৯৭২। সময় রাত আড়াইটা। ফলে শনিবার সকালের কাগজে এই চুরির কোন খবর ছিল না। ওয়াশিংটন পোস্টের ৩৫ বছরের পোড় খাওয়া পুলিশ বিটের রিপোর্টার আলফ্রেড ই লিউইস (Alfred Ed. Lewis) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই খবরের পিছনে লেগে গেল।

লিউইস পাকা রিপোর্টার ছিল কিন্তু লেখক ছিল কুব কাঁচা। ৩৫ বছর রিপোর্টারির জীবনে তিনি বরাবর টেলিফোনে খবর দিয়ে কাজ বজায় রেখে গেছেন। ১৭ই জুনও তিনি তাই করলেন।

লিউইস দফতরে জানালেন, চোরেরা সবাই ধোপদুরস্ত পোশাক পরিহিত। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রচুর টাকা ছিল— সবই ১০০ ডলারের নোট। তাদের হেপাজত থেকে, ক্যামেরা এবং আড়িপাতার যন্ত্র পাওয়া গেছে।

উইক এন্ডে এই রকম একটা খবর চট করে মেলে না। সুতরাং মোট আটজন রিপোর্টার খবরটার বিশদ বিবরণ যোগাড় করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে নবীনতম দুই রিপোর্টার হলেন উডওয়ার্ড এবং বার্নস্টাইন।

উডওয়ার্ড আদালতে গিয়ে খবর পেলেন, ধৃতদের মধ্যে একজন সি আই এ'র প্রাক্তন কর্মী। বার্নস্টাইন খবর আনলেন, বাকি চারজনেরও সি আই এ'র সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

মাসের পর মাস এই খবরের পিছু ধাওয়া করতে করতে জানা গেল, পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে হোয়াইট হাউসের মদতে এবং রাষ্ট্রপতি নিক্সনের জ্ঞাতসারে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষের নেতাদের গোপনে কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনা। এই খবরেরই শেষ পরিণতি নিক্সনের ইস্তফা।

এবার আমরা পেন্টাগন পেপার্স সম্পর্কে জানব। কারণ, রিপোর্টারের স্বআরোপিত আচরণবিধির একটা হল মিথ্যা খবর না লেখা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, খবরের তথ্য যোগাড় করার জন্য রিপোর্টার সব কিছু করতে পারেন ? এ বিষয়ে একটা মত হল, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা জনবিরোধী কাজ করে তা গোপন করার চেষ্টা করল তা ফাঁস করতে রিপোর্টার সব কিছু, এমন কী চুরি পর্যন্ত করতে পারেন।

পেন্টাগন পেপার্স বা ম্যাকনামারা পেপার্স ফাঁস করার ড্যান এলসবার্গের (Daniel Ellsberg) সাহায্যে এই কাজই করেছিলেন নিল সেহান (Neil Sheehan)। নিউইয়র্ক টাইমসে পেন্টাগন পেপার্স ফাঁস করার সময় তিনি ছিলেন একজন ফ্রি লান্স রিপোর্টার।

রিপোর্টার হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন তা আপনাদের কাছে শিক্ষণীয় হবে। স্যালিসবেরি জানাচ্ছেন —As a reporter he (Neil Sheehan) possessed limitless energy and doggedness. No detail was too small to resist his curiosity. অর্থাৎ রিপোর্টার হিসাবে নিল সেহান ছিলেন অসীম প্রাণশক্তির অধিকারী। সেই সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড জেদ। তাঁর কৌতূহলের কাছে কোন তথ্যই তুচ্ছ করার ব্যাপার ছিলনা।

এই সব গুণাবলীর অধিকারী সেহান সস্ত্রীক ম্যাসাচুসেটস শহরের একটি হোটেলে নাম ভাঁড়িয়ে ওঠেন। স্যালিসবেরি লিখছেন, They had come to steal the Pentagon Papers.

পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে জড়িত ড্যান এলসবার্গ সেই সব সরকারি কাগজপত্র সেহানকে দেন। সেগুলি ম্যাসাচুসেটস শহরের এক জেরক্স সেন্টারে সার রাত ধরে কপি করা হয়। তার খরচ পড়ে ১৫০০ ডলার।

এইভাবে সংগৃহীত কাগজপত্রে দেখা যায়, আমেরিকার সরকার ভিয়েতনামে অনেক আগে থেকেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারা সে কথা কখনও স্বীকার না করে চেপে গেছে। এই খবরই ফাঁস করা হয় ম্যাকনামারা পেপার্স বা পেন্টাগন পেপার্স নামের রিপোর্টে।

৫.২.১১ স্তম্ভকার

খবরের কাগজে স্তম্ভকারের বিশেষ ভূমিকা ও মর্যাদা আছে। ইংরেজি ভাষায় স্তম্ভকারকে বলা হয় Columnist। আমরা Columnist কেই বাংলায় স্তম্ভকার বলছি।

স্তম্ভকার কাগজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক বা বিশেষ সংবাদদাতা নন। সম্পাদক চাইলে যে কোন স্থায়ী সাংবাদিককে দিয়ে স্তম্ভকারের কাজ করাতে পারেন। আবার কাগজের বাইরের কোন বুদ্ধিজীবী বা মুক্ত বিহঙ্গ (Free Lance) সাংবাদিককে দিয়েও স্তম্ভকারের কাজ করাতে পারেন। খবরের কাগজে এই দু'রকম পদ্ধতিই চালু রয়েছে।

এবার আমরা জানব স্তম্ভকার কী কাজ করেন?

তাঁর কাজ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে খবর বিশ্লেষণ করা। কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধই প্রকাশিত হয়। সেই সব নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য সেই কাগজের বক্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। স্তম্ভকারের বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধের বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত মত বলে বিবেচিত হয়।

স্তম্ভকারের লেখা তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তা, কল্পনা, অনুমান, ধ্যানধারণার ফল। তার সঙ্গে একই বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্যের মিল থাকতে পারে, নাও পারে। সম্পাদক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কলম ধরতে পারেন। স্তম্ভকার তাঁর লেখায় ওই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করতে পারেন। সেই স্বাধীনতা তাঁকে দিতে হয়।

এই স্বাধীনতার মর্যাদা দিতে হলে স্তম্ভকারকে সব রকম মতাদর্শের বাইরে থাকতে হয়। মন খোলা না থাকলে স্তম্ভকার কখনও সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে পারবেন না।

স্তম্ভকারের কাজ সংবাদ বিশ্লেষণ করা, যুদ্ধ করা নয়। কলম লেখক সরকার বা বিরোধী কোন পক্ষেরই বাজনদার নন। সরকার পক্ষের কোন সিদ্ধান্ত, কাজ বা বক্তব্য রাষ্ট্র, সমাজ বা জগণের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে না হলে তার কারণ ব্যাখ্যা করা তাঁর ধর্ম। একইভাবে বিরোধী পক্ষের কোন সিদ্ধান্ত, কাজ বা বক্তব্য রাষ্ট্র, সমাজ বা জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর হলে সে কথাও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা কর তাঁর কর্তব্য। তিনি এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারলে তাঁর কলম দলমত নির্বিশেষে জনসাধারণের কাছে সমান আদর না পাক, গুরুত্ব পায়। এর অন্যথা হলে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে বলে পাঠকদের মনে ধারণা জন্মে গেলে কলমের সর্বনাশ হয়।

তাঁকে লেখার সময় মনে রাখতে হয়, তিনি সমাজ ও জনগণের সেবক। তাঁদের স্বার্থের চিরজাগ্রত ও সাহসী এক প্রহরী। সরকার বা তার বিরোধী কোন পক্ষের নিন্দা বা প্রশংসার পরোয়া না করে তিনি কলম ছোটান। তিনি সরকার বা বিরোধী কোন পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চান না। তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের বিরোধী নন। তিনি নিজে কোন প্রতিষ্ঠান হতে চান না।

লেখার মধ্যে দিয়ই তাঁকে এই সব ব্যাপার প্রমাণ করতে হয় লেখার মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রমাণ করতে হয় তিনি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতিনিরপেক্ষ, দলনিরপেক্ষ, মতাদর্শ নিরপেক্ষ। দেশ, সমাজ ও জনগণের পক্ষে যা কিছু ভাল স্তম্ভকার তার পক্ষে, যা কিছু মন্দ স্তম্ভকার তার বিপক্ষে।

স্তম্ভকার জনগণের স্বার্থের রক্ষক। এ কথার মানে কী? জনগণের ৫১ শতাংশ যদি ভুল করে, মন্দকে ভাল বলে গ্রহণ করে, ভালকে মন্দ ভেবে বর্জন করে বা আঘাত করে কী করবেন স্তম্ভকার? উত্তর খুবই সহজ। স্তম্ভকারের কলম বলিষ্ঠভাবে দেখিয়ে দেবে, জনগণ ভুল করছেন, নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছেন, নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

মাটির ওপরে, জলের ওপরে, দেওয়ালের এ পিঠে, দিগন্তের এ পারে যা ঘটছে তা লেখা রিপোর্টারের কাজ। মাটির তলায় কী ঘটতে পারে, জলের গভীরে কী ঘটতে চলেছে, দেওয়ালের ও পিঠের রঙ কী, দিগন্তের ও পারে কী অঘটনের প্রস্তুতি চলেছে তা দেখিয়ে দেওয়া স্তম্ভকারের কাজ। সে সব কাজ তিনি কী করে করবেন? তিনি কী গণৎকার? তিনি কি স্ফটিক গোলকের মধ্যে জগৎসংসারের ভবিষ্যৎ দেখতে পান?

সে সব কিছুই নয়। স্ফটিক গোলক নয়, স্তম্ভকারের সম্পদ তাঁর দূরদৃষ্টি, তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা, তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর দার্শনিক মন। এইসব বিরল গুণ ব্যবহার করে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে একজন সফল স্তম্ভকার বলে পাঠকদের কাছে গৃহীত হবেন। তবেই তাঁর লেখা পাঠকদের মনে দাগ কাটবে, সরকারকে ভাবাবে, বিরোধীদের চিন্তায় ফেলবে।

আর তা না হলে? অকাট্য যুক্তির বদলে কিছু কড়া কড়া কথা, কিছু নিন্দা, কিছু গালিগালাজ দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ছে সকালের স্তম্ভ বিকালের মধ্যেই পাঠকের মত থেকে মুছে যাবে।

খবরের শিরোনাম এবং স্তম্ভের শিরোনাম ভিন্নধর্মী। খবরের শিরোনাম হবে সোজাসাপটা। শিরোনামই সংক্ষেপে মূল খবরটা পাঠককে জানিয়ে দেবে। স্তম্ভ নিবন্ধের শিরোনাম তেমন হলেতার আকর্ষণ থাকবে না। পাঠক শিরোনাম পড়েই স্তম্ভের বিষয়বস্তু বুঝে ফেললে তা আর নাও পড়তে পারেন। সেইজন্য স্তম্ভ নিবন্ধের শিরোনাম হবে ইঙ্গিতধর্মী।

কয়েকটি শিরোনামের দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বোঝার সুবিধা হবে। প্রথমে আমরা জে এন সাহানির লেখা কয়েকটি স্তম্ভ নিবন্ধের শিরোনাম উদ্ধৃত করছি (Rogues' Gallery and Indian Politics, 1982)—

Dark clouds over the national sky.
Boulders on the road
Building the nation on dreams
Placing the pawns in place
Period of crisis

জে এন সাহানি ১৯২৬ সালে Hindustan Times-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সে পদে ইস্তফা দিয়ে বিভিন্ন কাগজে স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন।

এস নিহাল সিং দীর্ঘকাল The Statesman কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেই কাগজে সাপ্তাহিক স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা স্তম্ভগুলি এইভাবে তিনি নিজেই ভাগ করেছেন (Indira's India, A Political Notebook)—

Choosing a President
The Split
Living Dangerously
Triumph
Disillusionment & Turmoil
Defeat
The Second Split

এবার আমরা ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানব। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান সাংবাদিক। ১৯১৪ সালের ৭ নভেম্বর The New Republic — দ্য নিউ রিপাবলিক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় চলতি ঘটনাপ্রবাহের ওপর মন্তব্য লেখার দায়িত্ব পড়ে লিপম্যানের হাতে। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৫ বছর। তখন থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের লেখাগুলিকে তাঁর প্রথম যুগের লেখা বলে গণ্য করা হয়।

এই সময়কালে তাঁর লিখিত নিবন্ধগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়— যুদ্ধ ও শান্তি (War and Peace), রাজনীতি (Politics), অস্থিরতা (Unreast) এবং কলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (Arts and other matters)।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে সংবাদ এবং স্তম্ভের শিরোনামের ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। সংবাদের শিরোনাম হবে সোজাসুজি সংবাদের নির্যাস। শিরোনামেই সংবাদকে চেনা যাবে, বোঝা যাবে, পাওয়া যাবে তার পরিচয়। কিন্তু নিবন্ধের শিরোনাম হবে রহস্যমণ্ডিত। শিরোনাম দেখে স্তম্ভের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্য ধারণাও করা যাবে না। কিন্তু সেটি পড়া শেষ হলে পাঠকের মনে হবে এই নিবন্ধের এর থেকে ভাল শিরোনাম আর হতে পারে না। লিপম্যানের প্রথম জীবনের কয়েকটি স্তম্ভের শিরোনাম উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে—

শক্তি এবং ভাবনা (Force and Ideas), বিশ্বাস করার ইচ্ছা (The Will to Believe), বিশ্বাসের অযোগ্য ? (Untrustworthy?), ধর্মঘট কি পরিত্যাগ করা যাবে ? (Can the strike be abandoned?) কেলেঙ্কারি (Scandal)।

"শক্তি ও ভাবনা" ছিল লিপম্যানের লেখা প্রথম স্তম্ভ। লেখাটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে। ধ্বংসের বিরুদ্ধে বিকাশের পক্ষে। এই লেখার মধ্যে দিয়ে প্রচারিত তাঁর মূল বার্তাটি ছিল, বিনাশ নয়, সৃষ্টিই আসল জয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, ইতিহাস বিনাশকে যে গুরুত্ব দেয় সৃষ্টিকে তা দেয় না।

এই নিবন্ধে লিপম্যান লিখেছিলেন, বিনাশের যাবতীয় শক্তি সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের কল্পনা (Idea)। তাই বিনাশের শক্তিকে পরাস্ত করতে মানুষের কল্পনাকেই কাজে লাগাতে হবে।

এ কথা ঠিকই যে কিছু মানুষ আজও লিপম্যানের এই ভাবনার বিপরীত কাজে তাঁদের প্রতিভার অপচয় করে চলেছেন। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে, এই নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে লিপম্যান যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজও অনেক মানুষকে নিরন্তর ভাবিয়ে চলেছে।

এবার তাঁর লেখা আর একটি নিবন্ধের সারমর্ম আমরা আলোচনা করব। নিবন্ধটির বিষয়বস্তু ধর্মঘট। বলা ভাল, ধর্মঘটের অধিকার। সব দেশের মত ভারতের কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকরা চান, ধর্মঘট নিষিদ্ধ হোক। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধর্মঘটের পথ পরিত্যাগ করুক। সরকার ধর্মঘট বেআইনি ঘোষণা করুক, আইন রচনা করে বলে দেওয়া হোক, ধর্মঘট আর শ্রমিক আন্দোলনের পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হবে না।

অন্যদিকে মধ্যপন্থী ও বামপন্থী দলগুলির নেতারা ওই বক্তব্যের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের সার্বজনীন দাবি, ধর্মঘট শ্রমিকদের আন্দোলনের ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁরা এই অস্ত্র ত্যাগ করবেন না।

তাহলে উভয় পক্ষে মুখোমুখি এস্পার-ওস্পার সংঘাত তো অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংকটকালে একজন সুস্থ নিবন্ধকার কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি বিচার করেন ও তা সমাধানের কি পথ দেখাতে পারেন?

৮২ বছর আগে এই রকম একটি ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে লিপম্যান যা লিখেছিলেন তা আজও বহাল রয়েছে। ওই সময় Elbert H. Gary — এলবার্ট এইচ গ্যারি নামে এক মার্কিন শিল্পপতি শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের প্রধান Samuel Gompers — স্যামুয়েল গোম্পার্স। গোম্পার্স বলেছিলেন, ইউনিয়ন গড়া এবং ধর্মঘট করা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার। তাঁর দাবি, কোন সামাজিক ব্যবস্থায় (ধর্মঘটে) নিষেধাজ্ঞা জারি করে অনিচ্ছুক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না।)

দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের এই ঘাত-প্রতিঘাত লিপম্যানকে বিপচলিত করে তুলল। সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে তিনি দ্য নিউ রিপাবলিক পত্রিকায় ১৯২০ সালের ২১ জানুয়ারি একটি কলম লেখেন। তারই শিরোনাম ছিল, "Can the strike be abandoned?" "ধর্মঘট কি পরিহার করা যাবে? লেখাটি শুরু হয়েছিল এইভাবে—

অনেক বছর আগে একদিন রাত ন'টায় প্যারিসের একটি বিদ্যুৎ কারখানার মজদুররা এক ঘণ্টার জন্য তাঁদের ক্ষমতা জাহির করেছিলেন। সেই এক ঘণ্টা কাল বিদ্যুৎ বিহনে প্যারিসের রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সোবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহাশয়কে হাতের কেতাব মুড়ে ফেলতে হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ বন্ধ করতে হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের জরুরি বৈঠক থামিয়ে ফেলতে হয়েছিল মধ্যপথে। অন্যান্য কলকারখানার কয়েক হাজার শ্রমিককে যন্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল ফাঁকা জায়গায়।

রাত দশটায় বিদ্যুৎ ফিরে এলে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ এই অনাচারকে তুলোধোনা করতে কলম বাগিয়ে বসে গেলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, মুষ্টিমেয় লোকের হক যতই ন্যায্য হোক তা আদায়ের জন্য বড় বড় কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কোন অধিকার তাদের নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কর্মীদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বিস্মৃত হওয়া খুবই অনৈতিক ব্যাপার। বিদ্যুৎ সরবরাহ ৬০ মিনিট বন্ধ থাকায় যাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরা সবাই এক বাক্যে ওই সম্পাদকীয় বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে

গেলেন। কিন্তু তাতেও নৈতিকতা বা আইনের দোহাই দিয়ে সংগঠিত শিল্পের কর্মীদের বশ মানাবার অবস্থা তৈরি করা গেল না।

তার ব্যবস্থা করতে গেলে গ্যারিবাদ (Garyism) বহাল করতে হয়। তাতে স্বৈরাচার কায়েম হয়, তাকে অনুসরণ করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (rebellion)। অন্যটা করতে গেলে গোম্পার্সবাদের (Gomperism) ওপর নির্ভর করতে হয়। গোম্পার্সবাদ কায়েম হলে অত্যাবশ্যক শিল্পের মুষ্টিমেয় কর্মীর স্বেচ্ছাচার যে কোন সময়ে সভ্য জীবনযাত্রা অচল করে দিতে পারে।

এই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত থেকে বৃহত্তর জনসাধারণকে রক্ষা করার কোন উপায়ই কি নেই ?

লিপম্যান লিখলেন, নিশ্চয় আছে। সেই পথ হল মেহনতী মানুষদের মানসিক অধিকার স্বীকার করে নেওয়া, তাদের কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। তাদের মেহনতের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া। এইসব ব্যবস্থা করার জন্য সাত দফা কর্মসূচি দিলেন লিপম্যান। আর লিখলেন, প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে আইনগত মান্যতা দেবার কথা।

এই লেখার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও মালিক এবং তৃতীয় পক্ষ বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য লিপম্যান যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা জলের মত পরিষ্কার। শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তিতে ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগের ব্যবস্থা এই লেখার মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়েছিল বলেই মনে হয় নাকি?

আপনি নিজে লিপম্যানের এই স্তম্ভ নিবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন, এতে আবেগের লেশমাত্র নেই, আছে যুক্তির পর যুক্তি। এতে কড়া কড়া কথার কশাঘাত নেই। শূন্যগর্ভ গালিগালাজ নেই, আছে বৃহত্তর জনগণের প্রতি স্তম্ভনিবন্ধ লেখকের দায়বদ্ধতার পরিচয়। মালিকের শোষণ এবং শ্রমিকদের স্বৈরাচার দুই অপশক্তির ক্ষতিকারক দিকগুলি এই নিবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছিলেন লিপম্যান।

একজন নিবন্ধলেখকের কতটা দূরদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তার একটি নজির এখন আপনাদের জানাব। ইটালিতে বেনিটো মুসোলিনি তখন বেশ ভাল করেই মাথা চাড়া দিয়েছেন। মুসোলিনিকে মহামানব (Superman) বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন জর্জ বার্নার্ড শ। গ্রেট ব্রিটেনের গ্রেট লিডাররা মুসোলিনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমেরিকান প্রেসেও মুসেলিনির প্রতি সমর্থনের ফোটারা ছুটছে। ১৯২৫ সালে এই রকম হাওয়ার বিরুদ্ধে কলম ছোটালেন ওয়াল্টার লিপম্যান। দ্য ওয়ার্ল্ড (The World) কাগজে তিনি একটি নিবন্ধে মুসোলিনির মুখোশ খুলে আসল মুখশ্রী জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেন। তাতে ইটালিতে মুসোলিনির বিরোধীদের জেলে কয়েদ করা এবং খুন করার ঘটনাবলী উল্লেখ করে লিপম্যান লিখলেন, "We do not trust Mussolini because we regard his regime as the supreme menace to the peace of Europe" — আমরা মুখোলিনিকে বিশ্বাস করি না। কারণ, আমরা মনে করি তার শাসন ইউরোপের শান্তির পক্ষে মহা বিপদ।

দীর্ঘ ১৪ বছর পরে লিপম্যানের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতারা ১৯২৫ সালে মুসোলিনিকে চিনতে ভুল করেছিলেন কিন্তু স্তম্ভলেখক মানুষ চিনতে ভুল করেননি।

ওই নিবন্ধে আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীকে সাবধান করে দিয়ে লিপম্যান লিখেছিলেন, "The fascist regime in Italy is a dictatorship which has had to become more dictatorial the longer

it has held power" — ইটালির ফ্যাসিস্ট শাসন স্বৈরতন্ত্রী শাসন। এই শাসন যত বেশি দীর্ঘায়িত হবে স্বৈরাচারও ততই বৃদ্ধি পাবে।

সম্পাদকের এই দূরদৃষ্টিও অনেক পরে প্রমাণিত হয়েছিল।

এই বিরল গুণাবলীর জন্যই লিপম্যানকে বলা হয় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্তম্ভকার। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লন্ডনের The Observer কাগজে Alistair Buchanan লিখেছিলেন, "The name that opened every door." Ten Days That Shook The World বইয়ের লেখক ও সাংবাদিক জন রিড (John Reed) ছিলেন লিপম্যানের সহপাঠি। তিনি বলতেন, লিপম্যান ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্য।

১৯৩১ সাল থেকে তিনি যে সব স্তম্ভ নিবন্ধ রচনা করেছেন, তার সাধারণ শিরোনাম ছিল Today and Tomorrow। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত নিবন্ধগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন কাগজে একযোগে প্রকাশিত হত।

পাঠকরা লিপম্যানের লেখা নিবন্ধগুলি থেকে সমস্যা সমাধানের পথ যত না খুঁজতেন তার থেকে বেশি খুঁজতেন খবরের পক্ষপাতহীন, আবেগশূন্য যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। লিপম্যান নিজেও সেটা জানতেন। তাই তিনি বলতেন, স্তম্ভকার আন্দোলনকারী নন, স্তম্ভকার ধর্মপ্রচারক নন। স্তম্ভকার জনকল্যাণে কখন রক্ষণশীল, কখন প্রগতিশীল; কখন পুঁজিবাদের সমর্থক, কখন সমাজতন্ত্রের।

আবেগ নয়— বিচারবুদ্ধি, গালিগালাজ নয়— যুক্তি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ নয়— সংযম এসবেরই নাম ওয়ল্টার লিপম্যান। স্তম্ভকার হিসাবে তিনি একজন আদ্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ।

১৯৭৪ সালে ৭৫ বছর বয়সে বিংশ শতাব্দীর এই মানবদরদী শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের জীবনাবসান হয়।

বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা কয়েকটি স্তম্ভনিবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব—

Life is Cheap
Taking a Chance
Quiet, Please
Devil's Advocates

৫.২.১২ বিষয়বস্তু নির্বাচন

পরের দিনের কাগজে কোন কোন বিষয়ে কি ধরনের খবর, মন্তব্য, স্তম্ভ, ফিচার, অন্যান্য রচনা থাকবে তা ঠিক করা বেশ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনারা আগেই জেনেছেন এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার সম্পাদকের, তার আগে পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধানরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।

মালিক যদি নিজেই সম্পাদক হন তো এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তাঁর তরফে নির্বাহী সম্পাদক। তাঁর সিদ্ধান্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মালিক-সম্পাদকের চিন্তা ও স্বার্থের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় ততক্ষণ নির্বাহী সম্পাদক নিরাপদ। তা না হলেই তাঁর বিপদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিতব্য বিষয়গুলি নির্বাচন করেন সহকারী সম্পাদকবৃন্দ। খবরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন বার্তা সম্পাদক। চিফ সাব এবং চিফ রিপোর্টার এই ব্যাপারে বার্তা সম্পাদককে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সাধারণভাবে প্রতিদিন কাগজে অনেক রকম ছোট বড়, গুরুত্বপূর্ণ, মামুলি খবর এসে জমা হয়। তার সবগুললি খবরকে একদিনের কাগজে স্থান দেওয়া যায় না। তাই প্রাপ্ত খবরগুলি যত্নের সঙ্গে বাছাই করতে হয়। দেখতে হয়, কোন খবরগুলি পরের দিনের কাগজে ধরাতেই হবে। কোন খবরগুলি সেদিন বা কোন দিন না ধরালেও কাগজের পাঠকদের বঞ্চিত করা হবে না। এই কাজ ভুল হলে এবং বারবার সেই ভুল হতে থাকলে কাগজ ক্রমশ পাঠকদের মন থেকে দূরে সরে যায়। কাগজের বিক্রি পড়তে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা সেই কাগজ সম্পর্কে আগ্রহ হারায়।

পাঠকরাই কাগজের শক্তির উৎস। সুতরাং তাঁদের চাহিদা কী, তাঁদের কৌতূহল কিসে, কোন বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ বেশি এসব বিষয়ের ওপরই খবরের গুরুত্ব নির্ভর করে। এসব বিষয়ে পাঠকদের মনের কথা যে রিপোর্টার, যে সাব-এডিটর, যে চিফ সাব, যে বার্তা সম্পাদক যত ভাল ভাবে বুঝতে পারেন তাঁর সংবাদ নির্বাচন তত ঠিক হয়।

সাংবাদিকরা নিজেরা কী চান, কী পছন্দ করেন, কী খবর পড়তে চান তার থেকে পাঠকের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য অনেক বেশি। কোন সাংবাদিক হয়ত ফুটবল ক্রিকেটকে বাজে ব্যাপার মনে করেন। তাই তিনি বাইচুং, ব্যারেটো, শচীন, সৌরভকে মাঝারি খবরের বেশি স্বীকৃতি দিতে চাননা। কিন্তু তাঁর কাগজের হাজার হাজার পাঠক এই বিষয়ে খুব বেশি উৎসাহী। তাঁদের কথা ভেবে সৌরভ শচীন বাইচুং ব্যারেটোকে প্রথম পাতায় বড় খবরের গুরুত্ব না দিলেই নয়।

আবার কোন সাংবাদিক মনে করতে পারেন সৌরভ শচীন বাইচুং ব্যারেটোই জীবন, বাকি সব ফালতু। কিন্তু হাজার হাজার পাঠক তা না মানতে পারেন। তাঁদের কথা উপেক্ষা করে কাগজের প্রথম পাতায় শুধুই ফুটবল ক্রিকেট, বাকিরা উপেক্ষিত। এমন সিদ্ধান্তের দ্বারা যে সাংবাদিক খবর নির্বাচন করবেন তিনি কাগজের ক্ষতি করবেন।

এই পরস্পরবিরোধী অবস্থা থেকে বোঝা যাচ্ছে, খবর নির্বাচনে বিভিন্ন বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শুধু খেলার খবর, শুধুই রাজনীতির খবর, শুধুই ব্যক্তিপূজা; বাকি সব কিছু আজেবাজে ব্যাপার এরকম ধারণা মনে গেঁথে থাকলে খবর নির্বাচনে ভুল হতে বাধ্য। তাই বিভিন্ন রুচির পাঠকের আগ্রহ সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে ভারসাম্য রক্ষা করে খবর বাছাই করা উচিত।

৫.২.১৩ সংবাদ সংস্কার

চিফ সাব এবং সাব-এডিটরদের কাজের বর্ণনা পড়ে আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন খবরাখবর যেমনভাবে লেখা হয় সব ক্ষেত্রে ঠিক তেমনভাবে তা কাগজে ছাপা সম্ভব নয়। খবরগুলি কাগজের প্রয়োজন, অন্য খবরের চাপ, অন্য খবরের গুরুত্ব, বিজ্ঞাপনের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে নির্বাচিত খবরগুলির সংস্কার করে নিতে হয়। হট মেটালের যুগে যে কাজ যারা করতেন কেউ কেউ তাঁদের বলতেন, "Man with a blue pencil", কেউ বা বলতেন, "The man in the green eyeshade"।

এই রহস্যময় মানুষগুলি পাঠকদের কাছে অপরিচিত। তাঁদের কর্মক্ষেত্র বার্তা বিভাগের News Desk — নিউজ ডেস্ক, কেউ কেউ বলেন Copy Desk — কপি ডেস্ক। সংক্ষেপে শুধুই ডেস্ক।

এই সুযোগে আমরা আর একবার Copy এবং Desk কে ভাল করে চিনে নিই। খবরের কাগজে Copy হল— "A term applied to all written material" — অর্থাৎ লিখিত সব বিষয়বস্তুই কপি। আর Copy Desk হল— "The desk, often horseshoe shaped, at which copy is edited. On smaller newspapers, frequently all copies is edited at a single universal desk. On larger papers there are usually several separate copy desks such as the city desk, telegraph desk, and cable desk" — অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতির যে টেবিলে কপি সম্পাদনা হয় তাকে ডেস্ক বলে। ছোট কাগজগুলিতে একটি বড় টেবিলের ওপর সব রকম খবর সম্পাদনা হয়। বড় কাগজগুলিতে শহরের খবর ও টেলিগ্রাফ যোগে পাওয়া খবর সম্পাদনার জন্য আলাদা আলাদা ডেস্ক থাকে।

খবর সম্পাদনা এক অর্থে খবর পরিমার্জনা বা সংস্কার (Process) করা। কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলা, আর পাঠকদের কাছে উপেক্ষিত ডেস্কে কর্মরত সাংবাদিকরা। কিন্তু প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের দক্ষতার ওপরই একটি কাগজ ঠিক সময়, নির্ভুলভাবে পাঠকদের হাতে পৌঁছবে কিনা তা নির্ভর করে।

খবর সংস্কারের কাজে গাফিলতি হলে নানা রকম ভুলের সম্ভাবনা থাকে। যথা—

এক বা একাধিক প্রয়োজনীয় খবর বাদ পড়ে যেতে পারে।

তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবরের জায়গার খানিকটা কেড়ে নিয়ে তার গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে।

বানান ভুল থেকে যেতে পারে।

ব্যাকরণ মেনে লেখা না হতে পারে।

বাক্যের গঠন অনাবশ্যক জটিল, বড় এবং অপাঠ্য হয়ে থাকতে পারে।

লিখন পদ্ধতিতে সমতা না থাকতে পারে।

লিখিত বিষয় রুচিসম্মত না হতে পারে।

প্রদত্ত তথ্যে ভুল থাকতে পারে।

এইসব গলদ নিয়ে কাগজ প্রকাশিত হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা নষ্ট হয়। ডেস্কের কাজ এই ধরনের গলদ ধরা ও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সংস্কার করে পরিবেশনযোগ্য করে তোলা। তছাড়া—

রিপোর্টারের মনের মাধুরী খবরে মিশে গেলে তাঁর বস্তুনিষ্ঠতা খর্ব হতে বাধ্য।

অনাবশ্যক বিশদ বিবরণ দিয়ে খবরের ভার বাড়াবার চেষ্টা হলে তার ভার ত বাড়েই না, ধারও নষ্ট হয়।

বাগাড়ম্বর পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব থাকলে পাঠকের ন্যায্য কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না।

বেখাপ্পা বর্ণনা পাঠকের হাসির কারণ হয়।

খবরের মধ্যে দিয়ে ছদ্ম বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে পারে।

আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়ে কাগজ সমস্যায় পড়তে পারে।

খবরেব নামে গুজব বা জনরব প্রচারিত হতে পারে।

পুরান খবর নতুন মোড়কে চালিয়ে দেওয়া হতে পারে।

একই বক্তব্য, একই তথ্য, একই বিবরণের পুনরাবৃত্তি থেকে যেতে পারে।

এসব গলদ ধরার জন্যই ডেস্ক। ডেস্ক শুধু গলদ ধরেই হাত ধুয়ে ফেলবে না। গলদগুলি ঝেড়ে মুছে, ছাঁটাই করে কপিকে পাতে দেওয়ার যোগ্য করে তুলবে। এ সবই খবর সম্পাদনা বা সংস্কারের অঙ্গ।

রিপোর্টারদের জব্দ করার জন্য বা তাদের অপদার্থ প্রমাণ করা খবর সংস্কারের লক্ষ্য নয়। এ কাজের উদ্দেশ্য কাগজের পাঠক ও গ্রাহককে তুষ্ট করা। তুষ্ট হলে বিজ্ঞাপনদাতারাও তুষ্ট হতে বাধ্য। পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতারা যে কাগজের ওপর তুষ্ট সে কাগজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত।

৫.২.১৪ লিখনপদ্ধতির সমতাবিধান

যে কোন বই বা সাময়িকপত্রের মত খবরের কাগজেও লিখনপদ্ধতির সমতা থাকা অপরিহার্য। এই বিষয়ে ভাষা বিশেষজ্ঞদের মতের ভিত্তিতে নীতি স্থির করবেন সম্পাদক। প্রত্যেক সাংবাদিককে লিখনপদ্ধতির নির্ধারিত রীতি অনুসরণ করতে হবে। তবেই সেই নির্দিষ্ট কাগজে লিখনপদ্ধতির সমতা বিধান সম্ভব হবে।

সম্পাদককে প্রথমে ঠিক করতে হবে তাঁর কাগজের ভাষা কী হবে— সাধু না চলিত? এই প্রশ্ন কেন আসছে সে কথাও আপনাদের জেনে রাখা উচিত। ষাটের দশকেও বাংলা খবরের কাগজগুলিতে সাধুভাষায় যাবতীয় লেখা প্রকাশিত হত। সেটাই ছিল তখনকার রীতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৫২ সালের জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সাধুভাষায় লেখা একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি—

কাজের পাগল

"অনেকে ভুল করে বলেছে, আমার ৭২ বৎসর হয়েছে: বাহাত্তুরে হলে পাগল হয়ই। আমাকে পাগল বলতে চান, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি বাজে পাগলের দলে নই। আমি নিজেকে কাজের পাগল মনে করতে চাই। আমি প্রতিমুহূর্তে নূতন শক্তি, নূতন চেতনা, নূতন ভাবধারা, নূতন জীবন নিয়ে নিত্যনূতন কাজের মধ্যে জন্ম নিতে চাই; বৎসরে বিশেষ একটি দিনে বিশেষ একটি ক্ষণে নহে।"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত মঙ্গলবার সায়াহ্নে কুমার সিং হলে তাঁহার একসপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সভায় ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে উপরোক্ত উক্তিতে সম্বর্ধনার উত্তর দেন। বিপুলভাবে পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া সাদা গলাবন্ধ কোট গায়ে ডাঃ রায়কে বিশেষ উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত মনে হইতেছিল। তিনি মাঝেমধ্যেই তাঁহার বক্তৃতায় কাব্যিকতা ও দার্শনিকতার অবতারণা করেন।

একসপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বক্তৃতার মাঝপথে কাব্যমুখর হইয়া উঠেন। উপমার সাহায্যে তিনি দার্শনিক কথাও বলেন। যেমন ত্যাগ ও ভোগ দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পাখীর গান, ফুলের গন্ধ ও চন্দ্রের কিরণের উল্লেখ করেন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বা শেষ দিক থেকে কলকাতার বাংলা কাগজগুলি একে একে সাধুভাষার বদলে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে চলিতভাষার দখলে চলে গেছে।

এই প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) বক্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান। ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় 'বাংলা ভাষার আধুনিক' রূপ শিরোনামে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রেসক্লাব,

কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত "১৪০১ সংবাদপত্রে শতাব্দী" স্মারক গ্রন্থে পুনপ্রকাশিত হয়েছিল। তার এক জায়গায় রাজশেখর লিখেছিলেন, "সাধুভাষার মানে সভ্যলোকের বা সভ্যলোকের ভাষা নয়। চলিতভাষার মানে প্রচলিত ভাষা নয়। বাংলা ভাষার বিশেষণ হিসাবে সাধু আর চলিত দুটিই রূঢ় শব্দ, দুই ভাষাই লৈখিক বা সাহিত্যিক। সাধা ও চলিতভাষার প্রধান প্রভেদ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের জন্য, যথা— "তাঁহারা বলিলেন" কিংবা "তাঁরা বললেন"।

কারো কারো ধারণা আছে, মুখের ভাষা আর চলিতভাষা একই। এই ধারণা ভ্রান্ত। তা কাটাবার জন্য রাজশেখর ওই প্রবন্ধে লিখেছেন, "লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয়, কথাবার্তায় ততটা হত পারে না।"

যথা?

রাজশেখর লিখেছেন, কোন লোক তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতেই পারেন, "গ্যালো রোব্বারে কোথা গেশলে হ্যা?"

এটা হল চলিতভাষার কথ্য রূপ। কিন্তু ওই ব্যক্তিই লেখার সময় সাবধান হয়ে লিখবেন, "গেল রবিবারে কোথা গিয়েছিলে হে?"

চলিতভাষায় লেখা মানে যেমন-তেমন করে লিখে ফেলা নয়। চলিতভাষা লেখার সময়েও তা সাবধানে ও নিয়মরীতি মেনে লিখতে হয়। তার ব্যতিক্রম হলে লেখক ও কাগজ দুইই ঠাট্টা তামাশার খোরাক হয়ে উঠবে। শিক্ষিত পাঠক সেই কাগজের ওপর ক্রমশ শ্রদ্ধা হারাবে।

নিয়ম নীতির কথাই যখন এসে গেল তখন আবার রাজশেখরের বক্তব্য স্মরণ করতে হয়। ওই প্রবন্ধে তিনি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে বলেছেন—

ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের সাধু রূপের বদলে চলিত রূপ গৃহীত হোক।

যে শব্দের সাধু আর চলিত রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধু রূপই বজায় থাকুক, যথা— "ওপর পেছন পেতল ভেতর" না লিখে "উপর পিছন পিতল ভিতর"।

যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার চলিত রূপই নেওয়া হোক, যথা— "কূয়া মিছা উঠান একচেটিয়া" স্থানে "কুয়ো মিছে উঠন একচেটে"।

বর্তমান সাধুভাষায় প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতরূপে রাখা হোক। "সত্য মিথ্যা নূতন অবশ্য শীঘ্র জিজ্ঞাসা" স্থানে "সত্যি মিথ্যে নোতুন অবিশ্যি শীগ্গির জিজ্ঞেস" লেখা হবে না।

এখন যে চলিত ভাষা বাংলা খবরের কাগজের অবলম্বন তার পোশাকি নাম মান্য চলিতভাষা। মান্য চলিতের লেখ্য রূপ বাংলা কাগজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের কাজ শেষ হয়ে গেল না। বরং তা শুরু হল। থেকে গেল বানানের প্রশ্ন। কোন শব্দের কী বানান লেখা হবে সেই বিষয়টি লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের ক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে।

রাজশেখর ওই প্রবন্ধে বানানের প্রসঙ্গটিও আলোচনা করেছেন। তিনি বানানকে "ভাষার তৃতীয় অঙ্গ" বলে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় অঙ্গটি যদি সর্বত্র একরূপ না হয়ে নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে আবির্ভূত হয় তাহলে তা খুবই গোলমেলে হয়ে উঠবে। তা যাতে না হয় তার জন্যই লিখনপদ্ধতিতে সমতবিধান করতে গেলে বানানে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য।

রাজশেখর বলেছেন, সংস্কৃতজাত ভাষায় রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না। যেমন— কর্ম লিখতে একটা ম যথেষ্ট, ম্ম দরকার নেই।

ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকলে অ-সংস্কৃত শব্দের শেষ বর্ণে হস্-চিহ্ন বর্জনীয়, যথা—"ওস্তাদ পকেট হুক ডিমা"। অসংস্কৃত শব্দে ণ থাকবে না। কেবল ন। "আরবী ফারসী ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে বাংলা বানানে S (s) স্থানে স, Sh (sh) স্থানে শ হবে। যথা— জিনিস সরকার ক্লাস নোটিস দন্ত্য স; শরম শুরু শাগরেদ শেমিজ পালিশ তালব্য শ।

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় বর্জনীয়। War — ওআর, ওয়ার নয়। কিন্তু Wire — ওয়ার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানের কতকগুলি নিয়ম সঙ্কলন করে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। রাজশেখর তাঁর ঐ প্রবন্ধে সে কথা উল্লেখ করেছেন।

তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। রাজশেখরের সময় যা ছিল 'কলিকাতা' এখন তা বাংলা খবরের কাগজে 'কলকাতা'।

রাজশেখর লিখতেন 'আরবী ফারসী ইংরেজী'। এখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি অনুযায়ী 'আরবি ফারসি ইংরেজি'।

আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি সবাই অনুসরণ করলে লেখনপদ্ধতির সমতাবিধানে বানানের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই একটা সমতা আসবে। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি মেনে নিয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে সেই বিধি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে। তবে পুরান অভ্যাস তো সহজে দূর হয় না।

লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানে আরও কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট সম্পাদকীয় নীতি থাকা দরকার। যেমন, নীচের বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি তাঁর কাগজে লেখা হবে—

বীরাপ্পন	—	বীরাপ্পান
জঙ্গি	—	জঙ্গী
অ্যাডমিশান টেস্ট	—	প্রবেশিকা পরীক্ষা
অগস্ট	—	আগস্ট
সনিয়া	—	সোনিয়া
গাঁধি	—	গান্ধী
গুজরাট	—	গুজরাত
বাজপেয়ী	—	প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী
আট	—	৮
কুড়ি	—	২০
আইনসভা	—	বিধানসভা
চন্দনদস্যু	—	জঙ্গলদস্যু
ভ্যাকসিন	—	টিকা
শচীন	—	সচিন

এই রকম প্রচুর শব্দ আপনাদের চোখে পড়বে যেগুলির ব্যবহারে নানা অসঙ্গতি রয়েছে। এমনও দেখবেন, একটি কাগজে একদিনের সংখ্যাতেই একজায়গায় বীরাপ্পন আর এক জায়গায় বীরাপ্পান লেখা হয়েছে। কোন কাগজ লেখে অগস্ট, কেউ লেখে আগস্ট, কেউ লেখে সোনিয়া, কেউ লেখে সনিয়া, কেউ লেখে জঙ্গি, কেউ লেখে জঙ্গী।

আকাডেমির বানানবিধিতে জঙ্গী, আগস্ট মান্য নয়। সংখ্যার ক্ষেত্রে ১ থেকে নয় পর্যন্ত শব্দে লেখাই চল, বাকিগুলি সংখ্যায়। আপনারাও এই নিয়ম মেনে চলবেন বলে আশা রাখি।

লিখনপদ্ধতির সমতাবিধান কেন দরকার এই বইয়ে সেই প্রসঙ্গই সংক্ষেপে আলোচনা কর হল। এই ব্যাপারটি বোঝার জন্য অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে মাত্র।

Killed বোঝাতে হত্যা না খুন না খতম, dead বলতে মৃত না নিহত কি লেখা হবে তার নির্দেশ থাকা দরকার।

হাতের কাছে 'খ' কাগজের ১১ আগস্ট ২০০২ সালের সংখ্যাটি রয়েছে। সেটি দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজি কথার কতটা বাংলা প্রতিশব্দ খবরে লেখা হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার। তা না থাকলে লেখার ধাঁচে সমতা আনা শক্ত। যেমন ধরুন—

জর্জ বুশকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, না আমেরিকার রাষ্ট্রপতি লেখা হবে ?

Planning Commission কে যোজনা কমিশন লেখা গেলে MOU — মউকে (Memorandum of Understanding) সমঝোতাপত্র লিখতে বাধা কোথায়? একই খবরে একবার "মউ", আর একবার "সমঝোতা পত্র", আর একবার "মউ বা সমঝোতাপত্র" লেখা হলে বুঝতে হবে লেখার ধাঁচে সমতা আনার ব্যাপারে ওই কাগজের চেষ্টার অভাব আছে।

ওই কাগজে একই দিনে লেখা হয়েছে, "শিল্প খাতে রাজ্যের টার্গেট"— "টার্গেট" কেন? লক্ষ্য কথাটি ওই কাগজের রিপোর্টার বা সাব-এডিটরের জানা থাকলে সেটাই লেখা হত।

লেখার ধাঁচে সমতা আনার চেষ্টা থাকলে কোন কাগজে যথেচ্ছ "হেস্তনেস্ত", "জেহাদ" এই রকম কথা ব্যবহার না করে বর্জন করা হত। "কম" বা "কমতি"কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে "থামতি" কথাটি জাঁকিয়ে বসতে পারত না।

'খ' কাগজের ওই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি খবরে লেখা হয়েছে, "রেল বিভাজন নিয়ে সোমবারের (১২ আগস্ট, ২০০২) মধ্যে কোন হেস্তনেস্ত না হলে" আরও বড় আন্দোলনের হুমকি। "আন্দোলনের হুমকি খবর হিসাবে বেশ গরম ঠিকই। কিন্তু এখানে "হেস্তনেস্ত" কথাটি খাটবে কি? "হেস্তনেস্ত" কথার মানে তো নিষ্পত্তি। তা রেলওয়ে জোন বিভাজনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একাধিক বার নিষ্পত্তি হয় গেছে। আর কি নিষ্পত্তি হবে? আর যা হতে পারে তা হল বিষয়টি পুনর্বিবেচনার পর বাতিল করা বা বহাল রাখা। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন "হেস্তনেস্ত" কথাটি এখানে মোটেই খাটে না। তবও খাটান হল কারণ, লেখার ধাঁচে সমতা রাখায় অবহেলা।

একই খবরে কিছু পরে লেখা হয়েছে, দলের নেতৃত্ব "দিল্লির বিরুদ্ধে খুব চড়া সুরে জেহাদের রাস্তা এড়িয়ে

এড়িয়ে গিয়েছেন"। "জেহাদ" বা "জিহাদ" কথার মানে "বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ"। এখানে জেহাদ না লিখে "সমালোচনা" বা "নিন্দা" লিখতে খবরের এতটুকু অঙ্গহানি হত না। লেখার ধাঁচে সমতা রাখার দিকে সতর্ক নজর থাকলে এ ক্ষেত্রে "জেহাদ" না লিখে "সমালোচনা" বা "নিন্দা" লেখা হত।

দৃষ্টান্ত বাড়ালে বাড়তেই থাকবে। তাই এই প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। ৯ আগস্ট ২০০২ তারিখে 'ক' কাগজে একটি খবরের শিরোনাম, "রাঢ়বঙ্গে বেস তৈরির ছক কষছে জনযুদ্ধ— মাওবাদীরা"।

ভেবে দেখুন তো, "বেস" লেখার বদলে "ঘাঁটি" লিখলে কাজ চলত কিনা। শিরোনামটি যে ভাবে লেখা হয়েছে তার বদলে "রাঢ় বঙ্গে মাওবাদী জঙ্গিদের ঘাঁটি তৈরির ছক" লিখলে বিষয়টি বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হত না, বরং সুবিধাই হত।

এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে, লিখনপদ্ধতির সমতারক্ষার চেষ্টা না থাকলে কাগজে এই ধরনের শব্দ বিভ্রাট ঘটতে থাকবে। তাতে খবর বোঝায় অসুবিধা হবে। খবর স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ করার জন্যই লেখার ধাঁচে সমতারক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। তার অন্যথা হলে একই কাগজে একই দিনে জর্জ বুশকে কেউ "মার্কিন প্রেসিডেন্ট", কেউ "আমেরিকার রাষ্ট্রপতি" লিখে ফেলবেন; একই খবরে এক জায়গায় "মউ" আর এক জায়গায় "সমঝোতাপত্র" ছাপা হয়ে যাবে। এইরকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার কোন সুসম্পাদিত কাগজের পক্ষে গৌরবের নয়।

খবর লিখনপদ্ধতির ও সম্পাদনার ধাঁচে সমতারক্ষার একটি সাধারণ নিয়মও খেয়াল রাখা দরকার। সেটি হল বাক্যের আকার কেমন হবে, অনুচ্ছেদের আকার কেমন হবে, ভাষা কেমন হবে, বক্তব্য নেতিবাচক হবে, না ইতিবাচক হবে। এই ব্যাপারে কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করা নির্দেশিকা হল, ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট অনুচ্ছেদ, মসৃণ ভাষা, নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক ভঙ্গি।

যে কাগজ তার রিপোর্টার, সাব-এডিটর ও অন্যান্য বিষয়ে লেখকদের ওই নির্দেশিকা মান্য করতে পারবে তা সলের প্রশংসা অর্জন করবে। পঞ্চাশ বা ষাট শব্দে গঠিত বাক্য পাঠক যতটা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবেন পাঁচ ছ'টি শব্দের বাক্য তার থেকে অনেক সহজে পড়া যাবে। পাঠক কষ্ট করে পড়বেন কেন? তাঁকে সহজে পড়াবার সুযোগ করে দিতে হবে।

৫.২.১৫ সংবাদ প্রদর্শনকলা

খবরের কাগজ আবির্ভাবের পর থেকে তাতে প্রদর্শনকলার (Display) জন্য বিশেষ কোন জায়গা ছিল না। পঞ্চাশের দশক থেকে কাগজগুলির সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রদর্শনকলার দিকে নজর দিতে শুরু করেন। তারও পরে খবরের কাগজ তৈরিতে হাই-টেক পদ্ধতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনকলা প্রয়োগের সুযোগ হঠাৎ খুবই বেড়ে যায়। সব কাগজই বুঝতে পারে পাঠক ও গ্রাহক টানতে হলে প্রদর্শনকলার দিকটি আর অবহেলা করা চলবে না। বরং তার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করতে হবে।

এই চেতনার বিকাশ হওয়ার পর থেকে প্রদর্শনকলার বিকাশও হয়েছে দ্রুত গতিতে। প্রদর্শনকলার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হল অঙ্গসজ্জা ও অঙ্গশোভার জন্য পরিকল্পনামাফিক নকশা প্রস্তুত করা। এ কাজ যাঁরা করবেন তাঁদের হরফ, ছবি ও গ্রাফিক্স সম্পর্কে প্রতিভা ও দক্ষতা থাকা দরকার। দরকার শিল্পীর মত চোখ ও মাত্রাজ্ঞান।

হরফ, ছবি, গ্রাফিক্সের সুসম ব্যবহার করার ক্রমতাই উন্নত মানের প্রদর্শনকলা। প্রয়োগের ক্ষেত্রে শেষ কথা। আর দরকার প্রদর্শনকলার রকমফের ঘটিয়ে তাতে বৈচিত্র্য আনা।

১১-৯-২০০২ তারিখে বিহারের রফিগঞ্জ ও দেওরোড স্টেশনের মধ্যে লাইনচ্যুত রাজধানী এক্সপ্রেসের ছবি আট কলম জুড়ে ছাপলে তা মোটেই বেমানান হবে না। একই ঘটনার ছবি দুই বা তিন কলম মাপের মধ্যে ছেপে দিলে ছবিটি যথাযথ গুরুত্ব পাবে না। প্রদর্শন-কুশলী সাংবাদিকের এই প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলে কাগজ মার খেতে বেশি দেরি হবে না। কাগজের প্রতি গ্রাহকদের আকর্ষণ বাড়াবার একটি বিশেষ উপায় হিসাবে এখানেই প্রদর্শনকলার গুরুত্ব।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। মনে করুন নানা রকম সুখাদ্য রান্না হল। আমন্ত্রিত অতিথিরাও এসে গেলেন। কিন্তু সে সব সুখাদ্য যেমন তেমন করে অতিথিদের সামনে ধরে দিলেন নিমন্ত্রণকর্তা। তাতে কোন আন্তরিকতার স্পর্শ নেই। নানা রকম খাদ্য পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। শালপাতার ওপর যেমন তেমন করে ঢেলে দেওয়া কতগুলি খাবার গড়াগড়ি যাচ্ছে। রান্না যতই সুন্দর হোক পরিবেশনে অবহেলার কারণে তার অনেকটা স্বাদই নষ্ট হয়ে যাবে না কি? কিন্তু তার বদলে সোনা বা রুপোর থালায় না হোক পরিষ্কার পাত্রে সেই সব খাদ্যগুলি সুচারুভাবে পরিবেশন করলে অতিথি তা সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তৃপ্ত হতেন। নিমন্ত্রণকর্তার প্রশংসা করতে করতে বিদায় নিতেন।

খবরের কাগজে সুচারু প্রদর্শনকলার প্রয়োজন অনেকটা এই রকমই।

৫.৩ সারাংশ

প্রত্যেক খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগে নানা রকম কাজ থাকে। সেই সব কাজ করার জন্য নানা শ্রেণির ও নানা পদমর্যাদার সাংবাদিকের দরকার হয়। তাঁদের সকলের ওপরে থাকেন সম্পাদক। সব সাংবাদিকের সব কাজে জন্য আইনের চোখে সম্পাদক দায়ী থাকেন।

কিন্তু একটি পুরো কাগজের সবকিছু সম্পাদক এক হাতে লিখতে ও কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে পারেন না। সেই জন্য তিনি সাংবাদিকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন।

সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদকরা কাগজের সম্পাদকের সাহায্যকারী। বার্তা বিভাগে সম্পাদককে সাহায্য করেন বার্তা সম্পাদক।

বার্তা সম্পাদকের একটি হাত চিফ সাব, আর একটি হাত চিফ রিপোর্টার। খবরের কাগজে পালাক্রমে কাজ চলে। প্রত্যেক পালা পরিচালনা করেন এক একজন চিফ সাব। কয়েকজন করে সব এডিটরের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে তাঁদের সাহায্যে নিউজ ডেস্কের কাজ চালান চিফ সাব। বাংলা কাগজের ডেস্কে সংবাদদাতা, রিপোর্টার এবং সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবরগুলি ছাপার জন্য তৈরি করা হয়।

রিপোর্টারদের সাহায্যে প্রকাশনা কেন্দ্রের অধীন শহরের যাবতীয় খবর যোগাড়ের ব্যবস্থা করেন চিফ রিপোর্টার। রিপোর্টারদের লেখা খবরগুলি প্রথমে তিনিই পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার পর কপিগুলি ডেস্কে পাঠিয়ে দেন তিনি।

বিশেষ সংবাদদাতারা বিশেষ বিশেষ খবর লেখেন, খবর বিশ্লেষণ করেন, বিশেষ খবরের বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, পটভূমি বর্ণনা করেন।

স্তম্ভকার নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর বিশ্লেষণ করেন। সেই বিশ্লেষণ তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

এসব ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয় সম্পাদকের দফতরে। তার মধ্যে রয়েছে কাগজে ছাপার জন্য কপি নির্বাচন করা। প্রতিদিন কাগজে যত কপি ছাপা হয় তার সব কিছু একদিনের কাগজে ধরাবার জায়গা থাকে না। তাই কোন কোন কপি ছাপা হবে, আর কোনগুলি বাদ যাবে তা বাছাই করতে হয়। সে কাজ হয় ডেস্কে।

খবর ছোট বা বড় করা, দরকারে নতুন করে লেখা, উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া এসব কাজও সাব-এডিটররা করে থাকেন।

খবর সংস্কারের সময় কাগজের নীতি অনুযায়ী লিখনপদ্ধতির সমতাবিধান করা হয়েছে কিনা স দিকেও সাব-এডিটররা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

এই সব কাজ শেষ হলে আরম্ভ হয় বিশেষ করে প্রথম পাতাটি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রদর্শনকলা প্রয়োগ করা।

এই সব পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন সংবাদপত্র তৈরি হয়।

৫.৪ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ভারতের সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

২। সম্পাদককে কী কী চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি কী ভাবে সেই সব চাপের মোকাবিলা করেন?

৩। খবরের কাগজের মূল উপাদান।

৪। ডেডলাইন (Deadline)।

৫। সমর সংবাদদাতাদের কাজ বিপজ্জনক— ব্যাখ্যা করুন।

৬। উত্তম রিপোর্টার।

৭। জিমির জগৎ (Jimmy's World)।

৮। সাব-এডিটরদের কাজ।

৯। স্তম্ভকারের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী।

১০। ওয়াল্টার লিপম্যান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সাংবাদিক কারা?

২। সব সাংবাদিককে কি একই ধরনের কাজ করতে হয়?

৩। সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ এবং পদবিন্যাস সম্পর্কে সর্বশেষ সরকারি চিঠি কোথায় পঞ্জিভুক্ত আছে?
৪। প্রত্যেক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রত্যেক পদের সাংবাদিক নিয়োগ করা কি বাধ্যতামূলক?
৫। বিধিতে বর্ণিত বিভিন্ন পদের সাংবাদিকের কাজের সংজ্ঞা কোথায় আছে?
৬। বিধিতে সাংবাদিকদের মোট কতগুলি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে?
৭। আইন অনুযায়ী সংবাদপত্র কাকে বলে?
৮। আইনের চোখে সম্পাদক।
৯। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে সম্পাদক।
১০। আইন অনুযায়ী খবরের কাগজে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পাদকের দায়িত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১১। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে সংবিধানে কি ব্যবস্থা আছে?
১২। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কিভাবে পাওয়া গেল?
১৩। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অবাধ অথবা সীমাবদ্ধ—সংক্ষেপে উত্তর দিন।
১৪। ভারতের সংবিধানের ১৯(২) ধারার বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।
১৫। সফল সম্পাদক কে?
১৬। খবরের কাগজের শক্তির উৎস কারা?
১৭। খবরের কাগজের ব্যর্থতার দায় কার?
১৮। অ্যাডলফ এস ওখস সাংবাদিক নিয়োগে কি মাপকাঠি ব্যবহার করতেন?
১৯। সব রকম খবর কি ছাপার যোগ্য—এই ব্যাপারে অ্যাডলফ ওখসের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?
২০। এ ব্যাপারে অ্যাডলফ ওখসের নীতি কি এখনও বহাল আছে?
২১। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কোন কাগজে সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন?
২২। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পরবর্তী জীবনে কোন কোন কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন?
২৩। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কলমের জোর কেমন ছিল?
২৪। সত্যেন্দ্রনাথর মজুমদার কোন সম্পেলনে খবরের কাজ ও তার সম্পাদক সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন?
২৫। খবরের কাগজকে সত্যেন্দ্রনাথ কী চোখে দেখতেন?
২৬। খবরের কাগজের সম্পাদককে সত্যেন্দ্রনাথ কিভাবে বর্ণনা করেছেন?
২৭। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন?
২৮। অমৃতবাজার পত্রিকা কোন ভাষায় প্রকাশিত হত?
২৯। অমৃতবাজার পত্রিকার নীতি কি ছিল?
৩০। অমৃতবাজার পত্রিকাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তার সম্পাদক?
৩১। অমৃতবাজার পত্রিকাকে কোন রাজপুরুষ কিভাবে বশ করার চেষ্টা করেছিলেন? তাঁর চেষ্টা কি সফল হয়েছিল?
৩২। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা কাগজ যুগান্তর-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন?
৩৩। তাঁর সাংবাদিক জীবন কোন কাগজে আরম্ভ হয়েছিল?
৩৪। তাঁর কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি প্রকাশের জন্য সরকার কাগজের জামানত বাজেয়াপ্ত করেছিল?

৩৫। যুগান্তরে প্রকাশিত তাঁর কোন সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছিল? এই বিষয়ে যা জানেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

৩৬। সম্পাদক ও সম্পাদকীয় সম্পর্কে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের শেষ জীবনে কি ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল?

৩৭। সম্পাদক ও সম্পাদকীয়ের অবমূল্যায়ন হয়েছে এই মতের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মন্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩৮। নির্বাহী সম্পাদকের কাজ সম্পর্কে যা জানেন তা লিখুন।

৩৯। বেন ব্রাডলি কোন কাগজের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে তাঁর সহকর্মীরা কি বলত? তাঁর পুরো নাম কি?

৩৯। নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে বেন কি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন?

৪০। বেন ব্রাডলির দৈনন্দিন কাজের রুটিন কি ছিল?

৪১। এ এস রোসেনথাল কোন কাগজের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন? তাঁর পুরো নাম কি?

৪২। তিনি প্রথম জীবনে নিউইয়র্ক টাইমসে কি পদে কাজ করতেন?

৪৩। বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে তিনি কোন দেশে কাজ করেছেন?

৪৪। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের ম্যানেজিং এডিটর থাকাকালে ওই কাগজে সবচেয়ে বড় কি খবর ফাঁস হয়েছিল এবং তার বিষয়বস্তু কি ছিল?

৪৫। সহকারী সম্পাদকের কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৪৬। সহকারী সম্পাদকদের ওপর কি কি কাজের ভার দেন সম্পাদক?

৪৭। সম্পাদকীয় পাতার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যই সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়— ব্যাখ্যা করুন।

৪৮। সহকারী সম্পাদকরা কি পদ্ধতিতে লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন?

৪৯। খবরের কাগজে বার্তা সম্পাদক কি কাজ করেন?

৫০। খবরের কাগজের মূল উপাদান সম্পর্কে কী জানেন?

৫১। স্থানীয় সংবাদ কী?

৫২। রাজ্যস্তরের সংবাদ কী?

৫৩। জাতীয় স্তরের সংবাদ কী?

৫৪। আন্তর্জাতিক সংবাদ কী?

৫৫। 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা কোন রাজনীতির সমর্থক ছিল? তার বিরোধী মতের সমর্থক ছিল কোন পত্রিকা।

৫৬। সার্ভেন্টের সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদক কারা ছিলেন?

৫৭। একজন বার্তা সম্পাদকের কাজের রুটিন কেমন হওয়া উচিত?

৫৮। বার্তা সম্পাদক কাজের মাধ্যমে বার্তা বিভাগের কাজের সমন্বয় করেন কিভাবে?

৫৯। একজন সফল বার্তা সম্পাদকের কি কি গুণ থাকা দরকার?

৬০। বার্তা সম্পাদকের গুরুত্ব কমাতে বেন কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

৬১। নিউজ ডেস্ক নির্দিষ্ট পালার পরিচালক কে?

৬২। নিউজ ডেস্কের পরিচালককে কি কি কাজ করতে হয়— সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৬৩। সকালের খবরের কাগজে সাধারণত কতগুলি শিফটে কাজ হয়?

৬৪। কোন পালায় খবরের চাপ সবথেকে বেশি বেড়ে যায়?

৬৫। রাত্তের পালায় কোন কাজের চাপ আসে?

৬৬। সাব-এডিটরদের কোন কোন কাজের ভার দেন চিফ সাব?

৬৭। চিফ সাব বার্তা সম্পাদকের চোখ ও ডান হাত— ব্যাখ্যা করুন।

৬৮। মাঝের পালার চিফ সাব কি ভাবে কাজ করেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৬৯। প্রথম পাতা সাজাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি ভাবে নেওয়া হয়?

৭০। কাগজ ছাপার আদেশ কে দেন?

৭১। কাগজ ছাপার আদেশ দেবার আগে তা নির্ভুল করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

৭২। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে চিফ রিপোর্টারকে কি ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭৩। রিপোর্টারদের সর্বেসর্বা তাঁদের চিফ রিপোর্টার— ব্যাখ্যা করুন।

৭৪। রিপোর্টারদের মধ্যে কারা চিফ রিপোর্টারের অধীন এবং কারা নয় তা বর্ণনা করুন।

৭৫। চিফ রিপোর্টারের পরের দিনের কাজ শুরু হয় আগের দিন রাতে— ব্যাখ্যা করুন।

৭৬। বার্তা বিভাগের কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য চিফ রিপোর্টারকে কি করতে হয় তা বর্ণনা করুন।

৭৭। রিপোর্টারদের কপি কে কি ভাবে প্রাথমিক পরীক্ষা করেন?

৭৮। চিফ রিপোর্টারের ওপরওলা কে?

৭৯। কোন রিপোর্ট হাতছাড়া হলে তার জন্য কে কার কাছে কৈফিয়ৎ দেন?

৮০। বিশেষ সংবাদদাতার কাজকর্ম সম্পর্কে যা জানের তা বর্ণনা করুন।

৮১। বিশেষ সংবাদদাতা শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য সংবাদদাতাদের পদগুলি উল্লেখ করুন।

৮২। নির্বাচনে কোন ক্ষমতাসীন দল তুলনামূলকভাবে খুব কম গরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবার দেবার দায়িত্ব রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের ওপর পড়ে?

৮৩। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একজন সাব-এডিটরকে কি কি কাজ করতে হয়?

৮৪। ছাপার ব্যাপারে খবরেরঅগ্রাধিকার কি বাবে নির্ধারিত হয়?

৮৫। রিপোর্টারের কপিতে কোন কোন গলদ থাকলে দক্ষ সাব-এডিটর তা ছাঁটাই করেন?

৮৬। কোন অভিযোগে আদালত কাউকে সাজা দিয়েছে কপিতে এমন কথা লেখা হলে সাব-এডিটর কি করবেন?

৮৭। ভারত সরকারের সংজ্ঞায় রিপোর্টার কাকে বলে?

৮৮। রিপোর্টারকে কি কি কাজ করতে হয়?

৮৯। খবর বলতে আপনি কি বোঝেন?

৮৯। বাস্তবে যা ঘটে বা যা বলা হয় তার মধ্যে খবর বলে কোন বিষয়গুলি বিবেচিত হয়?

৯০। খবর চেনার জ্ঞান কাকে বলে?

৯১। খবরের রকমফের আছে— ব্যাখ্যা করুন।

৯২। প্রত্যাশিত খবর সম্পর্কে যা জানেন তা লিখুন।

৯৩। অপ্রত্যাশিত খবর বলতে কি বোঝেন?

৯৪। প্রত্যাশিত খবরের কি অপ্রত্যাশিত পরিণতির দু'একটি উদাহরণ দিন।
৯৫। "চন্দ্রকোণায় প্রায় চার একর জমি আত্মসাতের অভিযোগ" শিরোনামে প্রকাশিত খবরটি ঠিক করে সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন।
৯৬। প্রেস কার্ড সম্পর্কে যা জানলেন তা লিখুন।
৯৭। পুরো সত্য লেখা রিপোর্টারের কাজ নয়, তার পক্ষে তা সম্ভবও নয়— ব্যাখ্যা করুন।
৯৮। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল কেন?
৯৯। স্তম্ভকারের কাজ কারা করেন?
১০০। স্তম্ভলেখক জে এন সাহানি এবং এস নিহাল সিং সম্পর্কে কী জানেন?
১০১। ওয়াল্টার লিপম্যানের লেখা কয়েকটি স্তম্ভের শিরোনাম লিখুন।
১০২। খবরের কাগজের বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি ও গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১০৩। খবর নির্বাচনে বারবার ভুল হতে থাকলে তার পরিণাম কি হয়?
১০৪। সাধুভাষায় লেখা উপরের খবরটি চলিতভাষায় লিখুন।
১০৫। বাংলা খবরের কাগজে চলিতভাষা চালু হওয়ার সময়ে কাদের কী অসুবিধা হত?
১০৬। লিখনপদ্ধতির রক্ষার ব্যবস্থা কেন দরকার তা দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা করুন।
১০৭। লেখার ধাঁচে সমতারক্ষার সাধারণ নির্দেশিকা কি?
১০৮। পাঠকের পছন্দ ছোট ছোট বাক্য, না বড় বড় বাক্য— আপনি কি মনে করেন?
১০৯। সম্পাদকের কাজ ও দায়িত্ব।
১১০। সহকারী সম্পাদকদের কাজ।
১১১। চিফ সাব এডিটরের কাজ।
১১২। চিফ রিপোর্টারের কাজ।
১১৩। সাব এডিটরদের কাজ।
১১৪। রিপোর্টারদের কাজ।
১১৫। বিশেষ সংবাদদাতাদের কাজ।
১১৬। লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের প্রয়োজন।
১১৭। প্রদর্শনকলার গুরুত্ব।
১১৮। বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি ও গুরুত্ব।

টীকা লিখুন :

১। অ্যাডলফ এস ওখস।
২। The Vernacular Press Act.
৩। ওই আইনকে এড়াবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার ব্যবস্থা।
৪। বেন ব্রাডলি।
৫। ডেস্ক
৬। বাসি, খবর, এঁটো খবর।

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১। খবরের কাগজের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যায় তার _______ নাম ছাপা বাধ্যতামূলক।

২। _______ খবরের কাগজের শক্তির একমাত্র উৎস।

৩। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর কাগজকে _______ সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

৪। _______ কাজে সহকারী সম্পাদক নিয়মিতভাবে সাহায্য করেন।

৫। বার্তা বিভাগের যাবতীয় কাজের সমন্বয় করেন _______ _______।

৬। খবরের কাগজের প্রধান উপাদন _______।

৫.৫ উত্তর-সংকেত

প্রশ্ন ৫.১ (ক) ১.১ অনুচ্ছেদ থেকে নিজে উত্তর করুন।

প্রশ্ন ৫.২ (ক) ১.২ অনুচ্ছেদ থেকে নিজে উত্তর করুন।

প্রশ্ন ৫.২.১ (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) : অনুচ্ছেদটি থেকে উত্তর খুঁজে নেওয়া খুব সহজ কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.১ (i) (ক) অনুচ্ছেদটি থেকে উত্তর তৈরি করুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (ii) (ক), (খ), (গ) অনুচ্ছেদের মধ্যেই উত্তর আছে।

প্রশ্ন ৫.২.২ (iii) (ক) ভারতের সংবিধানের ১৯(১) (ক) ধারায় নাগরিকদের বক্তব্য ও মনোভাব প্রচার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার ভারতের প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। এই ধারার ব্যাখ্যা করে আদালত বলে দিয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ওই ধারার অন্তর্গত একটি বিষয়।

(খ) ভারতের সংবিধানের ১৯(১) (ক) ধারার ব্যাখ্যা করে আদালত বলে দিয়েছে, সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা ওই ধারার অন্তর্গত একটি বিষয়। আদালতের এই ব্যাখ্যাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হয়ে আছে।

(গ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একদিকে অবাধ, অন্যদিকে সীমাবদ্ধ। সংবিধানসম্মতভাবে যে কোন বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, সমর্থন, বিরোধিতা, প্রশংসা, সমালোচনা সবকিছুই বিনা বাধায় খবরের কাগজে লেখার স্বাধীনতা আছে।

অন্যদিকে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কুৎসা, অশ্লীলতা, হিংসায় প্ররোচনা, সাম্প্রদায়িকতা, দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বিষয় সংবাদপত্রে লেখা চলে না। তবুও তেমন কিছু লেখা হলে তা বেআইনি ও দণ্ডযোগ্য বলে গণ্য হবে। সেই হিসেবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইনের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।

(ঘ) নিজে লেখার চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (iv) (ক) যে সম্পাদক তাঁর কাগজের দিকে পাঠকদের বেশি করে টানতে ও ধরে রাখতে পারেন তিনি একজন সফল সম্পাদক বলে স্বীকৃত হন।

(খ) পাঠকরাই খবরের কাগজের শক্তির একমাত্র উৎস।

(গ) পাঠকদের কাগজের দিকে টানতে ও ধরে রাখতে ব্যর্থতার দায় একমাত্র সম্পাদকের।

প্রশ্ন ৫.২.২ (v) (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদের মধ্যে থেকে উত্তর বার করে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (vi) (ক) অ্যাডলফ এস ওখস মনে করতেন সমকামিতা, যৌনতা, দৈহিক ব্যাপার ছাড়া বাকি সব খবরই ছাপার যোগ্য।

(খ) খবরের যোগ্যতা নির্ধারণে ওখসের নীতি এখন আর বহাল নেই।

প্রশ্ন ৫.২.২ (vii) (ক) আনন্দবাজার পত্রিকা।

(খ) যুগান্তর, অরণি, স্বরাজ, সত্যযুগ।

(গ) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বিষয়ে বলা হয়েছিল, তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ, তীক্ষ্ণধী, শক্তিমান লেখক। সম্পাদকরূপে তিনি ছিলেন সব্যসাচী।

(ঘ) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ খবরের কাগজ ও সম্পাদকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে ওই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(ঙ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজে উত্তর লিখুন।

(চ) অনুচ্ছেদটির প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে নিজের ভাষায় উত্তর লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (viii) (ক) শিশিরকুমার ঘোষ।

(খ) সূচনায় ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হত। পরে তা সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হত।

(গ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজের ভাষায় উত্তর লিখুন।

(ঘ) অমৃতবাজার পত্রিকাকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ।

(ঙ) বাংলার লাটসাহেব স্যার অ্যাশলি ইডেন অমৃতবাজার পত্রিকাকে বশ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাটসাহেবের দেওয়া ক্ষমতার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ।

(চ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজের ভাষায় লিখুন।

(ছ) আইন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক কাগজটিকে পুরোপুরি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রশ্ন ৫.২.২ (ix) (ক) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

(খ) আনন্দবাজার পত্রিকা।

(গ) সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, "সাহিত্যে সরকারি দৌরাত্ম্য"।

(ঘ) প্রশ্নের উত্তরটি নিজে লিখুন।

(ঙ) শেষ জীবনে বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল সম্পাদকের বা সম্পাদকীয়ের অবমূল্যায়ন ঘটেছে।

(চ) প্রশ্নের উত্তর নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.৩ : নির্বাহী সম্পাদক সম্পাদকের বকলমে সম্পাদকীয় দপ্তর পরিচালনা করেন। তার পদাধিকার সম্পাদকের সমতুল্য হলেও তাঁর ক্ষমতা সম্পাদকের সমান নয়। তাঁকে নিয়ন্ত্রণের রাশ থাকে সম্পাদকের হাতে।

প্রশ্ন ৫.২.৩ (i) (ক) বেন ব্রাডলি দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সহকর্মীরা বলতেন ধূর্ত চটপটে শেয়াল। তাঁর পুরো নাম ছিল, বেঞ্জামিন ক্রাউনিনশিল্ড ব্রাডলি।

(খ) নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে বেন ব্রাডলির লক্ষ্য ছিল ওয়াশিংটন শহরে পোস্টকে সর্বাধিক পঠিত খবরের কাগজে পরিণত করা।

(গ) বেন ব্রাডলি প্রতিদিন সকাল সকাল দফতরে আসতেন। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে রিপোর্টার এবং সাব-এডিটরদের মহলে টহল দিতেন।

প্রশ্ন ৫.২.৩ (ii) (ক) নিউইয়র্ক টাইমস। আব্রাহাম মাইকেল রোসেনথাল।

(খ) আংশিক সময়ের সংবাদদাতা।

(গ) ভারত, পোল্যান্ড এবং জাপান।

(ঘ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিজে উত্তর লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.৪ (ক) সম্পাদকের কাজে সহকারী সম্পাদক নিয়মিতভাবে সাহায্য করেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধসহ মন্তব্য ও মতামতধর্মী বিভিন্ন বিষয়ে লেখাও তাঁর কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.৪ (i) (ক) ও (খ) নিজে উত্তর তৈরি করুন।

প্রশ্ন ৫.২.৪ (ii) (ক) সহকারী সম্পাদকরা রোজ দুপুরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময় করে সম্পাদকের অনুমোদন ক্রমে লেখার বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিকোণ স্থির করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (ক) বার্তা সম্পাদক খবরের কাগজের বার্তাবিভাগের যাবতীয় কাজে সমন্বয় ও তদারক করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (i) (ক) স্থানীয়, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন খবরকে খবরের কাগজের মূল উপাদন বলা হয়।

(খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) : নিজে ভাবনা চিন্তা করে বিস্তারিত উত্তর লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (ii) (ক) "সার্ভেন্ট" পত্রিকা গান্ধীজি ও কংগ্রেসের রাজনীতি সমর্থন করত। তার বিপরীত রাজনীতি সমর্থন করত "ফরোয়ার্ড"।

(খ) "সার্ভেন্ট"-এর সম্পাদক ছিলেন পন্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং বার্তাসম্পাদক ছিলেন বিধুভূষণ সেনগুপ্ত।

(গ) অনুচ্ছেদে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিজের উত্তর রচনা করুন।

(ঘ) চিফ সাব-এডিটর এবং চিফ রিপোর্টারের মাধ্যমে বার্তা সম্পাদক বিভাগীয় কাজকর্ম সমন্বয় ও তদারক করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (iii) (ক) একজন সফল বার্তা সম্পাদকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা দরকার—

আপৎকালে বিভিন্ন বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান।

প্রাসঙ্গিক খবরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য কী কী উপাদন দরকার সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা।

সেই সব উপাদান যোগাড়ের সূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।

খবরের গুরুত্ব এক লহমায় বুঝে নেবার মত ঘ্রাণশক্তি ও পাঠকদের নাড়ীজ্ঞান।

একটানা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার মত মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা।

প্রশ্ন ৫.২.৫ (iv) (ক) দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক। পুরো নাম বেঞ্জামিন ক্রাউনিনশিল্ড ব্রাউলি।

(খ) বার্তা সম্পাদকের গুরুত্ব কমাতে বেন ব্রাডলি বার্তাবিভাগকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন–
–বৈদেশিক, জাতীয় ও স্থানীয়। তিনজন ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটরকে তিনি ওই তিনটি উপবিভাগ পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (ক) চিফ সাব-এডিটর, সংক্ষেপে চিফ সাব।

(খ) নিউজ ডেস্কের পচিচালক চিফ সাব তাঁর হাতের খবরগুলি সম্পাদনা করার জন্য সাব-এডিটরদের মধ্যে ভাগ করে দেন, তাঁদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেন, কোন খবর, কোন পাতার কোন জায়গায় কতটা স্থান জুড়ে ছাপা হবে তা ঠিক করেন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (i) (ক) তিনটি— দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত।

(খ) সন্ধ্যার পালায় খবরের চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে।

(গ) রাতের পালায় কাগজের প্রথম পাতা সাজাবার চাপ সবথেকে বেশি থাকে।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (ii) (ক) সাব-এডিটরদের রিপোর্টারদের কপি সম্পাদনার ভার দেন চিফ সাব। বাংলা কাগজে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর তরজমা এবং সম্পাদনাও তাঁদের করতে দেওয়া হয়।

(খ) নির্দিষ্ট পালার মধ্যে ডেস্ক যে-সব খবরের বিলি বন্দোবস্ত করে তার ব্যবস্থাপনা করে থাকেন চিফ. সাব। সেই জন্য তাঁকে বার্তা সম্পাদকের চোখ ও ডান হাত বলে বর্ণনা করা হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (iii) (ক) নিজে লেখার চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (iv) (ক) বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে সন্ধ্যা ও রাতের পালার চিফ সাবদ্বয় বৈঠক করে প্রথম পাতা সাজাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

(খ) চিফ সাব কাগজ ছাপার আদেশ দেন।

(গ) পুরো প্রথম পাতর প্রুফটি তিনি আগাগোড়া সতর্কভাবে পরীক্ষা করার পর কাগজ ছাপার অনুমতি দেন।

প্রশ্ন ৫.২.৬ (v) (ক) চিফ সাব যে টেবিলে সাব-এডিটরদের নিয়ে যাবতীয় সংবাদ সম্পাদনা করেন তাকে নিউজ ডেস্ক সংক্ষেপে ডেস্ক বলা হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (ক) নিজে লিখুন।

(খ) খবরের কাগজের মূল কেন্দ্রে নিযুক্ত রিপোর্টাররা চিফ রিপোর্টারের দ্বারা পরিচালিত হন। এই জন্য চিফ রিপোর্টারকে রিপোর্টারদের সর্বেসর্বা বলা হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (i) (ক) খবরের কাগজের মূল কেন্দ্রে নিযুক্ত স্টাফ রিপোর্টাররা চিফ রিপোর্টারের অধীন। বিশেষ সংবাদদাতা, রাজনৈতিক সংবাদদাতা, সংসদীয় সংবাদদাতারাও রিপোর্টার কিন্তু তাঁরা কেউ চিফ রিপোর্টারের দ্বারা পরিচালিত হন না।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (ii) (ক) সারা দিনের কাজ সুসম্পন্ন করে রাতে বাড়ি ফেরার আগে চিফ রিপোর্টার পরের দিনের প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত খবর সংগ্রহের জন্য রিপোর্টারদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেন। এই জন্যেই বলা হয় চিফ রিপোর্টারের পরের দিনের কাজ আরম্ভ হয় আগের দিন রাতে।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (iii) (ক) ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরের দিনের কাগজ প্রকাশের পরিকল্পনা করা এবং প্রয়োজনে তার রদবদলের ব্যাপারে ডেস্কের সঙ্গে রিপোর্টিং বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করেন চিফ রিপোর্টার।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (iv) (ক) রিপোর্টারদের কপি প্রথম পরীক্ষা করেন চিফ রিপোর্টার। সমস্ত তথ্য নির্ভুল কি না, মুখবন্ধ ঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা এবং বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগ যথাযথ কি না ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা চিফ রিপোর্টারের কাজ। কপিতে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক এবং ব্যক্তিগত মন্তব্য থাকলে তা কড়া হাতে কলম চালিয়ে কেটে দেওয়াও তাঁর কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.৭ (v) (ক) বার্তা সম্পাদক চিফ রিপোর্টারের ওপরওলা।

(খ) কোন বড় খবর হাতছাড়া হলে চিফ রিপোর্টারের কাছে তার কারণ জানতে চাইতে পারেন বার্তা সম্পাদক।

প্রশ্ন ৫.২.৮ (ক) বিশেষ সংবাদবাতা আইনসভা, সংসদ, রাজনৈতিক বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ খবর লেখেন এবং তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি কাগজের মূল কেন্দ্র, এক বা একাধির রাজ্যের রাজধানী, দেশের রাজধানী বা বিদেশে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হতে পারেন বা বিশেষ কোন ঘটনার খবর সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হতে পারেন।

প্রশ্ন ৫.২.৮ (i) (ক) রাজনৈতিক সংবাদবাদাতা, বৈদেশিক সংবাদদাতা, সমর সংবাদদাতা, সংসদীয় সংবাদদাতা ও শ্রেণিগতভাবে বিশেষ সংবাদদাতার সমতুল্য।

প্রশ্ন ৫.২.৮ (ii) (ক) সেই প্রশ্নগুলি হল—

বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কি ফের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন?

নতুন মন্ত্রিসভা কেমন হবে?

পুরান মন্ত্রীদের মধ্যে কারা বাদ যাবেন?

নতুন মন্ত্রী কারা হতে পারেন?

পুরান মন্ত্রীদের মধ্যে কাদের ক্ষমতা বাড়বে?

এত স্বল্পগরিষ্ঠতার সরকার কতদিন স্থায়ী হবে?

বিরোধী পক্ষ কি ভাবছেন?

প্রশ্ন ৫.২.৯ (ক) নিজে লিখুন।

(খ) খবরের গুরুত্ব, তা ঘটার সময় এবং খবরটি কখন ডেস্কে এল তা বিচার করে খবরের অগ্রাধিকার স্থির করা হয়।

(গ) দিনের খবর দিনের মধ্যে ডেস্কে না এলে তা বাসি খবর হয়ে যায়। অন্য কাগজে আগেই বেরিয়ে যাওয়া খবর এঁটো খবর বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ৫.২.৯ (i) (ক) রিপোর্টারের কপিতে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, নিজস্ব মন্তব্য, একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্য নজরে পড়লে তা বর্জন করা সাব-এডিটরের অন্যতম কাজ।

প্রশ্ন ৫.২.৯ (ii) (ক) সাব-এডিটর ভুল শব্দটি বাদ দিয়ে ঠিক শব্দটি লেখবার জন্য রিপোর্টারকে বলবেন। অথবা নিজেই ভুলটি ঠিক করে দেবেন। এক্ষেত্রে "অভিযোগ" সাজার কারণ বলে বর্ণনা করা ভুল। সাজার কারণ "অপরাধ" লেখা ঠিক।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (ক) নিজে লিখুন।

(খ) রিপোর্টার খবর যোগাড় করেন, লেখেন এবং ছাপার জন্য চিফ রিপোর্টারকে দেন।

(গ) যে ঘটনা নতুন ঘটল তা যখন সাধারণ মানুষ জানতে চায় তখন তা খবরে পরিণত হয়।

(ঘ) বাস্তবে যত ঘটনা ঘটে তার মধ্যে যেগুলির বিবরণ জানতে অনেক মানুষের আগ্রহ থাকে সেগুলি খবর বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (i) (ক) খবর প্রধানত দু'রকম—প্রত্যাশিত খবর এবং অপ্রত্যাশিত খবর।

(খ) যে-সব ঘটনা আগে থেকে নির্ধারিত থাকে এবং যে-সব সূত্র থেকে খবর পাবার সম্ভাবনা থাকায় রিপোর্টার সময়মত হাজির সেগুলি প্রত্যাশিত খবর।

(গ) যে-সব ঘটনা আগাম জানান না দিয়ে হঠাৎ বা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটে যায় সেগুলি অপ্রত্যাশিত খবর।

(ঘ) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (ii) (ক) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (iii) (ক) প্রেস কার্ড রিপোর্টারদের দেওয়া সরকারি পরিচয়পত্র। নিরাপত্তার কারণে সংরক্ষিত এলাকায় প্রেস কার্ড থাকলে ঢোকা যায়। বিপজ্জনক এলাকায় খবর যোগাড়ের জন্য যেতে হলে সঙ্গে প্রেস কার্ড থাকা দরকার।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (iv) (ক) রিপোর্টার কখনও কোন কারণে মিথ্যা খবর লিখবেন না। তবে পুরো সত্য লেখা তাঁর কাজ নয়, তার পক্ষে ত সম্ভবও নয়। তার অনেক কারণ। ধরুন, একজন জননেতা টানা এক ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন। পুরো সত্য লিখতে গেলে পুরো ভাষণটাই লিখতে হয়। কিন্তু কাগজে তা ছাপার জায়গা হবে না। জায়গা হলেও পাঠকরা তা পড়বেন না। সুতরাং ভাষণের যেটুকু অংশ জনসাধারণের জানা দরকার বলে রিপোর্টার মনে করবেন তিনি সততার সঙ্গে, অবিকৃতভাবে এবং প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে সেই অংশটুকু খবরে ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন ৫.২.১০ (v) (ক) ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিউইয়র্ক টাইমসে ফাঁস হয়েছিল। তার জেরে রিচার্ড নিক্সন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ওয়াটারগেট ওয়াশিংটনের একটি বিশাল আবাসন। এর একটি ফ্ল্যাটে নিক্সনের প্রতিপক্ষ ডেমোক্রাটিক পার্টির একটি অফিস ছিল। সেই অফিসে ডেমোক্রাটিক পার্টির বড় বড় নেতারা নির্বাচনের কৌশল আলোচনা করতেন। অফিসটিতে সিঁধ কেটে চুরি করতে গিয়ে পাঁচজন লোক ধরা পড়ে। বব উডওয়ার্ড এবং কার্ল বার্নস্টাইনসহ নিউইয়র্ক টাইমসের কয়েকজন রিপোর্টার অনুসন্ধান করে লিখতে থাকেন, ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের গোপন কথাবার্তা শোনার জন্য আড়ি পাতার যন্ত্র বসাবার চেষ্টা হয়েছিল। এই কাজে হোয়াইট হাউসের মদত ছিল। সব ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতি নিক্সনের জ্ঞাতসারে ঘটেছিল।

প্রশ্ন ৫.২.১১ (i) (ক) সম্পাদক তাঁর কাগজের কোন স্থায়ী সাংবাদিককে স্তম্ভকারের দায়িত্ব দিতে পারেন। কাগজের বাইরের কোন সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবীকে দিয়েও সে কাজ করাতে পারেন। খবরের কাগজে দু'রকম পদ্ধতিই চালু আছে।

প্রশ্ন ৫.২.১১ (ii) (ক) জে এন সাহানি ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত হিন্দুস্তান টাইমস-এর সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি বিভিন্ন কাগজে স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন।

এস নিহাল সিং দীর্ঘকাল দি স্টেটসম্যান-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ওই কাগজে সাপ্তাহিক স্তম্ভ নিবন্ধ লিখতেন। তাঁর সেই স্তম্ভের নাম ছিল 'A Political Notebook'.

প্রশ্ন ৫.২.১১ (iii) (ক) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১২ (ক) খবর নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি খবরের গুরুত্ব।

(খ) খবরের গুরুত্ব নির্ধারণে ভুল হতে থাকলে কাগজ ক্রমশ পাঠকদের মন থেকে দূরে সরে যায়। কাগজের বিক্রি পড়তে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা সেই কাগজ সম্পর্কে আগ্রহ হারায়।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (i) (ক) নিজে লিখুন।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (ii) (ক) বাংলা খবরের কাগজে সাধুভাষা বর্জন করে চলিতভাষা চালু হবার সময় রিপোর্টার ও সাব-এডিটরদের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অসুবিধা হত। যেমন— এটা ওটা সেটা লিখতে তাঁদের কলম সরত না। সে সবের বদলে ইহা উহা তাহা লিখে ফেলতেন।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (iii) (ক) কাগজে শব্দ বিভ্রাট পরিহার করে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ করার জন্যই লিখনপদ্ধতির সমতারক্ষা করা দরকার। তা না হলে একই দিনে একই কাগজে একই খবরে এক জায়গায় মউ আর এক জায়গায় সমঝোতাপত্র ছাপা হয়ে যাবে। এরকম এলেমেলো ব্যাপার কোন সুসম্পাদিত কাগজের পক্ষে গৌরবজনক নয়।

প্রশ্ন ৫.২.১৪ (iv) (ক) লিখনপদ্ধতির সমতাবিধানের একটি সাধারণ নিয়ম হল— ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট অনুচ্ছেদ, সরল ও মসৃণ ভাষা এবং ইতিবাচক ভঙ্গি অনুসরণ করা।

(খ) ছোট ছোট বাক্যে লেখা খবর নিবন্ধ ইত্যাদি পাঠকরা পছন্দ করেন। কারণ লম্বা লম্বা বাক্য ও বড় বড় অনুচ্ছেদের লেখা পড়তে পাঠকের অসুবিধা হয়। কিন্তু ছোট ছোট বাক্য ও ছোট ছোট অনুচ্ছেদে লিখিত খবর বা নিবন্ধ পাঠক স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেন।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. Journalist' Handbook, Indian Journalists' Association, Calcutta, May 31, 1961.

২. IJA Annual 1991, 249B, B. B. Ganguly Street, Calcutta – 700 012.

৩. Law of the Press in India, Durga Das Basu, Prentice Hall of India, New Delhi, 1980.

৪. Without Fear or Favour, Harrison E. Salisbury.

৫. বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক, গণমাধ্যম কেন্দ্র, কলকাতা – ৭০০ ০২০।

৬. The Imperial Post, Tom Kelly, William Morrow and Company, INC New York, 1983.

একক ৬ □ সম্পাদনা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ সম্পাদনা

৬.২.১ অক্ষরবিন্যাস

৬.২.২ শিরোনাম

৬.২.৩ পাতা সাজানোর খসড়া

৬.২.৪ প্রুফ সংশোধন

৬.২.৫ প্রদর্শনকলা ও অঙ্গসজ্জা

৬.২.৬ চিত্র প্রদর্শনকলা

৬.২.৭ সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সম্পাদনা

৬.২.৮ লেখচিত্র

৬.২.৯ সাময়িকী সম্পাদনা

৬.২.১০ মুখবন্ধ ও বিশদ বিবরণ

৬.২.১১ অনুচ্ছেদকরণ

৬.৩ সারাংশ

৬.৪ অনুশীলনী

৬.৫ উত্তর-সংকেত

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

কিছু খবর এবং কয়েকটি নিবন্ধ, ফিচার ও মন্তব্য লিখে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিলেই একটি খবরের কাগজ তৈরি হয়ে যায় না। খবর ও অন্যান্য লেখা শুরু করার আগে থেকেই প্রতিদিনের খবরের কাগজ প্রস্তুত করার পর্ব আরম্ভ হয়ে যায়। ভোরের আলো ফোটার সময় ছাপা হয়ে কাগজ বেরিয়ে যাবার পর সেই পর্ব শেষ হয়। তার কয়েক ঘণ্টা পরে আবার প্রাণের সাড়া জাগে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে। তার অন্তর্বর্তীকালে যে সব কাজ সুসম্পন্ন করতে হয় তার বিবরণ দেওয়াই এই এককটির উদ্দেশ্য।

৬.১ প্রস্তাবনা

খবর এবং অন্যান্য বিষয়ের লিখিত বিবরণ খবরের কাগজের মূল উপাদান। অর্থাৎ সংসারের হেঁসেলের তরিতরকারি, চাল, ডাল, লবণ, চিনি, তেল, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি রসদের সঙ্গে খবর ও অন্যান্য লেখাকে খবরের কাগজের হেঁসেলের কাঁচা উপাদানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু ভাল বাজার হাতে পেলেই সুগৃহিণীর কাজ ফুরিয়ে যায় না। বরং তা শুরু হয়। কাঁচা উপাদানগুলি বেছে, কেটে, ধুয়ে পরিষ্কার করে, উপযুক্ত পরিমাণে তেল মশলা দিয়ে তা ভালভাবে পাক করে সুচারুরূপে পরিবেশন করার ওপর সুগৃহিণীর সুনাম নির্ভর করে। খবরের কাগজ তৈরি করার ভার যাঁদের হাতে থাকে তাঁদেরও মন দিয়ে ওই সব কাজ করতে হয়। সেই সব কাজের সঙ্গে আপনারা এই এককটির মাধ্যমে পরিচিত হতে পারবেন।

৬.২ সম্পাদনা

একটু আগেই বলা হয়েছে, কিছু খবর যোগাড় করে এবং তার সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ নিবন্ধ, সম্পাদকীয় মন্তব্য, বিভাগীয় রচনা ইত্যাদি লিখে ফেলতে পারলেই সম্পাদকমশাই নিশাবসানে একটি পূর্ণাঙ্গ টাটকা খবরের কাগজ পাঠকদের উপহার দিতে পারবেন না। তার জন্য তাঁকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এই পুরো কর্মধারাকে বলা হয় খবরের কাগজ সম্পাদনা।

এই কর্মধারা সফল হলে কাগজ তার পাঠকদের মনজয় করতে পারে। এই জন্যই বলা হয়, সম্পাদককে যেন প্রত্যেক দিন পাঠকদের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। দ্বিতীয় পত্রের তিন নম্বর পর্যায়ের দু'নম্বর এককে সম্পাদনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৬.২.১ অক্ষরবিন্যাস

হরফ বা অক্ষরের মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। সেই সব শব্দ সাজিয়ে শুদ্ধ বাক্যরচনা করে খবরের কাগজের বিষয়বস্তু ছাপা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঝড়ের মতো অগ্রগতি এই কাজটায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। হরফ বা অক্ষরবিন্যাসের সাবেকি পদ্ধতি ঠাঁই পেয়েছে পুরাবস্তুর যাদুঘরে। সাবেকি পদ্ধতিতে হাত দিয়ে হরফের পর হরফ সাজিয়ে তা ছাপার ব্যবস্থা করা হত। আধুনিক খবরের কাগজ সেই পদ্ধতি বাতিল করেছে

প্রাতঃস্মরণীয় নির্লোভ ও তেজস্বী সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর ওই সাবেকি পদ্ধতিতে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা দুটি ছাপার ব্যবস্থা করতেন।

তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কথা আপনাদের জানা দরকার। তাঁর জন্ম ১২৮৮ সালের ১৩ বৈশাখ। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর শহর থেকে এক মাইল দূরে এক অজ পাড়াগাঁ। গ্রামের নাম দফরপুর। ১৯০২ সালে তিনি সেখানে একটি অতি ক্ষুদ্র ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ-বাইশ। কলকাতার প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে ও তাঁর সাহায্যে শরৎ পণ্ডিত একটি কাঠের তৈরি পুরনো প্রেস, ছাপাখানার কিছু সরঞ্জাম এবং এক খণ্ড প্রিন্টার্স গাইড কিনে গ্রামে ফেরেন। দাম পড়েছিল মাত্র ৪৬ টাকা।

সেই ছাপাখানার একটু বিবরণ দিই। ছাপাখানাটির নাম ছিল পণ্ডিত প্রেস। তাতে চেক-দাখিলা, নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি উপহার এই সব ছাপা হত। দাদাঠাকুর নিজেই বলতেন, "আমার ছাপাখানা হালফ্যাশানি ছাপাখানা নয়। ..... আমার ছাপাখানার আমিই প্রোপাইটার, আমি কম্পোজিটার, আমি প্রুফরিডার, আমিই ইঙ্কম্যান। কেবল প্রেসম্যান আমি নই — সেটি ম্যান নয়, উওম্যান, অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী। ছাপানোর কাজে ব্রাহ্মণী আমাকে সাহায্য করেন। ঘরের মাঝে আমার টাইপ রাখার কেস। মাটির মেঝেতে ঠিক কাঠের কেসের মতোই সারি সারি গর্ত করে সাজিয়ে, সেই সব ফোঁকরে এক একটি ছোট ছোট মাটির ভাঁড় বসিয়ে তার মধ্যে টাইপ রেখেছি।"

দাদাঠাকুর পরে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এবং 'বিদূষক' নামে দুটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রয়োজনে তিনি আরও একটু উন্নত ধরনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ইতিহাসও বেশ চমকপ্রদ। একটু পুরনো অথচ পত্রিকা ছাপার উপযুক্ত একটি মেশিনের সন্ধানে দাদাঠাকুর হাজির হলেন আজব শহর কলকাতায়। মেশিন খুঁজতে খুঁজতে দাদাঠাকুর একটি কোম্পানির অফিস ঘরে সটান ঢুকে পড়লেন। ঢুকে দেখলেন, কর্মকর্তাটি একজন সাহেব। তাই দাদাঠাকুর সাহেবি কেতা মতো গুড মর্নিং বলে সম্বোধন করলেন।

খালি গা, খালি পা, কোঁচার কাপড় কোমরে বেড় দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা, এক হাতে টিনের চোঙার মতো একটা বাক্স, অন্য হাতে একটি কলিকাশীর্ষ হুক্কা, বগলে ছাতা।

এই অভিনব অভ্যাগতের আগমনে ও তাঁর গুড মর্নিং সম্ভাষণে বিস্মিত সাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "Are you coming from a jungle? (তুমি কি জঙ্গল থেকে আসছ?)

দাদাঠাকুর ইংরেজিতে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "You are right, I am coming from a jungle."

একটা নেহাতই গাঁইয়ার মুখে এ রকম চোস্ত ইংরেজি জবাব শুনে কৌতূহলী হয়ে সাহেব জানতে চাইলেন, "কী করো তুমি?"

দাদাঠাকুরের জবাব, "আমি একখানা জংলী কাগজের জংলী এডিটর।"

এই সাহেব দাদাঠাকুরের কথাবার্তায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে ১০০ টাকা দামে একটি ছাপাখানা কিনে দিলেন। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সুরেশচন্দ্র মজুমদারের। তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক।

এই প্রেস থেকে দাদাঠাকুর তাঁর সম্পাদিত কাগজ দুটি ছাপতেন। তাঁর একটির নাম ছিল 'বিদূষক'। পত্রিকাটির মলাটে লেখা থাকত "ধামাধরা উদারপন্থী দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র"। নিজেকে সম্পাদক বলে পরিচয় না দিয়ে লেখা হত "সেবাইত—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত"।

সেকালের ছাপাখানার হরফবিন্যাসের কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক দাদাঠাকুরের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি এসে গেল। আর দু'চারটে কথা বলে আমরা দাদাঠাকুর প্রসঙ্গ শেষ করব।

মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দীতে একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সে অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। পরে শাস্ত্রীমহাশয় একটি বইয়ে লিখেছিলেন—

"জেমোকান্দীতে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহার নাম সোজাসুজি শরৎ পণ্ডিত—বিদূষকের এডিটর, তিনি মুখে মুখে পদ্য লেখেন, তাঁর কাগজও পদ্যে। ..... ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্টি করিয়া সকলকে হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ।"

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুরের আমলের মুদ্রণ ব্যবস্থা বিদায় নিল। বিশেষ করে দৈনিক খবরের কাগজ ছাপার জন্য অক্ষরবিন্যাসের কাজ লাইনো মেশিনেই করা আরম্ভ হল।

এই মেশিনে অপারেটর টাইপের কী বোর্ডে (Key Board) স্থাপিত অক্ষরের বোতাম টিপে টিপে একটি করে সুসংবদ্ধ লাইন তৈরি করতেন। হরফ তৈরি হত সীসা এবং আরও কয়েকটি ধাতুর গরম গলানো মিশ্রণ দিয়ে। তরল ও গরম মিশ্রণ থেকে হরফবিন্যাসের এই পদ্ধতিকে বলা হত Hot Metal Process। মোটরে উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে লাইনো মেশিন সক্রিয় হত।

চল্লিশের দশকের শেষে, বা পঞ্চাশের দশকে মুম্বাইয়ের টাইমস অব ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর মালিক রামকৃষ্ণ ডালমিয়া কলকাতা থেকে সত্যযুগ নামে একটি খবরের কাগজ বার করেন। তার ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন প্রতাপকুমার রায়। লাইনো মেশিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন (পদ্মপত্রে জলবিন্দু, সাপ্তাহিক বর্তমান, ৩ আগস্ট ২০০২), "বোম্বাই থেকে পুরাতন পাঁচখানা লাইনো টাইপ মেশিন এসে গেল। কী বোর্ডের চাপি টিপে লাইন লাইন কম্পোজ করার মেশিন। সিসা গরম হচ্ছে। প্রত্যেকবারই নতুন টাইপের সৃষ্টি হচ্ছে।"

যথাসময়ে সত্যযুগ বাজারে বেরিয়ে গেল। প্রতাপকুমার লিখছেন (ঐ, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১০ আগস্ট ২০০২), "যদিও আমাদের ছাপার কৌশল পুরনো, যত্ন করে ছাপা হয় বলে সত্যযুগ দেখতে ঝকঝকে। তার ওপর কম্পোজ করা হয়েছে লাইনো টাইপে। তার জন্য অক্ষরগুলি পরিচ্ছন্ন এবং পড়ায় সাহায্য করে।"

খবরের কাগজ উৎপাদনে গরম ধাতু পদ্ধতিও স্থায়ী হলনা। কালক্রমে তার জায়গায় এল কম্পিউটারে ফটোটাইপ সেটিং (Photo Type Setting বা PTS) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মিশ্র গরম ধাতুতে লাইনো যন্ত্রে তৈরি হরফ সাজবার ব্যবস্থা উঠে গেল। চালু হল হরফের ছবিতে শব্দ ও বাক্যসৃষ্টির পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে DTP বা Desk Top Publishing পদ্ধতিও বলা হয়।

ক্রমে সেই ব্যবস্থাও বিদায় নিল। খবরের কাগজের হরফবিন্যাসের কাজ এই পরিবর্তনে আরও উন্নত হল। এল আরও উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার। তার অঙ্গগুলি হল কি বোর্ড (Key Board), মাউস (Mouse), প্রিন্টার (Printer), স্ক্যানার (Scanner), হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক ইত্যাদি যন্ত্রাংশ। এল আরও উন্নত প্রযুক্তির সফটওয়ার। এই সব যন্ত্রাংশের মিলিত প্রচেষ্টায় অতি দ্রুতগতিতে লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, ছবি বদল করা যায়, গ্রাফিক্স (Graphics) সৃষ্টি করা যায়। কোন জিনিষটা কেমন হল তা কম্পিউটারের পর্দায় (Monitor) সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, যাচাই করা যায়, চটপট ভুল সংশোধন করা যায়, হরফের দৈর্ঘ ও প্রস্থ প্রয়োজনমত ছোট বা বড় করা যায়।

এমন কী, লেখা ছবি গ্রাফিক্স যে রঙে যেভাবে স্থাপন করে (Lay Out) পুরো পাতা সাজান হয় ঠিক সেভাবে তার একটি প্রতিচ্ছবি (Print Out) কম্পিউটারের প্রিন্টার থেকে বার করে নেওয়া যায়।

এই পদ্ধতির চালু নাম ডিটিপি (DTP)। আপনারা আগেই জেনেছেন ডিটিপি কাজ করে কম্পিউটারের মাধ্যমে। কম্পিউটার দেখতে অনেকটা টেলিভিশনের মত। আয়তন ও কর্মক্ষমতার বিচরে কম্পিউটার চার রকমের হয় তার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা ছোট তাকে পার্সোনাল কম্পিউটার (Personal Computer) বা পিসি (P.C.) বলে। পিসি-তে কাজ করতে একাধিক ব্যক্তির দরকার হয় না, একজনই যথেষ্ট।

অনেক রকম যন্ত্রাংশ নিয়ে কম্পিউটার তৈরি হয়। তার মধ্যে যেগুলির মাধ্যমে কম্পিউটারকে কাজের

নির্দেশ (Command) দেওয়া যায় সেগুলিকে বলে ইনপুট ডিভাইস (Input Device)। কী বোর্ড, মাউস, ট্যাবলেট বা গ্রাফিক্স প্যাড ইত্যাদি যন্ত্রাংশ ইনপুট ডিভাইসের অন্তর্গত। কী বোর্ডে থাকে প্রয়োজনীয় ভাষার বর্ণমালার সব হরফ, ০ থেকে ৯ সংখ্যা, যদি ও ছেদচিহ্ন। এর বোতামগুলি প্রয়োজনমত টিপতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের পর্দায় লেখার পর লেখা ফুটে উঠতে থাকে।

পুরো পাতার বিষয়বস্তু কম্পিউটারের মধ্যে মজুত হয়ে গেলে তা থেকে পুরো পাতার প্রিন্ট আউট বার করা হয়। প্রিন্ট আউটের ভিত্তিতে নেগেটিভ তৈরির পর সেটি সম্পাদকীয় বিভাগের হাত থেকে চলে যায় মুদ্রণ বিভাগে প্রিন্টারের হাতে। তিনি নেগেটিভ থেকে প্লেট তৈরি করে কাগজ ছাপার জন্য প্রস্তুত হন।

একটি খবর বা একটি নিবন্ধ লেখা সম্পূর্ণ হলে কী বোর্ডের আর একটি নির্দিষ্ট বোতাম টিপে তা কম্পিউটারের মধ্যেই মজুত রাখা হয়। চিফ রিপোর্টার, চিফ সাব, বার্তা সম্পাদক বা সম্পাদক ইচ্ছা করলে অন্যের কম্পিউটারে মজুত যে কোন লেখা তাঁর নিজের পিসি'র পর্দায় টেনে এনে দেখতে ও সম্পাদনা করতে পারেন।

লেখা তৈরির এই সর্বাধুনিক পদ্ধতিকে বলা হয় Cold Process — শীতল পদ্ধতি। তার কারণ হল, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে এইসব যন্ত্র স্থাপন করতে হয়। শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণহীন পরিবেশে এই বিভাগের কাজ চলে। লাইনো যন্ত্রে হট মেটাল পদ্ধতির উত্তপ্ত ও কালিঝুলি লিপ্ত পরিবেশ আজ অতীতের ব্যাপার। এসব হল শীতল পদ্ধতির আশীর্বাদের দিক।

এখন কম্পিউটার সম্পর্কে আরও কিছু প্রাথমিক বিষয় জেনে নিন। এর ইনপুট ডিভাইস (Input Device) সম্পর্কে আগে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। এবার আউটপুট ডিভাইস (Out Device) সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি।

কম্পিউটার ব্যবহারকারী বা চালকের নির্দেশ (Command) পালনের পর যে সব যন্ত্রাংশের মধ্যে দিয়ে তার ফল জানা যায় তার সবগুলিকে বলে আউটপুট ডিভাইস। মনিটর এবং প্রিন্টার আউটপুট ডিভাইসের অন্তর্ভুক্ত দুটি যন্ত্রাংশ। মনিটর হল কম্পিউটারের পর্দা। এই পর্দায় অপারেটরের নির্দেশমত লেখা, ছবি, গ্রাফিক্স ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। প্রাপ্ত প্রতিচ্ছবির অনুলিপি নির্দেশ ছাপিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন থাকলে কম্পিউটারকে দিলেই হল। কম্পিউটারের প্রিন্টার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুলিপি ছাপিয়ে আপনার হাতে তুলে দেবে।

কম্পিউটারের যে সব যন্ত্রাংশ সবসময়ে আমাদের চোখের সামনে থাকে সেগুলিকে হার্ডওয়্যার বলা হয়। যেমন— কী বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। আর কম্পিউটারকে যেসব কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় তার প্রত্যেকটিকে বলে প্রোগ্রাম। অনেকগুলি প্রোগ্রামের সমষ্টিকে বলে সফটওয়্যার। সফটওয়্যার না থাকলে কম্পিউটার একটি অকেজো বস্তু। সফটওয়্যারহীন কম্পিউটারকে মগজহীন মানুষের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

কম্পিউটার সম্পর্কে কয়েকটি গোড়ার কথা আপনারা জানলেন। তা জানতে জানতে আপনাদের মন প্রশ্ন জেগে থাকতে পারে কম্পিউটার (Computer) জিনিষটা কী?

কম্পিউটারের প্রথম ও সবচেয়ে বড় পরিচয় হল যন্ত্র বর্ণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে পাঠ্যবস্তু সৃষ্টি, মজুত, সংশোধন ও সরবরাহ করে। (First and foremost a machine to create, store, manipulate and deliver alphanumeric text.) এই যন্ত্র হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কাজ করে।

কম্পিউটারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর অবিশ্বাস্য গতি। এক যন্ত্রে অনেকগুলি কাজ করার ক্ষমতা এবং অসাধারণ স্মরণশক্তি। কোন মানুষ বা আর কোন যন্ত্র এই তিনটি ব্যাপারে কম্পিউটারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পরে না।

কম্পিউটারকে চেনাবার জন্য ডক্টর জন জি কেমেনি (Dr. John G. Kemeny) একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি কে সেটা জানা বিশেষ দরকার। তিনি গণিত এবং দর্শন শাস্ত্রে একজন জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি এক সময়ে আলবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণায় সহকারীর (research assistant) কাজ করেছেন। পরে তিনি আমেরিকায় দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। কম্পিউটারের ক্রমোন্নতিতে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা ছিল।

তিনি ম্যান অ্যান্ড দ্য কম্পিউটার (Man and the Computer) বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন মানুষ এ যাবৎ যত ভৃত্যের সন্ধান পেয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও বিশ্বস্ত ভৃত্য হল এই কম্পিউটার (The computer is the most patient and obedient servant that man has ever found)।

খবরের কাগজের কাজে হরফকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। হরফের মাপের ওপর এই শ্রেণিবিভাগ নির্ভর করে। হরফের উচ্চতা ও প্রস্থের ওপর তার মাপ নির্ভর করে। মুদ্রণ ব্যবস্থায় অক্ষরের মাপের হিসাবের একককে বলা হয় পয়েন্ট (Point)।

খবরের বিশদ বিবরণ (body) এবং শিরোনাম (headline) ছাপার জন্য আলাদা মাপের হরফ ব্যবহার করা হয়। বিশদ বিবরণ ছাপার জন্য যে হরফ ব্যবহৃত হয় তাকে বলে বডি টাইপ (body type)। শিরোনাম ছাপার জন্য ব্যবহৃত হরফকে বলে ডিসপ্লে টাইপ (Display type)।

কম্পিউটারের যুগে বডি টাইপের সাধারণ মাপ ১০ পয়েন্ট থেকে ১২ পয়েন্ট হয়। ডিসপ্লে টাইপ ২৫ পয়েন্ট থেকে আরম্ভ হয়ে বাড়তে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী ডিসপ্লে টাইপের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বৃদ্ধি করা যায়। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ স্থির করার পর কলমের আয়তনের মধ্যে ধরাবার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পয়েন্টের প্রস্থকে সরু বা মোটা, ভারি বা হালকা করে নেওয়া যায়। ধাতুর তৈরি হরফ ব্যবহারে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না।

নীচে বিভিন্ন পয়েন্টের মাপে কম্পিউটারে তৈরি হরফের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল—

নেতাজি সুভাষ ১০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ১২ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ১৬ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ২০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ২৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৩০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৩৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৪০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৪৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৫০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৫৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৬০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৬৫ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৭০ পয়েন্ট

নেতাজি সুভাষ ৭৫ পয়েন্ট

হরফগুলির মাপের তুলনা করলে আপনি বুঝতে পারবেন ১০, ১২, ১৬ বা ২০ পয়েন্টের টাইপে আপনি কোন খবরের শিরোনাম রচনা করবেন না। ১০ পয়েন্ট টাইপ আপনি বডি টাইপ হিসাবে ব্যবহার করলে তা পাঠকদের পড়তে খুব কষ্ট করতে হবে। এত কষ্ট পাঠক কারো মুখ চেয়ে মেনে নেবেন না। ১৬ বা ২০ পয়েন্ট টাইপ বডি টাইপ হিসাবে ব্যবহার করলে পাঠকের পড়ার খুব সুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু তাতে অনেক বেশি জায়গার বাজে খরচ হবে। এত বাজে খরচ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করবেন না।

অন্যদিকে, এক কলম মাপের কোন শিরোনাম আপনি ৭৫ পয়েন্ট টাইপ ব্যবহার করতে চাইলে পারবেন না। এক কলম মাপের খবরের শিরোনামের হরফের উপযুক্ত মাপ ২৫ পয়েন্ট। ৮ কলম জোড়া ফলাও শিরোনামের জন্য হরফের পয়েন্ট অনেক বেশি বাড়িয়ে না নিলে তা মানানসই হবে না।

হরফের মাপের রকমফেরের মত হরফের ধাঁচ ও গঠনেরও রকমফের হয়। কাগজে কোন ধাঁচ ও গঠনের হরফ ব্যবহার করা হবে তা সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও পাঠকের রুচি এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

উপরের অনুচ্ছেদে আপনারা জেনেছেন হরফের মাপের মত হরফের ধাঁচ ও গঠনেও বৈচিত্র্য আছে। নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল—

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

নেতাজি সুভাষ ব্যানার হেডলাইন

৬.২.২ শিরোনাম

খবরের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেয় তার শিরোনাম। ব্যস্ত পাঠক কাগজ হাতে নিয়ে চটপট শিরোনামে চোখ বুলিয়ে ঠিক করেন, তিনি কোন কোন খবর পড়বেন। তার মধ্যে কোন কোন খবরের পুরোটা তাঁর পড়া দরকার, কোন কোন খবরের পুরোটা না পড়লেও চলবে তিনি তাও ঠিক করেন খবরের শিরোনাম দেখে। শিরোনাম পড়েই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, কোন খবরটা তিনি মোটেই পড়বেন না এবং কোনটা সবার আগে পড়বেন।

এই সব কারণে এক একজন সাংবাদিক খবরের শিরোনামকে এক একভাবে বর্ণনা করে থাকেন। কেউ বলেন, খবরের শিরোনাম খবরের বিজ্ঞাপন। কেউ বলেন, খবরের শিরোনামগুলি সেদিনের কাগজের সূচীপত্র। আর কেউ শিরোনামকে বলেন, খবরের জানলা।

জানলা দিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে কী আছে। ঠিক তেমনি, শিরোনামের ভেতর দিয়ে দেখে নেওয়া যায় খবরের মধ্যে কী আছে।

নিউজ ডেস্কের এলাকায় খবরের শিরোনাম সম্পর্কে শেষ কথা বলে থাকেন চিফ সাব। যে সাব-এডিটর যে খবরটি সম্পাদনা করেন বা অনুবাদ করেন তিনিই সেই খবরের শিরোনাম রচনা করেন।

সাব-এডিটরের লেখা শিরোনাম চিফ সাব বহাল রাখতে পারেন, দরকার মনে করলে তা বদলেও দিতে পারেন। তেমন গুরুত্বপূর্ণ খবর হলে চিফ সাব নিজেই শিরোনাম লিখতে পারেন।

শিরোনাম খবরের নির্যাস স্পষ্ট ও সরল ভাষায় এবং কম কথায় লিখতে হয়। শিরোনামে অতিরঞ্জনের কোন সুযোগ নেই। যে সাব-এডিটর যত কম অথচ উপযুক্ত শব্দ সাজিয়ে শিরোনাম পরিবেশন করতে পারেন তিনি তত যোগ্য সাব-এডিটর বলে স্বীকৃত হন। শিরোনাম লেখায় ভাষার মারপ্যাঁচ বা পাণ্ডিত্য ফলাবার চেষ্টা করবেন না। কারণ, সব পাঠক তো পণ্ডিত নন যে ভাষার সব মারপ্যাঁচের কুয়াশা ভেদ করে খবরের মর্মে পৌঁছলে সক্ষম হবেন। শিরোনাম লেখার সময় তাই মনে রাখত হবে খবরের কাগজ শুধু পণ্ডিতরাই পড়েন না সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাই কাগজের পাঠকদের গরিষ্ঠ অংশ।

খবরের পরিচয় দেওয়া ছাড়াও সুলিখিত শিরোনাম কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। টপ (Top), ডবল কলম, তিন বা চার কলম। বিশেষ ক্ষেত্রে সাত বা আট কলম জোড়া শিরোনাম দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কোন খবরের শিরোনাম প্রস্থে এক কলম টপ হবে অথবা কোন খবর আট কলমের ব্যানার হবে তা খবরের গুরুত্ব এবং সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির খবরের গুরুত্ব (News Sense) বোঝার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

কিন্তু অঙ্ক, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ফুটবল বা হাডুডু খেলার যেমন বাঁধাধরা নিয়ম থাকে খবরের কাগজের শিরোনাম লেখার তেমন কোন অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নেই। তাই একই খবরের শিরোনাম বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন মাপে ও ভাষায় লেখা হয়ে থাকে।

উপরের অনুচ্ছেদে আপনার Banner — ব্যানার নামে একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। যে সংবাদের শিরোনাম প্রস্থে কাগজের প্রথম পাতার এক কলম থেকে আট কলম পর্যন্ত জায়গা জুড়ে ছাপা হয় তাকে ব্যানার হেডলাইন বলা হয়। রোজ রোজ একটা না একটা খবরকে ব্যানার হেডলাইন দিয়ে প্রকাশ করলে এর ভার ও ধার অতি ব্যবহারে ক্ষয়ে যায়। রাজ্য, দেশ বা দুনিয়া কাঁপানো খবরই ব্যানার হেডলাইন পাবার দাবি রাখে। দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি বোঝার সুবিধা হবে।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকালে। সেই দিন সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ছিনতাই কর চারটি বিমান আমেরিকার তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবনে ও স্থানে সবেগে ধাক্কা মারে। পরদিন কলকাতার বিভিন্ন কাগজে এই খবরের ব্যানার শিরোনাম ছিল এই রকম—

১। কাগজ ক — "আমেরিকা আক্রান্ত"

২। কাগজ খ — "আমেরিকায় অভূতপূর্ব জঙ্গী হামলা

৩। কাগজ গ — "Attack on America"

৪। কাগজ ঘ — "AMERICA ATTACKED"

৫। কাগজ ঙ — "Terror Towers Over America"

৬। কাগজ চ — "বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র"

পাঠক হিসেবে আমার বিচারে ক, গ, ঘ কাগজ মূল খবরটি শিরোনাম দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, আমেরিকা আক্রান্ত হয়নি, তবুও এইভাবে শিরোনাম দিয়ে খবরটি প্রকাশ করায় পাঠক খবরটি পড়ার জন্য খুবই আকর্ষণ বোধ করতে পারেন। তার ফলে খবরটি তিনি পড়বেন ঠিকই কিন্তু পড়ার পর তাঁর মনে হবে খবরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও শিরোনাম ফাঁপানো, বিভ্রান্তিমূলক ও অতিরঞ্জিত।

খ, ঙ এবং চ কাজ তবুও শিরোনামে মূল ঘটনাটি ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে। খ এবং ঙ কাগজ বোঝাতে পেরেছে ব্যাপারটি আমেরিকায় জঙ্গি হামলার ঘটনা। চ কাগজের শিরোনামে অন্তত জানা যাচ্ছে, খবরটি আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রে বিস্ফোরণের ঘটনার বিবরণ।

এগুলির পাশাপাশি পড়ুন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত The Wall Street Journal-এর ব্যানার শিরোনাম (১২ সেপ্টেম্বর)—

"TERRORIST DESTROY WORLD TRADE CENTER, HIT PENTAGON IN RAID WITH HIJACKED JETS"

দেখুত তো, কত স্পষ্ট, কত নিটোল, কত পূর্ণাঙ্গ এই শিরোনাম। অন্য কাগজগুলির শিরোনামের তুলনায়

এই শিরোনামটিতে কয়েকটি বেশি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন শব্দই অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে কি? আমার মতে যাবে না।

ওই দুনিয়া কাঁপানো ঘটনাটি ঘটেছিল ১১ সেপ্টেম্বর সকালে। পরদিন সকালের জন্য তো কোন আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন কাগজ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। কাগজের ইন্টারনেট সংস্করণে দিনের তাজা খবর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের জার্নাল বেলা ৩-১৫ মিনিটে ইন্টারনেট সংস্করণে শিরোনাম দিয়েছিল—

“Terrorist Attacks Hit U.S. Cities

o

Plane Crashes Level World Trade Center, Pentagon, State Department Also Struck”

আপনি বিচার করে দেখুন কলকাতার কাগজগুলির তুলনায় জার্নালের এই শিরোনাম ছিল পুরোপুরি খবরভিত্তিক। নিউইয়র্ক টাইমসও এই ব্যাপারে ইন্টারনেট সংস্করণে খবরের ওপরেই সব জোর দিয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বর রাত ৯-১২ মিনিটে টাইমসের ইন্টারনেট সংস্করণের শিরোনাম ছিল—

“Terrorists Attack New York and Washington

o

Thousands Feared Dead as World Trade Center Is Toppled”

পরদিন ১২ সেপ্টেম্বর টাইমসের প্রভাতী সংস্করণের শিরোনাম ছিল—

“U.S. ATTACKED

o

HIJACKED JETS DESTROY TWIN TOWERS AND HIT PENTAGON IN DAY OF TERROR”

১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদী বিমান হানার খবর জানার পর আমেরিকার বিভিন্ন শহরের কাগজগুলি অতিরিক্ত সংস্করণ (Extra) প্রকাশ করেছিল। কয়েকটি কাগজের অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনাম নীচে উল্লেখ করা হল—

The Tallahassee Democrat

"AMERICA ATTACKED"

The Tampa Tribune

"TERROR"

The Telegram Gazette

"TERROR ATTACKS"

The Times Indiana

"TERRORIST ATTACK"

The Times Leader

"AMERICA ATTACKED NEW YORK, D.C. HIT"

The Topeka Capital Journal

"U.S. UNDER SIEGE"

The Daily Breeze

"U.S. ATTACKED"

The Tri-City Herald

"TERROR ATTACK ON AMERICA"

The Tulsa World

"ATTACK ON AMERICA"

The Tuscaloosa News

"TERROR AT HOME"

The Valley News Dispatch

"TERRORISTS HIT U.S."

The Vindicator

"UNDER SIEGE"

The Virginian Pilot

"UNDER ATTACK"

The Washington Times

"HORROR"

The West Sound Sun

"AMERICA UNDER ATTACK"

The Wichita Eagle

"ATTACKED"

The Winston-Salem Journal

"TERRORIST STRIKE N.Y., WASHINGTON"

The Wyoming Tribune Eagle

"AMERICA ATTACKED"

এবার আমরা The Washington Post কাগজটির শিরোনামগুলি দেখব। ১১ সেপ্টেম্বর পোস্টের কয়েকটি ইন্টারনেট সংস্করণের শিরোনাম—

বেলা ১২-১৬ মিনিট

“Planes Crash Into World Trade Center : Explosion Rocks Pentagon”

রাত ৮-১৪ মিনিট

“President to Address Nation After Day of Terrorist Attack”

লক্ষ্য করুন, প্রথম শিরোনামে শুধু ঘটনার নির্যাস। দ্বিতীয় শিরোনামে ঘটনার নির্যাস এবং তার প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় শিরোনামে আমেরিকা তথা বিশ্ববাসীকে জানান হল, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশ সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে হোয়াইট হাউসের নীতি ঘোষণা করবেন।

কিছুক্ষণ পরে বুশ জাতির উদ্দেশ্যে এই হামলা সম্পর্কে নীতি ঘোষণা করলেন। পোস্টের পরবর্তী নেট সংস্করণে তার নির্যাস—

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলায় স্তম্ভিত জাতির কাছে বুশ শপথ নিলেন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর বদলা নেওয়া হবে (“Bush vows to avenge thousands of deaths as nation reels from attacks on World Trade Center, Pentagon”).

রাত ১০-৩ মিনিট

“President Addresses Nation After Day of Terrorist Attacks”

ওই ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে পোস্ট একটি অতিরিক্ত (Extra) সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। নামেই বোঝা যাচ্ছে প্রাত্যহিক প্রভাতী সংস্করণের ওপর বাড়তি সংস্করণ বলেই এই সংখ্যাটির নাম অতিরিক্ত বা Extra। আপনি ভাবতে পারেন অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজন হয় কেন?

এখন টেলিভিশন এবং কেবল চ্যানেল চালু হওয়ায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় বা আধ ঘণ্টা অন্তর দেশ-বিদেশের খবর পাওয়া যায়। তার আগে যখন শুধু রেডিও ছিল তখনও তার মাধ্যমে দিনের মধ্যে কয়েক বার খবর প্রচারিত হত। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য তখন এবং এখন আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরের খবরের কাগজগুলি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। টেলিভিশনের কেবল চ্যানেলে (Cable Channel) যাকে বলা হয় Breaking the news, খবরের কাগজের অতিরিক্ত সংখ্যাকেও তাই বলা যায়।

প্রভাতী সংস্করণ বেরিয়ে যাবার পর থেকে বিকালের মধ্যে কোন মস্ত বড় ঘটনা ঘটলে অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশের রেওয়াজ চালু আছে। স্তালিনের জীবনাবসান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণ, ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়, সেই রায় বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের খবর

সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবার জন্য কলকাতার The Amrita Bazar Patrika, যুগান্তর এবং অন্যান্য ইংরেজি ও বাংলা কাগজগুলি অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। প্রতিটি অতিরিক্ত সংস্করণে ৮ কলমের ফলাও শিরোনাম (Banner) ব্যবহার করা হয়েছিল।

১১ সেপ্টেম্বর পোস্টের অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনাম ছিল—

“Terror Attacks Pentagon, World Trade Center”

লক্ষ্য করুন আমেরিকার আঞ্চলিক কাগজগুলির অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনামের তুলনায় পোস্টের অতিরিক্ত সংস্করণটির শিরোনাম হয়ত একটু বড়, কিন্তু কত স্পষ্ট। Under Siege, Under Attack, Horror, Attacked ইত্যাদি শিরোনাম আকারে ছোট নিশ্চয় কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট, বড়ই ধোঁয়াটে। শুধুই Terror এক্ষেত্রে একটা নেহাতই অর্থহীন শব্দ, তার তুলনায় Terrorist Strike N.Y., Wasington পড়লে সবটা না হোক, কিছুটা বোঝা যায়। আর পোস্টের অতিরিক্ত সংস্করণের শিরোনামে বোঝা যায় অনেকটাই।

আর সবটাই বোঝা যায় ১২ সেপ্টেম্বরের পোস্টের এই শিরোনামে—

“Terrorists Hijack 4 Airliners, Destroy World Trade Center, Hit Pentagon : Hundreds Dead”

১১-১২ সেপ্টেম্বর পোস্টের বিভিন্ন সংস্করণের শিরোনামগুলির কী রকম বিবর্তন হয়েছিল তা আপনারা দেখলেন। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস কাগজটির দুটি শিরোনামের সঙ্গে আপনারা আগেই পরিচিত হয়েছেন। ১১ সেপ্টেম্বর রাত ৯-১২ মিনিটের ইন্টারনেট সংস্করণে এই শিরোনামটি দেখা গিয়েছিল—

“Terrorists Attack New York and Wasington”

এই শিরোনামে ঘটনাটির কাঠামো ফুটে উঠেছিল। মূল খবরের অর্ধেকটা ফুটে উঠেছিল আলাদা একটি শিরোনামে—

“Thousands Feared Dead As World Trade Center Is Toppled”

পোস্ট কিন্তু ১২ সেপ্টেম্বর পুরো ঘটনার নির্যাস একটিমাত্র শিরোনামে পরিবেশন করতে সফল হয়েছিল। এখানেই পোস্টের মুন্সিয়ানা। সেদিনের নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম শিরোনামটিতে বলা হয়েছিল U.S. Attacked। এটা তো ঘটনা নয়, ঘটনার অতিরঞ্জন। পোস্ট এই রকম ছলনা বাদ দিয়েই শিরোনাম রচনা করতে পেরেছিল।

ফলে তারা শিরোনামে নিহতের সংখ্যার আন্দাজ দিতে পেরেছিল। টাইমস বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তা পারেনি। এখানেই টাইমসের শিরোনামের দুর্বলতা।

এরপর আমরা আর একটি আন্তর্জাতিক মানের খবরের শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করব। ঘটনাটি হল শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল। জাপানের ইয়োকোহামা শহরের একটি স্টেডিয়ামে সেই খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০২ সালের ১ জুলাই সেই খেলার খবর বিভিন্ন কাগজে ব্যানার শিরোনামের তলায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে কলকাতার চারটি কাগজের শিরোনাম আপনাদের আলোচনার জন্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

১। কাগজ ক — "শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ব্রাজিলেরই"

২। কাগজ খ — "RONALDO'S REDEMPTION"

৩। কাগজ গ — "KAHN'T BLOCK RONALDO"

৪। কাগজ ঘ — "World at Brazil's Feet"

আপনারা বিবেচনা করে দেখুন ওই চারটি শিরোনামের মধ্যে কোনটি খবরের মূল বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে পেরেছে। আমার বিবেচনায় সেই কৃতিত্ব খ কাগজটিকেই দেওয়া যায়। বাকি তিনটি কাগজ ভাষার মারপ্যাঁচ দেখাতে গিয়ে আমল বিষয়টিকেই হারিয়ে ফেলেছে।

এবার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী অপরাধের আর একটি খবরের শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা যাক। ২০০২ সালের ১৫ জুন বিভিন্ন কাগজে পাকিস্তানের বন্দর-শহর করাচিতে একটি নাশকতার বিষয়ে কয়েকটি খবরের কাগজের শিরোনাম ছিল এই রকম—

গ কাগজের শিরোনাম—

"Car Bomb Message to Parvez"

"পারভেজকে গাড়ি বোমার বার্তা"

কিছু বুঝলেন ? কিছু মনে পড়ছে ? কী সেই বার্তা ?

ঘ কাগজের শিরোনাম—

"America Under Attack in Pak"

"পাকিস্তানে আমেরিকা আক্রান্ত"

কিছু জানা গেল ? কিছু বোঝা গেল ? কিছু মনে পড়ল ?

তুলনায় ঙ কাগজের শিরোনাম—

"11 Die in Karachi Sucide Blast"

"করাচিতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত"

চ কাগজের শিরোনাম—

"করাচিতে মার্কিন কনসুলেটের সামনে আত্মঘাতী হামলা, হত ১১"

যে কোন সাধারণ পাঠকের বিচারে গ ও ঘ-এর তুলনায় ঙ ও চ-এর শিরোনাম স্পষ্ট। তবে ঙ এবং চ শিরোনামে "আত্মঘাতী" শব্দটি বাদ দিয়ে আরও ভালো হত। কারণ বিস্ফোরণের মূলে আত্মঘাতী হামলা, না রিমোট কন্ট্রোলের কারসাজি তা নিয়ে তাড়াতাড়ি রায় দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া মূল ঘটনাটি করাচিতে বিস্ফোরণ এবং তাতে ১১ জনের মৃত্যুর। শিরোনাম তাই বিষয়দুটিতে সীমাবদ্ধ রাখলে তার এতটুকু অঙ্গহানি হত না। বরং সেটাই যথাযথ (accurate) হত। পরে তা প্রমাণও হয়েছিল। ফরেনসিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল বিস্ফোরণ ঘটনা হয়েছিল রিমোট কন্ট্রোলের ব্যবস্থায়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে কে আর নারায়ণের উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা চলে। কেন্দ্রের শাসক জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং বিরোধী দলগুলির নেতারা উপযুক্ত প্রার্থীর সন্ধান করতে থাকেন। এই সময় ১৪ জুন কয়েকটি কাগজে একটি বিশেষ খবরের শিরোনাম ছিল এই রকম—

ঝ কাগজের শিরোনাম—

"Congress Ditches Left for Kalam"

"কালামের জন্য বামপন্থীদের ডুবিয়ে দিল কংগ্রেস"

ছ কাগজের শিরোনাম—

"Launching Kalam, Cong. Leaves Left Lonely in the Orbit"

"কালামকে উৎপ্রেক্ষণ, বামপন্থীদের কক্ষপথে একা ছেড়ে দিল কংগ্রেস"

জ কাগজের শিরোনাম—

"কংগ্রেসের সমর্থন, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কালামই"

নিশ্চয় বুঝতে পারছেন মূল খবরটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এ পি জে আবদুল কালামের প্রার্থীপদ সম্পর্কিত। কালামকে প্রথমে প্রার্থী মনোনীত করেছিল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার সব শরিক, সহযোগী এবং বহির্ভূত কংগ্রেস দল। সংসদের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস তার দিন কয়েক দিন পরে কালামের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী না দেবার বা অন্য কাউকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নিল। এক্ষেত্রে মূল খবর ছিল, কালামকে কংগ্রেসের সমর্থনের সিদ্ধান্ত। এর ফলে বামপন্থীদের অবস্থা কী হল তা মূল খবরের তুলনায় গৌণ খবর। কিন্তু গ এবং ছ খবরের মুখ্য ও গৌণ দুটো দিককেই তুল্যমূল্য করে ফেলল। এতে কোন পাঠকের মনে হতে পারে, বামপন্থীদের খোঁচা দেবার জন্যই মুখ্য ও গৌণ খবরকে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে জ কাগজের শিরোনামে গৌণ অংশটির কোন উল্লেখই থাকল না। এতে কোন পাঠকের সন্দেহ হতে পারে, বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতির কারণেই খবরের গৌণ অংশটি চেপে দেওয়া হয়েছে। এর কোনটাই কাগজগুলির নিরপেক্ষতা প্রমাণের পক্ষে সহায়ক হয় না।

২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খবরের শিরোনামের দিকে আর একবার নজর দিন। ওই বছরের ২৬ জুন প্রকাশিত একটি খবরের কয়েকটি শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ক কাগজ : প্রথম পাতার ৬ কলম জুড়ে শুধুই বিশ্বকাপের খবর। প্রধান সংবাদের শিরোনাম—

"তুরস্ক পা চালানোর খেলা খেলবে ধরে নিয়ে তৈরি কার্লোসরাও"

কত শতাংশ পাঠক এই শিরোনাম থেকে খবরটা বুঝতে পারবেন?

'পা চালানোর খেলা' মানে কী? খেলায় যখন 'পা' আসছে তখন ধরে নিতে হয় ব্যাপারটা ফুটবল নিয়ে। কিন্তু ফুটবল তো পায়েরই খেলা। তাহলে 'পা' না চালিয়ে উপায় কী? নাকি, বাক্যটির অন্য মানে আছে। সেটা হল তুর্কিরা খেলতে নেমে লাথির পর লাথি ছুঁড়বে, ল্যাং মারবে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের পায়ে? এর মধ্যে কে কোন মানেটা ধরবেন? তাই বলছি, এই রকম শিরোনাম অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিমূলক।

একই দিনে একই বিষয়ে খ কাগজের শিরোনাম—

"রোনাল্ডো না খেললে সমস্যা হবে ব্রাজিলের"

এই ভবিষ্যৎবাণী একজন ফুটবল পণ্ডিত রিপোর্টারের।

পরদিন রোনাল্ডো পুরো সময় খেলল না। তাতেও কিন্তু ব্রাজিলের জেতার পথে কোন বাধা পড়ল না। তাই এই রকম ভবিষ্যৎবাণীকে কাগজ কালির বাজে খরচ বলে ধরে নিতে হবে।

কিন্তু শিরোনামে প্রথম জায়গায় যে রোনাল্ডো তিনি খবরের কোন জায়গায়। বিশ্বাস করুন তিনি খবরের মুখবন্ধে জায়গা পাননি। পিছুতে পিছুতে চলে গেছেন পঞ্চম অনুচ্ছেদে। সেখানে তাঁকে নিয়ে খবর হল, এই ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন কিনা তা অনিশ্চিত।

পণ্ডিতের কাছে যা অনিশ্চিত, একজন পেশাদার ও দক্ষ রিপোর্টারের কাছে তা নয়। তিনি একই দিনে

সাতিয়াম্মা থেকে জানিয়ে দিয়েছেন, রোনাল্ডো খেলার যোগ্য আছেন। এই ব্যাপারে ঝ কাগজে রয়টার্সের পাঠানো খবরের শিরোনাম ছিল—

"Ronaldo Fit to Play"

"রোনাল্ডো খেলার যোগ্য"

ব্রাজিল দলের চিকিৎসক জোশ লুই রানকোর বক্তব্য উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানাল, "রোনাল্ডো পুরো সময় মাঠে থাকার যোগ্য। আর কোন সমস্যা নেই।" অতি চালাক পণ্ডিতের সঙ্গে পেশাদার রিপোর্টারের এটাই হল তফাৎ, এতটাই পার্থক্য।

গ কাগজও "Ronaldo Fit" এই শিরোনামে একই খবর দিয়েছিল তার পাঠকদের।

রয়টার্সের এই খবর খ কাগজেও নিশ্চয় এসেছিল। তবুও ওই কাগজ রোনাল্ডোকে নিয়ে ওই ধোঁয়াটে খবর ছাপল কেন? তার একটা কারণ হতে পারে ডেস্কের অমনোযোগ। অথবা সাব-এডিটরদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। কারণ যাই হোক এই ধরনের ধোঁয়াটে ভিত্তিহীন খবর ছাপা হলে কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এবার বিশ্বকাপের খবর ছাড়া একই দিনে প্রকাশিত অন্য একটি প্রধান খবরের দিকে নজর দেওয়া যাক। তাতে দেখা যাবে ক, ঝ ও গ কাগজের নিউজ ডেস্ক ঘটনাটির গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিল। শিরোনামের মধ্যে দিয়েই তারা তা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ক কাগজে ২ কলম জোড়া দ্বিতীয় প্রধান খবরের শিরোনাম—

"অবশেষে সংবাদপত্রের দরজাও খুলল
বিদেশি বিনিয়োগের জন্য"

ঝ কাগজে ৬ কলম জোড়া শিরোনাম প্রধান খবর,

"Print Media Door Opens For Foreigners"

"বিদেশীদের জন্য মুদ্রিত মাধ্যমের দরজা খুলল"

গ কাগজে ৮ কলম জোড়া ব্যানার শিরোনামে প্রধান খবর,

"Print Media Thrown Open to Foreign"

"বিদেশি পুঁজির জন্য মুদ্রিত মাধ্যমের দরজা খুলল"

প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজের জগতে ২৫ জুন তারিখটি ছিল ঐতিহাসিক। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সরকারের আমলে দেশের সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশি পুঁজির জন্য নিষিদ্ধ ছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রি

সভা ২০০২ সালের ২৫ জুন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৭ বছরের সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল। এরপর সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশিরা সর্বাধিক ২৬ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার লগ্নি করতে পারবেন।

সংবাদপত্র শিল্পে এতবড় একটা পরিবর্তন খ কাগজে কোন গুরুত্বই পেল না। তাই তাকে প্রথম পাতা থেকে নির্বাসন দিয়ে পাঁচের পাতায় পাঠিয়ে দিল। এটা নিশ্চিতভাবেই বিচার বিভ্রাটের পরিচয়।

এই খবরটির গুরুত্ব নির্ধারণে ক কাগজের তুলনায় খ ভুল করলেও কলকাতার একটি স্থানীয় খবরের শিরোনাম রচনায় ক-কে হারিয়ে দিল খ।

ক. "দাবি আলাদা, পৃথক দিনে বাস ট্যাক্সি ধর্মঘটের ডাক"

খ. "আজ মাঝরাত থেকে টানা ট্যাক্সি ধর্মঘটের ডাক"

পাঠকের যা জানা দরকার খ-এর শিরোনামে তা স্পষ্ট, ক-এর শিরোনাম তেমন নয়।

এবার ১৭ আগস্ট, ২০০২ সালে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনামের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করব। খবরটির বিষয়বস্তু ছিল, অক্টোবর মাসের মধ্যে গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত।

গুজরাট বিধানসভার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে তা ভেঙে দেবার জন্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রিসভার সুপারিশ গ্রহণ করে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা আরও সুপারিশ করে ৬ অক্টোবরের আগে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন করা হোক।

নির্বাচন করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র অধিকার নির্বাচন কমিশনের। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জে এম লিংডো ১৬ আগস্ট তাঁদের সিদ্ধান্ত জানান। বিভিন্ন কাগজে সেই খবরের শিরোনাম ছিল এই—

কাগজ ক : "Poll and Pramod pile agony"

কাগজ খ : "GUJARAT WOUNDS YET TO HEAL, NO EARLY POLL : EC"

কাগজ গ : "EC spoils BJP Gujarat poll party"

কাগজ ঘ : "EC Rules Out Early Polls in Gujarat"

কাগজ ঙ : "গুজরাটে ভোট নয়, জানালো কমিশন"

কাগজ চ : "গুজরাতে এখন ভোট হচ্ছে না"

কাগজ ছ : "Gujarat polls not before Nov, says EC"

গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগরে স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের অক্ষরধাম মন্দিরের কথা খুব বেশি মানুষের জানা ছিল না। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখে ওই মন্দিরটি সন্ত্রাসবাদীদের হামলা ও নরহত্যার কারণে হঠাৎ খবরের কাগজের শিরোনাম দখল করে নেয়। জঙ্গিহানার পরদিন বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার সব কাগজে ওই ঘটনার খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

আপনাদের আলোচনার জন্য তার মধ্যে কয়েকটি কাগজের শিরোনাম নীচে উদ্ধৃত করছি—

কাগজ ক : ৮ কলমজোড়া ব্যানার শিরোনাম—

জঙ্গি হানা এবার গুজরাতের মন্দিরে

তারপর প্রথম কলমে আলাদা করে ১ কলম শিরোনাম—

রণক্ষেত্র অক্ষরধাম, গুলি-যুদ্ধ, নিহত ৪৪

কাগজ খ : ডবল ডেকার (২ সারি) শিরোনাম। ৮ কলম জোড়া ব্যানার—

“এ কে ৪৭ নিয়ে অতর্কিত হামলা বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা ৫০ পুণ্যার্থী গুজরাটে মন্দিরে জঙ্গি হানা”

কাগজ গ : দোতলা ৮ কলম শিরোনাম—

“গুজরাটে স্বামীনারায়ণ মন্দিরে জঙ্গি হানা, হত ৫০
সামনেই রাজভবন, মনখ্যমন্ত্রী নিবাস, অদূরে সচিবালয়”

কাগজ ঘ : স্রেফ ৮ কলমজোড়া ব্যানার শিরোনাম—

“গুজরাতে মন্দিরে জঙ্গিহানা, হত ৫০”

কাগজ ঙ : চারতলা শিরোনাম, নামের মাথার ওপর মাথা। ওপরের মাথার বক্তব্য—

“জঙ্গিরা দোষী, মোদিরাও খলনায়ক
আসুন, দু পক্ষকেই ধিক্কার জানাই”

তেতলায় খবরের শিরোনাম—

“জখম ১০০, সন্ধে থেকে রাত দীর্ঘক্ষণ লড়াই কম্যান্ডোদের সঙ্গে”

দোতলা ও একতলার শিরোনাম—

“মৃত ৩২
মন্দিরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলির মারণতাণ্ডব জঙ্গিদের”

কাগজ চ : দোতলা ৮ কলম শিরোনাম,

"Terror strike at house of prayer
44 killed, 100 injured in Gandhinagar
Temple Gunbattle Rages"

কাগজ ছ : ৬ কলম শিরোনাম—

"44 killed, 100 hurt Muslims injured NSG
arrives VHP calls Bharat bandh on Thursday
Terror Tuesday in Gujarat temple

কাগজ জ : দোতলা শিরোনাম। প্রথম অংশটি ৮ কলম, দ্বিতীয় অংশটি ৬ কলম। ৮ কলমে,

"44 die in Gujarat temple terror
NSG commandos begin operation flush out"

কাগজ ঝ : দোতলা ৬ কলম শিরোনাম—

"100 hurt at Gandhinagar Swaminarayan
Mandir 40 devotees still trapped
TERRORISTS STORM TEMPLE, 44 KILLED"

কাগজ ঞ : দোতলা শিরোনামের প্রথমেই ৮ কলম অংশ—

"গুজরাটের মন্দিরে জঙ্গি হামলা, মৃত ৩০
সম্প্রীতি রক্ষায় দেশজুড়ে সতর্কতা"

কাগজ ট : দোতলা শিরোনাম,

"Terrorist in temple, Gujarat on edge again
23 killed, many injured : terrorists
holed up in Akhardham"

কাগজ ঠ : ৮ কলম শিরোনামে,

"TERROR IN TEMPLE"

আলাদা শিরোনামে,

"Gujarat bleeds:from Godhra to Gandhinagar"

এবার খবরের শিরোনামের প্রয়োজনের আর কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করে এই প্রসঙ্গটি শেষ করব। খবরের পরিচয় দেওয়া ছাড়া শিরোনামের আরও কিছু কাজ আছে। উপযুক্ত শিরোনাম কাগজের আকর্ষণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। শিরোনাম যথাযথ হলে কাগজের পাতায় খবর সাজানোয় সুবিধা হয়। কোন জটিল ও ঘটনাবহুল খবরের মূল বিবরণ খুব অল্প স্থানের চৌহদ্দির মধ্যে খুব কম কথায়ফুটিয়ে তোলাই শিরোনাম রচনা করা। এই কাজটি সার্থকভাবে করার জন্য খবর বোঝার ক্ষমতা, ভাষার ওপর দখল এবং সৃজনশীল প্রতিভার প্রয়োজন। এই গুণগুলি যে সাংবাদিকের নেই তিনি শিরোনাম রচনার সফল শিল্পী হতে পারবেন না।

আপনারা আগেই জেনেছেন, খবরের শিরোনামকে খবরের কাগজের সূচীপত্রও বলা হয়। সূচীপত্রের কাজ কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে তা আঙ্গুল দিয়ে পাঠককে দেখিয়ে দেওয়া। তাতে সংক্ষিপ্ততম সময়ে পাঠক বিষয়বস্তুটি খুঁজে নিতে পারেন। সূচীপত্র না থাকলেও পাঠক বিষয়বস্তুটি খুঁজে পাবেন কিন্তু তাতে বেশি সময় লাগবে। ব্যস্ত পাঠক সময়ের অপব্যবহার করতে চান না।

একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝা যাক। ধরুন, কেউ একজন জয় গোস্বামীর "মালতীলতা বালিকা বিদ্যালয়" কবিতাটি খুঁজছেন। কিন্তু কবিতাটি গোস্বামীর কোন বইয়ে আছে তা তার মনে পড়ছে না। তার হাতের কাছে তখন গোস্বামীর 'আলেয়া হ্রদ', 'প্রত্নজীব', 'উন্মাদের পাঠক্রম', 'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো' ইত্যাদি আটটি বই রয়েছে। কিন্তু কোন বইয়েই সূচীপত্র নেই। তখন মালতীলতার সন্ধান পেতে তাঁকে প্রত্যেকটি বইয়ের পাতা ওলটাতে হবে। তাতে অনেকটা সময় অপচয় হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি বইয়ে সূচীপত্র থাকলে তা থেকে চট করে জানা যেত "আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো" বইয়ে মালতীলতা আছেন।

তাতো হল, কিন্তু বইটিতে মোট ২৭টি কবিতার মধ্যে মালতীলতা ঠিক কোথায় অবস্থান করছেন তা তাড়াতাড়ি কী করে জানা যাবে। তা জানা যাবে কোন লেখা কোন পাতায় আছে তার সংখ্যা দিয়ে।

আশা করি আপনারা এবার পরিষ্কার করে সূচীপত্রের উপকারিতা বুঝে নিয়েছেন। খবরের শিরোনামের উপকারিতাও একই রকম। লক্ষ্য করে দেখবেন সূচীপত্রে কবিতার নামগুলি ছোট ছোট, যথা, 'রাখাল', 'ঝুলন', 'মূকবধির', 'দাগী', 'ছুই' ইত্যাদি। খবরের শিরোনামও ঠিক ওই রকম না হলেও তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট শব্দের মধ্যে লিখতে হয়।

বইয়ের সূচীপত্রের সঙ্গে খবরের কাগজের সূচীপত্রের অর্থাৎ শিরোনামের একটা মৌলিক তফাৎ হল প্রথমটিতে নামের সঙ্গে পৃষ্ঠাসংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়টিতে শিরোনামের সঙ্গে পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ থাকে না। কারণ, তার দরকার হয় না। পাঠকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে গেছেন কোন কাগজের কোন পাতায় কোন খবর পাওয়া যেতে পারে। নিউজ ডেস্কও অভিজ্ঞতা ও খবরের জ্ঞান দিয়ে জেনে গেছেন কোন

শিরোনাম কাগজের কোন পাতার কোন জায়গা কতটা স্থান জুড়ে দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এক্ষেত্রে শিরোনামকে অনুসরণ করে খবর। তাই আলাদা করে পাতার সংখ্যা উল্লেখ করা দরকার হয় না।

কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের বাজেট, রফিগঞ্জে রাজধানী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা, ধূপগুড়ির সিপিএম কার্যালয়ে জঙ্গিহানা ইত্যাদি খবর যে কাগজের প্রথম পাতায় পাওয়া যাবে সে জ্ঞান পাঠকের আছে। নিউজ ডেস্কেরও তা থাকা দরকার। অর্থাৎ, খবরের তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ধারণ করে তার শিরোনাম রচনা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর কাগজটির কোন পাতার কোন জায়গা এবং কতটা জায়গা দখল করবে তাও স্থির হয়ে যায়। একই সঙ্গে ঠিক হয় সংশ্লিষ্ট হরফের মাপ বা পয়েন্ট। কারো বাড়িতে ভেন্ডার প্রতিদিন কাগজ দিয়ে যান। কেউ বা দোকান বা স্টল থেকে শিরোনাম দেখে কাগজ কিনে থাকেন। অর্থাৎ, স্টলে বিভিন্ন কাগজের শিরোনামের প্রতিযোগিতায় জিতে কাগজ বিক্রি করতে হয়। শিরোনাম লেখকদের এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়।

প্রত্যেক খবরের কাগজে শিরোনামের একই মানে। কাগজ ভেদে সেই মানে বদলায় না। কিন্তু অনেক পাঠক আছেন যারা শিরোনামের সঠিক মানে জানেন না। তাঁরা মনে করেন, কাগজের মাথায় বড় বড় হরফে যে কথাগুলি ছাপা হয় শুধু সেটাই হেডলাইন, বা হেডিং বা শিরোনাম।

২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বুধবারের আনন্দবাজার পত্রিকার মাথায় ৮ কলম জুড়ে মস্ত বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল—

"আমেরিকা আক্রান্ত"

কিছু পাঠকের ধারণা, শুধু ওটাই সেদিনের হেডলাইন। বাস্তবে তা নয়। বাস্তব হল, কাগজে Display type-এ আর যত কথা ছাপা হয়েছে তা সবই হেডলাইন বা শিরোনামের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, "আমেরিকা আক্রান্ত" কথা দুটির তলায় কাগজের বাঁ দিকে ৮ কলম জুড়ে দু'সারিতে ছাপা হয়েছিল—

"ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধূলিসাৎ • পেন্টাগন ও বিদেশ দফতরে হানা • হোয়াইট হাউস ফাঁকা • বিমান ছিনিয়ে জঙ্গি আক্রমণ"

ডিসপ্লে টাইপে ছাপা কাগজের এই অংশটিও হেডলাইন বা শিরোনামের পর্যায়ভুক্ত। ওই কাগজের প্রথম পাতার প্রথম কলমে এক কলম "টপ" মাপে ছাপা হয়েছিল—

"দুটি বিমান
গুঁড়িয়ে দিল
দুই টাওয়ার"

ওই পাতায় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কলম জুড়ে ছাপা হয়েছিল—

"হতাহত কোথায় পৌঁছবে
কেউ জানে না, বুশ বললেন
শেষ দেখে ছাড়বেন"

প্রথম পাতায় নীচের ভাঁজের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কলম জুড়ে ছাপা হয়েছিল—

"তিন সপ্তাহ আগেই হুঁশিয়ারি দেন লাদেন"

নীচের ভাঁজের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কলম জুড়ে ছাপা হয়েছিল—

"ওয়াশিংটনের আকাশে ফৌজি বিমান
খালি করা হল সব সরকারি অফিস"

এই অনুচ্ছেদে যে সব উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হল তার সবগুলিই হেডলাইন বা শিরোনামের পর্যায়ভুক্ত বিষয়। কাগজে ডিসপ্লে টাইপে ছাপা এক লাইন, দু'লাইন, তিন লাইন, বা একতলা, দোতলা, তেতলা বা এক সারি, দু'সারি বা তিন সারিতে ছাপা সব সংক্ষিপ্ত ঘোষণা বা বার্তা সংশ্লিষ্ট খবরটির হেডলাইন বা শিরোনাম বলে স্বীকৃত।

এই বিষয়ে Bruce Westley লিখেছেন, "The term headline has pretty much the same meaning from one newspaper to another but is often confused by the public. Any line or collection of lines of display type that precedes a story and summarizes it or introduces it can be called a headline. Some people use the term incorrectly to apply only to the banner line across the top of Page One. Others incorrectly use it to apply to the top unit of a series of decks of a headline."

৬.২.৩ পাতা সাজাবার খসড়া

খবরের কাগজ ছাপার আগে তার প্রতিটি পাতার কোথায় কী থাকবে তা সাজিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন পাতা সাজিয়ে দেবার দায়িত্ব বিভিন্ন লোকের ওপর থাকে। পাতা সাজাবার এই প্রক্রিয়াকে বলে Dummy — অর্থাৎ, খসড়া, নকশা বা নকল তৈরি করে দেওয়া

আপনারা জেনেছেন পরের দিনের কাগজের পাতাগুলির কোথায় কোন খবর ব নিবন্ধ ঠাঁই পাবে তা ঠিক করে দেন একজন নয়, কয়েকজন ব্যক্তি। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, এক একটি পাতা এক একজন ব্যক্তি সাজিয়ে দেন। উদাহরণ দিল ব্যাপারটি আরও সহজে বোঝা যাবে।

আমার হাতে রয়েছে ৯ অগস্ট, ২০০২ তারিখের প্রকাশিত ক কাগজের একটি কপি। কাগজটিতে ১২টি পাতা রয়েছে। আমরা শুরু করব শেষ পাতা থেকে।

পাতা নং ১২ — পাতা জোড়া একটি বিজ্ঞাপন। সেটিকে সাজাবার কোন প্রয়োজন ও সুযোগ নেই। বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা যেমন বলেছেন তেমনভাবে বিজ্ঞাপনটি ওই পাতায় স্থাপন করা হয়েছে।

পাতা নং ১১ — খেলার খবরের পাতা। এই পাতা সাজিয়েছেন ক্রীড়া সম্পাদক।

পাতা নং ১০ — জেলার খবরের পাতা। যে চিফ সাব জেলার খবরের ডেস্কের দায়িত্বে থাকেন এই পাতা সাজাবার অধিকার তাঁর। সন্ধ্যার মধ্যে এই পাতা সাজাবার কাজ সেরে ফেলা হয়।

পাতা নং ৯ — পশ্চিমবঙ্গ বাদে বিভিন্ন রাজ্যের খবর। এই সব খবর সম্পাদনা ও নির্বাচনের দায়িত্ব যে চিফ সাবের থাকে তিনিই এই পাতা সাজান। এই পাতাটি রাত আটটা ন'টার মধ্যে সাজিয়ে ফেলতে হয়।

পাতা নং ৮ — ব্যবসা বাণিজ্য শেয়ারের খবর। এই পাতা সাজাবার ভার থাকে বাণিজ্যিক সম্পাদকের হাতে। রাত আটটা ন'টার মধ্যে এই পাতাও সাজিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিতে হয়।

পাতা নং ৬-৭ — বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের পরবর্তী সাত দিনের অনুষ্ঠানসূচি। এই পাতা সাজাবার কাজ দেখেন বিনোদন সম্পাদক।

পাতা নং ৫ — প্রথম পাতায় প্রকাশিত কিছু খবরের শেষাংশ এবং ভিন রাজ্যের আরও খবর। এই পাতার খসড়া রাতের পালার চিফ সাবের হাতে।

পাতা নং ৪ — সম্পাদকীয় নিবন্ধ, সঙ্গে কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু খবর। সেইদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক ঠিক করে দিয়েছেন দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে কোনটি আগে, কোনটি তার পরে বসবে। বাকি অংশ সাজিয়েছেন রাতের পালার চিফ সাব।

পাতা নং ৩ — ভিন রাজ্য ও দিল্লির খবর। পাতাটি সাজিয়েছেন মাঝের পালার চিফ সাব।

পাতা নং ২ — পরের দিনের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই পাতার এই অংশটি সাজিয়ে দিয়েছেন বিনোদন সম্পাদক।

পাতা নং ১ — এই পাতায় দিনের প্রধান প্রধান খবর এবং কাগজের একান্তভাবে নিজস্ব কোন বড় খবর থাকলে (Exclusive, Scoop) সেগুলি স্থান পায়। সেই সব খবর কোথায়, কি ভাবে, কত কলম শিরোনামে বসবে তা ঠিক করে সাজিয়ে দেন রাতের পালার চিফ সাব।

পাতার খসড়া কারা তৈরি করেন সেই ব্যাপারে আপনাদের ধারণা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে। আপনারা জেনেছেন, খবরের কাগজের পাতাগুলি সাজিয়ে দেন সংশ্লিষ্ট পালার চিফ সাব। এই ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদকের অনুমোদনসাপেক্ষ। তাই বলে বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদক যে প্রতিদিন খবরের প্রতিটি পাতা সাজাবার ব্যাপারে চিফ সাবের ওপর খবরদারি করেন তেমন ঘটে না। সারা দিনের খবরের গতি প্রকৃতি জেনে বার্তা সম্পাদক মনে করলে খসড়া তৈরির ব্যাপারে চিফ সাবকে কোন পরামর্শ বা নির্দেশ দিলেও দিতে পারেন। তার অবশ্য প্রয়োজনও হয় না। কারণ, প্রথম পাতার খসড়া তৈরির সময়ে চিফ সাবের পাশে থাকেন বার্তা সম্পাদক।

কেন্দ্রে বা রাজ্যে নির্বাচনের ফল প্রকাশ, সরকার গড়া, কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রয়াণ এই রকম অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর থাকলে প্রথম পাতাটি ছাপার জন্য প্রিন্টারের হাতে ছাড়ার আগে পর্যন্ত সম্পাদক তাঁর বার্তা সম্পাদক ও চিফ সাবের টেবিলে এসে বসেন। তাঁদের কাজ দেখেন এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত বদলের জন্য পরামর্শ দেন।

খবরের কাগজের দুটি প্রধান অংশ থাকে। একটিতে থাকে খবর এবং প্রাসঙ্গিক নানাবিধ লেখা। অন্য অংশে থাকে বিজ্ঞাপন। তাই খবরের কাগজ শুধু খবরের কাগজ নয়, তা খবর এবং বিজ্ঞাপনের মিশ্রিত পণ্য। সুতরাং পাতায় খবর সাজাবার খসড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন স্থাপনের স্থান নির্দেশ করেও খসড়া তৈরি করতে হয়। আমরা সবাই খবরের কাগজের পাতায় খবর ও প্রাসঙ্গিক লেখার সঙ্গে বিজ্ঞাপনও দেখে থাকি।

এই অনুচ্ছেদে আমরা 'ক' কাগজের যে সংখ্যাটি সামনে রেখেছি তার ৪ নং পাতাটি বাদ দিয়ে ১১টি পাতার প্রত্যেকটিতে কম বেশি বিজ্ঞাপন আছে। পাতার নকশা তৈরির দুটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে সেই কাজ করা হয় বিজ্ঞাপন বিভাগে।

বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা পরের দিনের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলি নিয়ে বসেন। তারপর প্রথমে দেখেন কোন কোন বিজ্ঞাপন বিশেষ বিশেষ পাতার বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসাবার জন্য বিজ্ঞাপনদাতার নির্দেশ আছে কি না। ৪ নং পাতা ছাড়া বাকি পাতাগুলির নকল তৈরি করে তিনি প্রথমে বিজ্ঞাপনদাতার নির্দেশ অনুসরণ করে বিজ্ঞাপনগুলির মাপ অনুযায়ী কলমের দৈর্ঘ ও প্রস্থে তার ছক কেটে দেন। ছক কাটা জায়গার মধ্যে কোন খবর বা লেখা বসান যাবে না।

তারপর বাকি বিজ্ঞাপনগুলি ভারসাম্য রক্ষা করে বিভিন্ন পাতায় বসাবার জন্য ছক কেটে দেন। পাতায় পাতায় ছক কাটা বিজ্ঞাপন বিভাগের তৈরি নকল পাতা বার্তা বিভাগের কাজের জন্য বিজ্ঞাপন বিভাগ সরবরাহ করে। সেই সব ছক কাটা পাতায় খবর ইত্যাদি বসাবার স্থান নির্দেশ করে ছক কাটেন বার্তা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এইভাবে বিজ্ঞাপন এবং খবর ও নিবন্ধাদির বিষয়বস্তু মিশিয়ে প্রতিটি পাতার খসড়া তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। আপনারা যে কাগজ হাতে পান তা ওই সব খসড়ার প্রতিরূপ।

মনে রাখবেন, কাগজ ছাপার আগের মুহূর্তে অথবা কাগজ ছাপা চলাকালেও প্রথম পাতার খসড়া বদলাতে হতে পারে। মনে করুন, কাগজ ছাপা শুরু হওয়ার সময় বা ছাপার কাজ চলাকালে খবর এল কোন বড় মানুষের জীবনাবসান হয়েছে, অথবা রাজ্যে বা দিল্লিতে কোন বিরাট বিপর্যয় ঘটেছে। তাহলে সেই খবর প্রথম পাতায় ধরাবার জন্য রাতের পালার চিফ সাব ছাপাখানায় প্রিন্টারের কাছে নির্দেশ পাঠান, Stop Press — মেশিন থামাও।

নির্দেশমত মেশিন থেমে যায়। অন্তর্বর্তী সময়ে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নতুন খবরটি তৈরি করে, আগের কোন একটি খবর সরিয়ে দিয়ে বা বাদ দিয়ে বা ছোট করে নতুন খবরটিকে স্থান করে দিয়ে পরিবর্তিত খসড়া তৈরি করা হয়। সেই খসড়া অনুসরণ করে ফের কাগজ ছাপা আরম্ভ হয়ে যায়।

তবে কাগজ ছাপা আরম্ভ হবার ঠিক মুখে বা কাগজ ছাপা চলাকালে নির্ধারিত ব্যবস্থাকে পাল্টে দিয়ে খসড়া পরিবর্তন করার মত জরুরী অবস্থা রোজ রোজ ঘটে না। সুতরাং প্রথম খসড়ার ভিত্তিতে কাগজ ছাপা স্বাভাবিক রীতি।

আপনাদের মধ্যে কারো কারো মনে হতে পারে, পাতার খসড়া তৈরি করা বুঝি খুব শক্ত কাজ। ব্যাপারটা শক্ত বা সহজ কোনটাই নয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাঁধাধরা ছক অনুসরণ করে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। যারা তা রপ্ত করেছেন তাঁরা মসৃণভাবে এই দায়িত্ব সামলাতে পারেন। তবে পর পর দু'দিন বা টানা সাতদিন একই ছকে খসড়া তৈরি করলে তা পাঠকদের পছন্দ হবে না। এই কথাটি মনে রেখে খসড়া তৈরি করতে হবে।

খবরের কাগজের পাতাগুলি, বিশেষ করে প্রথম পাতাটি সময়মত সাজিয়ে নকশাটি প্রিন্টারের হাতে তুলে দেওয়া কাজটি অভ্যাসসাপেক্ষ ব্যাপার। উপস্থিত বুদ্ধি, খবরের গুরুত্ব চট করে ধরে ফেলার ক্ষমত, কোন কোন খবর পাঠকের নজর কাড়বে তা স্থির করায় এক এক কাগজের এক এক এডিটর নিজস্ব বিচারের দ্বারা চালিত হন। ফলে একই দিনের দুটি কাগজের প্রথম পাতা অবিকল একরকম হয় না, ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা কাগজের একটি বিশেষ দিনের সংখ্যাগুলির প্রথম পাতাগুলি আমরা দেখতে পারি।

রবিবার, ৮–৯–২০০২

আনন্দবাজার পত্রিকা — মোট খবর ৬ (ছয়)

(ক) ৬ কলম শিরোনাম : "মমতার হুমকি না মেনে প্রমোদকে বাড়িতে চা খাওয়ালেন সুদীপ"

(খ) ১ কলম শিরোনাম : "ফের ঝলসাল রাহুলের ব্যাট"

(গ) ২ কলম শিরোনাম : "তদন্তের ফাঁক ঢাকার চেষ্টা / মৃত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা"

(ঘ) ১ কলম শিরোনাম : "সৌরভেরাই ঠিক করবেন কলম্বো তাঁরা যাবেন কিনা"

(ঙ) ৬ কলম শিরোনাম : "কোটায় পাম্প অন্যায় নয়, বলছে বিজেপি"

(চ) ৬ কলম শিরোনাম : "বীরাপ্পানের খোঁজে কুন্ডাল জঙ্গলের ওপর চক্কর দিচ্ছে তিন হেলিকপ্টার"

বর্তমান — মোট খবর ১০ (দশ)

(ক) ১ কলম শিরোনাম : "বন্ধ বাইপাসসহ কিছু অপারেশন"

(খ) ৩ কলম শিরোনাম : "মেডিকেলে সঙ্কটজনক রোগী ছাড়া ইমার্জেন্সিতে ভর্তি বন্ধ"

(গ) ১ কলম শিরোনাম : "পাক কমিটির সঙ্গে বৈঠক চান জেঠমালানিরা"

(ঘ) ১ কলম শিরোনাম : "সুদ কমছে, খুশি নন অসীম"

(ঙ) ১ কলম শিরোনাম : "শিশু মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু"

(চ) ২ কলম শিরোনাম : "ব্ল্যাঙ্ক চেকের টোপ দিয়ে শচীনদের পুরনো শর্তেই সই করতে বলল বোর্ড"

(ছ) ১ কলম শিরোনাম : "দুরন্ত দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক"

(জ) ৩ কলম শিরোনাম : "মালিকপক্ষকে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অবাধ ক্ষমতা দিতে বলল দ্বিতীয় শ্রম কমিশন"

(ঝ) ১½ কলম শিরোনাম : "মৃত্যু, নার্সিং হোমে মারধর"

(ঞ) ৪ কলম শিরোনাম : "মমতাকে ছাড়া সিপিএমকে হটানো যাবে না : মহাজন"

সংবাদ প্রতিদিন — মোট খবর ৮ (আট)

(ক) ৪ কলম শিরোনাম : "গুলির লড়াই সত্যমঙ্গলম জঙ্গলে // টাস্ক ফোর্স ব্যর্থ /// হাতে পেয়েও হাতছাড়া বীরাপ্পন"

(খ) ১ কলম শিরোনাম : "ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি বোর্ড, চাপে সৌরভরা"

(গ) ১ কলম শিরোনাম : "ইরাককে ধ্বংস করার হুমকি বুশের"

(ঘ) ২ কলম শিরোনাম : "বুশের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে জল"

(ঙ) ১ কলম শিরোনাম : "দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরি, পারলেন না শচীন"

(চ) ১½ কলম শিরোনাম : "প্রমোদও বললেন, মমতা স্বাগত"

(ছ) ১½ কলম শিরোনাম : "পেট্রোকেমে অনিশ্চিত গেইল, আই ও এল"

(জ) ৩ কলম শিরোনাম : "কাশ্মীরের বাতাসে ভাসে অনিশ্চয়তা"

আজকাল — মোট খবর ৭ (সাত)

(ক) ৬ কলম শিরোনাম : "ক্রিকেটার-ঐক্যের কাছে হার ডালমিয়ার / শচীনদের ক্ষতিপূরণ দেবে বোর্ড, তবু জট // সানিকে কথা বলার দায়িত্ব /// কাল দল"

(খ) ২ কলম শিরোনাম : "শৌরি কুপোকাত / ২ তেল কোম্পানীর বিলগ্নীকরণ স্থগিত"

(গ) ১ কলম শিরোনাম : "আবার সফল রাহুল, শচীন এবং সৌরভ"

(ঘ) ১½ কলম শিরোনামে ১ শোল্ডারের তলায় দুটি খবর (মোট তিন কলম) :

"বিজেপির রাজনৈতিক সম্মেলনে মমতাকে (শোল্ডার) / তপনের তুলোধোনা // প্রমোদের প্রশস্তি"

(ঙ) ২ কলম শিরোনাম : "কেন্দ্রকে শ্রম কমিশন / অবাধে ছাঁটাই, লে অফ"

(চ) ৩ কলম শিরোনাম : "বিদ্যুৎ, জল, হাসপাতাল নিয়ে অভিযোগ / বিনা ব্যয়ে নিষ্পত্তি হবে লোক আদালতে"

তাহলে আমরা ওই তারিখের পাঁচটি বাংলা কাগজের প্রথম পাতায় মোট ৩৮টি খবর পেয়েছি। তার মধ্যে অধিকাংশ কাগজ শুধু রাহুল দ্রাবিড়কে প্রথম পাতায় ঠাঁই দিয়েছে। বীরাপ্পানকে প্রথম পাতায় টেনে আনার ব্যাপারে আনন্দবাজারের একমাত্র সঙ্গী সংবাদ প্রতিদিন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশকে সমগুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান ও আজকাল। বাকিরা তা দেওয়া দরকার মনে করেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, খবরের কাগজে খবরের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে এত পার্থক্য কেন হয়। এই বিষয়ে ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) যা বলে গেছেন আমরা তা শুনতে পারি। লিপম্যান গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক বলে স্বীকৃত।

তিনি যা বলেছেন তা অনেকটা এই রকম, প্রত্যেক খবরের কাগজ নিবিড় বাছাইয়ের ফল হিসাবে পাঠকের হাতে পৌঁছায়। যত খবর আসে তার মধ্যে কোনগুলি ছাপা হবে, কাগজের কোন জায়গায় ছাপা হবে, খবরটি জন্য কতটা জায়গা বরাদ্দ করা হবে, কাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে ধারাবাহিক বাছাই পর্বের মধ্যে দিয়ে তা স্থির হয়। এই ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই। চলতি ধারা অনুসরণ করাই এই ব্যাপারে একমাত্র রীতি।

লিপম্যানের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই রকম– "Every newspaper when it reaches the reader is the result of a whole series of selections as to what items shall be printed, in what position they shall be printed, how much space each shall occupy, what emphasis each shall have. There are no objective standards here. There are conventions.

এই প্রসঙ্গে লিপম্যান আরও কয়েকটি কথা বলেছেন। সেগুলিও মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, সম্পাদক সবসময় নিজের পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে খবর বাছাই করেন না। পাঠকের রুচি ও প্রয়োজন জেনেও তাঁকে এই কাজ করতে হয়। হ্যাঁ, এই রকম ক্ষেত্রেও পাঠকের রুচি কী তা ঠিক করতে সম্পাদককে নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। যে সম্পাদক কাগজের পাতা সাজাবার সময় পাঠকের রুচি, চাহিদা, আবেগ ও কৌতূহলের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন সেই কাগজের সাফল্য অবধারিত। পাতা সাজাবার মধ্যে দিয়ে পাঠককে হাসাতে, কাঁদাতে, ভাবাতে, উত্তেজিত করতে পারলে বুঝতে হবে পাঠক খবরের সঙ্গে মিশে গেছেন। পাতা সাজান সার্থক হয়েছে।

৬.২.৪ প্রুফ সংশোধন

খবরের কাগজে ছাপার জন্য নির্বাচিত খবর বা নিবন্ধের পাণ্ডুলিপির প্রথম মুদ্রণকে প্রুফ কপি বলা হয়। প্রুফ কপি পড়া খবরের কাগজ প্রকাশনার একটি পর্যায়। প্রুফ কপি পড়ার উদ্দেশ্য প্রথম মুদ্রণে যে সব ভুল থাকে তা ঠিক করে দেওয়া। ভুল সংশোধন করা না হলে ভুলে ভরা কাগজ বেরিয়ে যায়। তেমন কাগজ মানুষের হাসির খোরাক হয়। পাঠকের সম্ভ্রম অর্জন করার জন্য নির্ভুল কাগজ প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

যে সব সাংবাদিক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে প্রুফ কপি পড়ে ভুল সংশোধন করেন তাঁদের Proof Reader — প্রুফ পাঠক বলা হয়। প্রুফ পাঠকদের কাজ বর্ণনা করে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "Proof Reader means a person who checks up printed matter or proof with Editors copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of

spelling, mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected" — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির প্রুফ পড়েন তিনি প্রুফ রিডার। তা করতে গিয়ে প্রথম বিষয়বস্তুর সঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর কোন অসঙ্গতি তাঁর চোখে ধরা পড়তে পারে। তা ছাড়া, ভুল তথ্য, ভুল বানান, বাক্য গঠন ও উপস্থাপনার ব্যাকরণগত ত্রুটিবিচ্যুতিও তাঁর নজরে আসতে পারে। এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি তিনি নিজে সংশোধন করে দেন কিংবা ডেস্কে গিয়ে সংশোধন করে নেন।

খবরের কাগজ প্রকাশনায় প্রুফ রিডারদের ভূমিকা ও অন্যান্য সাংবাদিকদের মতই গুরুত্বপূর্ণ। যারা কপি লেখেন ও কপি সম্পাদনা করেন, তাড়াহুড়োয় বা অন্য কারণে কপিতে নানারকম ভুল করে ফেলতে পারেন। ভুলগুলি কি ধরনের তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হরফ সাজিয়ে সেই সব লেখা ছাপার জন্য তৈরি করার সময়ে পাণ্ডুলিপির ভুল সংশোধন করা হয় না। তা ছাড়া হরফ সাজাবার সময় কম্পোজিটারও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু কাজ করে ফেলতে পারেন।

পাণ্ডুলিপি নির্ভুল কিনা এবং তা নির্ভুলভাবে কম্পোজ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয় প্রুফ রিডিং বিভাগে। সেই জন্য এই বিভাগকে কেউ কেউ ছাপাখানার চেক পোস্ট বলেন। ছাপাখানার থেকে পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ একসঙ্গে প্রুফ রিডিং বিভাগে সরবরাহ করা হয়। তা টেবিলে আসামাত্র একজন প্রুফ রিডার পাণ্ডুলিপি ধরেন, আর একজন জোর গলায় প্রুফ পড়তে থাকেন। এই পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রুফ মেলাবার কাজ চলে। সেই সময় পাণ্ডুলিপিতে বা প্রুফে বা উভয় ক্ষেত্রে কোন রকম অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা তখনই সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রুফ রিডারদের দায়িত্ব। একাজ হেলাফেলা করার নয়। বরং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। তা না হলে নিখুঁত কাগজ বার করা সম্ভব হয় না।

ছাপার বিষয়বস্তুতে কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন করার জন্য সুনির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন আছে। ছাপা বিষয়বস্তুতে কোন ভুল সংশোধন করতে হলে প্রুফ রিডার নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন প্রুফের মার্জিনে বসিয়ে দেন। কম্পোজিটারকেও সেই সব সাংকেতিক চিহ্নর মানে জানতে হয়। প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলি সব দেশেই এক রকম।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব এবং তার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কালের যাত্রাপথে খবরের কাগজ ছাপার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। লাইনো মেশিনের হরফবিন্যাসের পদ্ধতির জায়গা দখল করেছে কম্পিউটার। প্রুফ রিডারকে সরিয়ে তাঁর কাজও করে দিতে পারে কম্পিউটার অপারেটার। সুতরাং প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলিও খবর কাগজ প্রকাশনায় আর অপরিহার্য থাকছে না, বরং ক্রমশ অচল ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু কম্পিউটার বিপ্লব প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব এতটুকুও কমাতে পারেনি। বরং তার গুরুত্ব আগেই মতই আছে।

প্রুফ রিডারের কাজ যে ছোট কাজ নয়। এই প্রসঙ্গে বিধুভূষণ সেনগুপ্তর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় প্রখ্যাত নট এবং অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ দেখতেন। ডেইলি নিউজের সম্পাদক কালীকৃষ্ণ সেন এবং বিধুভূষণ দু'জনে মিলে সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রুফ দেখতেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন প্রথম জীবনে কিছুদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রুফ দেখেছিলেন।

প্রতাপ কুমার রায় লিখেছেন (সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৭ জুলাই, ২০০২), তাঁর বন্ধু সমরেন রায়ের ছাপাখানায় গৌরকিশোর ঘোষ "থাকত। প্রুফ দেখত"।

প্রাচীন মার্কসবাদী নেতা এবং সিপিআইএম-এর সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দেশহিতৈষীর প্রধান সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্ত এই বিষয়ে স্মৃতিকথামূলক একটি রচনায় কয়েকটি কথা জানিয়েছেন। (গণশক্তি, শারদ সংখ্যা, ২০০২)। লেখার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এসেছে স্বাধীনতা পত্রিকাকে জড়িয়ে। সিপিআই-এর দৈনিক কাগজ স্বাধীনতা'র বার্তা বিভাগে যুক্ত ছিলেন সুধাংশবাবু। তিনি লিখছেন, "আজও মনে পড়ে লেখক বিষ্টু মুখার্জি কাজ করতেন প্রুফ টেবিলে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদই তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন প্রুফ টেবিলে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ বলতেন— কাগজে সিপিআইয়ের একটা বানানও ভুল থাকবে না। তাই তিনি লেখক দিয়ে স্বাধীনতা'র প্রুফ টেবিল সাজিয়েছিলেন। সে সময়ে স্বাধীনতা'র প্রুপ টেবিলে কাজ করতেন কমরেড বিষ্টু মুখার্জি, বিদ্যোদয় লাইব্রেরির কমরেড দীনেশ চট্টোপাধ্যায় আর আনন্দবাজার পত্রিকার কমরেড স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।"

৬.২.৫ প্রদর্শনকলা ও অঙ্গসজ্জা

নিয়মিত খবর ও নিবন্ধগুলি ছাপার জন্য তৈরি হবার এবং ছবিগুলি বাছাই হয়ে যাবার পর অঙ্গসজ্জার কাজ আরম্ভ হয়। গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি উপযুক্ত শিরোনামে, উপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করা এবং কোন ছবি কোন পাতায় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কতটা জায়গা নিয়ে ছাপা হবে তা স্থির করাকেই পাতার প্রদর্শনকলা বা অঙ্গসজ্জা বলা হয়।

উন্নত মানের সংবাদপত্র প্রকাশনায় উন্নত মানের অঙ্গসজ্জার বিশেষ প্রয়োজন আছে। উন্নত ও সুরুচিসম্পন্ন অঙ্গসজ্জা কাগজের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

অঙ্গসজ্জার সংজ্ঞা নির্দেশ করে Bruce Westley যা বলেছেন তা আপনাদের জানাই। তারও আগে জানাই, খবরের কাগজে অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলা দুটি কথা চালু থাকলেও অর্থ একই রকম। তাই আপনারা প্রদর্শনকলা (Display) এবং অঙ্গসজ্জার (Makeup) মধ্যে পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করবেন না।

Westley এ সম্পর্কে বলেছেন, "Good make-up consists of an attractive typographical arrangement and one which helps tell the days news."

অর্থাৎ, কোন খবরের শিরোনাম কত পয়েন্টে ছাপা হলে আকর্ষণীয় হবে তা স্থির করা এবং কোন খবরকে কতটা গুরুত্ব দিতে হলে পাতার ঠিক কোন জায়গায় স্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই অঙ্গসজ্জা।

Westley বলেছেন ছ'টি বিষয় খেয়াল রেখে অঙ্গসজ্জার ব্যবস্থা করতে হয়। বিষয়গুলি হল—

পাঠককে দিনের খবর জানতে সাহায্য করা— "Helping tell the day's news—smoothing the path of information to the reader—helping minimise the effort required by the reader to find, read and understand the news."

দিনের খবরগুলি পরিকল্পিতভাবে পরিবেশন করা— "Giving an orderly, meaningful pattern to the presentation of the days news."

খবরের আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝাতে শিরোনামের হরফ নির্বাচন ও খবর স্থাপন কর— "Expressing, through headline size and placement, the relative importance of the news of that day."

পাঠকের কাছে কাগজকে আকর্ষণীয় করে তোলা— "Making the paper attractive to the reader—an inviting package."

পাঠকের অভ্যাসের সুযোগ নেওয়া— "Capitalizing on reader habits."

পাঠক যা যা পড়তে চান সেগুলি তাঁকে সহজে খুঁজে পেতে সাহায্য করা— "Helping the reader find what he wants to read with relative ease."–

Westley যে ছ'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন সেগুলির সামান্য বিশ্লেষণ দরকার। তিনি বলেছেন, এমনভাবে ছবি ও খবরগুলি প্রদর্শনের পরিকল্পনা করতে হবে যাতে পাঠক দিনের প্রধান প্রধান খবরগুলি চট করে খুঁজে পান। ধরুন, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরে সিপিআইএম-এর একটি অফিসে জঙ্গিরা হামলা করল, গুলিবৃষ্টি করল, কয়েকজন হতাহত হল। এই খবরটি ব্যানার হেডলাইনে প্রথম পাতায় অনেকটা জায়গায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। ওই পাতাতেই কলকাতায় রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া এবং সরকারি বক্তব্য আলাদা ভাবে ঠাঁই দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই পাঠক এই বিষয়ে সংবাদগুচ্ছ চট করে খুঁজে পাবেন। এর অন্যথা হলে তিনি বিভ্রান্ত ও বিরক্ত হবেন। পাঠকের অসন্তোষ কাগজের পক্ষে ক্ষতিকর।

দিনের খবরগুলি পরিকল্পিতভাবে প্রদর্শন করার মানে হল, ধূপগুড়িতে সিপিআইএম-এর অফিসে জঙ্গি হামলার তিনটি খবর একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঢাউস কপি তৈরি করা নয়। বড় বড় কপি অধিকাংশ পাঠক ধৈর্য ধরে পড়তে চান না। সেই জন্য তিনটি কপি আলাদাভাবে কিন্তু একই পাতায় কাছাকাছি অবস্থানে প্রদর্শন করতে হয়।

খবরের গুরুত্ব বুঝে শিরোনামের হরফ ছোট, মাঝারি বা বড় করে যোগ্যস্থানে প্রদর্শনের মানে হল, ধূপগুড়ির ওই ঘটনার খবরের শিরোনাম কমপক্ষে ৭০ পয়েন্টে ছাপতে হবে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর না থাকলে এই খবরটিকেই প্রধান খবর হিসাবে প্রথম পাতায় কাগজের নামের ঠিক নীচে প্রদর্শন করতে হবে। ৩০ পয়েন্ট টাইপে এই খবরের শিরোনাম করে এবং তাকে প্রথম পাতার বদলে তিন, পাঁচ বা সাতের পাতায় ঠেলে দিলে পাঠক বুঝবেন, কাগজটা পাতে দেবার যোগ্য নয়।

ধূপগুড়ির ওই ঘটনার তিনটি খবর প্রথম পাতায় বড় বড় শিরোনামে কাছাকাছি প্রদর্শন করার বদলে তিনটি পাতায় ছড়িয়ে দিলে সবটা এলোমেলো হয়ে যাবে। এলোমেলোভাবে খবর প্রদর্শন করলে কাগজের আকর্ষণ নষ্ট হয়।

আট পাতার কাগজে খেলার খবর সাধারণত আটের পাতায় থাকে। খেলার খবর আটের পাতায় দেখতেই পাঠক অভ্যস্ত। তাঁর এই অভ্যাসের মর্যাদা দিতে হলে খেলার খবর এক একদিন এক এক পাতায় প্রদর্শন না করে প্রতিদিন আটের পাতায় প্রদর্শন করাই উচিত।

একই ভাবে আট পাতার কাগজে সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বিশেষ নিবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের নির্দিষ্ট স্থান চারের পাতা। সুতরাং সেইভাবেই সেগুলি প্রদর্শন করতে হবে। এর অন্যথা হলে পাঠক অসুবিধায় পড়বেন।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ালো যে কাগজের অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলার মধ্যে কোন সীমারেখা

নেই। এই কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে সংবাদের গুরুত্ব অগ্রাধিকার পায়। পাতাগুলি মানানসই হয়, তা দেখতে ভাল লাগে এবং পছন্দের খবরগুলি অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যায়। এই চারটি বিষয় হল উৎকৃষ্ট অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলার প্রধান শর্ত।

৬.২.৬ চিত্র প্রদর্শনকলা

খবরের কাগজ শুধু খবর ছাপা হয় না, সংবাদচিত্রও ছাপা হয়। নানা ধরনের খবরের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি না থাকলে কাগজের অঙ্গহানি ঘটে ও খবরের কাগজ পাঠকদের কাছে আকর্ষণ হারায়। সুতরাং ভাল ভাল খবরের সঙ্গে ভাল ভাল ছবি দিতে না পারলে কোন খবরের কাগজ ভাল খবরের কাগজের স্বীকৃতি পায় না। তাই রিপোর্টাররা যখন কোন অঘটনের খবর যোগাড় করতে ছোটেন তখন তাঁর সঙ্গে তাল রেখে ছোটেন সেই কাগজের ফোটোগ্রাফার। সেই দৌড়ে রিপোর্টারের একটু পিছিয়ে পড়লেও চলে কিন্তু ফোটোগ্রাফারের সেই ত্রুটি অমার্জনীয়। কারণ, খবরটা পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেওয়া যায়, টেলিফোনে তার বিবরণ সংগ্রহ করা যায় কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। সুতরাং ফোটোগ্রাফারকে ছুটতে হয় রিপোর্টারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বা তাঁকে পিছনে ফেলে।

যে ঘটনা বর্ণনা করতে কয়েক শত শব্দ লাগে শুধু একটি ছবিতেই তা বোঝান যায়। শব্দ এবং ছবি দুইই কথা বলে। তারা কথা বলে নিঃশব্দে। কথা বলে যে যার ভাষায়।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাঁশের ব্যারিকেড নিচু হয়ে গলে যাচ্ছেন খবরের সঙ্গে এর ছবি প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজে বেরলে এবং আপনার কাগজে না থাকলে কেমন লাগবে ?

ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের মঞ্চে বসে থাকার সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে কোন মতে ওঠার চেষ্টা করছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ইন্দিরা। ভাবুন তো এই ছবি আপনার কাগজের প্রথম পাতায় না দেখলে আপনাদের সম্পর্কে পাঠকরা কি ভাববেন।

কিম্বা ভাবুন, জন কেনেডির ঘাতক হার্ভে লি অসওয়াল্ডের পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়েছে নাইট ক্লাবের মালিক জ্যাক রুবি। এই ছবি অন্য কাগজ ছাপতে পারল কিন্তু আপনি সে কাজে ব্যর্থ হলেন—আপনার পাঠকরা আপনাকে মাপ করবেন ? করবেন না।

একবার ভাবুন তো, এই সব ঐতিহাসিক মুহূর্ত ও ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি ক্যামেরায় বন্দি করতে ফোটোগ্রাফারদের কতটা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়। রিপোর্টার কিছুক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে খোশগল্প করতে পারে, এমনকি ঘটনাস্থলে না গিয়েও রিপোর্টের মালমশলা যোগাড় করে নিয়ে কাজ সামলে দিতে পারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বা বিষয়ের খবর কভার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোটোগ্রাফারের মূলমন্ত্র, সদা সতর্ক থাকা। মুহূর্তের অসাবধানতায় ঐতিহাসিক কোন খবরের ছবি তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে। কোন পন্থায়, কোন মূল্যে তিনি ফেলে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

সব ছবিই কি খবরের কাগজে ছাপা যায় ? সব ছবিই কি কাগজের প্রথম পাতায় ছাপার যোগ্য ?

এই সব প্রশ্নের একটা সাধারণ জবাব হচ্ছে, কাগজের প্রথম পাতায় কদাচ এমন ছবি ছাপা হবে না যা পাঠকদের কাছে রুচিসম্মত নয়। যে ছবি দেখলে পাঠক আতঙ্কিত হতে পারেন বা মনে বিকার সৃষ্টি হয় এমন ছবিও কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয় না।

আবার এমন ছবিও সম্পাদকের হাতে আসতে পারে যার ঐতিহাসিক মূল্য অসীম কিন্তু তবুও তিনি তা কাগজের প্রথম বা অন্য কোন পাতায় না ছাপার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরের মুহূর্তের বীভৎস ছবিগুলির কথা স্মরণ করতে পারি। দেশের একটি ইংরাজি সাময়িক পত্র সেই ছবিগুলি প্রচুর দাম দিয়ে কিনেছিল এবং তা কয়েক পাতা জুড়ে ছেপেছিল। পত্রিকার সেই সংখ্যাটি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়েছিল। তাতেও চাহিদা না মেটায় ওই সংখ্যাটি আর একবার ছাপতে হয়েছিল।

ছবিগুলির অধিকাংশ ছিল ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত বিকৃত অনেকগুলি শবদেহের। তার মধ্যে রাজীব গান্ধীর ক্ষতবিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত এবং বিবস্ত্র মৃতদেহও ছিল। ভারতীয় সাময়িক পত্রটিতে সেই ছবিও ছাপা হল।

কিন্তু এই সব ছবির গোছা হাতে পেয়েও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী সেগুলি ছাপল না। পত্রিকাটির সূচীপত্রের নিচে একটি চৌকো আকারের ছোট ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে দেখান হয়েছিল, একটি টেবিল ঘিরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। টেবিলের ওপর কতকগুলি ছোট ছোট ছবি চিৎ করে রাখা আছে। তার মধ্যে রাজীব গান্ধীর মৃতদেহের ছবিটিও চেষ্টা করলে চিনে নেওয়া সম্ভব। এই ছবির তলায় চিত্র পরিচিতিতে বলা হয়েছিল, রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের এই ছবিগুলি আমরা পেয়েছি ও পরীক্ষা করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত, প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাভাজনের জন্য ছবিগুলি ছাপা উচিত হবে না।

একই ঘটনার ছবি নিয়ে দুটি পত্রিকার পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের কাহিনী উল্লেখ করার উদ্দেশ্য যে, কোন ছববি ব্যবহার করা হবে অথবা হবে না তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তা একান্তভাবে নির্ভর করে সম্পাদকের রুচি ও বিচারবুদ্ধির ওপর।

তবে সাধারণভাবে শুধু রাজীব গান্ধী নয়, যে কোন ক্ষতবিক্ষত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত মৃতদেহের ছবি কাগজের প্রথম পাতায় তো বটেই অন্য কোন পাতাতেও ছাপা হয় না।

খবরের কাগজে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এমন সব ছবি দেখা যায় যেগুলি রুটিন ছবি, মামুলি ছবি, সাজান ছবি। কোন নেতা কোথাও বক্তৃতা করছেন, কোন মন্ত্রী ফিতে কেটে কিছু উদ্বোধন করছেন এই সব ছবি কোন পাঠকই মন দিয়ে দেখেন না। কারণ, এই রকম ছবি পাঠকের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে।

মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোবার পর আর এক ধরনের ছবি কোন কোন কাগজে এখনও ছাপা হয়। সেই ছবি হল প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীর মিষ্টি খাওয়ার ছবি। কিম্বা মা, বাবা, দাদু বা অন্য কারো গলা জড়িয়ে হাসি মুখের ছবি।

খবরের কাগজে যে সব ছবি ছাপা হয় সেগুলি নানা সূত্রে সংগ্রহ করা হয়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বড় বড় কাগজগুলির কলকাতার প্রধান অফিসে স্টাফ ফোটোগ্রাফাররা থাকেন। তা ছাড়া কয়েকজন ফ্রি ল্যান্স ফোটোগ্রাফারও বিভিন্ন কাগজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কলকাতায় এবং শহরতলিতে বিভিন্ন খবরের ছবি তাঁরাই সরবরাহ করেন।

জলপাইগুড়িতে বন্যা, পুরুলিয়ায় খরা, পশ্চিম মেদিনীপুরে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা, মালদহ-মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙ্গন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরসঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান ইত্যাদি ঘটনার ছবি তুলতে স্টাফ ফোটোগ্রাফার অথবা ফ্রি ল্যান্স ফোটোগ্রাফারদের পাঠান হয়ে থাকে।

দেশের অন্যান্য স্থান এবং বিদেশের সংবাদচিত্র আসে নানা সূত্র থেকে। রয়টার্স, এ এফ পি, পি টি আই, পেশাদার ফটো এজেন্সি, বিভিন্ন দূতাবাস, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তথ্য বিভাগ বিভিন্ন সংবাদচিত্র কাগজগুলিকে সরবরাহ করে। ফটো এজেন্সি, রয়টার্স, এ এফ পি বা পি টি আইয়ের মত সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে চুক্তিমত দাম দিয়ে ছবি কিনতে হয়। অন্য সূত্রে ছবিগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। স্টাফ ফোটোগ্রাফারই হোন বা কাগজের সঙ্গে যুক্ত ফ্রি ল্যান্স ফোটোগ্রাফারই হোন তাঁদের কারো পক্ষেই অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার কেন্দ্রে উপযুক্ত সময়ে হাজির থাকা সম্ভব হয় না। ঘটনার খবর পেয়ে তাঁরা সেই জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে জল অনেকটা গড়িয়ে যায়।

কলকাতা ও তার শহরতলির বাইরের কোন কোন গ্রামের রেল বা সড়ক সেতু কবে ভাঙবে, কবে কোন সড়কে দুটি ধাবমান গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে অনেক লোক হতাহত হবে, কোথায় কবে দু'দল মারমুখি লোকের মধ্যে প্রচণ্ড হিংসাত্মক দাঙ্গাহাঙ্গামা অগ্নিকাণ্ড রক্তপাত হবে তা আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। অথচ ওই রকম প্রত্যেকটি ঘটনার সংবাদমূল্য (News Value) আছে।

স্থানীয় কোন স্টুডিয়োর পেশাদার ফোটোগ্রাফার ওই রকম কোন অঘটনের ছবি তুলে তা নিয়ে কলকাতায় কোন কাগজের বা একাধিক কাগজের অফিসে এসে ছবিগুলি দেখাবেন। ফোন করার সুযোগ থাকলে কলকাতায় আসার আগে কাগজের অফিসে কথা বলে জেনে নেবেন ওই ঘটনার ফোটো তাঁরা চান কিনা। তাঁদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেলে সেই ফোটোগ্রাফার ছবি নিয়ে কলকাতায় ছুটবেন। তার মধ্যে দু'একটা ছবি পরের দিনের কাগজে ছাপা হয়ে যাবে।

সারা দুনিয়ায় এই রকম অনির্দিষ্ট সূত্র থেকেও অপ্রত্যাশিত ঘটনার ছবি সংগ্রহ করার রেওয়াজ আছে।

একজন ফোটোগ্রাফার কীভাবে কাজ করেন ফ্রেডরিক ফরসাইথ (Frederick Forsyth) একটি ছোটগল্পের মধ্যে তাঁর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন (ব্ল্যাকমেল, ভাষান্তর সুদীপ্ত চক্রবর্তী)। একজন দক্ষ ফোটোগ্রাফার কী চোখে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে অ্যাকশন ছবি শিকার করেন তার বাস্তব বর্ণনা এই গল্পে ফুটে ওঠেছে।

গল্পের পটভূমিতে ডাবলিন শহরে একটি বসতি উচ্ছেদের অভিযান। নগর পরিষদ (সিটি কাউন্সিল) বসতি উচ্ছেদ করে সেখানে একটি আধুনিক বাজার বসাবে। গ্লস্টার ডায়মন্ড মহল্লার মেয়ো রোডে অবস্থিত বস্তিটি ভাঙার কাজ ৯৯ শতাংশ শেষ হয়ে গেছে। বাকি আছে একটি জীর্ণ দোতলা বাড়ি। বাড়িতে এক ততোধিক জীর্ণ বৃদ্ধ এবং তার পোষা চারটি মুরগির বাস। আজ সেই বাড়িটিও ভাঙা হবে। গল্পে আছে—

"বুড়োকে নিয়ে স্থানীয় খবরের কাগজগুলোর লাফালাফির শেষ নেই। তার নাম দেওয়া হয়েছে মেয়ো রোডের সাধক।"

এইদিন আরও অনেকের সঙ্গে "স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রবীণ ফোটোগ্রাফার বার্নি কোলহার যথারীতি হাজির। সঙ্গে এক অল্পবয়সী রিপোর্টার।"

পুলিশ এবং সাংবাদিক উভয় পক্ষই জানে দূরত্ব বজায় রেখে যার যার কাজ করতে হবে। "সম্পর্ক নষ্ট করে, ঝগড়া করে লাভ কারুরই নেই।"

বাড়িটি ভাঙার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে পুলিশের সঙ্গে "কথা বলতে এগিয়ে এল রিপোর্টারটি। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি জোর করে ভদ্রলোককে উচ্ছেদ করে দেবেন?"

খুব স্পর্শকাতর কিন্তু ষোল আনা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। চিফ পুলিশ সুপার উইলিয়ম জে হ্যানলির পক্ষে জবাব দেওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু এই রকম বহু অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা হ্যানলির আছে।

তাই "হ্যানলি নিমেষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধূসর চোখ দুটো দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। পিছিয়ে গেল রিপোর্টার। না বললেই ভাল ছিল কথাটা।

গম্ভীর গলায় হ্যানলি বললেন, যথাসম্ভব ভদ্র আচরণই করার চেষ্টা করব আমরা।

তীব্র গতিতে লিখতে লাগল রিপোর্টার, এত ছোট একটা বাক্য মনে থাকবে না তার তা নয়। তবুও নোট দেওয়াই সব থেকে ভাল।"

বিদ্রোহী বুড়ো কিন্তু প্রতিরোধে অনড়। অবশেষে কাজ শুরু করার জন্য বুড়োকে পাঁজাকোলা করে বার করে আনা হল। একজন পুলিশ দু'হাতে দুটো মুরগি নিয়ে বেরিয়ে এল।

"ওদিকে বার্নি কোলহার সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ছবি তুলে ফেলল। ভাল ছবি হবে। মনে মনে চিন্তা করল বার্নি।

মেয়ো রোডের সাধকের শেষ বন্ধু। ক্যাপশনটাও দুর্ধর্ষ।

ঘণ্টা কয়েক পরে কোলহারকে হ্যানলি জিজ্ঞাসা করলেন, ছবি টবি তুললেন?

বার্নি বলল, "তুলেছি কয়েকটা। মুরগির ছবিটা ভাল হয়েছে। চিমনির ওপরের অংশটা ভাঙা পড়ার ছবিটাও তুলেছি। তারপর বুড়োকে কম্বলে জড়িয়ে বের করে আনার ছবিটা। ক্যাপশনও দেব, একটি যুগের অবসান।

৬.২.৭ সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সম্পাদনা

খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য যাবতীয় খবর প্রধানত দুটি সূত্র থেকে আসে। একটি সূত্র হল সেই কাগজের রিপোর্টারবৃন্দ। অপর সূত্রটি হল সংবাদ সরবরাহ সংস্থা।

আমাদের দেশের প্রধান দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা হল Press Trust of India (PTI) এবং United News of India (UNI)। এই দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা তাদের গ্রাহকদের কাছে দেশের নানা রকম খবর পৌঁছে দেয়। তাদের মাধ্যমে আমরা বিদেশের খবরও পেয়ে থাকি। সেই সব খবর তারা রয়টার্স, এ এফ পি, এ পি প্রভৃতি বিদেশি সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে চুক্তির ভিত্তিতে সংগ্রহ করে গ্রাহকদের কাছে পাঠায়।

তাদের খবরের ভাষা সাধারণত ইংরেজি। তারা আগে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে সরাসরি খবর পৌঁছে দিত। এখন টেলিপ্রিন্টারের জায়গা নিয়েছে কম্পিউটার মনিটার।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলি নির্বাচিত খবর কেটে ছেঁটে প্রয়োজনীয় রূপ দিয়ে সম্পাদনা করে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার সরবরাহ করা নির্বাচিত খবরের নির্বাচিত অংশ প্রকাশনার নিজস্ব ভাষায় তরজমা করে নেয়। আনন্দবাজার, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, গণশক্তি, আজকাল, কালান্তর, খবরের কাগজ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাই তারা পিটিআই এবং ইউএনআই থেকে পাওয়া খবর বাংলায় তরজমা করে ব্যবহার করে। The Telegraph, The Statesman, The Times of India, The Hindustan Times প্রভৃতি ইংরেজি কাগজ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তারা সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর ব্যবহার করার জন্য সরাসরি সম্পাদনা করে নেয়।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলিতে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রেরিত নির্বাচিত খবরগুলি

ইংরেজি থেকে বাংলায় তরজমা করে থাকেন সাব-এডিটররা। কোন খবর কোন সাব-এডিটর তরজমা এবং সম্পাদনা করবেন তা ঠিক করে দেন তখনকার পালার চিফ সাব।

তরজমা করার জন্য প্রতিটি শব্দের বঙ্গানুবাদ করা দরকার হয় না। মূল খবরটি পড়ে সাব-এডিটর সংবাদের মূল অংশটি বুঝে নেন। তারপর তথ্যাদি বজায় রেখে খবরটি সরল বাংলায় লিখে ফেলেন। তাতেই কাজ চলে যায়।

তা ছাড়া, চিফ সাব সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সাব-এডিটারদের হাতে তুলে দেবার সময় খবরের পরিমাপ, শিরোনামের সম্ভাব্য মাপ বলে দেন। দরকারে খবরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি চিহ্নিত কর দেন। তাতে সাব-এডিটর তাড়াতাড়ি কাজ সারতে সক্ষম হন। চিফ সাবকেও হয়রান হতে হয় না। কাজ চলে মসৃণ ছন্দে।

আফগানিস্তানে তালিবানি জমানার অবসান হয়েছে ২০০২ সালের গোড়ায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীর গুপ্ত ঘাতকরা সে দেশে সক্রিয় রয়েছে। তার প্রমাণও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

জুলাই মাসে এই রকম এক গুপ্ত হামলায় আফগানিস্তানের এক জন উচ্চপদস্থ শাসনকর্তা নিহত হন। এই ঘটনার বিবরণ একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা যে ভাবে পাঠিয়েছিল তা নীচে উদ্ধৃত করা হল—

Afghan Vice President Qadir Gunned Down

KABUL (ABC) – Haji Abdul Qadir, one of Afghanistan's three vice presidents, was assassinated outside his office in the center of Kabul on Saturday, Interior Minister Taj Mohammad Wardak said.

Qadir, a Pashtun from the Northern Alliance who was also public works minister and governor of Jalalabad, was shot by two gunmen as the drove into his office compound, Kabul police chief Basir Salangi told reporters.

Some 36 rounds were fired, smashing the car windshield and riddling the side with holes. Blood could be seen in the car and on the ground.

A veteran warlord from eastern Afghanistan, Qadir played a leading role in the downfall of the Taliban last year.

His brother, Mujahideen commander Abdul Haq, was himself executed by the Taliban shortly after the United States launched air strikes on Afghanistan last year.

"He was one of the few Pashtuns in the Northern Alliance, so it could have been a kind of Taliban hit, because he is considered a betrayer of the Taliban," one Afghan expert said.

The Taliban were Pashtuns, Afghanistan's biggest ethnic group, while the Northern Alliance was dominated by Tajiks.

Qadir's driver was also killed in the shooting. Two passengers were wounded, witnesses said.

Salangi said 10 guards, who had been appointed by Qadir's predecessors at the public works ministry, Abdul Khaliq Fazal, had been arrested.

Officers from the International Security Assistance Force (ISAF), in Kabul to help keep the peace, said they were investigating. The assassination illustrates the problems facing President Hamid Karzai just weeks after a Loya Jirga, or Grand Assembly, of Afghan leaders approved a new cabinet to lead the country out of 23 years of war and prepare for elections in 18 months time.

The assembly faced the tough task of finding a government acceptable to the Pashtun majority, the Northern Alliance which had a strong hand on the ground, and the various warlords who dominate swathes of the country.

Earlier this year, Tourism Minister Dr. Abdul Rehman was killed at the airport under circumstances which have never been made clear.

এই খবরটি সম্পাদনা করার পর যে রকম দাঁড়াবে—

আফগানিস্তানের উপরাষ্ট্রপতি কাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত

"কাবুল, ৬ জুলাই : আফগানিস্তানের এক উপরাষ্ট্রপতি হাজি আবদুল কাদির আজ কাবুলের কেন্দ্রস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। তাঁর অফিসের কাছে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তিনি দেশের তিনজন উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে অন্যতম। কাদিরের হত্যাকাণ্ডের খবর জানিয়েছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাজ মহম্মদ ওয়ারদাক।

নিহত নেতা পাশতুন উপজাতি গোষ্ঠীর লোক। তিনি জোট সরকারের উত্তরের জোটের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি দেশের পূর্তমন্ত্রী এবং জালালাবাদের শাসনকর্তার পদেও ছিলেন। কাবুলের পুলিশ প্রধান বসির সালাঙ্গি সাংবাদিকদের বলেছেন, হাজি গাড়ি করে দফতর প্রাঙ্গণে ঢোকার সময়ে তাঁকে দু'জন বন্দুকধারী গুলি করে।

৩৬ রাউন্ড গুলিতে গাড়ির কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং গাড়ির গায়ে গর্ত হয়ে যায়। গাড়িতে এবং মাটিতে রক্ত দেখা যায়।

কাদির আফগানিস্তানের পূর্ব অঞ্চলের একজন পোড় খাওয়া লড়াকু সর্দার। গত বছর তালিবানি জমানার পতন ঘটাতে তিনি বেশ বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আমেরিকা গত বছর আফগানিস্তানে বিমান আক্রমণ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ভাই মুজাহিদিন নেতা আবদুল হককে তালিবানি ঘাতকরা হত্যা করে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে কাদিরের গাড়ির চালকেরও মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দু'জন যাত্রীরও মৃত্যু হয়েছে।

এই বছরের গোড়ার দিকে পর্যটন-মন্ত্রী ড. আবদুল রেমোন বিমানবন্দরের কাছে নিহত হন। কি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।"

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন, সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রেরিত খবরটির বাক্যগুলি কত ছোট ছোট। অনুচ্ছেদগুলিও সেই রকম। তা ছাড়া পুরো খবরটিতে ছাঁকা তথ্যের ঠাসবুননি। একটিও অপ্রয়োজনীয় কথায় খবরটি অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত নয়। খবরটি পড়লেই বোঝা যায় একজন পেশাদার পাকা রিপোর্টার কেমনভাবে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার জন্য কাজ করেন।

সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ঝড়ের গতিতে তার গ্রাহকদের কম্পিউটার মনিটরে দেশ বিদেশের খবর পৌঁছে দেয়। অপ্রত্যাশিত ঘটনার খবর পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবাদ সংস্থা তা গ্রাহককে জানিয়ে দেয়।

দিনের প্রত্যাশিত প্রধান প্রধান কয়েকটি খবরের বিষয়েও সংস্থা তার গ্রাহকদের জানায়। বার্তা বিভাগও হাতে যথেষ্ট সময় থাকতে ওই সব খবর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তা জানিয়ে যে সব বার্তা গ্রাহকদের কাছে আসে তার একটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল—

PRI NAT GEN
NEWDEL DEL 11
NEWS SCHEDULE
PTI NEWS SCHEDULE FOR
THURSDAY, OCTOBER 17
DOMESTIC

NEW DELHI	:	RURAL DEVELOPMENT MINISTER SHANTA KUMAR TO INAUGURATE NATIONAL WORKSHOP ON RURAL HOUSING
CHENNAI	:	UNION LABOUR MINISTER SAHIB SINGH VERMA TO ATTEND EMPLOYMENT FEDERATION OF SOUTH INDIA MEETING
BANGALORE	:	AICC PRESIDENT SONIA GANDHI'S ENGAGEMENTS STORIES ON KIDNAPPING OF FORMER KARNATAKA MINISTER H. NAGAPPA

FOREIGN

UNDATED	:	WEST ASIA SITUATION

SPORTS

HYDRABAD : WORLD CUP CHESS
CHENNAI : SECOND CRICKET TEST MATCH BETWEEN INDIA AND WEST INDIES

PTI APS

10171056 K

(সৌজন্য : পিটিআই)

আপনি দেখবেন এই বার্তার অনেক কিছুই আপনাদের কাছে দুর্বোধ্য। যারা সাংবাদিকতা শিখছেন তাঁদের পক্ষে এটা লজ্জার নয়, বরং স্বাভাবিক। আমি ব্যাপারটি আপনাদের বুঝিয়ে দিই।

দেখুন, প্রথম লাইনে লেখা আছে PRI NAT GEN। এই তিনটি সাংকেতিক শব্দ আসলে তিনটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দ তিনটি হল— Priority National General। এই শব্দ তিনটির মধ্যে দিয়ে সংস্থার বার্তা বিভাগ ট্রান্সমিশন বিভাগকে নির্দেশ দিচ্ছে। বার্তাটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে পরিবেশন করতে হবে। গ্রাহকেরা বুঝবেন খবরটির বিষয়বস্তু সাধারণ।

দ্বিতীয় লাইনের NEWDEL আসলে New Delhi। Del 11 মানে ওই তারিখে সংস্থার দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ১১ নম্বর ফাইলের খবর। বার্তার বাকি বিষয়গুলি নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু শেষ লাইনের 10171056 সংখ্যাগুলি নিশ্চিতভাবে দুর্বোধ্য। ব্যাপারটি কিন্তু খুবই সরল। খবরটি পাঠাবার তারিখ ও সময় ওই সংখ্যাগুলির মধ্যে দিয়ে জানানো হয়েছে। প্রথম মাস, বৎসরের দশম (10) মাস অর্থাৎ অক্টোবর। তারপর তারিখ ১৭ (17) অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর। সময় ১০৫৬ অর্থাৎ সকাল ১০টা বেজে ৫৬ মিনিট।

প্রত্যেকটি খবরের আলাদা আলাদা ফাইল নম্বর থাকে। Del 11 নম্বর মানে ১৭ অক্টোবর সকাল ১০টা ৫৬ মিনিটে পাঠানো দিল্লি অফিসের ১১ নম্বর ফাইলের খবর। তার আগে হয়ত চেন্নাই, মুম্বাই, ইটানগর বা লন্ডন ফাইলের খবর ছিল। তারও আগে ছিল Del 10।

আবার Del 11 ফাইলের খবরের পর বাঙ্গালোর, তিরুবনন্তপুরম, ভুবনেশ্বর, ওয়াশিংটন ফাইলের খবরের পর এল Del 12 নম্বর ফাইলের খবর।

প্রতিটি খবরের আলাদা ফাইল নম্বর থাকায় খবরের কাগজের নিউজ ডেস্কের কোন খবর সম্পর্কে সংবাদ সংস্থার কাছে কিছু জানতে হলে ফাইল নম্বরটি আগে বলতে হয়। তাতে সংবাদ সংস্থা প্রাসঙ্গিক খবরটি চট করে খুঁজে পায়।

ধরুন Del 11 নম্বর ফাইলের খবরের কয়েকটি লাইন বিকৃতভাবে এসেছে। ফলে বার্তাটির মর্ম বোঝা যাচ্ছে না। তখন সংবাদ সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ফোন করে নিউজ ডেস্ক Del 11 বললে খবরের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন বিকৃতভাবে এসেছে। ওটা ঠিক করে দিন। সংবাদ সংস্থা তখন যা করা সম্ভব তা করবে।

সংবাদ সংস্থা দিনের মধ্যে কয়েকবার বড় বড় খবরের চুম্বক গ্রাহকদের জানিয়ে দেয়। তা দেখে নিউজ ডেস্ক খবর বাছাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে। এই রকম একটি বার্তার নমুনা নীচে দেওয়া হল—

NEWDEL DEL 36
1400 hours news advisory
1400 hours news advisory
1400 hours pti newsfile

Here are highlights of pti newsfile at 1400 hours :

Nation :

Shrinagar	:	Jammu and Kashmir Governor Girish C. Saxena said there was no deadline now on the formation of Government in the state and asked the political parties to come with credible claim. (Lead moved under Del 19)

Foreign :

United nations	:	Faced with global opposition to explicit authorisation of use of military force against Baghdad. The US has agree to modify its resolution before the UN Security Council in this regard. (Second Lead moved under FGN 12).
Islamabad	:	Terming as baseless report that Palestine supplied nuclear weapons technology and equipment to North Korea, president Parvez Musharaf has said Islamabad firmly stood by its commitment to non-proliferation. (FGN 14).

Sports

Chennai	:	relaying to west Indies first innings score of 167, India were all out for 316 on the third day of the second cricket test here. (Del 24).

PTI VS APS
10191545

(সৌজন্য : পিটিআই)

খবরের চুম্বকের ফাইল নম্বর প্রথম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে। নিউজ ডেস্ক চুম্বকে উল্লেখ করা কোন খবর দেখতে চাইলে ওই ফাইল নম্বর খুলে তা চট করে দেখতে পারেন। ফাইল নম্বরে FGN বলে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি FOREIGN শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

বেলা দু'টোয় (1400 hours) প্রথমবার চুম্বর দেবার চার ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা ছ'টায় (1800 hours) পিটিআই (PTI) আর এক দফা চুম্বক প্রচার করে থাকে।

একটা সময় ছিল যখন দূরের খবর ভিডিয়ো টেলিফোনে, স্যাটেলাইট ফোন, আই এস ডি, কম্পিউটার, টেলিফ্যাক্স তো দূরের কথা টেলিপ্রিন্টারেও আসত না। তখন দূরের খবর আসত তারে (Telegram)। খরচ সাশ্রয়ের জন্য কাগজের বা সংবাদ সংস্থার রিপোর্টাররা সব কথা গোটা গোটা বাক্যে লিখতেন না। লিখতেন সংক্ষেপে, কাটা কাটা বাক্যে।

নিউজ ডেস্কের দক্ষ সাব- এডিটররা সেই তারের কাঠামোয় খড় মাটি রঙ দিয়ে খবরের প্রতিমা নির্মাণ করতেন। এই কাজ কেমন করে করা হত তার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় আর্থার কোনান ডয়েলের একটি ছোট গল্পে। গল্পটির নাম, তিন সাংবাদিকের গল্প।

গল্পের পটভূমি মিশরের মরুভূমি। সাহারা মরুর বুক চিরে যাওয়া একটি পুরানো রেল লাইন মেরামত করতে চায় মিশরিরা। তাদের পক্ষে ইংরেজ, বিপক্ষে আরবিরা। তারা রেললাইন মেরামতে বাধা দিতে চায়। এই নিয়ে আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই চলছে মিশরিয় ও ইংরেজদের। সেই যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে চলেছেন ছ'জন ব্রিটিশ রিপোর্টার।

রয়টার্সের রিপোর্টার ফ্রন্টের দিকে ৩০ মাইল এগিয়ে গেছেন। তাঁর ২০ মাইল পিছনে উটের পিঠে চড়ে আসছেন ইনটেলিজেন্সের রিপোর্টার মার্টিসার এবং কুরিয়ারের রিপোর্টার স্কট। দু'জনেই ঝানু সাংবাদিক। তাঁদের সঙ্গী গেজেটের রিপোর্টার আনারলি। তিনি তুলনামূলকভাবে এই পেশায় নবাগত।

কাহিনীর মাঝখানে তিন রিপোর্টার ফ্রন্টের পথে এক মরুদ্যানে কুলি, লটবহর, উট ও খচ্চরসহ আশ্রয় নিয়েছেন। স্কট তিনজনের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করছেন। মার্টিসার হাঁটুর ওপর নোটবুক রেখে রেল ইঞ্জিনিয়ার মেরি ওয়েদার যা বলে গেলে সে সব কথা মনে করে লিখে ফেলছিলেন।

তৃষ্ণার্ত মেরি ওয়েদার তাঁদের কাছ থেকে জল চাইলেন। জল পান করে তিনি বললেন, ঠিক আছে, এবার চলি।

সাংবাদিকসুলভ কৌতূহলে মার্টিসার অনিবার্যভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন খবর

—রেলওয়ের কাজে গোলমাল হচ্ছে। জেনারেলের সঙ্গে এখনই দেখা করতে হবে আমাকে।

এই কটি কথা ছুঁড়ে দিয়ে ব্যতিব্যস্ত ইঞ্জিনিয়ারসাহেব উটের পিঠে সওয়ার হয়ে ধাবিত হলেন ফ্রন্টের দিকে। তিনি বিদায় নেবার পর ম্যার্টিসার বললেন, আমি ভাবছি এই মাত্র যা শুনলাম তা টেলিগ্রাম করে দেব।

—কিন্তু মাত্র ওই ক'টি কথার মধ্যে এমন কী খবর আছে যা টেলিগ্রাম করা জরুরী ?

নবাগত সাথীর সরল প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন মার্টিসার। তার পর বললেন, এই কাজে একের অন্যকে খবর দেওয়াটা রীতি নয়। তবে যেহেতু তুমি একদম নতুন তাই তোমাকে আমার টেলিগ্রাম পড়ে শোনাচ্ছি। এই বলে মার্টিসার পড়লেন, মেরি ওয়েদারের কাজে বাধা STOP জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে STOP অসুবিধার বিষয়গুলি জানাবেন STOP গুজব দরবেশের দল আশেপাশে STOP EOM।

আনারলি বললেন, এতো খুব সংক্ষিপ্তি তার।

—সংক্ষিপ্ত, বলো কী! আমার ইচ্ছা তারটা আরও ছোট করে দেওয়া, যেমন ধরো "দেখা করতে যাচ্ছে", "বিষয়গুলি" এবং "গুজব" এই তিনটি শব্দ কেটে বাদ দেওয়া। তা সত্ত্বেও এর মর্ম উদ্ধার করে দশ লাইনের খবর লিখতে ডেস্কের কোন অসুবিধাই হবে না।

—কি করে ?

—ঠি আছে আমিই লিখে দেখাচ্ছি তোমাকে :

হাসান ইমাম মরুদ্যান (মিশর) থেকে বিশেষ সংবাদদাতা টমাস মার্টিসার : সারাস থেকে ফ্রন্ট পর্যন্ত রেললাইন মেরামতের কাজ পরিচালনা করছেন প্রখ্যাত রেল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ চার্লস এইচ মেরি ওয়েদার। তিনি কাজ চালাতে গিয়ে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এ রকম অসুবিধা খুবই সমস্যার বিষয়। তাই তিনি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে অসুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে মুখোমুখি আলোচনার জন্য ফ্রন্টে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফ্রন্ট এখান থেকে ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। কাজটা কী করে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করা যায় সেটাই তাঁর চিন্তা।

তাঁকে কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা নিরাপত্তার কারণে তিনি গোপন রেখেছেন। ফ্রন্টলাইন এখন পর্যন্ত শান্ত। তবে আরব দরবেশের দলকে আশেপাশে ঘুরতে দেখা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন।

তারের বয়ান পড়া শেষ করে মাটিসার জানতে চাইলেন, কেমন হল খবরটা ?

আনারলি স্তম্ভিত।

● ২০০১ সালের শেষে আফগানিস্তানে তালিবান বিরোধী যুদ্ধের সময়ও দেখা গেছে সেই রিপোর্টাররা আছেন, আছে প্রচুর লটবহর, ট্রাক টয়োটার সঙ্গে উটও। নেই শুধু তারে সংক্ষেপে কাটা কাটা শব্দে খবর পাঠাবার ব্যস্ততা।

তার বদলে সংবাদ সংস্থা এখন শিরোনাম সমেত সুসম্পাদিত খবর সরবরাহ করে তার গ্রাহকদের তার কিছু দৃষ্টান্ত আগে দেওয়া হয়েছে। এখানে আর একটি ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ সংস্থার খবর পাঠাবার কৌশল দেখান হচ্ছে।

ঘটনাস্থল রাশিয়ার রাজধানী মস্কো। তারিখ ২৩ অক্টোবর ২০০২। ভারতীয় মান সময় রাত সাড়ে দশটা, রাশিয়ার মান সময় রাত সাড়ে ন'টা।

মস্কোর একটি দর্শকপূর্ণ রঙ্গমঞ্চে কয়েকজন সশস্ত্র লোক ঢুকে পড়ে স্যাবমেশিনগান থেকে গুলি চালাতে চালাতে হলটি দখল করে নেয়।

রাত ১২টা বেজে ১৫ মিনিটে কলকাতার গণমাধ্যমগুলির দফতরে পিটিআইয়ের কম্পিউটারে ওই ঘটনার প্রথম খবরটি এসে যায়।

ভালো করে লক্ষ্য করবেন, খবরটি কত নিটোল এবং সুসম্পাদিত। শিরোনামশুদ্ধ খবরটি কাগজের ডাক সংস্করণে ধরিয়ে দেবার মত করে তৈরি। তাতে ইংরেজি কাগজের নিউজ ডেস্কের বিশেষ কিছু করার নেই।

১ নং খবর

URG GEN INT
MOSCOW FGN 51
RUSSIA THEATRE

GUNMEN OPEN FIRE IN MOSCOW THEATRE, HOLD AUDIENCE HOSTAGE
MOSCOW, OCT 23 (AFP) ABOUT 20 GUNMEN FIRED IN THE AIR IN A MOSCOW THEATRE TODAY AND WERE HOLDING THE AUDIENCE HOSTAGE, RUSSIA'S FSB SECURITY TOLD AFP
10240025

(সৌজন্য : পিটিআই)

এক্ষেত্রে URG কথাটি URGENT শব্দের, GEN কথাটি GENERAL শব্দের এবং INT কথাটি INTERNATIONAL কথার সংক্ষিপ্ত রূপ।

RUSSIA – THEATRE শব্দ দুটি খবরের তকমা (Slag)। পিটিআইয়ের সঙ্গে বিনিময় চুক্তি থাকায় AFP প্রেরিত খবরটি পিটিআইয়ের।

তার ঠিক ১৪ মিনিটের মাথায় এল পিটিআইয়ের নিজস্ব সংবাদদাতার খবর—

২ নং খবর

URG GEN INT
MOSCOW FGN 52
RUSSIA – LD THEATRE
ABOUT 700 PEOPLE TAKEN HOSTAGE
IN MOSCOW THEATRE : ITAR-TASS

MOSCOW, OCT 23 (PTI) ABOUT 700 PEOPLE WERE TAKEN HOSTAGE BY OVER 10 ARMED MEN IN A THEATRE IN SOUTHERN MOSCOW TONIGHT, STATE-RUN ITAR-TASS AGENCY REPORTED.

QUOTING AUTHORITIES.

THE GUNMEN, ARMED WITH SUB-MACHINE GUNS CAME IN FOREIGNMADE CARS, ENTERED THE PALACE OF CULTURE BUILDING, BLOCKED THE ENTRANCE AND TOOK ABOUT 700 PEOPLE HOSTAGE AT AROUND 2230 IST, ITAR-TASS QUOTED LAW-ENFORCEMENT SOURCES AS SAYING.

THE ARMED MEN, DESCRIBED BY THE AGENCY AS LOOKING LIKE ETHNIC RESIDENTS OF THE CAUCASUS FIRED SEVERAL ROUNDS IN THE AIR.

ANTI-RIOT POLICE UNITS HAVE BEEN DESPATCHED TO THE SCENE.

NO CASUALTIES HAVE BEEN REPORTED SO FAR AND THE GUNMEN ARE YET TO MAKE ANY DEMANDS, THE AGENCY SAID.

THE PALACE OF CULTURE WAS SHOWING A MUSICAL "NORDT-OST" IT SAID.

10240039

(সৌজন্য : পিটিআই)

পিটিআইয়ের দিল্লি অফিসের নিউজ ডেস্ক খবরটি সম্পাদনা করার সময় দেখল কিছু নতুন তথ্য আছে। তাই তারা তকমা পাল্টে করে দিল RUSSIA-LD THEATRE। এক্ষেত্রে LD হল মুখবন্ধ বা Lead শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

৩ নং খবর

URG GEN INT

DELHI FGN 57

RUSSIA–2ND LD THEATRE

ISLAMIC TERRORISTS TAKE UPTO 1000 HOSTAGE IN MOSCOW THEATRE

VINAY SHUKLA

MOSCOW, OCT 23 (PTI) ABOUT 20 ALLEGED CHECHEN ISLAMIC TERRORISTS HAVE TAKEN UPTO 1000 PEOPLE HOSTAGE TONIGHT IN A MOSCOW THEATRE STATING A POPULAR MUSICAL, RUSSIAN TV CHANNELS REPORTED

10240125

(সৌজন্য : পিটিআই)

৩ নম্বর খবরে আরও নতুন তথ্য ছিল। তাই মুখবন্ধ বদল করে নতুন তকমা হয়েছিল RUSSIA-2nd LD THEATRE। এবার খবরটি পিটিআইয়ের বিশেষ সংবাদদাতা বিনয় শুক্লার নামাঙ্কিত।

পরের খবর আসে রাত ২ বেজে ৫৭ মিনিটে—

৪ নং খবর

PRI GEN INT

RUSSIA-THEATRE-FREE

150 HOSTAGES FREED IN MOSCOW BY CHECHEN GUNMEN : POLICE

MOSCOW, OCT 24 (AFP) CHECHEN GUNMEN HOLDING SEVERAL HUNDRED PEOPLE HOSTAGE IN A MOSCOW THEATRE HAVE RELEASED SOME 150 PEOPLE, INCLUDING CHILDREN AND FOREIGNERS, POLICE SAID EARLY TODAY.

10240257

(সৌজন্য : পিটিআই)

৪ নম্বর খবরে একই ঘটনার সম্পূর্ণ নতুন মোড়। তাই এবারও তকমা নতুন RUSSIA-THEATRE-FREE।

৫ নং খবরে আর একটা নতুন মোড়। সেটি হল, দখলদারদের পরিচয়। অতএব ফের নতুন তকমা RUSSIA-THEATRE-CHECHNYA।

৫ নং খবর

URG GEN INT

RUSSIA–THEATRE-CHECHNYA

CHECHAN REBELS CLAIM HOSTAGE-TAKING IN MOSCOW

MOSCOW, OCT 24 (PTI) CHECHEN REBELS HAVE CLAIMED THE RESPONSIBILITY FOR THE SEIZURE OF SEVERAL HUNDRED HOSTAGES IN MOSCOW THEATRE THROUGH THEIR WEBSITE.

10240327

(সৌজন্য : পিটিআই)

৬ নম্বর খবরে মুক্তিপ্রাপ্ত পণবন্দিদের সংখ্যা কিছু বাড়ল। তাই ফের তকমা বদল হল। এবার তকমা RUSSIA-3rd LD THEATRE।

৬ নং খবর

PRI GEN INT
MOWCOW FGN 15
RUSSIA–2RD LD THEATRE
GUNMEN RELEASE 180 HOSTAGES, DEMAND MONEY, TROOP WITHDRAWAL
VINAY SHUKLA

MOSCOW, OCT 24 (PTI) OVER 40 HEAVILY ARMED CHECHEN REBELS HOLDING 500-800 PEOPLE HOSTAGE INSIDE THE SOVIET-ERA PALACE, OF CULTURE TURNED INTO THE VENUE FOR RUSSIA'S FIRST MULTI-MILLION DOLLAR MUSICAL, HAVE SOUGHT A LARGE SUM IN ADDITION TO THE DEMAND FOR THE COMPLETE PULL OUT OF RUSSIAN TROOPS FROM CHECHNYA.

10241000

(সৌজন্য : পিটিআই)

৭ নম্বর খবর দিল AFP (এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস)। এই খবর এক পুলিশের মৃত্যুর। তাই তকমা RUSSIA-THEATRE-POLICE।

৭ নং খবর

PRI GEN INT
MOSCOW FGN 17
RUSSIA–THEATRE-POLICE
RUSSIAN POLICEMAN KILLED AT HOSTAE SCENE : CHECHEN REBELS.

MOSCOW, OCT 24 (AFP) A RUSSIAN

POLICEMAN WAS SHOT DEAD EARLY TODAY BY CHECHEN REBELS HOLDING SOME 1000 HOSTAGES IN A MOSCOW THEATRE, THE CHECHEN SEPARATIST INTERNET WEBSITE KAVKAZ.ORG SAID.
10241021

(সৌজন্য : পিটিআই)

এই সংবাদপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে আপনি দেখবেন, সংবাদ সংস্থা যখন যতটুকু খবর পায় তখন দেরি না করে তা পাঠিয়ে দেয়। তার প্রত্যেকটি খবর হয়ত সব সময়ে খবরের কাগজে কাজে লাগে না কিন্তু টেলিভিশনের নানা নিউজ চ্যানেল এবং রেডিয়ো স্টেশন ওই সব খবর তাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবরে ব্যবহার করে। প্রথম দিকে খবরের নির্ভরযোগ্য বিবরণ হয়ত থাকে না। কিন্তু তার জন্য সংবাদ সংস্থা অপেক্ষা করতে পারে না।

তাই এএফপি (AFP) এক নম্বর খবরে বন্দুকধারীর সংখ্যা ২০ জন বলে উল্লেখ করল। পরে তা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করুন, এ এফ পি'র খবরের সূত্র ছিল রাশিয়ার FSB (ফেডেরাল সিকিউরিটি ব্যুরো)। সুতরাং ভুলের প্রাথমিক দায়িত্ব এ এফ পি'র হলেও মূল দায়িত্ব ছিল ব্যুরোর। এই খবরে বন্দিদের সংখ্যা, বন্দুকধারীদের উদ্দেশ্য ও তাদের পরিচয় সম্পর্কে কোন তথ্য ছিল না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে সে সব বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সে সব বিষয়ে কিছুটা পাওয়া গেল ২ নম্বর খবরে। সরকারি সংবাদ সংস্থা ইতার—তাসকে উদ্ধৃত করে পিটিআই খবর দিল, পণবন্দির সংখ্যা ৭০০ জন। কিন্তু বন্দুকধারীর সংখ্যা বলা হল ১০ জন। এই পার্থক্যের কারণ তখন সর্বস্তরে প্রচণ্ড বিভ্রান্ত চলছিল। থিয়েটার হলে হামলাকারীদের ঢোকার সময় AFP, PTI বা FSB জঙ্গিদের মাথা গুণতে পারেনি। সেটাও এই বিভ্রান্তির একটা কারণ। ডামাডোলের সময় এরকম ব্যাপার ঘটে থাকে।

পিটিআইয়ের এই খবরে কিন্তু জঙ্গিদের পরিচয় সম্পর্কে আভাস দেওয়া হল। বলা হল, তাদের ককেশাস অঞ্চলের অধিবাসীদের মত দেখতে। আর বলা হল, জঙ্গিরা তাদের এই কাজের মতলব তখনও পর্যন্ত জানায়নি।

৩ নং খবরে অসমর্থিত তথ্যের ভিত্তিতে পিটিআই বলল, হামলাকারীরা চেচনিয়ার মুসলমান সন্ত্রাসবাদী। নাট্যশালা দখলের সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে দখলদাররা তাদের ওয়েবসাইটের (Website) মাধ্যমে জানিয়ে দিল, তারা চেচনিয়ার অধিবাসী। তাদের দাবি, রাশিয়া চেচনিয়া থেকে হাত গোটাক। চেচনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামিয়ে সেনাদের সে দেশের সীমানার বাইরে ফিরিয়ে নিক মস্কো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সময় থেকে চেচনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সশস্ত্র সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল। চেচনিয়ার স্বাধীনতার দাবি ছিল সেই সংঘাতের মূলে। সংঘাত শীঘ্র যুদ্ধে পরিণত হয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট তখন বরিস ইয়েলৎসিন। তাঁর নির্দেশে ১৯৯৪ সালের ১১ ডিসেম্বর রুশ ফৌজ কামানে বিমানে লড়াই শুরু করে দেয় বিদ্রোহী চেচেনদের বিরুদ্ধে।

প্রচুর রক্তক্ষয় এবং প্রাণহানির পর চেচনিয়ার রাজধানী গ্রজনি এবং সমতলভূমির অধিকাংশ জায়গা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। চেচেন বিদ্রোহীরা ঘাঁটি গাড়ে পাহাড়ে। সেখান নতুন করে শক্তি সংগ্রহ ও সংহত করে বিদ্রোহীরা ১৯৯৬ সালে ফের রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে বড় রকম প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। এর চাপে বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসে মস্কো। রুশ ফৌজ চেচনিয়া থেকে সরে আসে। ঠিক হয় চেচনিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিয়ে পরে উভয়পক্ষে আলোচনা হবে। কিন্তু সে আলোচনা আর কোন দিন হয়নি।

ইতিমধ্যে চেচনিয়ায় শুরু হয় ক্ষমতার লড়াই, হানাহানি, অরাজকতা। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্কো এবং রাশিয়ার অন্যান্য শহরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে ৩০০ শতাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এইসব নাশকতার জন্য চেচেন বিদ্রোহীদের দায়ী করে ক্রেমলিন। প্রধানমন্ত্রী ভ্লাডিমির পুটিন তাই পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে চেচনিয়ায় ফের ফৌজি অভিযান শুরু করে দেন। পরের বছরের এপ্রিল মাসে পুটিন ঘোষণা করেন, চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সশস্ত্র মোকাবিলার পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। ততদিনে রুশ ফৌজ চেচনিয়ার পাহাড়ি এলাকা বাদে আর সব অঞ্চলে ফের তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে ফেলেছিল। বিদ্রোহীদের ফের পালায় পাহাড়ের দুর্গম ঘাঁটিতে। তার আড়াই বছর বাদে মস্কোর নাট্যশালায় সংগঠিত হয়েছিল চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের এই দুঃসাহসিক অমানবিক ও মূঢ় হামলা। তার খেসারতও তাদের দিতে হয়েছিল জীবন দিয়ে।

● বুধবার ২৩ অক্টোবর ২০০২, ভারতীয় মান সময় রাত সাড়ে দশটায় যে দুনিয়া কাঁপানো বিস্ফোরক নাটকের শুরু হয়েছিল তাতে যবনিকা পড়ল শনিবার ২৬ অক্টোবর ভারতীয় মান সময় সকাল সাতটায়। শীতার্ত মস্কো শহরে তখনও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জবুথবু। কিছুক্ষণ আগে দু'জন নিরপরাধ নির্দোষ পণবন্দিকে হত্যা করেছে চেচেন ঘাতকরা। তাই ক্রেমলিন সিদ্ধান্ত করল, আর দেরি নয়। এবার প্রত্যাঘাত।

সংঘাত পাওয়া মাত্র রুশ নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ তালিম পাওয়া কমাণ্ডোরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নাট্যশালার অবরুদ্ধ দুর্গকে মুক্ত করতে। ক্রেমলিনের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে সকাল ছ'টার ঘণ্টা বাজছে। অভিযান ও জয়ের খবর বিশ্ববাসীর কাছে আসতে আরম্ভ করল সকাল ন'টার কিছুক্ষণ পর থেকে। প্রথম খবর এল এ এফ পি'র কাছ থেকে—

URG INT GEN
MOSCOW FGN 16
RUSSIA-THEATRE-CHIEF
MOSCOW, OCT 26 (AFP) CHECHEN CHIEF HOSTAGE—TAKER BARAYEV DEAD—RUSSIAN OFFICIAL. AFP
10260909

(সৌজন্য : পিটিআই)

প্রায়ই একই সঙ্গে দ্বিতীয় খবর। এবার তাড়াহুড়োর জন্য খবর এল Dateline ছাড়াই।

URG GEN INT
MOSCOW FGN 19
RUSSIA–THEATRE-FREE
ALL MOSCOW HOSTAGES RELEASED. PTI

10260909

(সৌজন্য : পিটিআই)

দু'মিনিটের মধ্যেই পিটিআইয়ের দ্বিতীয় খবর।

MOWCOW FGN 20
RUSSIA-THEATRE-LD FREE
ALL HOSTAGES RELEASED

MOSCOW, OCT 26 (PTI) ALL 700 HOSTAGES HELD IN MOSCOW THEATRE BY CHECHEN REBELS HAVE BEEN RELEASED IN AN OPERATION BY RUSSIAN SPECIAL SECURITY FORCES. (MORE) PTI.

10260911

(সৌজন্য : পিটিআই)

এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীল উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের রিপোর্ট পাঠাবার সময় প্রতিযোগিতার তাগিদে অনেক সময় ভুল বা অসমর্থিত খবরও ছড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা সামাল দেওয়াও হয়। এক্ষেত্রেও সেই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল।

সকাল ১১টা বেজে ৩১ মিনিটে পিটিআইয়ের কম্পিউটারে এপি'র (Associated Press) খবর—

URG GEN INT
MOSCOW FGN 28
RUSSIA-THEATRE-TOLL
TOLL COULD REACH 130 : MAYOR

MOSCOW, OCT 26 (AP) MOSCOW CITY MAYOR YURI LUZHKOV THAT THE NUMBER OF PEOPLE KILLED DURING THE OPERATION TO FREE THE HOSTAGES AT A

MOSCOW THEATRE COULD REACH 130, THE INTERFAX NEWS AGENCY REPORTED TODAY.

UNFORTUNATELY, THERE ARE VICTIMS 'I ESTIMATE THEM TO BE ABOUT 130 PEOPLE, LUZHKOV TOLD JOURNALISTS, NEAR THE THEATRE, THE AGENCY REPORTED.' AP

10261131

(সৌজন্য : পিটিআই)

ঠিক দু'মিনিটের মাথায় খবরট প্রত্যাহার করা হল—

URG GEN INT

DELHI FGN 29

IMPORTANT ADVISORY

EDITORS PLEASE IGNORE THE STORY ISSUED UNDER FGN 28 SLUGGED 'RUSSIA–THEATRE–TOLL'. THE AGENCY THAT REPORTED THE MAYOR'S COMMENTS HAS WITHDRAWN ITS REPORT. AP.

10261137

(সৌজন্য : পিটিআই)

সে দিন এই বিষয়ে সারাদিন ধরে মাঝে মাঝেই নানারকম খবর আসে। একই খবর মাঝে মাঝে ফের উগরে দেয় পিটিআইয়ের কম্পিউটার। নিউজ ডেস্ককে সতর্ক রাখার জন্যই সংবাদ সংস্থাকে এই ব্যবস্থা করতে হয়।

খবরের কাগজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাপা হয় না। তাহলে, বার বার টুকরো টুকরো করে খবর পাঠিয়ে বা পেয়ে কী লাভ? এর জবাব হচ্ছে, সংবাদ সংস্থার খবর শুধু খবরের কাগজ কেনে না, তার আরও অনেক গ্রাহক। যেমন— টেলিভিশনের বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল, বিভিন্ন রেডিয়ো স্টেশন, বিভিন্ন সরকারি অফিস, বিভিন্ন দূতাবাস আরও কয়েকটি সংস্থা।

টেলিভিশন চ্যানেল বা রেডিয়ো স্টেশনগুলি দিনের মধ্যে অনেকবার খবর সম্প্রচার করে থাকে। তার

জন্য তারা খাদ্য চায়, টাটকা তাজা গরম খবর। সেই বিশেষ দিনে সারা দুনিয়া জানতে চাইছিল, কী ঘটছে মস্কোর সেই নাট্যশালায় ? কেমন আছেন কয়েক শত পণবন্দি ? কী বলছে ক্রেমলিন ? চেচেন সন্ত্রাসবাদীরা কী নির্দোষ নিরস্ত্র নিরপরাধ পণবন্দিদের গুলি করে খুন করতে আরম্ভ করেছে ?

এই রকম উদ্বেগজনক মুহূর্তে মস্কো এফ এন জি ১৬, মস্কো এফ জি এন ১৯ এবং মস্কো এফ এন জি ২০ নম্বর ফাইলে তিনটি নতুন খবর এল। সময় তখন সকাল ৯টা বেজে ৯ মিনিট থেকে ১১ মিনিট। টেলিভিশনে চ্যানেল এবং রেডিয়োর পরবর্তী খবর সম্প্রচারের নির্দিষ্ট সময় সকাল সাড়ে ন'টা। হাতে আর ২১ মিনিট সময়। নিউজ ডেস্কের পক্ষে ফাইল দুটির ভিত্তিতে জোর খবর তৈরি করার পক্ষে সময়টা যথেষ্ট। কয়েক মিনিটের মধ্যে খবর তরজমা ও সম্পাদনা হয়ে গেল।

ঠিক সকাল সাড়ে নটায় টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ উপস্থাপকের মুখ ভেসে উঠল টেলিভিশনের পর্দায়। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—

> "এখনকার প্রধান খবর হল, মস্কোর থিয়েটার হল জঙ্গিমুক্ত হয়েছে।
>
> এবার পুরো খবর, আজ সকালে রাশিয়ার বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে মস্কোর নাট্যশালায় চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বন্দি ৭০০ জন দর্শক মুক্ত হয়েছেন। রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযানের সময়ে চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের পাণ্ডা বারায়েভ নিহত হয়েছে।"

সান্ধ্য খবরের কাগজগুলিতে এবং টেলিভিশন ও রেডিয়ো স্টেশনগুলি তাদের পরবর্তী বুলেটিনগুলিতে আরও বেশি বেশি খবর সম্প্রচার করতে থাকবে। সঙ্গে থাকবে টাটকা ছবি। প্রভাতী সংস্করণের জন্য খবরের কাগজগুলির নিউজ ডেস্ক এই সংক্রান্ত সব তথ্য গুছিয়ে নিয়ে একটু বেশি সন্ধ্যায় এই খবর পরিবেশনের পরিকল্পনা করবে। তাদের খবরে থাকবে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ।

এই ভাবে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সম্পাদনা হয় খবরের কাগজ এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে।

৬.২.৮ লেখচিত্র

লেখচিত্রের (Graphics) সাহায্যে খবরের কাগজ তার খবরকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে পারে। শুধু শব্দ সাজিয়ে যে খবর পরিবেশিত হয় তাকে বড় করে চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে লেখচিত্র বা গ্রাফিক্স। বেশ বড় আকারের খবরকে চুম্বকে পরিণত করে লেখচিত্র।

কেউ কেউ মনে করেন ও বলে থাকেন, গ্রাফিক্স খানিকটা শিশুসুলভ ব্যাপার। মোটা লাইন, সরু লাইন, বেঁটে মানুষ, লম্বা মানুষ, টাকার থলি, ট্যাঙ্ক কামান বিমান, কার্টুন, উত্থান-পতনের গ্রাফ ইত্যাদির সাহায্যে লেখচিত্র তৈরি করে খবরের কাগজের পাঠকের মন ভোলানো এবং ছবির বই দিয়ে ছেলে ভোলাবার ব্যবস্থা করার মধ্যে তাঁরা কোন তফাৎ খুঁজে পান না।

আবার অনেকে বলেন, টেলিভিশনের প্রবল চাপের কাছে কাগজের আত্মসমর্পণের একটা দৃষ্টান্ত হল গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে লেখচিত্র জুড়ে দেওয়া।

খবরের কাগজে গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে লেখচিত্র ব্যবহার করার কারণ যাই হোক না কম্পিউটার যুগের আধুনিক খবরের কাগজ লেখচিত্র ছাড়া অঙ্গহীন বলে গণ্য হয়। তা ছাড়া এ কথা অনস্বীকার্য যে লেখচিত্র কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ব্যস্ত পাঠকের পক্ষে খবরটি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য তাড়াতাড়ি খুঁজে নেওয়ার পক্ষে লেখচিত্র সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

● খবরের সঙ্গে লেখচিত্রের ব্যবহারের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা করা হোক না কেন হাই টেক যুগের আধুনিক খবরের কাগজের পাতায় তা পাকাপোক্ত ঠাঁই করে নিয়েছে। কি ধরনের লেখচিত্র খবরের সঙ্গী হচ্ছে তার কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল।

RATE CARD

TAXI

Distance	Existing fare	Proposed fare
First 2 km	Rs. 12.00	Rs. 14.00
Subsequent 200 metres	Rs. 1.20	Rs. 1.30
Waiting charge	Re. 1.00	Re. 1.00
Luggage charge*	75 p	75 p

* For package more than 75 cm × 80 cm and more than 20 kg

BUSES (CMC area)

Distance	Existing fare	Proposed fare
Up to 6 km	Rs. 2.50	Up to 2 km – Rs. 2.00
Up to 16 km	Rs. 3.00	Up to 6 km – Rs. 3.00
Up to 18 km	Rs. 3.50	Up to 18 km – Rs. 4.00
Up to 22 im	Rs. 4.00	Rs. 5.00

MINI BUSES

Distance	Existing fare	Proposed fare
Up to 2 km	Rs. 2.50	Rs. 3.00
Up to 8 km	Rs. 3.00*	Rs. 3.00**

*25p increase for each subsequent stage. **50p or each subsequent stage.

TRAM

Distance	Existing fare	Proposed fare
First class (first stage)	Rs. 1.75	Rs. 2.50
(second stage)	Rs. 2.00	Rs. 3.00

১ নং নমুনা যে খবরের সঙ্গী তার বিষয়বস্তু হল বাস ট্রাম ট্যাক্সির ভাড়া বৃদ্ধি। লেখচিত্রটিতে চোখ বোলালেই পাঠক এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাবেন। তার খোঁজে পুরো খবরের মধ্যে তাঁকে হাবুডুবু খেতে হবে না। তাই এই লেখচিত্র তাঁকে খুশিই করবে। তারপর দরকার বুঝলে এবং হাতে সময় থাকলে তিনি পুরো খবরটি পড়ে নেবেন।

২ নং নমুনার লেখচিত্রটি ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খবরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। খবরটির বিষয় আটটি দেশের দুটি গ্রুপের লড়াই শেষের চূড়ান্ত ফল। লেখচিত্রটি দেখলে এক নজরে জানা যাবে কোন কোন গ্রুপে কোন কোন দেশ লড়েছে। লেখচিত্রটি দেখা মাত্র কৌতূহলী পাঠক জেনে যাবেন গ্রুপ লড়াইয়ে জিতে কোন কোন দেশ দ্বিতীয় রাউন্ডে ময়দানে যাবার সুযোগ অর্জন করতে সফল হয়েছে।

গ্রুপে যাদের লড়াই শেষ হল

		ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
বি	স্পেন	৩	৩	০	০	৯-৪	৯
	প্যারাগুয়ে	৩	১	১	১	৬-৬	৪
	দঃ আফ্রিকা	৩	১	১	১	৫-৫	৪
	স্লোভেনিয়া	৩	০	০	৩	২-৭	০

৬.২.৯ সাময়িকী সম্পাদনা

আমরা দু'ধরনের সাময়িকীর সঙ্গে পরিচিত। বিভিন্ন খবরের কাগজের রবিবারের সংস্করণের সঙ্গে বাড়তি কয়েক পাতার একটি ক্রোড়পত্র বিতরণ করা হয়। এই ক্রোড়পত্রকে ম্যাগাজিন (Magazine) বা সাময়িকী বলা হয়।

তা ছাড়া অনেক পত্রিকা আছে যেগুলি রোজ প্রকাশিত হয় না। সাতদিন, দু'সপ্তাহ বা এক মাস অন্তর পাঠকদের হাতে যায়। সেগুলিও ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকা বলে অভিহিত হয়।

আমরা এই অনুচ্ছেদে খবরের কাগজের রবিবারের ক্রোড়পত্রে বা সাময়িকী সম্পাদনার বিষয়টি আলোচনা করব। খবরের কাগজের সাময়িকী তৈরির ভার একজন সহকারী সম্পাদকের ওপর থাকে। কিন্তু তিনি ম্যাগাজিন এডিটর বলেই পরিচিত হন।

ম্যাগাজিন এডিটর দু'তিনজন সাব-এডিটরের সাহায্যে সাময়িকী সম্পাদনা করেন। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে খবরের কাগজের সাময়িকীতে সহিত্য সম্পর্কিত লেখা প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী রসরচনা, পুস্তক সমালোচনা থাকত এই সব সাময়িকীতে।

সংবাদপত্রের সাময়িকীতে রোজ রোজ যা যা ঘটে তার বিবরণ থাকে না। তবে গুরুতর সংবাদের পটভূমি ও পার্শ্বকাহিনী সাময়িকীতে প্রকাশের সুযোগ আছে। তাকে প্রচ্ছদ কাহিনী বলা হয়।

ধরুন, শিবানী ভাটনগর হত্যা মামলা। তিনি ছিলেন Indian Express পত্রিকার দিল্লি অফিসে কর্মরত একজন রিপোর্টার। ১৯৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁকে দিল্লিতে নিজের ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু ছিল অস্বাভাবিক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ সেই নিশ্চিন্ত হয় যে শিবানী আত্মঘাতী হননি, তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় ছক কসে খুন করা হয়েছে।

তখনকার কাগজে এই ব্যাপারে অনেক খবরই প্রকাশিতহয়েছিল। তার পর ধীরে ধীরে তিনটি বছর পার হয়ে গেছে। মানুষ অজস্র নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহে কবেই ভুলে গেছে শিবানী ভাটনগরের হত্যা রহস্যের কথা।

এমন সময় ২০০২ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে ফের ভেসে উঠল শিবানী ভাটনগর হত্যা মামলার খবর। কিন্তু আগেই বলেছি, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঐ ব্যাপারে অনেক কথাই ভুলে গেছে। সেই সব কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য কোন কাগজের সাময়িকীর সম্পাদক ওই হত্যাকাণ্ড এবং প্রাসঙ্গিক মামলার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে দু'তিনটি বিশেষ লেখা একই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারেন। তাতে এই ব্যাপারে পাঠকদের কৌতূহল মেটাবার খোরাক থাকবে।

শিবানী ভাটনগর হত্যা মামলার পটভূমি বর্ণনায় নানা বিষয় থাকবে। যথা—

তাঁর বিস্তারিত পরিচয়— বয়স, শিক্ষাদীক্ষা, পেশায় যোগদান, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি।

তাঁ সম্পর্কে পুরান সহকর্মীদের ধারণা।

তিনি কবে, কখন, কোথায় ও কীভাবে খুন হয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ।

এই হত্যা মামলা কেমন ভাবে এগিয়েছে, প্রধান সন্দেহভাজন কারা, হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য (Motive) সম্পর্কে পুলিশ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য।

শিবানী ভাটনগরকে হত্যা এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ ধরা পড়ে থাকলে এবং কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তাদের সম্পর্কে সব খবর।

এই মামলার তদন্তকারী অফিসার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ।

সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য এই সব বিষয়কেন্দ্রিক লেখা যোগাড়ের ব্যবস্থা করবেন সম্পাদক।

এই সব লেখা যোগাড় করার জন্য সাময়িকীর সম্পাদক দ্রুতগতিতে লোক লাগিয়ে (assign) দেবেন। বিভাগের কোন সাব-এডিটরকে কাগজের পুরান ফাইল ঘেঁটে একটি লেখা তৈরির দায়িত্ব দেবেন। কোন ফ্রি ল্যান্স ফিচার লেখকের কাছে আর একটি লেখা চাইবেন। বার্তা সম্পাদকের মাধ্যমে দিল্লির সংবাদদাতাকে একটি লেখা দেবার জন্য নির্দেশ পাঠাবেন।

লেখার দায়িত্ব বণ্টনের সময় কবে, ক'ঘণ্টার মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে তাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে কোন গড়িমসি খবরের কাগজ সহ্য করে না।

খবরের কাগজের সাময়িকী মূল কাগজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। করার চেষ্টা করলেও তাতে এঁটে উঠতে পারবে না। কারণ দৈনিক প্রকাশিত খবরের কাগজে কালকের ঘটা সব গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রতিদিনের সংখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু সাময়িকী প্রকাশিত হয় প্রতি সপ্তাহের সপ্তম দিনে। তাই টাটকা ঘটনার খবরের বোঝা সাময়িকী হতে পারে না। সেই ঘাটতি পূরণের জন্যই সাময়িকীকে সাহিত্যধর্মী রচনা এবং সংবাদের বিস্তারিত পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতের রচনাগুচ্ছের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমেরিকার পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী বিমান হানার খবর বিস্তারিতভাবে খবরের কাগজে পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই খবরের মধ্যে পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের খুঁটিনাটি বর্ণনা খুঁজতে গেলে পাঠক হতাশ হবেন। তাঁদের এই ব্যাপারে কৌতূহল মেটাতে পারে সাময়িকী। সেই জন্যই সম্পাদকরা জানেন, সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

তাই বলে ধরে নেবেন না, সব খবরের কাগজই তার সাময়িকীতে সংবাদের পটভূমি নিয়ে রচনাগুচ্ছ প্রকাশের পথে পা দিয়েছে। কোন কোন কাগজের সাময়িকী এখনও সাহিত্যধর্মী রচনা প্রকাশের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক খবরের কাগজের সাময়িকী সম্পর্কে আপনাদের কয়কটি কথা জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাময়িকীর নাম "রবিবাসরীয়"। ১৮ অগস্ট, ২০০২ সালের "রবিবাসরীয়"

ছটি পাতা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে শেষ পাতাটি কিশোরদের জন্য সংরক্ষিত নিয়মিত পত্রিকা। বিভাগটির নাম "আনন্দমেলা"।

প্রথম পাতায় রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে রাজারামের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণামূলক লেখা। তাতে তিনটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করা হয়েছে— "রাজারাম রামমোহন রায়ের পুত্র ? না, পোষ্যপুত্র ? দত্তক? কে এই রাজারাম" ?

দ্বিতীয় লেখাটি একটি ছোটগল্প।

শেষ ও তৃতীয় লেখাটি একটি ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাসের একটি অধ্যায়।

লক্ষ্য করুন, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের এই সাময়িকীতে চলতি ঘটনা নিয়ে কোন লেখাকে স্থান দেওয়া হয়নি।

"বর্তমান" ভিন্ন পথের পথিক। সাময়িকীর নাম "রবিবার"। ১৮ অগস্ট, ২০০২ সালের সংখ্যায় আটটি পাতা ছিল।

প্রথম পাতাতে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে তিনটি রচনাগুচ্ছের একটি প্রচ্ছদকাহিনী স্থান পেয়েছিল। তাঁর শরীর খারাপ বলে কিছুদিন ধরে নানারকম ইঙ্গিতমূলক লেখা এদিকে-ওদিকে বেরচ্ছিল। তাই পড়ে অনেক লোকের মনে ধারণা হয়েছিল, বাজপেয়ীর শরীর খুব খারাপ। তিনি চলতি লোকসভার বাকি মেয়াদের পুরো সময়টা হয়ত প্রধানমন্ত্রীত্বের গুরুভার বহন করতে পারবেন না। এই বিষয়ে চর্চা করা হয়েছে রবিবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে। প্রধান লেখাটির শিরোনাম, "বাজপেয়ী কি সত্যই অসুস্থ?" দ্বিতীয় লেখাটিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর "ব্যক্তিগত ডাক্তার" যা বলেছেন। তৃতীয় ও শেষ লেখাটির শিরোনাম প্রধামনন্ত্রীর "মেয়ে-জামাই সর্বক্ষণের সঙ্গী"।

"রবিবার" তার শেষ পাতাটি কিশোরদের বিভাগ হিসাবে ব্যবহার করে। বিভাগটির নাম "হ য ব র ল"।

অন্যান্য লেখাগুলির মধ্যে রয়েছে একটি ছোটগল্প, পুরান কলকাতার বাবু কালচার নিয়ে একটি রম্য রচনা, আদিবাসী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণামূলক একটি রচনা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ রচনা।

রবিবারের ভ্রমণকাহিনী এবং আবিষ্কারকদের বিষয়ে রচনাও ছাপা হয়ে থাকে।

এখন আপনারা প্রচ্ছদকাহিনী নামে একটি শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বইয়ের মলাটের আর এক নাম প্রচ্ছদ। চার পাতা, ছ'পাতা বা আট পাতার সাময়িকীর প্রথম পাতাটিকে প্রচ্ছদ বলে কল্পনা করে নেওয়া। সেই জায়গায় সংবাদ বা সাময়িক প্রসঙ্গভিত্তিক রচনাগুচ্ছ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলে তাকেই সেই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী বলে বর্ণনা করা হয়।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সাময়িকীর নাম রবিবারের প্রতিদিন। ১৮ অগস্ট, ২০০২ তারিখের "রবিবারের প্রতিদিন"-এ চারটি পাতা ছিল। সংখ্যাটিতে চলতি ঘটনা সম্পর্কে একটি বিশেষ রচনা আছে। আছে একট ধারাবাহিক আত্মজীবনী মূলক লেখা, একটি ছোটগল্প, সিনেমার পর্দার আড়ালের নানা কাণ্ডকারখানা নিয়ে একটি বড় ফিচার। পুস্তক সমালোচনা, বিগত সপ্তাহের একটি সাড়া জাগানো খবরের প্রধান ব্যক্তির পরিচিতি এবং একটি তাত্ত্বিক স্তম্ভও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল। কলকাতাকেন্দ্রিক যে সব টুকরো খবর 'প্রাত্যহিক

সংবাদ'-এর রোজের পাতায় মাথা গলাতে পারে না, সেগুলি নিয়ে একটি নিয়মিত ফিচার থাকে এই সাময়িকীর শেষ পাতায়।

গণশক্তির সাময়িকীর নাম "রবিবারের পাতা"। রবিবারের পাতায় সংবাদধর্মী লেখা এবং সাহিত্যধর্মী লেখার সহাবস্থান। সংবাদধর্মী লেখার উপকরণ "জ্বালানী কেলেঙ্কারি", আর চা-শিল্পে সঙ্কট এবং সাক্ষরতা আন্দোলনের একটি বিশেষ দিকের আলোচনা। পুস্তক সমালোচনা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে টেলিভিসন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সমালোচনা। এই বিষয়টি আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান বা সংবাদ প্রতিদিন-এ থাকে না। টেলিভিসন চ্যানেলের অনুষ্ঠানের সমালোচনা "রবিবারের পাতা"র বৈশিষ্ট্য। "রবিবারের পাতা"য় কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছে। পূর্বোক্ত সাময়িকীগুলির একটিতেও কবিতা ছাপা হয় না।

"আজকাল"-এর সাময়িকীর নাম "রবিবাসর"। ১৮ অগস্ট, ২০০২ তারিখের "রবিবাসর" অন্য সাময়িকীগুলির তুলনায় খানিকটা আলাদা। এর দুটি নিয়মিত বিভাগ হল "সুস্থ" এবং "সফর"। "সুস্থ"য় মানুষের নানা অসুখ ও তা নিরাময়ের হদিশ দেওয়া হয়। "সফর"-এ থাকে বেড়াতে যাবার সুলুকসন্ধান। আর একটি নিয়মিত বিভাগ "রবিবারের চিঠি"। এই বিভাগে পাঁচমিশালি সাময়িক প্রসঙ্গে পাঠকদের বক্তব্য চিঠির আকারে প্রকাশিত হয়। নামে চিঠি হলেও এগুলি নিবন্ধের সমতুল্য রচনা। চার পাতার "রবিবাসর"-এ দুটি ছোটগল্প ছিল। আর ছিল ব্যয়বহুল বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একটি বড়মাপের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

৬.২.১০ মুখবন্ধ ও বিশদ বিবরণ

প্রতিটি খবরের মধ্যে দুটি অংশ থাকে। একটি হল খবরের মুখবন্ধ বা Lead। অপরটি হল বিশদ বিবরণ বা Body। দুটি অংশ মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ খবর তৈরি হয়। খবরটি ছোট হলে অবশ্য মুখবন্ধ এবং বিশদ বিবরণ আলাদা করে লেখার দরকার হয় না।

খবরের বিশদ বিবরণের সারমর্মকে বলে মুখবন্ধ। খবরের সমস্ত তথ্যকে বলে তার বিশদ বিবরণ।

রিপোর্টার তার হাতের কোন বড় খবর লেখার সময় তা এই রকম দু'ভাগে ভাগ করে লিখে থাকেন। তিনি সেই কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করতে সফল হলে তাঁর লেখা কবি দেখতে চিফ রিপোর্টারের কম সময় লাগে। চিফ সাব এবং সাব-এডিটর চট করে সহজে সেই খবর সম্পাদনা করতে পারেন। সাব-এডিটরের পক্ষেও একই যোগ্যতা থাকা দরকার।

রিপোর্টারই হোন বা সাব-এডিটরই হোন, গুরুত্বপূর্ণ বড় খবরের উৎকৃষ্ট মুখবন্ধ রচনা করতে যথেষ্ট দক্ষতা থাকা দরকার। তার জন্য মুখবন্ধ লেখার প্রয়োজন ও তার উপাদানগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

খবরটি পড়তে পাঠককে আগ্রহী করে তোলার জন্য উপযুক্ত মুখবন্ধ দরকার। আবার যোগ্য মুখবন্ধ লেখা হলে ব্যস্ত পাঠক সেটি পড়ে নিয়ে অন্য খবর পড়তে বা আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিতে পারেন।

খবরের প্রধান তথ্যগুলি হল মুখবন্ধের উপাদান। খুব কম কথার মধ্যে দিয়ে সেগুলি উপস্থাপন করতে হয়। কম কথায় লিখতে হবে বলে ব্যাকরণকে বুড়ো আঙুল দেখান চলবে না। বাক্যগঠনের ব্যাকরণসম্মত

নিয়ম কানুন বজায় রেখে স্পষ্ট ভাষায়, কিন্তু ভাষার মারপ্যাঁচ না কসে সরলভাবে মূল বিষয়গুলি উপস্থাপন করতে পারলে ভাল মুখবন্ধ লেখার কাজ সুসম্পন্ন হয়।

খবরের ভাল মুখবন্ধ লেখার একটি সহজ সূত্র আছে। সেটি হল খবরের প্রথম অনুচ্ছেদে ৫ ডব্লু (W) এবং ১ এইচ (H)-এর যতগুলি সম্ভব উত্তর দেওয়া। খবরের এই ছয় সঙ্গী সম্পর্কে আপনারা আগে জেনে নিয়েছেন। তবুও ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই ছয় সঙ্গী হল— What—কী, Why—কেন, When—কখন, How—কেমন করে, Where—কোথায় এবং Who—কে?

ফের মনে রাখুন, ভাল মুখবন্ধে ওই ছয়টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তর নাও থাকতে পারে। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি, দুটি বা তিনটির উত্তর দিয়েও ভাল মুখবন্ধ লেখা সম্ভব। রিপোর্টার বা সাব-এডিটর মুখবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন কোন প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেবেন তা তাঁর অভিজ্ঞতা, সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে।

কোন খবরের এত চমৎকার মুখবন্ধ সচরাচর দেখা যায় না। এই মুখবন্ধ রিপোর্টার নিজেই লিখে থাকুন বা সাব-এডিটর নতুন করে লিখে থাকুন তিনি বাহবা পাবার মত কাজ দেখাতে পেরেছেন।

ছয় প্রশ্নের কষ্ঠিপাথরে মুখবন্ধটি যাচাই করলে আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এটি একটি আদর্শ (Model) মুখবন্ধ।

প্রথম প্রশ্ন What—কী? জবাব, চারজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

দ্বিতীয় প্রশ্ন When—কখন? জবাব, শনিবার সকালে।

তৃতীয় প্রশ্ন Where—কোথায়? জবাব, শিয়ালদহের কাছে।

চতুর্থ প্রশ্ন Who—কে? জবাব, মা এবং তাঁর তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে।

পঞ্চম প্রশ্ন How—কেমন করে? জবাব, "আত্মহত্যা না হত্যা" তা স্পষ্ট নয়।

বাকি থেকে গেল শুধু একটি প্রশ্ন—Why—কেন? জবাব, "এই মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।"

খবরের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখিত মুখবন্ধে ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রত্যেকটির জবাব, সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জিতভাবে বর্ণনা করা সত্যই বাহাদুরির কাজ।

মুখবন্ধের মধ্যে খবরের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এতে জানা যাচ্ছে, একই পরিবারের চারজন মানুষের একসঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর সরকারিভাবে সমর্থিত হয়েছে। এই বিষয় কলকাতা পুলিশের ডিসি (ই এস ডি) সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে রিপোর্টার খবরটির তথ্য যোগাড় করেছেন।

মুখবন্ধ পড়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ কী ভাবে জানা যাবে। তা জানার একটাই পথ, মৃতদেহগুলির ময়না তদন্ত। মুখবন্ধের শেষ বাক্যে তাই বলা হয়েছে, "পুলিশ ময়না তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।"

এবার আমরা আর একটি খবরের মুখবন্ধ নিয়ে আলোচনা করব। ক কাগজে প্রকাশিত খবরটির পূর্ণ পাঠ—

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দু'বছর ধরে পালিয়ে বেড়ানোর পরে অবশেষে বুধবার দুপুরে কালিম্পঙের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে গুলিভর্তি এ কে-৪৭ রাইফেল-সহ ধরা পড়ল জি এল ও নেতা ছত্রে সুব্বার ছেলে সন্তোষ সুব্বা। পুলিশ জানিয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও বারুদের চোরাকারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্তোষকে দীর্ঘদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল। শুধু পুলিশ নয়, কাঠমান্ডু থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের যে-বিমানটি ছিনতাই করে কন্দহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই ছিনতাইকারী দলের সদস্য কুমার ভুজেলকে গ্রেনেড সরবরাহ করার অভিযোগে সন্তোষকে খুঁজছিলেন সি বি আই-এর তদন্তকারী অফিসারেরাও। দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার সঞ্জয় চন্দ্র জানিয়েছেন, "সন্তোষকে গ্রেফতারের পরেই সি বি আই-কে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্ত্র ব্যবসায় জড়িত আরও চারজনের নাম পাওয়া গিয়েছে। তাদের খোঁজে কালিম্পঙের পাহাড়ি এলাকায় তল্লাশি চলছে।"

পুলিশ জানায়, কালিম্পঙের রওসে বাজার এলাকায় ছত্রের বাড়ি। তাঁর ছেলে সন্তোষের খোঁজে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাজার লাগোয়া একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ সন্তোষ ভেবে অন্য এক যুবককে আটক করে। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গত রবিবার কালিম্পঙের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফের গোপন সূত্রে খবর পান, বাগরাকোট চা-বাগান এলাকার একটি বাড়িতে সন্তোষকে দেখা গিয়েছে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তাকে না-পেলেও তার অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গী কাজি বিশ্বকর্মাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে লাগাতার জেরার পরেই পুলিশ জানতে পারে, কালিম্পঙের দুর্গম গাঙ্গেত গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে সন্তোষ ও তার দলবল। শহর থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা গাড়িতে যাওয়ার পরে সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে ওই গ্রামে যেতে হয়। রবিবার দুপুর থেকে প্রস্তুতির পরে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে চার দিক থেকেই গ্রামটিকে ঘিরে ফেলা হয়। গ্রামের একটি বাড়ি থেকে সন্তোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছে একটি এ কে-৪৭ ও ৫০ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, গোর্খা লিবারেশন অর্গানাইজেশন (জি এল ও)-এর স্বঘোষিত 'চিফ' ছত্রে সুব্বার ছেলে সন্তোষ কিশোর বয়স থেকেই সমাজবিরোধী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে ছোটখাটো অপরাধ করে হাত পাকানোর পরে সে অস্ত্র ব্যবসায় নামে। কালিম্পঙ থেকে মিরিক হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে ঢুকে সেখানকার একটি অস্ত্র পাচারকারী দলের সঙ্গে হাত মেলায় সে। পাহাড়ের বিভিন্ন দুষ্কৃতী দলের কাছে পাইপগান, গুলি, রিভলবার, পিস্তল বিক্রি করে রীতিমতো নিজস্ব দল গড়ে ফেলে সন্তোষ। তার পরেই এ কে-৪৭ এবং ৯ মিমি পিস্তলের চোরাকারবারও আরম্ভ করে দেয় সে। ইতিমধ্যে পাহাড়ে জি এল ও-র জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে পুলিশ হামলা চালানোর পরে ছত্রে ও তাঁর ছেলে দু'জনেই নেপালের বিরাটনগর এলাকায় গা-ঢাকা দেয়। গত বছর জানুয়ারিতে সুবাস ঘিসিংয়ের ওপরে হামলার পরে এপ্রিলে ছত্রে ধরা পড়লেও সন্তোষের খোঁজ মেলেনি। চার মাস পরে সন্তোষ হঠাৎ কালিম্পঙে ফিরে তার কাকার রাইফেল চুরি করে পালায়। সেই থেকেই পুলিশ তাকে খুঁজছিল। দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, "সন্তোষ যে বেআইনি অস্ত্রের কারবারের পাণ্ডা, প্রাথমিক তদন্তেতা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই ব্যবসা ছাড়াও ধৃতের সঙ্গে নেপাল ও উত্তরবঙ্গের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কোনও যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দলের অন্যেরা ধরা পড়ার পরে চিত্রটি আরও পরিষ্কার হবে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

মুখবন্ধটি বদলে এইভাবেও লেখা যায়—

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কালিম্পঙ পুলিশ বুধবার দুপুরে জি এল ও নেতা ছত্রে সুব্বার ছেলে সন্তোষ সুব্বাকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের সময় তার হেফাজত থেকে একটি বেআইনি এ কে-৪৭ রাইফেল এবং ৫০ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া গেছে বলে সরকারিভাবে জানান হয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, মুখবন্ধটি কত ছোট হয়ে গেল। অথচ খবরের মূল কথাগুলি হারিয়ে গেল না। তবে খবরটি অসম্পূর্ণ থাকার কারণে মুখবন্ধে একটি বড় ফাঁক থেকে গেল। সন্তোষকে গ্রেফতার করার পর

পুলিশ তাকে নিয়ে কি করল সেই বিষয়ে কোন তথ্য খবরের বিশদ বিবরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলে তাও মুখবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হত।

আইন অনুযায়ী পুলিশ এইরকম ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে পেশ করে। আরও তদন্তের স্বার্থে জেরা করার জন্য নিজের হেফাজতে রাখার আরজি জানায়। এই আরজি আদালত মঞ্জুর বা খারিজ করতে পারে। খবরটি এই ব্যাপারে নীরব। এই নীরবতা খবরটির একটি মস্ত বড় ত্রুটি।

এবার দেখা যাক অনাবশ্যক তথ্য বর্জন করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বজায় রেখে খবরটির বিশদ বিবরণ নতুন করে লিখলে কেমন হয়।

মুখবন্ধের পর পাঠককে জানিয়ে দেওয়া যাক সন্তোষকে কোথা থেকে (Where) গ্রেফতার করা হল—

"দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমার একটি দুর্গম গ্রাম গাঙ্গেতে গা ঢাকা দিয়েছিল সন্তোষ। কালিম্পং শহর থেকে গাড়িতে ওই গ্রামে পৌঁছবার পথ নেই। শহর থেকে গাড়িতে দেড় ঘণ্টা গিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে সেখানে পৌঁছতে হয়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারপর বাড়ি বাড়ি চিরুনি তল্লাশী চালিয়ে সন্তোষকে তার ডেরা থেকে ধরে ফেলে।"

তারপর পাঠককে জানাতে হবে পুলিশ কি অভিযোগে সন্তোষকে গ্রেফতার করল—

দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার সঞ্জয় চন্দ্র জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে সন্তোষ বেআইনি অস্ত্রের কারবারের একজন পাণ্ডা। অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরণের চোরাকারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্তোষকে দীর্ঘদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল। কিন্তু দু'বছর ধরে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, নেপালের অস্ত্র চোরাকারবারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সন্তোষ তার বেআইনি কারবার চালাত। পাহাড়ের বিভিন্ন মাফিয়া গোষ্ঠীর দুষ্কৃতীরা ছিল সন্তোষের চোরাকারবারের ক্রেতা। তাদের হাতে সে অর্থের বিনিময়ে পাইপগান, গুলি, রিভলবার, পিস্তল, ৯ মিলিমিটার পিস্তল, এ কে-৪৭ রাইফেল বিক্রি করত।

সন্তোষ একবার তাঁর কাকার রাইফেল চুরি করে পালিয়েছিল।

জেলার পুলিশ সুপারের কথায় জানা গেছে, সি বি আই-এর গোয়েন্দাদের নজর ও সন্তোষের ওপর ছিল। কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডু-দিল্লি উড়ানটি যারা ছিনতাই করেছিল তাদের মধ্যে একজনকে সন্তোষ গ্রেনেড বিক্রি করেছিল বলে সি বি আই-এর কাছে খবর আছে। তাই সন্তোষকে গ্রেফতারের কথা সি বি আই-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬.২.১১ অনুচ্ছেদকরণ

খবরের অনুচ্ছেদকরণও একটি প্রয়োজনীয় কাজ। খবর বাছাই করা, তার শিরোনাম রচনা করা, যথাযোগ্য স্থানে তা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অনুচ্ছেদ ভাগ করারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তা নির্ভর করে সম্পাদকের ইচ্ছা, রুচি, বিচারবুদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। তিনি চাইলে লম্বা লম্বা অনুচ্ছেদ রচনা করায় বাধা নেই, তিনি না চাইলে লম্বা লম্বা অনুচ্ছেদ রচনা করে পরা পাওয়া যাবে না।

অবশ্যই এটা হল সম্পাদনার তাত্ত্বিক দিক। ব্যবহারিক দিক হল, অনুচ্ছেদের আকার কেমন হবে তা রিপোর্টারের, সাব-এডিটরের এবং সেই পালার ভারপ্রাপ্ত চিফ সাবের ইচ্ছা ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তাঁরা তিনজনই যদি মনে করেন ছোট ছোট অনুচ্ছেদে খবরকে ভাগ করা হলে তা দেখতে সুন্দর এবং পাঠকের

পক্ষে সহজপাঠ্য করা যাবে তা হলে সেটাই করা হবে। তা না হলে নিউজ ডেস্কে এই ব্যাপারে চিফ সাবের কথাই শেষ কথা।

আবার, রিপোর্টার, সাব-এডিটর ও চিফ সাবের সতর্কতা ও কাজে মন না থাকলে অনুচ্ছেদ লম্বা হবে, না ছোট হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না। তার ফলে বিভিন্ন কাগজে, বিশেষ করে বাংলা খবরের কাগজে প্রায়ই অপ্রয়োজনে লম্বা লম্বা অনুচ্ছেদ পাঠকের অসুবিধার কারণ হয়।

ছোট ছোট অনুচ্ছেদ পাঠকের খবরটি পড়ার ও বিষয়বস্তু মনে রাখার পক্ষে সুবিধাজনক। এই সরল সত্যটা না জানা, না বোঝা বা না মানার জন্যই লম্বা অনুচ্ছেদের বিচ্যুতি পাঠকদের সহ্য করতে হয়। রাজ্যস্তরের আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত প্রধান প্রধান কাগজের পক্ষে এই ব্যাপারে উদাসীনতা মানায় না।

দৃষ্টান্তসহ বিষয়টি আলোচনা করা যাক। ২০০২ সালের ১১ জুলাই খ কাগজে প্রকাশিত খবর—

ডোমকলে সি পি এম কর্মী খুন, বোমায় মৃত আরও এক

বহরমপুরঃ বুধবার রাতে ডোমকল থানার ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপুরে নবী সেখ (৩৮) নামে এক সি পি এম সমর্থক খুন হয়েছেন। সি পি এমের অভিযোগ, কংগ্রেসের দুর্বৃত্তরা এই খুন করেছে। প্রতিবাদে শুক্রবার ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত ও গড়াইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্‌ধ ডেকেছে সি পি এম। কংগ্রেস অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিস এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তি ঘোড়ামারা পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের উপপ্রধান। তবে পুলিসের বক্তব্য, রাজনৈতিক কারণে এই খুন নয়। দুষ্কৃতীদের নিজেদের বিরোধে এই খুন। নবীর বিরুদ্ধে তিনটি কেস রয়েছে।

বুধবার রাতেই সারংপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চাননপুর এলাকায় বোমা বাঁধতে গিয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। চার জন আহত হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার রাতে একটি বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়া নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। প্রায় ৫০টি বোমা পড়ে। বিবাদে কংগ্রেস, সি পি এম জড়িয়ে যায় বলে কংগ্রেস স্বীকার করলেও সি পি এম এই ঘটনাকে নিছকই পারিবারিক গণ্ডগোল বলে জানিয়েছে। বোমার আঘাতে কাশেম সেখ নামে এক জন আহত হন। তিনি এখন বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কাশেম সেখ সি পি এমের সমর্থক বলে ডোমকল লোকাল কমিটির সম্পাদক কাওসার সেখ জানান।

জোনাল কমিটির সম্পাদক নারায়ণ দাস বলেন, মোমিনপুরে নিহত নবী সেখ ছিল দলের প্রথম সারির কর্মী। কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁর বাবাকেও খুন করা হয়। কংগ্রেসের ডোমকল ব্লক সভাপতি কমলেশ সেনগুপ্ত বলেন, মোমিনপুরে দু দল সমাজবিরোধীদের মধ্যে বিবাদের জেরে খুন হয়েছে। জোর করে কংগ্রেসিদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে।

পুলিস জানিয়েছে, বোমা বিস্ফোরণে মৃতের দেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে একটি বাড়ি থেকে সেই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

খবরটি যিনি লিখেছেন এবং যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে মনে করছেন, অনুচ্ছেদ রচনা যথাযথ হয়েছে। আমরা বিষয়টি অন্যভাবে দেখব। তাতে ধরা পড়বে খবরটি লেখা, তার অনুচ্ছেদ রচনা ও সম্পাদনা তিনটি ক্ষেত্রেই পেশাদারি দক্ষতার অভাব রয়েছে।

রিপোর্টারের দক্ষতার অভাব : নবী সেখকে কীভাবে খুন করা হল তার কোন বিবরণ খবরে নেই।

নবী সেখকে গুলি করে, কুপিয়ে, থেঁতলে, জলে ডুবিয়ে, গলা টিপে বা অন্য কোনভাবে হত্যা করা হয়েছে তার বিবরণ খবরটির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অথচ রিপোর্টার তা জানার চেষ্টা করলেন না, জানতে পারলেও তা খবরের অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

সম্পাদনায় দক্ষতার অভাব : তবুও নিউজ ডেস্ক চোখ বুজে খবরটি ছাপার জন্য ছেড়ে দিল। ডেস্কের এই শৈথিল্যের জন্য রিপোর্টার দক্ষতা অর্জনের আগ্রহ বোধ করবেন না।

লক্ষ্য করুন, খবরটিতে মোট ৪টি অনুচ্ছেদের মধ্যে দুটি আলাদা আলাদা খবর আছে। প্রথম খবরের শেষাংশ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদকে এক লাফে টপকে তৃতীয় অনুচ্ছেদে চলে গেছে। আর দ্বিতীয় খবরের শেষাংশ তৃতীয় অনুচ্ছেদকে টপকে চতুর্থ অনুচ্ছেদে চলে গেছে।

অনুচ্ছেদ রচনায় দক্ষতার অভাব : আপনার আগে দেখলে মোট চারটি অনুচ্ছেদের মধ্যে দুটি খবর আছে। কিন্তু অনুচ্ছেদগুলি বিক্ষিপ্ত। এক এবং দু'নম্বর অনুচ্ছেদে একটি খবর এবং তিন ও চার নম্বর অনুচ্ছেদে অন্য খবরটিকে স্থাপন করা উচিত ছিল। তা করা হয়নি। আপনাদের অনুরোধ করি, এ রকম খামখেয়ালি কাজ কখনও করবেন না। তা করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, দক্ষতাহীনতা এবং কাজে মনোযোগের অভাবের পরিচয় দেবে।

খবরটি অন্যভাবে সম্পাদনা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তা করা গেলে খবরটি এই রকম দাঁড়াত—

বহরমপুরঃ বুধবার রাতে ডোমকল থানার এক গ্রামে নবী সেখ (৩৮) নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। সি পি এমের ডোমকল জোনাল কমিটির সম্পাদক নারায়ণ দাস বলেছেন, নিহত ব্যক্তি তাঁদের দলের কর্মী ছিলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নবী সেখের বাবাকেও হত্যা করা হয়েছিল। কংগ্রেসি দুষ্কৃতীরা নবীকে খুন করেছে বলে সি পি এম নেতা অভিযোগ করেছেন।

কংগ্রেসের ডোমকল ব্লক কমিটির সভাপতি ব্লক কমিটির সভাপতি কমলেশ সেনগুপ্ত ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দু'দল সমাজবিরোধীর বিবাদের পরিণতি এই হত্যাকাণ্ড।

স্থানীয় পুলিশও প্রায় একই কথা বলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নবীর বিরুদ্ধে তিনটি ফৌজদারি মামলা ছিল। রাজনৈতিক কারণে এই খুন হয়নি। সমাজবিরোধীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই নবী সেখ খুন হয়েছেন।

অন্য খবরটিও অন্যরকমভাবে সম্পাদনা ও অনুচ্ছেদ রচনা করা সম্ভবপর।

এবার আমরা কাবুলে হামিদ কারজাইয়ের জোট সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যা করার একটি খবর দেখব। খবরটির অন্যান্য গুণের মধ্যে একটি হল খুব ছোট ছোট অনুচ্ছেদে তা লেখা হয়েছে। অথচ প্রতিটি অনুচ্ছেদ সুলিখিত ও তথ্যসমৃদ্ধ। তথ্য ছাড়া এতে একটিও বাজে কথা নেই। ফালতু কথা বর্জন করা ছোট ছোট অনুচ্ছেদে সংবাদ রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

অপ্রয়োজনীয় কথা আমদানি করে খবরে নাটকীয়তা আনার কোন দরকার নেই। কোন পেশাদার রিপোর্টার তেমন চেষ্টা করেন না। কোন দক্ষ সাব-এডিটর বা চিফ সাব তেমন চেষ্টা বরদাস্ত করেন না। বরং তার মোকাবিলা করেন কড়া হাতে।

এবার খবরটি দেখুন—

Afghan vice president shot dead

KABUL, Afghanistan (XYZ), July 6, 2002—Gunmen have shot dead one of Afghanistan's deputy presidents, Haji Abdul Qadir, and his driver outside the gates of a government ministry in Kabul.

Afghan officials arrested several members of Qadir's security personnel shortly after the shooting on Saturday afternoon, an interior ministry official told XYZ. They were arrested for negligence, the official said.

A Pashtun, Qadir also served as the minister of public works in Afghanistan's transitional government, and helped fight the Taliban as a former Northern Alliance commander in eastern Afghanistan.

He was one of three vice presidents chosen by last month's grand council to serve in the Cabinet of President Hamid Karzai, and was a former governor of Nangarhar province.

Government spokesman Omar Samat said two gunmen waiting outside the gate of Qadir's office fired on his black Toyota Land Cruiser from the side and then from the rear as the vehicle veered into a wall.

"They were on foot. They were standing near the gate when they shot the minister," he said. "As they fired the last shots, a car which looks like a taxi cab ... came and picked them up and fled."

Video of the scene showed Qadir's vehicle riddled with bullet holes, crashed into a wall surrounding the Ministry for Public Works. The interior of the vehicle was covered in blood.

Armed military personnel from the international security forces assigned to Kabul surrounded the area.

A spokeswoman for the U.S. State Department in Washington said the department was mobilizing its South Asian bureau to assist in the investigation. She said any assassination of an elected official was "tragic and awful."

Questions about security

XYZ's John Raedler said the shooting raised profound question about security, and the stability of the government in Afghanistan.

In February, the Afghan minister of Civil Aviation and Tourism Abdul Rahman was assassinated at Kabul airport. (Full Story)

At least four people were killed and 20 others injured when a bomb exploded near a convoy carrying Afghanistan's interim defense minister Mohammad Fahim in April. (Full Story).

Afghan government officials called Saturday's shooting a terrorist act

"It could be any one of different enemies of Afghanistan, one peace, of reconstruction in this country," Samat said.

"Whoever they are, we are sure they are terrorists because this was an Afghan national ... a leader with a long history of struggle for the freedom of his country."

Samat said the Cabinet was meeting in an emergency session and would have a statement shortly. He called the assassination "a stumbling block," but said officials were "confident that stability and peace will prevail in Afghanistan."

"The process continues," he said. "The goal is to bring total peace and stability to this country that has seen nothing but war for the past 24 years."

Samat said Qadir eschewed personal security, believing guards kept him too separate from the people of Afghanistan. He had no security guards with him in the vehicle, Samat said.

Qadir was brother of legendary rebel commander Abdul Haq, who was captured and hanged by the Taliban last year after slipping into the country to organize resistance to the Islamic militia.

খবরটি যত্ন করে বিশ্লেষণ করলে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এটি উত্তম অনুচ্ছেদকরণের একটি আদর্শ উদাহরণ। খবরটি কী?

— একটি হত্যাকাণ্ডের।

— নিহত হলেন কে?

— আফগানিস্তানের একজন উপরাষ্ট্রপতি। তাঁর নাম হাজি আবদুল কাদির।

— তাঁকে কোথায় হত্যা করা হল?

— কাবুলে সরকারি অফিসের প্রবেশ দ্বারের বাইরে।

— হত্যাকারী কারা?

— কয়েকজন বন্দুকধারী।

— তাদের গুলিতে আর কারও মৃত্যু হয়েছে?

— কাদিরেব গাড়ির চালকেরও মৃত্যু হয়েছে।

উত্তরগুলি একত্র করে খবরটির প্রথম অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছে—

কাবুল, আফগানিস্তান, ৬ জুলাই (এক্স ওয়াই জেড) : আফগানিস্তানের অন্যতম উপরাষ্ট্রপতি হাজি আবদুল কাদির এবং তাঁর গাড়ির চালককে আজ কাবুলে সরকারি অফিসের বাইরে কয়েকজন বন্দুকধারী গুলি করে হত্যা করেছে।

বিচার করে দেখুন, খবরটির প্রথম অনুচ্ছেদে নিখাদ তথ্য ছাড়া একটিও ফালতু কথা আছে? নেই। সস্তা নাটকীয়তা সৃষ্টির কোন চেষ্টা আছে? নেই।

এই কারণে যথাযথভাবে খবরটির অনুচ্ছেদ রচনা সম্ভব হয়েছে।

টাটকা জোরদার খবরের মাথায় তথ্যের বদলে কিছু অপ্রয়োজনীয় কথার বোঝা চাপিয়ে দিলে অনুচ্ছেদের ভার বেড়ে গেলেও ধার কমে যায়। তার একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চার দফাস জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার নির্বাচন হয়। ভোট গোনা হয় ১০ অক্টোবর। সেদিন ভোটের ফলও জানা যায়।

নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস এবং পি ডি পি দলের প্রার্থীদের মধ্যে ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। বিদায়ী বিধানসভায় রাজ্যের শাসস দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা এবার ভোটে দাঁড়াননি। তাঁর বদলে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ছেলে ওমর আবদুল্লা। ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রচারকরা বলেছিলেন, তাঁদের তরফে ওমর আবদুল্লাই ভাবি মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটের ফলে মানুষ জানতে চায়, জিতল কোন দল? ভি আই পি প্রার্থীদের মধ্যে কে জিতলেন, কে হারলেন? সরকার গড়বে কোন দল বা কাদের জোট?

ক কাগজে প্রাসঙ্গিক খবরটিতে কিন্তু মানুষের আগ্রহের ওই দিকগুলিকে অবহেলা করে অনুচ্ছেদগুলি রচনা করা হল। খবরটি ছিল এই রকম—

এনসি পরাজিত, হার সন্ত্রাসেরও

শ্রীনগর : ১০ অক্টোবর— সন্ত্রাস ও পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলায় রক্তাক্ত কাশ্মীরের মানুষ অবশেষে ভোটের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, এই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁদের কোনও সহানুভূতি নেই। একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ব্যালটের মাধ্যমে গদিচ্যুত করে কাশ্মীরের মানুষ এটাও বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লির হাতের পুতুল হয়ে থাকা কোন সরকার তাঁদের না-পসন্দ। এর আগের আগের নির্বাচনগুলিতে রাজ্যের মানুষের ইচ্ছা কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল তা নিয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার মনে প্রশ্ন থাকলেও এ বারের ভোটপর্ব যে যথেষ্ট নিরপেক্ষ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে কথা বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও পর্যবেক্ষকরা ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন। তা-ই, ভোটে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও বি জে পির জোটকে হারিয়ে বিরোধী কংগ্রেস এবং পি ডি পি দল জয়ী হলেও প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অখুশি হওয়ার কারণ নেই। তিনি বলেছেন, ভোটের এই ফল আসলে পাকিস্তানের মদতপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জয়। প্রধামন্ত্রীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট, কাশ্মীরে ভোট আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রকের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কিছু এলাকা বধ্যভূমিতে পরিণত হতে শুরু করে। প্রার্থী, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, সাধারণ মানুষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ধরে ভোট পর্যন্ত ৪৬২ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া জঙ্গিরাও মারা গিয়েছে অনেকে। গুলিগোলা, বোমা বিস্ফোরণ, আত্মঘাতী বাহিনীর হামলা, এ সবই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাশ্মীরের দৈনন্দিন ব্যাপার। জঙ্গিরা প্রকাশ্যেই হুমকি দিচ্ছিল যাতে মানুষ ভোটপর্ব থেকে দূরে সরে থাকেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফও বার বার বলছিলেন, কাশ্মীরে ভারত ভোটের নামে প্রহসন করবে। প্রতিকূল অবস্থা দেখেও নির্বাচন কমিশন পিছিয়ে না গিয়ে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় ভোটগ্রহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন। এর আগে ১৯৮৭ সালের ভোটপর্ব নিয়ে খোদ ফারুক আবদুল্লাই প্রকাশ্যে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রহসনের অভিযোগ এনেছিলেন। আগের আগের ভোটের বৈধতা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার মনেও প্রশ্ন থাকায় এবার সেখানে অনেক পর্যবেক্ষক হাজির ছিলেন। এত আশঙ্কার মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও মানুষ অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় ভোট দিতে হাজির হয়ে প্রমাণ করে দিলেন, সে সব ছিল অমূলক। এক কথায়, এবারের কাশ্মীর নির্বাচন অই সব দিক থেকেই ঐতিহ্যাসিক।

ভোটের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে শাসক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এন সি) একেবারে ভূপাতিত। ৮৭ সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস ২১, পি ডি পি ১৫টি আসনে জিতেছে। এন সি পেয়েছে ২৮টি। কংগ্রেস ও পি ডি পি জোট বেঁধে এখন সরকার গড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে। আগামীকাল দিল্লিতে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকেছেন।

খবরটির প্রথম অনুচ্ছেদে ২১টি কথায় প্রথম বাক্যটি রচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও টাটকা খবর নেই। দ্বিতীয় বাক্যে শব্দের সংখ্যা আরও বেশি। তার মধ্যে অবশ্য আসল খবরটি ঠাঁই পেয়েছে। তার জন্য ২৩টি মধ্যে মাত্র ৬টি শব্দে খরচ করা হয়েছে। তৃতীয় বাক্যে শব্দের সংখ্যা আরও বেশি ৩৬। সব মিলিয়ে ফাঁকা আওয়াজ। চতুর্থ বাক্যে ২২ শব্দের মধ্যে খবর আছে সামান্য। ২৪টি শব্দে পঞ্চম বাক্যটি পেশ করে অনুচ্ছেদটি শেষ হয়েছে।

১২৬ শব্দের একটি অনুচ্ছেদকে ছোট অনুচ্ছেদ বলে মানা যায় কি? যায় না। একজন পাকাপোক্ত

সাংবাদিক প্রথম অনুচ্ছেদটি অন্যভাবে রচনা করে তাকে সংবাদভিত্তিক অথচ তথ্যনির্ভর চেহারা দিতে পারতেন। তাতে অনুচ্ছেদটি এই রকম দাঁড়াত।

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর : জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা ত্রিশঙ্কু। ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্স নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ। রাজ্যে একদলীয় শাসনের অবসান। কোয়ালিশন যুগের শুরু।

বিধানসভার ৮৭টি আসনের মধ্যে ২৮ আসন দখল করে ন্যাশনাল কনফারেন্স অবশ্য একক বৃহত্তম দল হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে কংগ্রেস এবং পি ডি পি। তাদের আসন সংখ্যা যথাক্রমে ২১ এবং ১৫। দলগত শক্তির এই বিন্যাস থেকে স্পষ্ট যে এবার রাজ্যে একদলীয় সরকার গঠিত হবে না। সরকার গড়ার জন্য দরকার নির্বাচনোত্তর জোট গঠন।

লক্ষ্য করুন, ১২৬ শব্দের অনুচ্ছেদের বদলে মাত্র ১৯টি শব্দে পুরো খবরটি ধরা হয়েছে। খবর হল, আর একদলীয় সরকার নয়, এবার রাজ্যে জোট সরকার।

কেন তা বলা হচ্ছে তা ছাঁকা তথ্য দিয়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখান হয়েছে। তাতে মাত্র ৫৩টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ দুটির ক্ষুদ্রতম বাক্যটি মাত্র চারটি শব্দের মধ্যে গঠিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ক কাগজে প্রকাশিত খবরের প্রথম অনুচ্ছেদের ক্ষুদ্রতম বাক্যটিতে ২১টি শব্দ রয়েছে। তাতে বাক্যটি জটিল হয়ে গেছে। হারিয়েছে সাবলীলতা। আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, সরল ছোট ছোট বাক্যে তথ্যনির্ভর ছোট ছোট অনুচ্ছেদে খবর পরিবেশন করতে পারা একজন সাংবাদিকের পেশাদারি যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

ওই ক কাগজেই চমৎকার অনুচ্ছেদে খবর রচনার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। ২০০২ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশিত দুটি খবরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনাদের বিচার বিবেচনার জন্য খবর দুটি পর পর তুলে দিচ্ছি—

ফের আত্মঘাতী ডানলপের শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া: ডানলপ কারখানার আরও এক জন শ্রমিক আত্মঘাতী হলেন। তাঁর নাম নারায়ণচন্দ্র বিশওয়াল (৪৭)। তিনি চুঁচুড়ার কপিডাঙার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, রবিবার রাতে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ডানলপ কারখানা বন্ধের পর থেকে মোট ১৪ জন আত্মঘাতী হলেন। অসুস্থতা ও অন্য কারণে মারা গিয়েছেন ৩৭ জন। এই নিয়ে গত ক'বছরে ওই কারখানার ৫১ জন মারা গেলেন। যদিও কারখানা খোলার দাবিতে সব রাজনৈতিক দলই আন্দোলন করেছে।

পুলিশ জানায়, সোমবার ভোররাতে রান্নার কাজ করতে ওঠেন নারায়ণবাবুর স্ত্রী পূর্ণপ্রভাদেবী। তিনি স্বামীকে শোবার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁকে দ্রুত নামিয়ে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। নারায়ণবাবু ডানলপের ভি-বেল্ট বিভাগে কর্মী ছিলেন। কারখানা বন্ধের পর থেকেই তিনি আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালানোই তাঁর দায় হয়ে উঠেছিল। কিছু দিন তিনি একটি বেসরকারি বাসে কনডাক্টরি করেছেন। কিন্তু তাতেও তাঁর আর্থিক সঙ্কটের কোনও সুরাহা হয়নি।

নারায়ণবাবুর ছেলে দেবরঞ্জন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারিতে সুযোগ পেয়েছে। তাঁর আক্ষেপ, "বাবা বলতেন লেখাপড়া করতে। ডাক্তারিতে সুযোগও পেলাম। কিন্তু বাবাই চলে গেলেন। এখন কী ভাবে ডাক্তারি পড়ার খরচ পাব আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

পিতা-পুত্র খুনে ১৩ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমানঃ বুদবুদের পান্ডুদহ গ্রামে পিতা-পুত্রকে খুনের অপরাধে ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সোমবার জেলার দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ অর্জুনপ্রকাশ গুপ্ত এই রায় দেন। ১৩ জনই এলাকার সি পি এম কর্মী বলে পুলিশ জানায়। ডি ওয়াই এফ আই নেতা উজ্জ্বল কারক এই দিন বলেন, "এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চতর আদালতে যাব।"

১৯৮৪ সালে বুদবুদের পান্ডুদহ গ্রামে পাঁঠা বলিকে কেন্দ্র করে সি পি এম এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। খুন হন সি পি এম কর্মী নিতাই বাগদি। পরে সি পি এম কর্মীরা এর বদলা নিতে গ্রামবাসী ও তৎকালীন কংগ্রেস কর্মী নিমাই মণ্ডলের বাড়ি আক্রমণ করলে খুন হন নিমাইবাবু। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর বাবা ভূতনাথ মণ্ডলও খুন হন। দীর্ঘ ১৯ বছর এই মামলার শুনানি চলে। নিতাই বাগদির পক্ষের অভিযুক্তেরা বেকসুর খালাস পেলেও অন্য মামলাটিতে ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছে আদালত।

ডানলপের শ্রমিকের আত্মহত্যার খবরটির শেষে একটি অনুচ্ছেদে কারখানা কবে থেকে বন্ধ রয়েছে তার উল্লেখ থাকলে খবরটি সম্পূর্ণ হত।

দুটি খবরের অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে রচিত হয়েছে। তবে দ্বিতীয় খবরটির একটি তথ্য দুর্বোধ্য। সেটি হল, "নিতাই বাগদির পক্ষের অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস" পেয়েছেন বলতে ঠিক কারা খালাস পেলেন বোঝা গেল কি? গেল না। বোধ হয় বলতে চাওয়া হয়েছে, নিতাইয়ের হত্যার অপরাধে অভিযুক্তরা খালাস পেয়েছেন।

৬.৩ সারাংশ

দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় এককে খবরের কাগজ প্রকাশের চূড়ান্ত পর্বের কাজকর্মের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হল। সামগ্রিকভাবে এই সব কাজ সম্পন্ন করাকে বলে সম্পাদনা।

সম্পাদনাকে একটি গাছের কাণ্ড বলে কল্পনা করা গেলে তার কয়েকটি শাখা দেখতে পাওয়া যাবে। সেই সব শাখার মধ্যে রয়েছে খবরের নির্যাস দিয়ে তার উপযুক্ত শিরোনাম রচনা। কাগজ ছাপার জন্য মুদ্রাকরকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার আগে মুদ্রিত বিষয়বস্তুগুলিকে নির্ভুল করার জন্য মনোযোগ দিয়ে প্রুফ সংশোধন করা।

তার সঙ্গে সঙ্গে চলে চিত্রস্থাপন, অঙ্গসজ্জা এবং খবরগুলির গুরুত্ব অনুসারে পাতা সাজাবার ব্যবস্থা। গ্রাফিক্স একটি প্রশাখা। কোন খবরের সঙ্গে গ্রাফিক্স দেওয়া দরকার সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্পাদনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যে সব সাংবাদিক সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন তাঁদের হরফের মাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। কোন শিরোনামে কী মাপের হরফ ব্যবহার করা দরকার সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে পাতাকে যেমন তেমন করে সাজিয়ে ফেলা যাবে কিন্তু তা দেখতে সুন্দর হবে না। পাতার ভারসাম্য থাকবে না।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলির সম্পাদনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলির ইংরেজিতে পাঠানো খবর সম্পাদনা ও তরজমা করা। পাঠকদের প্রয়োজনীয়তা, রুচি কৌতূহলের বিষয়গুলি বিবেচনা করে সংবাদ সংস্থার খবর বাছাই, সম্পাদনা ও তরজমা করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

প্রতিদিনের কাগজে প্রকাশের জন্য নানা সূত্র থেকে যত খবর আসে তার অনেক কিছুই কাগজে জায়গা দেওয়া যায় না। কাগজে জায়গা দেবার জন্য যে সব খবরকে বাছা হয় সেগুলি তথ্যনির্ভর ও সুপাঠ্য করার প্রয়োজনে অনেকভাবে সংস্কার করাও সম্পাদনার মধ্যে পড়ে। তার জন্য খবরের মুখবন্ধে মূল খবরটি তুলে আনতে হয়। খবরের বিশদ বিবরণকে ছাঁকা তথ্য ছাড়া অন্য কিছু থাকলে সেসব নির্মমভাবে ছাঁটাই করতে হয়। অনুচ্ছেদগুলি যথাযথভাবে সাজিয়ে দিতে হয়। দরকারে নতুন করে লিখতেও হয়। খবর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং ব্যাকরণ ও ভাষার ওপর চমৎকার দখল থাকলে তবেই এই কাজ ভালোভাবে করা যায়।

খবরের কাগজের একটি বাড়তি আকর্ষণ তার রবিবারের ক্রোড়পত্র। এই ক্রোড়পত্র কী ভাবে সম্পাদনা করা হয়ে থাকে এই এককে সে সব কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। রবিবার সাধারণ ছুটির দিন বলে পাঠকরা অন্যদিনের তুলনায় এই দিনটিতে কাগজের জন্য খানিকটা বেশি সময় দিতে পারেন। সেই কারণেই রবিবারের সাময়িকী বা Sunday Magazine চালু হয়েছিল। এই ক্রোড়পত্রে কী কী বিষয়বস্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে সম্পর্কেও এই এককে কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৬.৪ অনুশীলনী

টীকা লিখুন :

১। দাদাঠাকুর
২। লাইনো টাইপ মেশিন
৩। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার।
৪। কম্পিউটার সফটওয়্যার
৫। বডি টাইপ, ডিসপ্লে টাইপ।
৬। অক্ষরের পয়েন্ট।
৭। প্রুফ কপি।
৮। গরম ধাতু পদ্ধতি (Hot metal process)
৯। পার্সোনাল কম্পিউটার
১০। ইনপুট ডিভাইস
১১। কী বোর্ড
১২। শীতল পদ্ধতি
১৩। শিরোনাম
১৪। ব্যানার হেডলাইন
১৫। পাতা সাজাবার খসড়া
১৬। প্রুফ রিডার
১৭। ছাপাখানার চেক পোস্ট

সংক্ষেপে উত্তর দিন :

১। হরফ বা অক্ষরবিন্যাসের সাবেকি পদ্ধতি সম্পর্কে কী জানেন
২। দাদাঠাকুরের নিজের ছাপাখানার কী বর্ণনা দিতেন?
৩। দাদাঠাকুরের সম্পাদিত পত্রিকা দুটির নাম লিখুন।
৪। হরফবিন্যাসের কাজে গরম ধাতু পদ্ধতিকে সরিয়ে কোন ব্যবস্থা চালু হয়েছে?
৫। আধুনিককালে কোন যন্ত্রের মাধ্যমে হরফবিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়? এই যন্ত্রের কয়েকটি অংশের নাম লিখুন।
৬। পার্সোনাল কম্পিউটারের কী বোর্ডের বর্ণনা দিন।
৭। কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে?
৮। কম্পিউটারের প্রথম ও সবচেয়ে বড় পরিচয় কী?
৯। কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কী কী?

১০। খবরের শিরোনাম লেখার প্রাথমিক দায়িত্ব কার?

১১। খবরের শিরোনাম লেখার সময় কোন দিকে নজর দিতে হয়?

১২। খবরের শিরোনাম লেখায় পাণ্ডিত্য ফলাবার সুযোগ নেই— ব্যাখ্যা করুন।

১৩। খবরের সুলিখিত শিরোনামের প্রয়োজন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১৪। শিরোনামের প্রস্থের মাপ কিসের ওপর নির্ভর করে?

১৫। আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা বিমান ছিনতাই এবং তার দ্বারা হামলার ঘটনা কবে ঘটেছিল?

১৬। ওই হামলায় কোন কোন ভবনের ক্ষতি হয়েছিল?

১৭। করাচি সম্পর্কে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

১৮। করাচিতে কোন খবরের ৪টি শিরোনাম ওপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে? তার মধ্যে কোন কোন শিরোনাম আপনার মতে যথাযথ এবং কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

১৯। ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের খবরের কোন শিরোনামটি আপনার মতে সবথেকে ভালো তা উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করুন।

২০। ভারতের কোন রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ২০০২ সালের জুলাই মাসে শেষ হয়েছে? তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হয়েছেন?

২১। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতির প্রার্থী কোন কোন দল সমর্থন করেছিল?

২২। ঝ এবং জ কাগজে এই বিষয়ে প্রকাশিত দুটি খবরের শিরোনামের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২৩। ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার একটি খবরের শিরোনাম ছিল, "রোনাল্ডো না খেললে সমস্যা হবে ব্রাজিলের"— সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২৪। ২০০২ সালের ২৫ জুন তারিখটি ভারতের খবরের কাগজের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দিন কেন?

২৫। ভারতের সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশি পুঁজি নিয়োগের সিদ্ধান্ত খ কাগজ ও ক কাগজ যে ভাবে বিচার করেছিল তার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২৬। গুজরাট রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সিদ্ধান্তের খবরগুলির শিরোনামের মধ্যে কোনটি আপনার মতে যথাযথ তা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

২৭। অক্ষরধাম মন্দিরে জঙ্গিহানার ঘটনার খবরের কোন বাংলা কাগজের শিরোনামটি আপনার মতে সবচেয়ে ভালো তা কারণ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

২৮। অক্ষরধাম মন্দিরে জঙ্গিহানার খবরের কোন ইংরেজি কাগজের শিরোনামটি আপনার মতে সবচেয়ে ভালো তা কারণ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

২৯। খবরের শিরোনামের প্রয়োজন সম্পর্কে যা জানেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

৩০। শিরোনামকে খবরের সূচীপত্র বলা হয় কেন?

৩১। পাতা সাজাবার খসড়া কাকে বলে?

৩২। কাগজের পাতা কারা সাজিয়ে দেন উদাহরণ দিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩৩। পাতার খসড়া তৈরির কাজে চিফ সাব, বার্তা সম্পাদক ও সম্পাদকের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩৪। খবরের কাগজের পাতার খসড়া তৈরির প্রথম ধাপ সম্পর্কে কি জানেন তা লিখুন।

৩৫। খবরের কাগজের পাতার খসড়া তৈরি করার সময়ে কোন বিষয়বস্তু অগ্রাধিকার পায়?

৩৬। তৈরি খসড়ার পরিবর্তন করে নতুন খসড়া তৈরির প্রয়োজনীয়তা কোন অবস্থায় সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করুন।

৩৭। পাতার নকশা তৈরি শক্ত বা সহজ কোনটাই নয়— ব্যাখ্যা করুন।

৩৮। পাতা সাজানো সার্থক হয়েছে কিনা তা কী ভাবে বোঝা যায়?

৩৯। প্রুফ সংশোধন করা দরকার কেন?

৪০। প্রুফ রিডার কাকে বলে?

৪১। প্রুফ কপিতে কোন কোন ধরনের ভুল থাকতে পারে?

৪২। প্রুফ কপির ভুল কি ভাবে সংশোধন করা হয়?

৪৩। খবরের কাগজ প্রকাশনায় প্রুফ রিডারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৪৪। প্রুফ সংশোধনের নির্দেশ কি ভাবে দেওয়া হয়?

৪৫। খবরের কাগজ প্রকাশনায় কম্পিউটারের আবির্ভাবের পর প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব ও পদ্ধতির কোন পরিবর্তন ঘটে থাকলে তা বর্ণনা করুন।

৪৬। খবরের কাগজের অঙ্গসজ্জার কাজে কখন হাত দেওয়া হয়?

৪৭। খবরের কাগজের অঙ্গসজ্জা বলতে কি বোঝায়?

৪৮। খবরের কাগজের যথোপযুক্ত অঙ্গসজ্জার গুরুত্ব কী?

৪৯। উৎকৃষ্ট অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলার প্রধান শর্তগুলি বর্ণনা করুন।

৫০। একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকলে সেগুলি কি ভাবে স্থাপন করা উচিত?

৫১। খবরের সঙ্গে যথোপযুক্ত ছবি থাকা দরকার হয় কেন?

৫২। ফোটোগ্রাফারের মূলমন্ত্র সদা সতর্ক থাকা— ব্যাখ্যা করুন।

৫৩। কাগজে ছবি ছাপার ব্যাপারে সাধারণভাবে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়?

৫৪। সবরকমের সংবাদচিত্রই কি পাঠকের মনে আগ্রহ জাগায়?

৫৫। খবরের কাগজে ছবি সংগ্রহের উৎসগুলি বর্ণনা করুন।

৫৬। খবরের কাগজ প্রধানত কোন কোন সূত্রে খবর পেয়ে থাকে?

৫৭। ভারতের প্রধান দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার নাম লিখুন। তাঁরা সাধারণত কোন ভাষায় খবর দেয়।

৫৮। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর ব্যবহারের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়ে থাকে?

৫৯। সংবাদ সংস্থার খবর বাংলা কাগজে তরজমা ও সম্পাদনা কারা করেন? তা সম্পাদনার ক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ করা হয়?

৬০। নীচের খবরটি একটি বাংলা খবরের কাগজের জন্য সম্পাদনা করুন।

PRITHVI SUCCESSFULLY TEST FIRED

BALASORE, MAR 31 : INDIA'S SOPHISTICATED MEDIUM RANGE SURFACE-TO-SURFACE MISSILE PRITHVI WAS SUCCESSFULLY TEST FIRED FROM THE INTERIM TEST RANGE (IRT) AT CHANDIPUR-ON-SEA, ABOUT 15 KM FROM HERE TODAY.

MOUNTED ON A MOBILE 8×8 TATRA TRANSPORTER ERECTOR LAUNCHER (TTEL), THE INDIGENOUSLY DEVELOPED 8.56 METRE HIGH AND ONE METRE THICK SLEEK MISSILE WAS BLASTED OFF AT ABOUT 11.30 HRS, ITR SOURCES SAID.

THE MAIN OBJECTIVE OF TODAY'S FLIGHT MISSION WAS TO GAUGE THE PROPULSION PARAMETERS OF THE MISSILE, WHICH FOR THE FIRST TIME WAS PUT TO TOTAL ON A SOLID INSTEAD OF A LIQUID FUEL SYSTEM.

HOWEVER, THE SOURCES DECLINED TO DIVULGE THE DETAILS OF TODAY'S TEST FLIGHT DESCRIBING IT AS A ROUTINE WORK OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION (DRDO) FOR COUNTRY'S INTEGRATED GUIDED MISSILE DEVELOPMENT PROGRAMME (IGMDP). THE MISSION OBJECTIVE OF THE TRIAL WOULD BE FULLY KNOWN AFTER ANALYSING VARIOUS DATAS.

TODAY'S FLIGHT TRIAL OF PRITHVI WAS TRACKED BY A NETWORK OF RADAR, OPTICAL TRACKING TELESCOPE, THREE TELEMETRY STATIONS AND A NAVAL SHIP LOCATED IN THE BAY OF BENGAL CLOSER TO THE IMPACT POINT.

POWERED BY LIQUID PROPELLANT, WITH LATEST ON-BOARD-COMPUTER AND AN ADVANCED INERTIA NAVIGATION SYSTEM, PRITHVI CAN BE FIRED ON TARGETS LOCATED AT A MINIMUM DISTANCE OF 40 KM AND TAKE JUST 300 SECONDS TO REACH ITS TARGET AT A DISTANCE OF 150 KM.

IT HAD A LAUNCH WEIGHT OF 4.6 TONNES WHICH INCLUDED ONE TONNE PAY LOAD.

HOWEVER, IF THE PAY LOAD IS HALF IT CAN HIT THE TARGET UPTO 250 KM RANGE, THE SOURCES SAID.

THE DRDO HAS CONDUCTED 14 FLIGHT TRIALS OF THE ARMY VERSION OF THE MISSILE BEFORE CARRYING OUT TWO USER TRIALS ON JUNE 4 AND 6, 1994 FROM THE ITR. THE FIRST FLIGHT TRIAL OF PRITHVI WAS CARRIED OUT ON FEBRUARY 22, 1988 AT SRIHARIKOTA IN ANDHRA PRADESH.

(সৌজন্য : পিটিআই)

৬১। খবরের কাগজে লেখচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ছে কেন তা আলোচনা কর।

৬২। সংবাদপত্রের রবিবারের ক্রোড়পত্রকে কি বলা হয়?

৬৩। সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র বা সাময়িকী কি ভাবে সম্পাদিত হয়?

৬৪। সংবাদপত্রের সাময়িকীতে কি ধরনের রচনা স্থান পায়?

৬৫। খবরের কাগজের সাময়িকীতে খবরের পটভূমির বর্ণনামূলক একপ্রস্থ লেখা প্রকাশের দরকার হয় কেন এবং তা মেটাবার পরিকল্পনা কি ভাবে করা হয় ?

৬৬। সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য সংবাদ পটভূমি বর্ণনামূলক প্রচ্ছদকাহিনীতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা উদাহরণ সহকারে বর্ণনা করুন।

৬৭। খবরের কাগজের সাময়িকীতে সংবাদের পটভূমির সম্পর্কে রচনাগুচ্ছ সম্পাদক কি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করেন ?

৬৮। সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়— ব্যাখ্যা করুন।

৬৯। বড় খবরের মধ্যে কতকগুলি অংশ থাকে এবং অংশগুলিকে কি বলা হয়?

৭০। খবরের মুখবন্ধের প্রয়োজন এবং তার উপাদানগুলি সম্পর্কে যা জানেন তা বর্ণনা করুন।

৭১। মুখবন্ধ লেখার কোন সহজ সূত্র আছে কি ? থাকলে সূত্রটি কি ?

৭২। এক পরিবারভুক্ত পাঁচজন মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে একটি রিপোর্টের মুখবন্ধ লিখুন।

৭৩। ছত্রে সুব্বা কে? তার ছেলের নাম কি? ছত্রে সুব্বার ছেলেকে গ্রেফতার সম্পর্কে রিপোর্টের মুখবন্ধ লিখুন।

৭৪। ছত্রে সুব্বার ছেলেকে গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে দার্জিলিঙ জেলার পুলিশ সুপারের বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখুন।

৭৫। ডোমকলের সারংপুর গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের খবরটি আপনার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সম্পাদনা ও অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৭৬। কীভাবে খবরের সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ অনুচ্ছেদ রচনা করা যায় ?

৭৭। খবরের কাগজের মূল উপাদানগুলি কী কী?

৭৮। খবরের কাগজ সম্পাদনা কাকে বলে?

৭৯। খবরের শিরোনাম কেমন করে লিখতে হয়?

৮০। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদীদের বিমান-নাশকতার ঘটনার শ্রেষ্ঠ শিরোনাম কোনটি তার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৮১। শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা চলাকালে একটি কাগজ শিরোনামে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, "রোনাল্ডো না খেললে সমস্যা হবে ব্রাজিলের"। এই ভবিষ্যৎবাণীর কি পরিণতি হয়েছিল?

৮২। খেলার খবর এবং জেলার খবরের পাতার খসড়া কারা তৈরি করেন?

৮৩। বিজ্ঞাপন ও খবরের মধ্যে কোন বিষয়বস্তু খসড়া তৈরিতে অগ্রাধিকার পায় এবং তার কারণ কি?

৮৪। প্রুফ সংশোধন না করার ফলে কি হয়?

৮৫। কি রকমে ছবি পাঠকের মনে আগ্রহ জাগাতে পারে না।

৮৬। কোন মানুষ বা আর কোন যন্ত্র কো তিনটি ব্যাপারে কম্পিউটারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না?

৮৭। সংবাদ সরবরাহ সংস্থা সম্পর্কে ৪০ থেকে ৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লিখুন।

৮৮। কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা খবরের কাগজের সাময়িকীর নাম লিখুন।

৮৯। একটি বাংলা খবরের কাগজের চার পাতার রবিবারের সাময়িকী প্রস্তুত করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১। কম্পিউটরের মনিটর এবং প্রিন্টার _______ অন্তর্ভুক্ত।

২। মনিটর হল কম্পিউটারের _______।

৩। কম্পিউটারের _______ অনুলিপি ছাপিয়ে দেয়।

৪। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের _______ কাজ করে।

৫। দাদাঠাকুর বলতেন আমার ছাপাখানা _______ ছাপাখানা নয়।

৬। কম্পিউটারের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর _______ গতি।

৭। কম্পিউটার মানুষের সবচেয়ে _______ ও _______ ভৃত্য।

৮। খবরের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেয় তার _______।

৯। ভুলে ভরা কাগজ মানুষের _______ খোরাক হয়।

১০। উন্নত ও সুরুচিসম্পন্ন অঙ্গসজ্জা কাগজের _______ ও _______ বৃদ্ধি করে।

১১। খবরের কাগজের সাময়িকী মূল কাগজের সঙ্গে _______ করে না।

ব্যাখা করুন :

১। খবরের পরিচয় বহন করে তার শিরোনাম।

২। পাতার খসড়া তৈরি ব্যবস্থাপনা।

৩। প্রুফ রিডারদের দায়িত্ব।

৪। ছাপাখানার চেক পোস্ট।

৫। বৈদ্যুতিন মুদ্রণ ব্যবস্থায় প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলি অচল।

৬.৫ উত্তর-সংকেত

১) মুদ্রণের কাজে সাবেক আমলে ধাতুনির্মিত হরফ সাজাবার ব্যবস্থা ছিল। হাতে করে এই কাজ করা হত।

২) দাদাঠাকুরের প্রকৃত নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনি দুটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

৩) দাদাঠাকুর নিজেই বলতেন, তাঁর ছাপাখানা হালফ্যাসানি ছাপাখানা নয়।

৪) দাদাঠাকুর সম্পাদিত পত্রিকা দুটির নাম 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ও 'বিদূষক'।

৫) কী বোর্ডের (Key Board) চাবি টিপে লাইন লাইন কম্পোজ করার যন্ত্রকে লাইনো টাইপ মেশিন বলা হয়।

৬) হরফ বিন্যাসের কাজে গরম ধাতু পদ্ধতির (Hot Metal Process) জায়গায় এসেছে শীতল পদ্ধতি (Cold Process)। কম্পিউটারের মাধ্যমে হরফ বিন্যাসের কাজকে শীতল পদ্ধতি বলা হয়।

৭) আধুনিককালে কম্পিউটারের মাধ্যমে হরফবিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলির মধ্যে রয়েছে কী বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি।

৮) পার্সোনাল কম্পিউটারের কী বোর্ডে বর্ণমালার প্রতিটি হরফ, ০-৯ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা, যতি ও ছেদচিহ্ন থাকে।

৯) কম্পিউটার ব্যবহারকারী বা চালকের আজ্ঞা পালনের পর যে সব যন্ত্রাংশের মধ্যে দিয়ে তার ফল জানা যায় তার সবগুলিকে বলে আউটপুট ডিভাইস (Output device)।

১০) আউটপুট ডিভাইসের পর্দা প্রিন্টার।

১১) কম্পিউটারের যে সব যন্ত্রাংশ আমাদের চোখের সামনে থাকে সেগুলিকে হার্ডওয়্যার বলা হয়।

১২) কম্পিউটারের প্রথম ও সব চেয়ে বড় পরিচয় হল এই যন্ত্র বর্ণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে পাঠ্যবস্তু সৃষ্টি, মজুত, সংশোধন ও সরবরাহ করতে পারে।

১৩) কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল এর অবিশ্বাস্য গতি, এক যন্ত্রে অনেকগুলি কাজ করার ক্ষমতা এবং অসাধারণ স্মরণশক্তি।

১৪) সমন্বয়ে।

১৫) খবরের বিশদ বিবরণ ছাপার জন্য যে হরফ ব্যবহার করা হয় তাকে বলে বডি টাইপ (Body type)। এই টাইপের সাধারণ মাপ ১২ পয়েন্ট। খবরের শিরোনামে যে সব হরফ ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে বলে ডিসপ্লে টাইপ (Display type)। ডিসপ্লে টাইপ ২৫ পয়েন্টে আরম্ভ হয়ে বাড়তে থাকে।

১৬) কম্পিউটার নির্ভর মুদ্রণ ব্যবস্থায় অক্ষরের মাপের হিসাবের একককে পয়েন্ট বলা হয়।

১৭) খবরের বিশদ বিবরণ পড়ার আগে তার বিষয়বস্তুর পরিচয় পেতে গেলে তার শিরোনাম পড়তে হয়। শিরোনাম পড়লেই বোঝা যায় খবরে কী আছে। সেই জন্যই বলা হয় খবরের পরিচয় তার শিরোনাম।

১৮) চিফ সাব হাত না দিলে খবরের শিরোনাম লেখার প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট খবরটি যিনি সম্পাদনা করেন সেই সাব এডিটরের।

১৯) খবরের শিরোনাম রচনার সময় খবরের গুরুত্বের দিকে নজর দিতে হয়।

২০) খবরের শিরোনাম রচনায় ভাষার মারপ্যাঁচ বা পাণ্ডিত্য ফলানোর সুযোগ নেই। কারণ, খবরের কাগজের শিরোনামে ভাষার মারপ্যাঁচ থাকলে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকরা তার মর্ম ভেদ করতে অসুবিধার বোধ করতে পারেন। আর পণ্ডিতরা নয়, সাধারণ শিক্ষিত মানুষরাই কাগজের পাঠকদের গরিষ্ঠ অংশ।

২১) খবরের পরিচয় দেওয়া এবং কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যই সুলিখিত শিরোনাম দরকার।

২২) শিরোনামের প্রস্থের মাপ খবরের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে।

২৩) ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।

২৪) সন্ত্রাসবাদীরা ছিনতাই করা বিমান গুলি চালিয়ে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনে পেন্টাগন ভবন দুটির ক্ষতি করেছিল।

২৫) করাচি পাকস্তানের একটি বন্দর শহর।

২৬) করাচিতে মার্কিন কনসুলেটের সামনে বোমা বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত হন। এই বিষয়ে খবরের চারটি শিরোনাম এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২৭) খ কাগজে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক খবরের শিরোনামটি সব থেকে ভালো। কারণ, একমাত্র এই শিরোনামেই জানা যাচ্ছে, বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলায় জিতেছে ব্রাজিল।

২৮) কে আর নারায়ণন ২০০২ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

২৯) কালামের প্রার্থীপদ সমর্থন করেছিল বি জে পি'র নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা, প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং মোর্চা বহির্ভূত আর কয়েকটি দল।

৩০) ঝ কাগজের শিরোনামে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বামপন্থীদের অসুবিধার দিকটি বড় করে তোলা হয়েছে। কংগ্রেসের কালামের প্রতি সমর্থনটি তুলনায় গৌণ হয়ে গেছে। এর থেকে কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে, কাগজটি বামপন্থীদের লোকচক্ষে হেয় করতে চায়। অর্থাৎ, কাগজটি নিরপেক্ষ নয়। পাঠকদের এই রকম সন্দেহ কাগজের গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়।
জ কাগজে পাঁচটি শব্দের মধ্যে খবরটির যথাযথ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। পাঠক শুধু শিরোনাম পড়েই বুঝে যাবেন, এন ডি এ প্রার্থী কালামকে কংগ্রেসও সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কংগ্রেসের এই সমর্থনে কালামের জয় নিশ্চিত হয়ে গেল।

৩১) শিরোনামে খবরের তুলনায় অনুমান এবং কল্পনার ভাগই বেশি। খবরের শিরোনামে রোনাল্ডোর মাঠে নামা নিয়ে সংশয় ফুটে উঠেছে। একই দিনে অন্য কাগজের খবরের শিরোনামে পাঠক জানতে পারছেন, রোনাল্ডো মাঠে নামার জন্য দৈহিকভাবে যোগ্য আছেন। সুতরাং তাঁর না খেলার কথা এবং তার জন্য ব্রাজিলের সমস্যার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। সুতরাং এই দুটি বিষয়ে ফলাও করে লেখা সংবাদদাতার মনগড়া ও অনুমানের ফল। কাজে ফাঁকি মারার ফলও হতে পারে।
রোনাল্ডো মাঠে না নামলে ব্রাজিলের অসুবিধা হবে এটা সংবাদদাতার কল্পনা। কারণ, বাস্তবে দেখা গেল যাকে নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা সেই রোনাল্ডো মাঠে নামলেন কিন্তু পুরো সময় মাঠে থাকলেন না। তাঁর পুরো সময় অনুপস্থিতি ব্রাজিলের জয়ের পথে কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারল না।

৩২) ২০০২ সালের ২৫ জুন ভারতের সংবাদপত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেওয়া হল। তার আগে পর্যন্ত ভারতের কোন খবরের কাগজে বিদেশিরা এক টাকাও বিনিয়োগ করতে পারত না। এখন থেকে তারা এই শিল্পে মোট পুঁজির ২৬ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারবে। এই কারণে তারিখটি ভারতের সংবাদ শিল্পের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক দিন।

৩৩) ভারতের সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশি পুঁজির অংশ নেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। এই সিদ্ধান্ত বিশ্বায়নের লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ। এত বড় একটি ঘটনাকে ক কাগজ উপযুক্ত শিরোনামসহ প্রথম পাতায় দ্বিতীয় প্রধান সংবাদের মর্যাদা দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। অথচ এত বড় একটা পরিবর্তনকে খ কাগজ উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হল। এটা ফিচার বিভ্রাটের পরিণাম।

৩৪) আলোচ্য খবরটির বিষয়বস্তু ছিল গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন অক্টোবরের মধ্যে করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের সুপারিশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক খারিজ করা। অক্টোবরের মধ্যে ঠিক কোন মাসে এই নির্বাচন হবে সে কথাও নির্বাচন কমিশন জানায় নি। এই খবরে চ কাগজের শিরোনাম "গুজরাতে এখন ভোট হচ্ছে না" যথাযথ শিরোনাম।

৩৫) খ কাগজের শিরোনামটি সবচেয়ে ভালো। কারণ এই শিরোনামটিতে সংক্ষিপ্ততম উপায়ে মূল খবরটি পরিবেশিত হয়েছে।

৩৬) জ কাগজের শিরোনামটি সবচেয়ে ভালো হয়েছে। কারণ একমাত্র এই কাগজে সবচেয়ে কম বাক্যে মূল খবরটি ধরে দেওয়া হয়েছে।

৩৭) খবরের শিরোনামের প্রয়োজন বহুবিধ।
শিরোনাম খবরের পরিচয় দেয়।
শিরোনাম কাগজের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।
শিরোনাম কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
শিরোনাম কাগজের পাতা সাজাতে সাহায্য করে।

৩৮) কোন বইয়ের কোন নির্দিষ্ট বিষয় ঠিক কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তা দেখিয়ে দেয় সূচিপত্র। ঠিক তেমনি কোন বিষয়ে খবর কোথায় রয়েছে তা শিরোনামে চোখ বুলিয়েই বুঝে ফেলা যায়। এই কারণেই শিরোনামকে খবরের কাগজের সূচিপত্র বলে।

৩৯) খবরের কাগজ ছাপার আগে তার প্রতিটি পাতার কোথায় কী থাকবে তা সাজিয়ে দেওয়া হয়। পাতা সাজাবার এই কাজকে বলে পাতার খসড়া, নকশা বা নকল তৈরি করা।

৪০) নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা খবরের কাগজের বিভিন্ন পাতা সাজিয়ে দেন—
বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা
ক্রীড়া সম্পাদক
নির্দিষ্ট পালার চিফ সাব
বাণিজ্যিক সম্পাদক
বিনোদন সম্পাদক
সহকারী সম্পাদক

৪১) সব ব্যাপারের মত পাতা সাজাবার ব্যাপারটিও বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদকের অনুমোদনসাপেক্ষ। তবে তাঁরা সাধারণত এই ব্যাপারেও চিফ সাবের ওপর প্রতিদিন খবরদারি করেন না। তবে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে চিফ সাবের সঙ্গে তাঁরাও পাতা সাজাবার ব্যাপারে মাথা ঘামান।

৪২) খবরের কাগজের পাতা সাজানোর প্রথম ধাপে বিজ্ঞাপনগুলি যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়। বিজ্ঞাপনগুলি খোপে খোপে স্থাপন করার পর পাতার শূন্য স্থানে খবর স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪৩) খবরের কাগজের পাতার খসড়া তৈরি করার সময়ে বিজ্ঞাপন অগ্রাধিকার পায়।

৪৪) খবরের কাগজ ছাপা শুরু হওয়ার মুখে অথবা ছাপা চলাকালে কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর পাওয়া গেলে নির্ধারিত খসড়া বদল্যবার প্রয়োজন হয়।

৪৫) পাতা সাজাবার মধ্যে দিয়ে পাঠককে হাসাতে, কাঁদাতে, ভাবাতে, উত্তেজিত করতে পারলে বুঝতে হবে পাঠক খবরের সঙ্গে মিশে গেছেন। পাতা সাজানো সার্থক হয়েছে।

৪৬) খবরের কাগজে ছাপার জন্য নির্বাচিত খবর বা নিবন্ধের পাণ্ডুলিপির প্রথম মুদ্রণকে প্রুফ কপি বলা হয়।

৪৭) প্রথম মুদ্রণে যে সব ভুল থাকে তা ঠিক করে দেওয়ার জন্য প্রুফ সংশোধন করা দরকার।

৪৮) যারা প্রুফ পড়েন ও সংশোধন করেন তাঁদের প্রুফ রিডার বলা হয়।

৪৯) প্রুফ কপিতে নিম্নলিখিত ভুলগুলি থাকতে পারে—

বানান

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অসঙ্গতি

ব্যাকরণগত

তথ্যগত

৫০) প্রুফ রিডাররাই ভুল সংশোধন করে দেন কিংবা ডেস্কে গিয়ে সংশোধন করে নেন।

৫১) প্রুফ রিডাররা নিখুঁত ও নির্ভুল কাগজ প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেন। সেই জন্য খবরের কাগজ সম্পাদনায় তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৫২) প্রুফের ভুল সংশোধনের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলি সব দেশেই এক রকম।

৫৩) খবরের কাগজের পাঠ্যবস্তু তৈরির জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে প্রুফ সংশোধনের পদ্ধতি বদলে গেছে। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলি অচল ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব একই রকম আছে।

৫৪) নির্বাচিত খবর ও নিবন্ধগুলি ছাপার জন্য তৈরি হবার এবং ছবিগুলি বাছাইয়ের কাগজ শেষ হবার পর খবরের কাগজের অঙ্গসজ্জার কাজে (Lay out) হাতে দেওয়া হয়।

৫৫) কোন খবর, কোন নিবন্ধ এবং কোন ছবি কতটা জায়গা নিয়ে পাতার কোথায় স্থাপিত হবে তা স্থির করাকে পাতার অঙ্গসজ্জা বলা হয়।

৫৬) উন্নত ও সুরুচিসম্পন্ন অঙ্গসজ্জার দ্বারা কাগজের কাগজের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করা হয়। এটাই অঙ্গসজ্জার গুরুত্ব।

৫৭) উৎকৃষ্ট অঙ্গসজ্জার চারটি প্রধান শর্ত আছে। সেগুলি হল—

সংবাদের গুরুত্ব বুঝে অগ্রাধিকার দেওয়া

পাতাগুলির অঙ্গসজ্জা মানানসই করা

পাতাগুলি দৃষ্টিনন্দন করা

পাঠকের মন বুঝে খবরগুলি নির্ধারিত পাতায় স্থাপন করা।

৫৮) একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক খবর থাকলে সেগুলি একই পাতায় কাছাকাছি জায়গায় স্থাপন করতে হয়। তাতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব পাঠককে সহজে বোঝান যায়। সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে পাতা সাজানো যায়।

তার বদলে খবরগুলি একই পাতায় প্রদর্শন না করে বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে দিলে ব্যাপারটার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। পাতার অঙ্গসজ্জা মানানসই বা সুন্দর কোনটাই হয় না।

৫৯) দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বড় ম্যাচ, বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি ইত্যাদি দিনের প্রধান প্রধান খবরের সঙ্গে উপযুক্ত ছবি না থাকলে খবরের অঙ্গহানি ঘটে।

৬০) ঘটনার সবচেয়ে চমকপ্রদ মুহূর্তের ছবি পাঠকদের উপহার দেবার ইচ্ছা থাকলে ফটোগ্রাফারকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। এক লহমায় অসতর্কতায় তিনি ঘটনার সবচেয়ে নাটকীয়, সবচেয়ে ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবিটি হারাতে পারেন। তখন তিনি আর কোন উপায়ে, আর কোন মূল্যে হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তটিকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

৬১) অশ্লীল এবং এই ধরনের বেআইনি বিষয় ছাড়া অন্য যাবতীয় বিষয়ে ছবি কাগজে ছাপার ব্যাপারে কোন অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নেই। সম্পাদকের রুচি ও বিচারবুদ্ধিই এই ব্যাপারে একমাত্র আইন। তবে পাঠকদের পছন্দ অপছন্দও এই ব্যাপারে খুব বড় কথা। পাঠকরা সাধারণত বীভৎস কোন ছবি দেখা পছন্দ করেন না। সেই কারণে পাঠক আতঙ্কিত হন বা তাঁর মনে বিকার সৃষ্টি হয় এমন কোন ছবি কাগজে ছাপা হয় না।

৬২) মামুলি ছবি পাঠকের নজর কাড়ে না। একটি ছোটোখাটো সভা বা অনুষ্ঠানে কোন নেতা বা মন্ত্রীর ভাষণ, নেতা বা মন্ত্রীকে মাল্যদান, ফিতে কেটে কোন কিছুর উদ্বোধন এই রকম সাধারণ ঘটনার ছবিতে পাঠকের আগ্রহ থাকে না।

৬৩) খবরের কাগজের ছবি সংগ্রহের সূত্রগুলি নীচে দেওয়া হল—
স্টাফ ফটোগ্রাফার
ফ্রিলান্স ফটোগ্রাফার
বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ সংস্থার ফটো ডিভিশান
বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বিভাগ
বিভিন্ন দূতাবাস
স্থানীয় কোন স্টুডিয়োর ফটোগ্রাফার
স্থানীয় কোন সখের ফটোগ্রাফার

৬৪) খবররের কাগজের প্রধান সংবাদ সূত্রগুলি হল—
রিপোর্টারবৃন্দ
সংবাদ সরবরাহ সংস্থা

৬৫) ভারতের প্রধান দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা হল—
প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া — Press Trust of India, সংক্ষেপে পি টি আই (PTI) এবং
ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া — United News of india, সংক্ষেপে ইউ এন আই (UNI)।
এই সংস্থা দুটি ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে।

৬৬) বাংলা ভাষার খবরের কাগজগুলি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর বাংলায় তরজমা করে দেয়।

৬৭) বাংলা কাগজের সাব-এডিটররা সংবাদ সংস্থার খবর তরজমা ও সম্পাদনা করেন। এই কাজে পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ সাব যে ভাবে বলে সাব-এডিটর সেইভাবে কাজ সারেন।

৬৮) এই কাজটি আপনি নিজে করতে চেষ্টা করুন।

৬৯) নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য খবরের কাগজে লেখচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে—
কম্পিউটার যুগের আধুনিক খবরের কাগজ লেখচিত্র ছাড়া অঙ্গহীন বলা গণ্য হচ্ছে।
লেখচিত্র কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
লেখচিত্রের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চট করে খুঁজে নেওয়া যায়।

৭০) সংবাদপত্রের রবিবারের ক্রোড়পত্রকে সাময়িকী বা ম্যাগাজিন বলা হয়।

৭১) কয়েকজন সাব-এডিটরের সাহায্যে একজন সহকারী সম্পাদক সাময়িকী সম্পাদনা করেন।

৭২) সংবাদপত্রের সাময়িকীতে সাহিত্য সম্পর্কিত নানাবিধ লেখা প্রকাশিত হয়।

৭৩) কাগজের খবরের পাতায় কোন বড় খবরের পটভূমি বা পার্শ্ব কাহিনী বিস্তারিতভাবে প্রকাশের প্রয়োজন থাকলেও তার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায় না। অথচ ওই সব বিষয়ে জানার জন্য পাঠকদের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। তাঁদের সেই তৃষ্ণা মেটাবার জন্য সাময়িকীর পাতায় বড় বড় চাঞ্চল্যকর খবরের পটভূমি ও পার্শ্ব কাহিনী ছাপা দরকার হয়।

৭৪) নিজে লিখুন।

৭৫) খবরের কাগজের সাময়িকীর প্রচ্ছদ কাহিনীর জন্য পরিকল্পিত বিষয়টি ঠিক হবার পর সম্পাদক বিষয়ভিত্তিক লেখাগুলি রচনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন। তাঁদের কবে ক'টার মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে সংবাদের পটভূমিভিত্তিক প্রচ্ছদ কাহিনীর রচনাগুচ্ছ সংগ্রহ করা হয়।

৭৬) দৈনিক খবরের কাগজ প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। তাতে টাটকা খবর পাওয়া যায়। খবরের কাগজের সাময়িকী সপ্তাহের শেষ দিনটিতে প্রকাশিত হয়। সেই জন্য তাতে টাটকা খবর প্রকাশের সুযোগ নেই। এই কারণে সাময়িকী তার মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

৭৭) বড় খবরের মধ্যে দুটি অংশ থাকে— মুখবন্দ বা এবং বিশদ বিবরণ বা।

৭৮) খবরটি পড়তে পাঠককে আগ্রহী করে তোলার জন্য উপযুক্ত মুখবন্ধ বা দরকার। খবরের প্রধান তথ্যগুলি হল মুখবন্ধের উপাদান।

৭৯) নিজে লেখার চেষ্টা করুন।

৮০) নিজে লিখুন।

৮১) নিজে লিখুন।

৮২) নিজে করুন।

৮৩) খবরের সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ অনুচ্ছেদ রচনার পদ্ধতি হল—

অপ্রয়োজনীয় ও ফালতু কথা বর্জন

নাটকীয় ভাষা বর্জন

কেবল তথ্য পরিবেশ

এক একটি অনুচ্ছেদে একাধিক তথ্য পরিবেশন না করে একটি তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা, রোনাল্ড ই উলসলে কর্তৃক সম্পাদিত, বাংলা একেডেমি, ঢাকা, জুন, ১৯৮১। সাঁইত্রিশ টাকা।

২. দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

৩. News Editing, Bruce Westley, Oxford and IBH Publishing Co. Kolkata : New Delhi.